পরিচারিকা ।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ।

(নব পর্য্যায়)
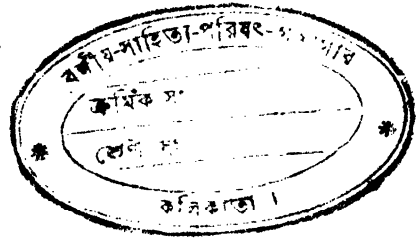
রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত ।

সহঃ সম্পাদক— শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস ।

পঞ্চম বর্ষ ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক ।

কোচবিহার ।

কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা ।

পরিচারিকা।

পঞ্চম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩২৮ সনের জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—:০:—

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৫ম বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সাল। { ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

স্মৃতির সৌরভ।

—:•:—

জানি টুটে যাবে বীণার তন্ত্রী
মিশে যাবে কাল-প্রবাহ সনে;
সঙ্গীত তার নাহি হবে লয়,
গাঁথা রবে সুর মানব-মনে!
নিঠুর-নিয়তি নির্ম্মম-বায়—
ফুল-হাসি-ডোর ছিঁড়ে দিয়ে যায়;—
গন্ধ যে তবু ভাসিয়া বেড়ায়
আকুল করিয়া বিশ্বজনে,
অমিয়-সাগরে ডুব্ দিয়ে সে যে
ফুটে উঠে পুনঃ মনের বনে।

প্রথম-মিলন-বাসরে তোমায়
দিছিনু যে মালা প্রণয় ভরে—
আজি সে শুষ্ক, তবু যে পুরাণ
প্রেমের সুরভি বহন করে।
মরণ, তুহিন-কর পরশিয়া
নিয়েছিল তোমা গোপনে হরিয়া,
স্মৃতি হয়ে আজ আসিলে ফিরিয়া—
লুটিয়া পড়িলে হৃদয়'পরে ;—
মৃত্যু-বিজয়ী প্রেমের গৌরী
পারে কি ভুলিতে আপন ঘরে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

চিররহস্য সন্ধানে।

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাচ্য ভূখণ্ডের কোনো এক সুদূর প্রদেশে, বহু শতাব্দী আগে এক সাধুপুরুষ বাস কর্‌তো,—তা'র নাম ছিল ফিলেমন। জ্ঞানার্জ্জনের জন্যে পরিশ্রম আর আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্যে চিন্তা বা প্রার্থনা, এই ছিল তা'র আজীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। যত কিছু আকাঙ্ক্ষা তা'র, সবই সেই এক মহা-অজ্ঞাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাক্‌তো ; যত

কিছু আগ্রহ, তা' এই বিরাট রহস্য-যবনিকা ভেদ করে' সৃষ্টি রহস্যটীকে আবিষ্কার করতে চাইতো। নরজীবনের এই সমস্ত দুঃখ, সুখ, আশা, স্মৃতি—এগুলোকে সেই অজ্ঞাত পরলোকের বিচিত্র সম্ভাবনার সঙ্গে তুলনা ক'রে সে মনে মনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে এ-সমস্তগুলো হ'চ্ছে নিতান্তই অসার, নিতান্তই তুচ্ছ এবং ঘৃণ্য। নির্জ্জনে ব'সে, ঐ এক পরলোকের স্বপ্ন-কল্পনাতেই সে বিভোর থাকৃতো।"

এইখানে একটু থামিয়া, পিয়োনোর চাবিগুলির ভিতর হইতে কেরাঙ্গ এক মৃদু-মধুর স্বর-ধারা তরঙ্গিত করিয়া তুলিল; সে ধ্বনির সুমধুর রেশটুকু তাহার পরবর্ত্তী বাক্যগুলির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মিলাইয়া গেল :—

"এম্‌নি ক'রে, আপন অজ্ঞাতসারে, পৃথিবীর কথা ক্রমেই ফিলেমন ভুলে যেতে লাগলো; এ-জগতের নরনারী, এখানকার বালকবালিকা,—আকাশের নীলিমা, শস্যক্ষেত্রের শ্যামলতা, —লতাপুষ্পের সৌন্দর্য্য, বিহঙ্গ সঙ্গীতের মাধুর্য্য—এককথায়, কেবল আপনাকে ছাড়া আর সমস্তই সে ভুলে গেল। মনে রইলো কেবল আপন অস্তিত্ব, আপন আকাঙ্ক্ষা, আপন জ্ঞান, আর জন্মমরণের ঐ সনাতন রহস্য-উৎসটীর সমীপবর্ত্তী হবার অনন্ত ইচ্ছা।"

স্বর-সঙ্গীত এবার যেন সখেদ-কোমল হইয়া আসিল।

"ক্রমে ক্রমে এই সাধুপুরুষটীর কথা নিকটবর্ত্তী লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়্‌লো,—সহরের মধ্যে অনেকেই তা'র উপবাসের ক্ষমতা, তা'র নিষ্ঠার কথা নিয়ে মহা আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিলে,—তা' ছাড়া তা'র সম্বন্ধে এমন সমস্ত অত্যুক্তিমূলক গল্পগুজব সৃষ্টি হ'তে লাগলো যে লোকে ভয়ে, বিস্ময়ে, আশায় আশ্বাসে উত্তরোত্তর সে-দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। ফলে, দেশের যত শোকার্ত্ত, রুগ্ন, বা উৎপীড়িত ছিল, তা'রা একদিন মস্ত এক দল বেঁধে ঐ সাধুর আশ্রমে এসে হাজির হ'ল।

"আমাদের ওপর একটু কৃপাদৃষ্টি করুন, প্রভু!" মাটীতে নতজানু হ'য়ে কাতর কণ্ঠে তা'রা বল্‌তে লাগ্‌লো—"খেটে খেটে আমরা আধমরা হ'য়ে গেছি, হৃদয়মন বড়ই অবসন্ন, যা-কিছু জীবনকে মূল্যবান করে' তোলে আমাদের অনেকেই তা' হারিয়েছি। আপনি দয়া না করলে কোথায় যাবো; দোহাই প্রভু, ভগবানের প্রতিভূ আপনি,—বলুন, আমাদের কি উপায় হবে—কেমন করে' আমরা হারানো শান্তি ফিরে পাবো!"

"রাগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ফিলেমন আসন ছেড়ে উঠ্‌লো; পরে জনতার সাম্‌নে গিয়ে চীৎকার করে বল্‌লে—"দূর হ'য়ে যা', হতভাগা আবর্জ্জনাগুলো, দূর হ'য়ে যা' আমার সাম্‌নে থেকে! কি কর্ত্তে এখানে এসেছিস? তোদের তুচ্ছ অভাব-বেদনার কথা শুনে কি লাভ আমার? তোদের দুরদৃষ্ট তোরা নিজেরাই গড়ে তুলেছিস্, তা'র ফল-ভোগ করাই হ'চ্ছে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। এখানে একবিন্দুও সহানুভূতি পাবিনে,—পাপকে কোনোমতেই আমি দয়ার চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বো না। পাছে তোদের সঙ্গে বাস করে' কলুষিত হই, সেই ভয়েই আমি লোকসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এসেছি,—এ জীবন ভগবানের জন্যে উৎসর্গ-করা, মানুষের জন্যে নয়!"

"এ কথায় উপস্থিত সকলেই চটে উঠ্‌লো; পরে ক্ষুব্ধচিত্তে নিজের নিজের বাড়ী ফিরে গেল। অপরদিকে ফিলেমনও, পাছে লোকগুলো আবার তা'কে বিরক্ত কর্‌তে আসে এই ভয়ে, সে-স্থান পরিত্যাগ করে' এক গভীর বনের মধ্যে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে বাস কর্‌তে লাগ্‌লো। সে স্থির কর্‌লে যে এই গাঢ় নির্জ্জনের নিস্তব্ধতার মধ্যে থেকেই যোগাভ্যাস চালাবে এবং হৃদয়মনকে প্রকৃতির দূষিত-স্পর্শ থেকে সদাসর্ব্বদা পবিত্র রেখে ভগবৎ-চিন্তায় জীবন কাটাবে।"

আবার সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হইল,—শৈল-গাত্র-বাহী নির্ঝর-প্রবাহশব্দের মত সে ধ্বনি এবার হিল্লোলিত; ফেরাজ বলিতে লাগিল:—

"একদিন সকালবেলা, আত্ম-চিন্তায় বিভোর হ'য়ে যখন সে দৈনিক প্রার্থনায় প্রকৃতির দিকে অভিনিবিষ্ট, সেই সময় একটী ছোট্ট পাখী তা'র জান্‌লার ওপর উড়ে এসে মহানন্দে গান আরম্ভ করে' দিলে। সে-গান অবশ্যই ওস্তাদী চীৎকার নয়; অতি মধুর সঙ্গীত, যতদূর সম্ভব কোমলতায় ভরা,—যা'র জন্মভূমি মুক্ত আকাশতলের মৃদুল বাতাস, শ্যামল শষ্পক্ষেত্র আর কানন-প্রদেশের সবুজ তরু-পল্লব। ফিলেমনের কাণে সে গান প্রবেশ-লাভ কর্‌লে এবং তা'র মনও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। মধুর সে গান; এত মধুর যে তা' শুন্‌তে শুন্‌তে এমন সমস্ত স্মৃতি ফিলেমনের মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌লো যা' বিস্মৃত বলেই তা'র ধারণা ছিল; আবার যেন সে তা'র মাতার স্নেহ-স্বর ঐ গানের ভেতর দিয়ে শুন্‌তে পেলে,—কৈশোর ও

যৌবনের মধুর দিনগুলি এমনভাবে তা'র মনে জেগে উঠ্‌তে লাগলো, যেন কোনো পূর্ব্বপ্রিয় কবিতার সুপরিচিত পংক্তিগুলি বিস্মরণের মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে পাখীটা উড়ে পালালো,—ফিলেমনও যেন হঠাৎ কোন স্বপ্নের মাঝখান থেকে চম্‌কে জেগে উঠ্‌লো;—কারণ যোগে বিঘ্ন ঘটে গিয়েছে এবং একটা তুচ্ছ পাখীর কাকলী-মোহে তা'র চিন্তাপ্রবাহ স্বর্গচ্যুত হ'য়ে একেবারে মর্ত্ত্যে এসে পড়েছে!"

"নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে সারাদিনটা সে অনুতপ্ত চিত্তে অতিবাহিত করলে এবং পরদিন প্রভাতে আরও বেশী একাগ্রতার সহিত ধ্যানাদিকার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। কিন্তু যোগাসনের ওপর বসে' যখন সে আত্মান্বেষণে ঘোরতর অভিনিবিষ্ট, ঠিক সেই সময় পূর্ব্বদিনের ঐ পাখীটার কম্পিত-মধুর কণ্ঠস্বর, গাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতর দিকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠ্‌লো.—ফিলেমন চম্‌কে উঠ্‌লো,—প্রথমটা সে বিস্মিতই হ'য়েছিল, পরে তা'র মধ্যে ক্রোধেরই সঞ্চার হ'তে লাগ্‌লো। অধীরভাবে চক্ষুরুন্মীলন করতেই সে দেখ্‌তে পেলে যে পাখীটা খুব কাছেই রয়েছে, প্রায় তা'র আয়ত্তের মধ্যেই,—কুঁড়ের ভেতর উড়ে এসে,'—মেঝের ওপর লাফাতে লাফাতে, সেটা এখন তা'র দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে; উজ্জ্বল দু'খানি চক্ষুতে ভয়ের লেশমাত্রও নেই, বরং সেখানে পূর্ণ বিশ্বাসই বর্ত্তমান,—তা' ছাড়া তা'র ছোট ছোট ডানাদুটী তখনও গানের আবেগে স্পন্দিত হ'চ্ছে। ফিলেমন একখানা চ্যালাকাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে তা'র মাথায় আঘাত করলে এবং সেই তুলোর মত নরম মৃতদেহটাকে বনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে' উঠ্‌লো—'তুই অন্ততঃ আমার যোগে আর বিঘ্ন ঘটাতে পার্ব্বিনে'!"

"এদিকে, ঐ কথাটা তা'র মুখ থেকে উচ্চারণ হবা মাত্র, সমস্ত কুঁড়েখানা একটা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো; এত উজ্জ্বল সে আলোক যে দিনের আলো তার কাছে কিছুই না! পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, কুঁড়ের মধ্যে যে জায়গাটা ঐ মৃত বিহঙ্গের শোণিত-সিক্ত, ঠিক সেইখানে এক অপার্থিব মূর্ত্তি দণ্ডায়মান! ফিলেমন একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেল, তা'র সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগ্‌লো,—কারণ এ-স্বপ্ন তা'র ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। এই বিস্ময়ের ভাবটা কাটতে না কাটতেই জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হ'ল—

"ফিলেমন, কি জন্যে তুমি আমার দূতকে হত্যা করলে?"

"সভীতি-বিস্ময়ে ফিলেমন উত্তর কর্‌লে—"

"সে কি প্রভু! একটা পাখী ছাড়া অন্য কাউকেই তো আমি হত্যা করিনি!"

জলদ-গম্ভীর স্বরে পুনরুক্ত হইল:—"হৃদয়হীন তাপস!—এ কথাও কি তোমার জানা নেই যে অরণ্যের প্রত্যেক বিহঙ্গটী আমার,—বৃক্ষের প্রতি পত্রটী আমার,—প্রত্যেকটী তৃণ, প্রত্যেকটী পুষ্প, আমারই সম্পত্তি আমারই অংশ? যে পাখীটীকে তুমি হত্যা করেছো তা'র সঙ্গীত তোমার প্রার্থনার চেয়ে অনেক বেশী মধুর ছিল;—আর ঐ গান শোন্‌বার সময় স্বর্গের এতখানি কাছাকাছি হয়েছিলে যা' পূর্ব্বে কখনো হয়নি! তুমি আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছো;—প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে' আমাকেই প্রত্যাখ্যান করেছো;—বিশেষতঃ, বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা না দিয়ে যখন তুমি বিপন্ন দরিদ্র-দলকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো, তখন আমিও তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম এবং তোমার সমস্ত আবেদন নামঞ্জুর কর্‌লাম। অতঃপর তোমার শাস্তির কথা শোনো। সহস্রবর্ষকাল এই অরণ্যের মধ্যে তোমাকে বাস কর্‌তে হবে; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তোমার ভাগ্যে নর-সন্দর্শন ঘট্‌বে না। পশুপক্ষী পুষ্পপত্রাদি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সঙ্গী তুমি পাবে না,—এদের মাঝখান থেকেই তুমি জ্ঞান-সঞ্চয় করবে—এদের ভালবেসেই কালে ভগবানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন কর্ত্তে সক্ষম হবে! যাও, এখন আর তপস্যা নয়, উপবাস নয়,—মুক্তির পথের-হিসাবে এরা নিতান্তই নগণ্য; কিন্তু ভালবাস, সমস্ত প্রাণ ঢেলে ভালবাস্‌তে চেষ্টা কর,—তুচ্ছতম জীবটীরও প্রিয় হ'বার চেষ্টা কর; এই উপায়েই একদিন ভগবৎ-রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হবে!"

"স্বর থেমে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিও মিলিয়ে গেল; ফিলেমন যখন চোখ তুলে চাইলে, তখন সে একা।"

কেরাজের অঙ্গুলিতল হইতে এতক্ষণ যে স্বপ্ন-সঙ্গীত উত্থিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল; ক্রমে তাহা সেই আবৃত্তি আরম্ভকালীন প্রভাতী-ধরণের সুরেই পুনরাবর্ত্তিত হইয়া আসিল।

"নিরুৎসাহ ক্ষুব্ধচিত্তে, শাস্তির ন্যায্যতা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে, অথচ একেবারে নিরাশ না হ'য়ে ফিলেমন তা'র কার্য্যে মনোনিবেশ কর্‌লে। আজ পর্য্যন্ত পর্য্যটকদের কাহিনীতে এক

দীর্ঘবৃক্ষবহুল বিজন অরণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে কখনও মানব-চরণ-পাত ঘটেনি, কিন্তু পশুপক্ষীর কল-কাকলীতে যা'র ঘন-সন্নিবিষ্ট পল্লবান্তরাল চিরমুখর। অন্যত্র-দুষ্প্রাপ্য বিবিধবর্ণের লতাপুষ্প, অশ্রান্ত ভ্রমর-গুঞ্জন, অসংখ্য উজ্জ্বল-পক্ষ প্রজাপতি সে অরণ্যে নিত্য-সুলভ। নানাজাতীয় পক্ষী, নানাজাতীয় কীটপতঙ্গ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে সেখানে পরম সন্তোষে বাস কর্‌ছে। শুন্‌তে পাওয়া যায়, সেই অরণ্য-প্রদেশের একজন অভিভাবক আছে,—এক শীর্ণ, পাংশু, কঙ্কালসার বৃদ্ধ,—যে ঐ সমস্ত পশুপক্ষীদের ভাষা বোঝে, পুষ্প-সমাজের রহস্য-কথা জানে এবং কানন-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ভাজন। এই আশ্চর্য্য ধরণের মানুষটা নাকি হাজার বছর ধরে' বেঁচে আছে। কত শত বংশ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, কত নগর কত রাজ্য ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে—এখন আর কেউ জানেই না যে ঐ লোকটাই এককালে ফিলেমন বলে' পরিচিত ছিল বা ঐ লোকটাই 'জ্ঞানী' সাধু যে অবশেষে সত্যসত্যই জ্ঞানী হয়ে উঠেছে,—এবং সে জ্ঞান-লাভ, ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট একমাত্র পথ, প্রেমের পথে।"

শ্রোতৃবর্গের হৃদয়-তন্ত্রীতে কোমল হই ত কোমলতর স্পন্দন তুলিয়া সঙ্গীত থামিয়া গেল এবং গল্পও শেষ হইয়া আসিল। পিয়ানো পরিত্যাগ করিয়া উঠিবামাত্র উৎফুল্ল জনতা ফেরাজের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রসংশায় প্রীত হইলেও ফেরাজের নয়নদ্বয় বারংবার এল র‍্যামির শ্যামকান্ত বিষণ্ণ সুন্দর আননখানির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। ভ্রাতার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেও ফেরাজ জানিত যে, এত কালের সস্নেহ ও সদয় ব্যবহারে, যে সুগভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা স্বভাবতঃই তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা উৎপাটিত করা অসম্ভব। প্রভুত্ব-বিস্তার যদিও বা করিয়া থাকেন, তথাপি এল র‍্যামি যে কনিষ্ঠকে ভালও বাসিতেন এ বিষয়ে ফেরাজের কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু আজ তাঁহাকে এত বিষণ্ণ, এত চিন্তান্বিত বোধ হইতেছে কেন? তিনি কি ফেরাজের উপর বিরক্ত বা তাঁহার কোন ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন? ফেরাজের হৃদয়-মধ্যে কেমন একটা বেদনা অনুভূত হইল,—ভ্রাতার সহিত একটা কাল্পনিক বিচ্ছেদ অনুভূতি পীড়িত হইয়া, সমবেত জনতা সে অসহ্য বোধ করিতে লাগিল; কারণ তাহার উচ্ছ্বসিত

হৃদয়াবেগ এ ভিড়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। লেডি মেলথর্প হাত-পাখার বাতাস খাইতে খাইতে মিষ্ট কথায় ফেরাজকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন,—বলিতেছিলেন যে তাহার বর্ণিত কাহিনীটী অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী এবং আবৃত্তিও অতীব সুললিত; কিন্তু এ প্রসংশায় ফেরাজ আদৌ উৎসাহিত হইতেছিল না। জনতার পরিবেষ্টনী হইতে মুক্তিলাভ করিবামাত্র সে এল র‍্যামির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিল।

"আমাকে তোমার কাছে রাখো!" মিনতির মত করিয়া নিম্নস্বরে সে বলিয়া উঠিল।

এল র‍্যামি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্নেহ দৃষ্টিতে কনিষ্ঠের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"যখন সুযোগ পেয়েছো তখন নতুন নতুন বন্ধু যোগাড় কর না ভাই"

"বন্ধু!" ফেরাজ উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"বন্ধু, এইখানে? না, বাড়ী চল; এতক্ষণেও কি ফেরবার সময় হয় নি?"

হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"সে কি! 'জীবন' দেখবে না? চারিদিকে এত সুন্দরী স্ত্রীলোক, এত সুশিক্ষিত পুরুষ;—এমন বড় বড় ঘর,—এমন উপভোগ্য কথাবার্ত্তা, বাঁদরের কিচির-মিচির শব্দের মত এই গোলমাল,—এত সুবিধে ছেড়ে তুমি কিনা বাড়ী ফিরতে চাও!"

মৃদু হাস্যসহ ফেরাজ বলিল—"হাঁ, আমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, ঘুম পাচ্ছে; এ-সমস্তগুলো আমার কাছে কৃত্রিম বলেই মনে হ'চ্ছে,—এ আমোদ-প্রমোদ যেন প্রাণহীন, কুহেলিকাচ্ছন্ন। এর চেয়ে ঘুমানো অনেক ভালো।"

এই সময় আইরিশ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ফেরাজের উপর সাগ্রহ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—"আমি এইবার বাড়ী ফিরছি, কিন্তু যাবার আগে আপনার 'ফিলেমনের গল্পটীর' প্রসংশা না করে' থাকতে পারছিনে; গল্পটী কি আপনার স্বকপোল-কল্পিত, না বাস্তবিকই এ-রকম কোনো রূপকথা আছে?"

"প্রকৃতপ্রস্তাবে, কিছুই নতুন নয়"—ফেরাজ জানাইল—তবে আপনি যে অর্থে জিজ্ঞাসা করছেন, তা'তে গল্পটা আমার কল্পিতই।"

"তা' হ'লে আপনি কবি ও গায়ক দুইই"—আইরীণ উত্তর করিলেন—"এ শক্তিদুটো প্রায় কাছাকাছি হ'লেও, এক সঙ্গে বড় একটা দেখা যায় না। আশা করি"—অতঃপর এল র‍্যামিকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"আশা করি, আপনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবেন; তবে সাহস করে' বল্‌তে পারিনে, কেননা আমি বিশেষ লোকপ্রিয় নই। আমার বন্ধুর সংখ্যা নিতান্তই অল্প, সুতরাং আপনাকে বিশেষ ব্যাপৃত রাখবারও আশা কর্‌তে পারিনে। বস্তুতঃ, লোকে স্বভাবতঃই আমাকে পছন্দ করে না।"

"আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি!"—আবেগভরে ফেরাজ বলিয়া উঠিল।

আইরিণ হাসিলেন।

"তাই নাকি? সুসংবাদ বল্‌তে হবে। আপনার উক্তিতে অবিশ্বাস কর্‌তে পারিনে, কেননা যতটা 'সাংসারিক' হ'লে তোষামোদে প্রবৃত্তি আসে, আপনি তা' একেবারেই ন'ন। কিন্তু স্ত্রী-সাহিত্যিকদের সমাজ যে সাধারণতঃ প্রীতির চক্ষে দেখে না, একথা বাস্তবিকই সত্যি।"

"দেখে না? আপনার মতন যাঁরা সুন্দরী, তাঁদেরও নয়?" স্বচ্ছন্দ ও সরল ভাবে ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

এই অকৃত্রিম প্রশংসায় এবং বালকের ন্যায় প্রকাশ-সারল্যে আইরীণের গণ্ডযুগল ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই স্নিগ্ধহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন—"নারী-সাহিত্যিকদের মধ্যে সৌন্দর্য্য আসলেই থাক্‌তে পারে ব'লে কেউ স্বীকার করে না। আর যদিই বা কারুর কোনোরূপ ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য থাকে, তা' হ'লে হিংসুকেরা সেটাকে নিন্দা অভ্যাস করবার পক্ষে একটা মস্ত উপকরণ মনে করেন। যে-সকল স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার স্পর্দ্ধা রাখে, পুরুষেরা তা'দের সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব নির্ম্মম।"

"এটা কি আপনি নিশ্চিত ব'লে জানেন?" বিনম্র স্বরে এল র‍্যামি প্রশ্ন করিলেন—"আপনার এই 'রায়' কি ভ্রমাত্মক হ'তে পারে না?"

"আহা, তা' যদি হ'ত!"—ক্ষোভের সহিত তিনি বলিলেন—"ভগবান জানেন, এ ধারণা ভ্রান্ত হ'লে আমি কত সুখী হ'তাম! কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার মত আসলেই ভুল নয়।

পুরুষদের ধারণা যে স্ত্রীলোকেরা তা'দের চেয়ে নিকৃষ্ট জীব— তা' সে শারীরিক সামর্থ্যের দিক থেকেই হোক, কি মানসিক শক্তির দিক থেকেই হোক্। শারীরিক হীনতা অবশ্য স্বীকার্য্য কিন্তু মানসিক নিকৃষ্টতা কোনোমতেই স্বীকার করা যায় না; অথচ ঐ ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তা'রা স্বীকারই কর্ত্তে চায় না যে স্ত্রীলোকদের স্বাধীন আত্মা বা স্বাধীন চিত্তবৃত্তি আছে; বস্তুতঃ, তা'দের চক্ষে স্ত্রীলোক যেন ভেড়া কি গরুর চেয়ে কতকটা উচ্চপদস্থ জীব মাত্র। আমার বিশ্বাস, যন্ত্রণাভোগী সৃষ্টজীবদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের যন্ত্রণাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এই যন্ত্রণা তা'রা যে রকম সহিষ্ণুতা, যে রকম নির্ব্বাক বীরত্বের সঙ্গে সহ্য করে' চলেছে তা'তে আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে এমন পুরস্কার তা'দের ভাগ্যে আস্‌বে, যা' বর্ত্তমানের অশ্রু-জলে ডুবে থেকে আমরা আজ ধারণাও কর্ত্তে পাচ্ছিনে।"

আইরিণ থামিলেন,—তাঁহার নয়নে স্বপ্ন-ভঙ্গিমা, ললাটে গাঢ় চিন্তার ছায়া এবং মুখভাবে ক্ষোভের চিহ্ন। পরক্ষণেই মধুর হাস্য-সহ তিনি এল-র‍্যামির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

"আপনি হয়তো ভাব্‌ছেন, আমি বড় বেশী কথা কই,—স্ত্রীলোক মাত্রেরই এটা স্বভাব! যাক্, যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন—নইলে দরকার করে না। লেডী মেলথর্পের হাত দিয়ে তবে আমার কার্ড পাঠাবো—আপাততঃ বিদায়!"

এল র‍্যামি তাঁহার প্রসারিত হাতখানি আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন; পুনরায় স্নায়ু মধ্যে সেই আশ্চর্য্য কম্পনা অনুভূত হইল।

"আপনি নিশ্চয়ই স্বপ্ন-দৃষ্টি সম্পন্ন"—তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আপনি যা' কিছু দেখেন তা'র অধিকাংশই অপার্থিব!"

আইরিণের গোলাপ-গণ্ড দুটী রক্তবর্ণ ধারণ করায় আননখানি নূতনতর সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"আমার হাতের মধ্যে থেকে এত সংবাদ কেমন ক'রে পান!"—হস্তখানি ধীরে ধীরে সরাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন—"ঠিক কথা,—পার্থিব জিনিষের চেয়ে উন্নততর কিছু যদি না দেখ্‌তে পেতাম তা' হ'লে নিজের অস্তিত্ব আমি এক দণ্ডও সহ্য করতে পারতাম না।

ভবিষ্যতকে আমার চারিদিকে দেখ্‌তে পাই বলেই বর্ত্তমানকে সহ্য করতে পারি বা তাকে অগ্রাহ্যও করতে সক্ষম হই।"

অতঃপর আইরিণ প্রস্থান করিলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই লেডি মেলথর্পের স্বর এল র‍্যামি ও ফেরাজকে আকৃষ্ট করিল—

"কেমন দেখলেন? এক সৃষ্টিছাড়া জন্তু, না—ঐ আইরিণ? এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত তা'র ধারণা যে আর কি বল্‌বো! কেউ ওকে দেখতে পারে না—ভয়ঙ্কর চালাক কি না!"

"দেখতে না পারবার এর চেয়ে কোন ভাল কারণ থাকতেই পারে না!"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন।

লেডি মেলথর্প বলিতে লাগিলেন—এমনি সমস্ত অপ্রিয় কথার অবতারণা করে, সকল বিষয়েই এমন এক একটা দৃঢ় মত আছে যে তা'তে সাধারণের সঙ্গে বনিয়ে চলা ওর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি নিজেই ওকে পছন্দ করিনে।"

"মনে রাখবেন, উনি আজ আপনার নিমন্ত্রিতা ছিলেন"—সহসা ফেরাজ বলিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা তীব্রতা ব্যক্ত হইল যে লেডি মেলথর্প ক্ষণকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন।

"অবশ্য! লোকে খ্যাতনামা লোকদের স্বভাবতঃই এসব উৎসবে চেয়ে থাকে।"

"তা' যদি চায়, তবে সম্মান দেখাতেও লোকে বাধ্য"—সংযত কণ্ঠে ফেরাজ উত্তর করিল, "আমাদের সভ্যতায় বলে, যাঁদের অতিথিরূপে গ্রহণ করা হয়, তাঁদের নিন্দা করা নিতান্তই গর্হিত।"

এম্‌নি ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ফেরাজ সে স্থান হইতে সরিয়া গেল যে, লেডি মেলথর্প নিস্পন্দ ও নিশ্চলবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এল র‍্যামির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বাস্তবিক মশাই, আপনার কনিষ্ঠের ব্যবহার বড়ই আশ্চর্য্য বড়ই—"

"তা' ঠিক্,"—বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"অস্বীকার করতে পারিনে। ফেরাজের আদব-কায়দা একেবারেই অমার্জ্জিত, কারণ সমাজে মেলা-মেশার

ও অভ্যস্ত নয়। লর্ড মেলথর্প্‌কে একথা আমি আগেই বলেছিলাম,—ওকে নিমন্ত্রণ করার সম্বন্ধেও আমার ইচ্ছা ছিল না। মনে যা' ভাবে, মুখেও ফেরাজ সেকথা অবিকল বলে ফেলে, এজন্যে সে ভয়ও করে না, ভালবাসাও চায় না ; এ-হিসাবে তাকে বর্ব্বর ছাড়া আর কি বলা যায়! যাক্, কিছু মনে করবেন না,—তার হ'য়ে আমিই মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি!"

লেডি মেলথর্প একটা শুষ্ক অভিবাদন করিলেন,—তাঁহার মনে হইল, যেন এল র‍্যামির ওষ্ঠান্তরালে এক প্রকার ক্ষীণ ব্যঙ্গ হাস্য তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। কি বিরক্তিকর,—কি বিরক্তিকর! ফেরাজের মত ভদ্রতা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসে! কেন,—আইরিণের সম্বন্ধে আলোচনা নাই বা করবে কেন?—সে এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি; এক জন লেখিকা, যাঁর রচনাবলী অনেকের মতে সমাজের পক্ষে 'মারাত্মক'। বস্তুতঃ, লেডি মেলথর্প দেখিলেন যে তাঁহার বিরক্তি হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে; এই দুটো 'কালা আদমি'কে আপন বাটীতে যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন সে জন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হইলেন। এল র‍্যামি তাঁহার বিরক্তি বুঝিতে পারিলেও, আর কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না,—পরন্তু সুযোগ পাইবা মাত্র যথাবিহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ফেরাজকে খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হইল না,—দেখা গেল সে হল-ঘরে দাঁড়াইয়া এন্সওয়ার্থের সহিত কথা কহিতেছে এবং পরদিন তাঁহাকে ছবি লইতে দেওয়া সম্বন্ধে পাকা কথা দিতেছে।

"আপনার মস্তক-পরীক্ষা করবারও বিশেষ আগ্রহ ছিল"—এল র‍্যামি উপস্থিত হইবামাত্র এন্সওয়ার্থ তাঁহাকে বলিলেন—"কিন্তু আপনি বোধ হয় সময় করে নিতে পার্ব্বেন না?"

"না, সময় আমার নেই—তা' ছাড়া প্রবৃত্তিও নেই!" হাসিয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন —"কারণ এ-দেহের কোনো রকম পরীক্ষা-ফল পৃথিবীতে থাকবে না, এইটেই আমার সঙ্কল্প। সেরূপ সিদ্ধান্ত কখনই সত্য হবে না—'আমার' কোনো ছাপই তা'তে থাকবে না, কেন না যা' নশ্বর তারই পরীক্ষা চলে, অথচ 'আমি' হচ্ছি অবিনশ্বর।"

"অদ্ভুত লোক!"—এন্সওয়ার্থ বলিলেন—"আপনার এ উক্তির অর্থ কি?"

"মানুষের ধর্ম্ম-জ্ঞান, মানুষের দর্শন, মানুষের দেবমন্দির চিরদিন যে অর্থ নির্দ্দেশ ক'রে আসছে

তা' ছাড়া অন্য কি অর্থ হবে,—অবশ্য ওগুলোর যদি কোনো সত্য অর্থ থাকে। এই রক্তমাংস মেদ মজ্জার অতিরিক্ত কিছুই কি প্রাণীদেহে নেই ? মানুষের কল্পিত আত্মা চক্ষু মেলে দাঁড়িয়ে আছে, এ রকম একখানা ছবি আঁক্‌তে পারলেই আপনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে স্বীকৃত হন,—কিন্তু এই দৈহিক ছদ্মবেশ থেকে বিযুক্ত ক'রে যদি ঐ আত্মার স্বরূপ আঁকতে পারতেন, যদি সেই বর্ণময়, বায়বীয়, বিদ্যুৎ তীব্র, উষা-বৎ-সৌন্দর্য্যকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারতেন, তা' হলে আরও অনেক বড় শিল্পী হ'তেন। এই আত্মাই হ'চ্ছি আমি,—বাহ্যিক আকার বা চেহারাটা আবরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়,—শিল্পীর কাছ থেকে আমরা প্রতিকৃতি চাই, পরিচ্ছদ মাত্র নয়।"

"আপনার যুক্তি আপনাদের উভয় ভ্রাতার সম্বন্ধেই খাটে"—এল র‍্যামির বলিবার ভঙ্গী ও বাক্যের তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া এন্সওয়ার্থ উত্তর করিলেন।

"ঠিক ! তবে, ফেরাজের পার্থিব পরিচ্ছদটা সুন্দর ও সুদর্শন,—আমার তা' নয়। তা' হ'লে এখন আসি,—নমস্কার !"

প্রতি-নমস্কার জানাইয়া চিত্রশিল্পী যথাক্রমে উভয় ভ্রাতার কর ধারণ করিলেন এবং গমনোদ্যত ফেরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তা' হ'লে ঐ কথা রইল কিন্তু; কাল আস্‌তে হবে। আশা করি, নিরাশ কর্ব্বেন না ?"

"আমার কথার ওপর বিশ্বাস কর্‌তে পারেন"—বলিয়া ফেরাজ বিদায় গ্রহণ করিল এবং অবিলম্বেই রাজপথে পড়িয়া দ্রুততর বেগে ভ্রাতার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

উপরে ঘন-নীল আকাশ ; তাহাতে কোটী কোটী নক্ষত্র দীপ্তি পাইতেছে। ভ্রাতৃদ্বয় যেন কোনো আভ্যান্তরীণ প্রেরণা-বশে একই কালে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ফেরাজ একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া লইল।

"ঐ"—সে বলিল—"ঐখানেই অনন্ত ও বাস্তব ; এতক্ষণ জীবনের যা' কিছু দেখ্‌ছিলাম তা' সান্ত ও অবাস্তব।"

এল র‍্যামি নিরুত্তর।

"তোমারও কি তাই মনে হয় না"—আগ্রহের সহিত ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

"কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা নয়, তা' নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে আমি অক্ষম, কেননা ওদুটোর সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ।...জানো কি ফেরাজ, যে লেডী মেলথর্পকে আজ তুমি চটিয়ে এসেছো ?"

"কেন ?—চটবার তো কোনো কারণ ঘটেনি! নিজের ধারণাটা সঠিক ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছুই আমি করিনি তো!"

"কি সর্ব্বনাশ! এই রকম ক'রে যদি ক্রমাগত ধারণা ব্যক্ত কর্‌তে থাক ভাই, তা' হ'লে অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীটা তোমার বিরুদ্ধে বিষম গরম হ'য়ে উঠ্‌বে। এমন কি, যদি বা একটু রেখে ঢেকেও বল, তা হলেও সমাজে চলাফেরা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ হবে না।"

"চাইনে আমি সমাজে চলাফেরা কর্‌তে"—ঘৃণাভরে ফেরাজ বলিল—"যদি লেডী মেলথর্পের এই সম্মিলনীই তা'র আলেখ্য হয়। আজকের রাতটা—অন্ততঃ তা'র অধিকাংশ —আমি ভুলে যেতেই চাই। শ্রদ্ধেয়া আহরীণকেই কেবল মনে রাখ্‌বো, কারণ তাঁ'র হৃদয় আছে, তাঁকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু বাদবাকী সমস্ত!—কাজ নেই দাদা, তোমার সঙ্গ আমার কাছে অনেক বেশী সুখের।"

স্নেহভরে ভ্রাতার হাতখানি আপন হস্তে তুলিয়া লইয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"তা' সত্ত্বেও তুমি যে আমাকে একলা ফেলে, কাল এক চিত্রকরের খেয়াল চরিতার্থ কর্ত্তে যাচ্ছ, এ কথা ভেবেছো কি ?"

"ওঃ, সে কিছুই নয়,—একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টার জন্যে বৈ ত নয়। তিনি বড্ড পেড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌লেন বলেই অস্বীকার কর্‌তে পারলাম না। এ জন্যে কি তুমি বিরক্ত ?"

"না ভাই, বিরক্ত আমি কিছুতেই হইনে। একবার তুমি আমার প্রভুত্বে ক্ষুব্ধ হয়েছিলে,— সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি যে দ্বিতীয়বার আর তোমাকে ক্ষোভের অবকাশ দেবো না। নিজেকে তুমি স্বাধীন মনে কর্‌তে পারো।"

"চাই নে আমি স্বাধীনতা!" ফেরাজ বলিয়া উঠিল।

"চেষ্টা কর!" ম্লান-হাসি হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"স্বাধীনতা খুবই মধুর,—তবে অন্যান্য জিনিষের-মত নিজের দায়িত্ব এ নিজেই নিয়ে আসে।"

আবাস-দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া এল র‍্যামি সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তোমার ফিলেমনের গল্পটী বেশ মৌলিক, বেশ সুন্দর। আমারই একটা রূপক-হিসাবে চরিত্রটা কল্পনা করেছো বোধ হয়; কেমন, তাই নয় কি?"

কৌতূহলী-চক্ষে ফেরাজ ভ্রাতার মুখপানে চাহিল; কিন্তু সহসা উত্তর দিতে পারিল না।

"আমার পক্ষে ওটা ঠিক খাটে না,"—কোমলকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"আমি ভালবাসার বিরোধী নই—কারণ তোমাকে ভালবাসি। সম্ভবতঃ, আমার ভাগ্যে ঐ হাজার বছর বনবাসের ব্যবস্থা করবার আগে, দেবদূতেরা এ বিষয়-সম্বন্ধে একটু বিবেচনা কর্‌বেন।"

এল র‍্যামির কথা কয়টীতে এমন একটু করুণ সুর বাজিয়া উঠিল যে ফেরাজ কাতর না হইয়া থাকিতেই পারিল না; ইহার উত্তরে কি বলিবে, কি করিবে তাহাও যেন সে খুঁজিয়া পাইল না। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার পর এল র‍্যামি বিদায়-সম্ভাষণান্তে যথাবিহিত করপ্রসারণ করিলেন,—কিন্তু ফেরাজ কোনো কথাই কহিতে পারিল না, শ্রদ্ধাভরে তাঁহার হাতখানি গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিল মাত্র। যে-হস্ত তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, কবিত্ব ও সঙ্গীতের অপার্থিব উপহারে জীবনকে আনন্দ-স্বপ্নের অজস্রতায় ভরিয়া গিয়াছে, সেই হাতখানিকে আকুল আগ্রহে চুম্বন করিয়া আজ সে তাহার ভাষাহীন অনুতাপটুকু জ্ঞাপন করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

দয়ালদেব।

নিবিড়তর তিমির ছায়
বসিয়া ছিনু একেলা,
লাগেনি ভাল, জগৎ জুড়ে,
চলিছে সদা যে খেলা।
দেখিনু, গোলাপ কলি নীরবে ফুটে
কোমল তা'র অধর পুটে,
মাধুরী ভরা হাসিটী সনে
জড়ান কার মমতা
নীহার নীরে সেজেছে স্মরি
কাহার প্রেম বারতা।
সহসা শীত সমীর আজ
পরাণহরা উদাসে
কাহার বাণী ঘোষিল জানি
আপনা-হারা উদাসে।
আকুল বায়ে অলকগুলি
বাঁধন হ'তে পড়িল খুলি।
শিহরি উঠে এদেহ কার
মধুরতর পরশে,
হৃদয় যেন ছাপিয়া উঠে
নদীরই মত হরষে।

জীবন কূলে দাঁড়িয়ে মম
        ভুলিয়া জানি কি ভুলে'
আমারে পাশে ডাকিল কে' সে
        মধুরে—অতি মৃদুলে।

ভুলিয়ে দিল অলস চিন্
ভুলিয়ে দিল আমি কি দীন,
ভুলিয়ে দিল ভাঙ্গা এ বীণ্
        ভাসাল কোন্ অকূলে,
ভুলিয়ে দিল ছিন্নহার
        শুকিয়ে গেছে "মুকুলে"
দেখিনু চেয়ে উদাস দিঠি
        আকাশ পানে তুলিয়া,
অচেনা কা'র কিরণমালা
        মিলিয়ে যায় দুলিয়া!
নীলিম কা'র চরণখানি
ঢাকিছে নিশা আঁচল টানি'
সদাজাগর তারকা আঁখি
        রয়েছে কে সে খুলিয়া,
নীরব স্বরে বলে সে গেল,
        "আমারে ছিলে ভুলিয়া!"
কাহার লাগি নিদ্রাহীন
        জাগিয়ে নিশি যাপনা
কাহার লাগি বিফল ওরে
        সকল ভয় ভাবনা!

আমি কি দীন ! কি অক্ষম !
দেবতা মর্ম্ম কি নিরুপম
জাগিয়া উঠে হিয়ার মাঝে
আজি কি পূত কামনা.
পরশি মৃদু অলস জনে,
কি মহা সাধ জাগালে মনে !
ভুলিয়াছিনু সরিয়াছিনু
দিল না তবু বেদনা
চরণে তার টানিল তবু
ভুলিতে সব ভাবনা !

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

খেলাফৎ।

—*—
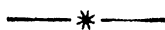
কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান মুসলমানদিগের এক সম্প্রদায়ের খলীফা ধর্ম্মগুরু। তাঁহার অধিকারের নাম খিলাফৎ। এই খিলাফৎ লইয়া কয়েক বৎসর তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই সময়ে খিলাফতের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিলে তাহা অপ্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া 'পরিচারিকা'র পাঠককে নিম্নোক্ত বিবরণ উপহার দিতেছি।

কনষ্টান্টিনোপল মুসলমানদের নিকট রুম বলিয়া পরিচিত। ইহার আরও দুইটা নাম আছে—কুস্তুনিয়া এবং ইস্তাম্বোল। এই শেষ দুইটী নামের সহিত 'চাহার দরবেশে'র পাঠক

পরিচিত আছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে কন্‌স্টান্টিনোপল নামই ব্যবহৃত হইবে। সাম্রাজ্যকে রূম সাম্রাজ্য বলা হইবে। রূম শব্দটা রোম শব্দেরই রূপান্তর। রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ নষ্ট হইবার পর কন্‌ষ্টান্টিনোপলই সম্রাট্‌দিগের রাজধানী হইল। সেই জন্যই উহাকেও রোম বা রূম বলিত। তখন সাম্রাজ্য তিন নামে অভিহিত হইত—পূর্ব্বরোম সাম্রাজ্য, গ্রীক্ সাম্রাজ্য, বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের পতনের পর পারস্যের সম্রাট্ খুস্রু দ্বারাই কন্‌স্টান্টিনোপল প্রথম আক্রান্ত হয়। তখন আরবের ভাববাদী মহম্মদ জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে খুস্রু যখন কন্‌স্টান্টিনোপল আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন মক্কার একজন সামান্য অধিবাসীর নিকট হইতে তিনি একখানি পত্র পাইয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে তিনি যেন মহম্মদকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করেন। খুস্রু এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং মহম্মদ সেই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন "এই রূপেই ঈশ্বর খুস্রুর রাজ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন।" খুস্রুর রণবাহিনী যখন সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতেছিল তখনই মহম্মদের মুখ হইতে পারস্যের পতন সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্‌ বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল। খুস্রু এসিয়া ও আফ্রিকার রাজ্যগুলি প্রায়ই জয় করিয়া ফেলিলেন। তখন পূর্ব্বরোম সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট রহিল গ্রীস, ইটালি, আফ্রিকার কিয়দংশ এবং এসিয়া মাইনরের সমুদ্রতটবর্ত্তী কয়েকটা নগর। কিন্তু ছয় বৎসর পরে খুস্রু ১০০০ ট্যালেণ্ট সুবর্ণ, ১০০০ ট্যালেণ্ট রৌপ্য ১০০০ পট্ট পরিচ্ছেদ, ১০০০ অশ্ব এবং ১০০০ কুমারী প্রতি বৎসর কর স্বরূপ পাইবার নিয়মে সমস্ত বিজিত দেশ ছাড়িয়া দিলেন। হিরাক্লিয়স্ তখন রূমের সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহাকে এই কর সংগ্রহের জন্য সময় দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি সেই সময়টাকে পারস্যের বিপক্ষে প্রাণপণ সমরের আয়োজন করিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন।

রূম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে নূতন করিয়া সমর আরম্ভ হইল। এই সময় যখন চলিতেছিল তখন ৬২৮ অব্দে খুস্রু হত হইলেন। সমরের ফলে উভয় সাম্রাজ্যই বলহীন হইয়া পড়িল। ইহাতে মহম্মদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের দেশ জয় করিবার সুবিধা

হইল। ইহার পর বৎসরই রূমের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের সমর আরব্ধ হইল। ৬৩২ অব্দে আবুবেকর, মহম্মদের সেনানী পদের উত্তরাধিকার হইয়া, আরবের প্রত্যেক জাতির নিকটে নিম্নলিখিত উপদেশপূর্ণ পত্র পাঠাইলেন; "ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার সময়ে তোমরা পুরুষের মত যুদ্ধ করিবে; কখনই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না; কিন্তু তোমাদের জয় যেন নারী ও শিশুদিগের রক্তে রঞ্জিত না হয়। তোমরা তাল বৃক্ষ নষ্ট করিবে না, শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করিবে না, কোন ফল-বৃক্ষ কাটিবে না। আহারের জন্য যে সকল গোবধ করিতে হইবে তাহা ভিন্ন অন্য গরুর অনিষ্ট করিবে না। কাহারও সহিত সন্ধি করিয়া বা কাহাকেও কথা দিয়া, সত্য পালন করিবে। তোমরা অগ্রসর হইতে হইতে এমন সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সাক্ষাৎ পাইবে যাহারা মঠে থাকিয়া নিজ নিজ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করে, তোমরা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবে না, তাহাদিগকে বধ করিবে না এবং তাহাদের মঠ ধ্বংস করিবে না। তদ্বিধ লোক ব্যতীত তোমরা আর এক শ্রেণীর লোক দেখিবে যাহারা শয়তানের উপাসনা করে এবং যাহারা মস্তক মুণ্ডন করে, তোমরা নিশ্চয়ই সেই সকল লোকের করোটি বিদীর্ণ করিয়া দিবে এবং তাহারা যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করে অথবা কর না দেয় তাহা হইলে তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রদর্শন করিবে না।"

এই আদেশ অনুসরণ করিয়া আবুবেকরের উত্তরাধিকারীরা পুনঃ পুনঃ রোম রাজ্য মধ্যে আপতিত হইয়া এবং কন্‌ষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করিয়া রুমের প্রজাবর্গের অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিতেন। এই সকল উত্তরাধিকারী, রাজা ছিলেন না কিন্তু আলেপ্পো, ইকানিয়ম্ দামাস্কাস্ এবং বোগদাদে খলিফা মাত্র ছিলেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর ১২৯৯ অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদের কোন রাজা ছিল না—তাহারা নানা দলে বিভক্ত ছিল। ১২৯৯ অব্দে ওথ্‌মান রাজতন্ত্র স্থাপন করিলেন। এই রাজাই পরে ওটোমান সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হইয়া সমস্ত মুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে।

১২৯৯ অব্দে ওথ্‌মান্ নিকোমিডিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তখন হইতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানেরা রূম সাম্রাজ্যের বিপক্ষে সমরে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু তাহারা কয়েকটা প্রদেশ মাত্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল—সমস্ত সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারে নাই।

এই ১৫০ বৎসর পরে রূম সম্রাট্ জনফালি ও লোগসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ত্রয়োদশ কন্‌স্‌ট্যাণ্টাইন্ দূত প্রেরণ করিয়া তুরস্ক সুলতান অমরথের সম্মতি লাভ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সম্মতি দান ও সম্মতি গ্রহণের ফলে তুরস্কের সুলতান প্রকৃতপক্ষে রূমের অধীশ্বর হইলেন এবং রূমের সম্রাট্ তাঁহার সামন্তে পরিণত হইয়া গেলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে অমরথের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় মহম্মদ তুরস্কের অধিপতি হইয়া কন্‌স্‌ট্যাণ্টিনোপলকে নিজ রাজধানীতে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে নগর অবরোধ করিলেন এবং ১৪৫৩ অব্দে তাহা অধিকার করিলেন। তখন হইতেই কন্‌স্‌ট্যাণ্টিনোপল তুরস্ক সুলতানের রাজধানী হইল।

তখন হইতে ৩১১ বৎসর পর্যন্ত তুরস্কের সম্রাট্‌গণ কন্‌স্‌ট্যাণ্টিনোপলে স্বেচ্ছায় একাধিপত্য করিলেন। তাহার পর কিরূপে তাঁহাদের স্বেচ্ছা খর্ব্বীকৃত হইল এবং সাম্রাজ্য সংকীর্ণীকৃত হইতে লাগিল তাহার সম্পাদকীয় অনুমতি পাইলে পরে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সমাপ্তি।
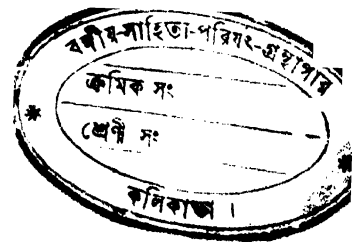
থামাও হে গান, গুণি, থামাও এবার!
ফুটিয়া-ফুটিয়া ফুল হয়ে গেল লীন—
ফলটি রাখিয়া; হের বন্ধ করে দ্বার
কমল-আগারে অলি—গেয়ে সারাদিন।

কত অশ্রু—অন্তরের নিগূঢ় বেদনা,
মান অভিমান কত, কত আলাপন,
অসীম শূন্যেতে কত স্বপন-রচনা—
হ'ল কত কাল, ওগো। এবে আর কেন?
ফুটেছিল পরিণয়-বৃক্ষে যে প্রসূন,
আত্মবিস্মৃতির ফলে আজি পরিণত;
লবে এবে—এতকাল গেয়ে তব গুণ,—
তোমাতে বিরতি চির চিত্ত-মধুব্রত।
পূজারি, আরতি শেষ,—মন্দিরের দ্বার
বন্ধ কর,—হবে এবে নিশীথ-বিহার!

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

স্বপ্ন।

জীবনের দান।

নারী ঘুমাইতেছিল। স্বপ্নে সে দেখিল জীবন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; দু'হাতে তার দু'টি জিনিস—এক হাতে প্রেম আর এক হাতে মুক্তি। সে নারীকে বলিল "কি চাও—বেছে নাও!"

নারী অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল "মুক্তি!"

জীবন বলিল "ঠিক, ভালই বেছে নিয়েছ তুমি—যদি বলতে প্রেম, পেতে তাই। কিন্তু এই যে আমি চলে যেতাম আর ফিরে আসতাম না কোনদিন—এখন এমন একদিন আসবে যে দিন আমি আবার আসবো, সে দিন দু'টো জিনিসই দিতে হবে তোমাকেই।"

নারী হাসিতে লাগিল সেই স্বপ্নাবেশেই!

কামনার বাগান।

সে ঘুরিতেছিল—সুন্দর মনমাতান মধুর সৌরভরাশি ভাসিয়া আসিতেছিল—সে দু'হাতে ফুল তুলিতেছিল। তখন কর্ত্তব্য তার সুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আসিয়া তাহার পানে চাহিল। নারী পুষ্প চয়ন বন্ধ করিল—কিন্তু তখনও সে হাসিয়া ফুলরাশির মধ্যে ঘুরিতেছিল, দু'হাত তার পূর্ণ। তখন কর্ত্তব্য তার ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে আবার আসিয়া তার পানে চাহিল—কিন্তু নারী তার পানে পেছন ফিরিল। অবশেষে তার পানে আবার দৃষ্টি পড়িতেই সুন্দরী হাতের কুসুমগুলি মাটিতে ফেলিয়া—ধীরে দূরে সরিয়া গেল।

আবার সে নারীর কাছে আসিল। নারী মাথা নোয়াইয়া অস্বস্তিতে গেটের পানে চলিল—কিন্তু বাহিরে যাইতে সূর্য্যালোকে ফুলের মুখগুলি দেখিয়া বেদনার অশ্রুরাশিতে তার নয়ন ভরিয়া উঠিল। সে বাহিরে গেলে চিরদিনের জন্য বাগানের দ্বার তার কাছে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু যে-ফুলগুলি সে হাতে করিয়াছিল তারই একটি পরাগের গন্ধ এই শূন্য মরুর মধ্যে বড় মধুর বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু কর্ত্তব্য তখনও নারীর পেছনে—আবার সে আসিয়া নারীর সমুখে দাঁড়াইল, নারী বুঝিল কি জন্য সে সঙ্গ ছাড়িতেছে না; এত ভালবাসার যে-ফুল, তার একটিমাত্র পরাগ সে মাটিতে ফেলিয়া দিল—শুষ্ক ব্যথিত চোখে একাকিনী পথ চলিতে লাগিল।

শেষবার সে আবার আসিল—নারী তার শূন্য হাত তাকে দেখাইল, হাতে তো আর কিছু নাই; তবু সে চাহিয়া রহিল—তখন নারী তার বক্ষের বাস খুলিয়া একটিমাত্র লুকান ক্ষুদ্র ফুল বালির উপর ফেলিয়া দিল।

আর কিছুই তো দেবার নাই তার—সে পথ চলিতে লাগিল,—চারিদিকে তার ধূসর বালিরাশির আবর্ত্ত খেলিয়া যাইতে লাগিল।

হারান আনন্দ।

সাগর তীরে সূর্য্যালোকে জীবন সমস্তদিন বসিয়াছিল—সমস্তদিন মৃদু বাতাস তাহার কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছিল। আর সেই তরুণ মুখখানা অপার জলরাশির পানে

একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—সে অপেক্ষা করিতেছিল—অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু কার জন্যে সে তা বলিতে পারে না।

সমস্তদিন কত সব ঝিনুক শঙ্খ তীরে ছড়াইয়া—ঢেউএর পর ঢেউ তীরের বালিরাশির বক্ষে আসিতেছিল যাইতেছিল। জীবন বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল—অবশেষে ক্লান্ত হইয়া হাঁটুতে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল—তখনও সে অপেক্ষা করিতেছিল।

বালি কড় কড় করিয়া উঠিল, তীরে পদশব্দ শোনা গেল—জীবন জাগিল—শুনিল। তাহার অঙ্গে একখানা হাতের পরশ লাগিল—একটা শিহরণ তাহার সমস্ত শরীরে বহিয়া গেল,—সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সমুখে তাহার অপরিচিত প্রেমের বিস্ফারিত নেত্র; জীবন জাগিল,—সে কাহার জন্য অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

প্রেম জীবনকে মিশাইল তাহার সঙ্গে। এই মিলনে একটা অপূর্ব্ব সুন্দর জিনিসের জন্ম হইল—সে আনন্দ—প্রথম আনন্দ তার নাম। ছল ছল জলের উপর সূর্য্যকিরণ-সম্পাত এত মধুর নয়—গোলাপের কুঁড়ি যখন উন্মুখ হইয়া ঠোঁট মেলিয়া প্রথম চুম্বন সূর্য্যের কাছে যাচিঞা করে সেও এত সরম-রাগ-রঞ্জিত নয়। ছোট জীবনপ্রবাহ তার সদা চলন্ত! এত কোমল মধুর সে! কথা বলিতে পারিত না সে কিন্তু সূর্য্যকিরণে সে হাসিত, এবং খেলা করিত--প্রেম ও জীবনের সুখের সীমা ছিল না। দু'জনার মুখে বাক্য ছিল না কিন্তু নিজ নিজ হৃদয়ের গভীর গোপন কথা তাহার ছিল "চিরদিন এ আমাদেরই থাকবে।"

তার পর একটা সময় আসিল—সে কি সপ্তাহ পরে—না মাস পরে? (প্রেম ও জীবন তো আর সময় গণে না) তখন সব যেমন ছিল তেমন আর রইল না।

তখনও সে খেলে, হাসে, ফলের রসে মুখ রঞ্জিত করে কিন্তু সময় সময় হাত দু'খানা যেন ক্লান্তভাবে ঝুলিয়া পড়ে—ভারাক্রান্ত ছোট আঁখি দু'টি যেন অনন্ত বারিরাশির পানে চাহিয়া থাকে।

প্রেম ও জীবন দু'জনা দু'জনার চোখে চাইতে সাহস করিত না।—'বাছার কি হয়েছে?' এ কথাও বলিতে সাহস করিত না। দু'জনার হৃদয়ই আপন মনে বলিত—"এ কিছু না—

কিছু না—কালই এর উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা যাবে।" কিন্তু কত কাল এল গেল, শিশু তাদের পাশে বসিয়া খেলে কিন্তু আর তেমন সজীব উচ্ছ্বাস নাই।

একদিন প্রেম ও জীবন ঘুমাইয়াছিল—তাহারা যখন জাগিল—সে চলিয়া গিয়াছে, শুধু তাহাদের কাছে অপর একটি অপরিচিত বসিয়া আছে—চোখ দু'টি তার খোলা, বড়ই কোমল, বিষাদে ভরা।

কোমল বিষাদভরা চোখওয়ালা অপরিচিত শিশু, আসিয়া দু'হাতে দু'জনার দু'হাত ধরিল, প্রেম ও জীবনকে লইয়া সমুখ চলিতে আরম্ভ করিল। সে পথে চলিত প্রেম যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "না, আর না—আর পারি না;—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! আর চলতে পাচ্ছি না—সব আলো পেছনে পড়ে রইল, সমুখে শুধুই যে আঁধার!"

একটি ছোট গোলাপী আঙ্গুল পাহাড়ের পাশে যেথায় সূর্য্যালোক ছড়ান আছে দেখাইয়া দিল। অপরিচিতের চোখ দু'টি সব সময় বিষাদ ভাবনায় ভরা ছিল; সাহসে ভরা ছোট মুখখানিতে শান্ত হাসি জড়ান।

প্রেম যখন পাথরের ঘায় তাহার পা' কাটিয়া ফেলিল, অপরিচিত তখন কাপড় দিয়া তাহার রক্ত পুঁছিয়া—আহত পদে তাহার ছোট ঠোঁট দু'খানি দিয়ে চুমো দিল। মরুভূমিতে প্রেম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল অপরিচিত তখন দৌড়াইয়া গিয়া সেই মরু হইতেই জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রেমের মুখে চোখে দিল—সে শুধু তাহাদের সম্মুখ যাত্রায় সাহায্য করিতে আসিয়াছে।

অন্ধকারে বরফের পাহাড়ের উপর আসিয়া প্রেম ও জীবনের হাত যখন অসাড় হইয়া গেল তখন অপরিচিত তাহার উষ্ণ বক্ষে তাহাদের হাত রাখিয়া উষ্ণ করিয়া দিল—ক্রমেই তাহাদের সমুখে চালাইয়া লইতে লাগিল।

সূর্য্যকিরণ আর ফুলের দেশে আসিয়াই অপরিচিতের চোখ দু'টি উজ্জল হইয়া উঠিল—অবিশ্রাম হাসি, উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল। উজ্জল হাস্যে সব মুখরিত করিয়া সে ঘাসের উপর ছুটিতে লাগিল। গাছ হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাদের দিল; পদ্মপত্রে জল আনিল, ফুলরাশিতে তাহাদের ছাইয়া ফেলিল, সব সময়ই মুখে সেই মধুর হাসি—আনন্দ

তাহাদের যেমন পরশ দিয়া ছিল ঠিক তেমনি এ পরশ কিন্তু এ পরশ যেন আরো স্নেহ-সিক্ত।

তাহারা সেই হাসিভরা বালককে মাঝে রাখিয়া সেই আলো ও আঁধারের রাস্তা দিয়া আগাইয়া যাইতে লাগিল, সময় সময় তাহাদের সেই প্রথম মধুর আনন্দকে মনে পড়িত, তখন মনে হইত "ও—তাকেও যদি পাইতাম এ সময়!"

অবশেষে তাহারা চিন্তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই অদ্ভুত বৃদ্ধা সব সময় তাহার হাত হাঁটুতে রাখিয়া—চিবুক হাতে ন্যস্ত করিয়া অতীতের আলো হরণ করিয়া সেই আলো ভবিষ্যতে ছড়াইতেছিল।

প্রেম ও জীবন চীৎকার করিয়া উঠিল "ওগো গুণী বল আমাদের—আমাদের প্রথম মিলনে আমরা একটি উজ্জ্বল ভালব সামণ্ডিত জিনিস পেয়েছিলেম সে যে অশ্রু-ছাড়া আনন্দ,— ছায়াহীন কিরণ—কি পাপে আমরা তাকে হারালেম—কোথায় গেলে তাকে পাব?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল "তাকে পেতে তোমরা কি তোমাদের পাশে এখন যে বেড়াচ্ছে তাকে ত্যাগ করতে পার?"

বিরক্তিভরে প্রেম ও জীবন চীৎকার করিয়া কহিল—"না।"

জীবন বলিল "একে ছাড়তে হবে! যখন কাঁটা ফুটেছিল পায় তখন কে বিষ চুষে নিয়েছিল? মাথা যখন ঘুরতে থাকবে তখন কে বুকে রেখে শান্ত করবে? আঁধারে বরফে কে এই জমাট হৃদয় গরম করে দেবে?"

প্রেম কহিল "বরঞ্চ আমি নিজে মরি! আনন্দ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি—একে ছাড়া তো পারি না;—একে হারাণোর চেয়ে আমার নিজের মরা ভাল।"

তখন গুণী বৃদ্ধা কহিল "ওরে বোকা অন্ধের দল! যা তোরা একবার পেয়েছিলি—এ সেই। প্রেম ও জীবনের প্রথম মিলনে ছায়াহীন ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত একটা জিনিসের জন্ম হয়েছিল, যখন পথ বন্ধুর হতে লাগল, ছায়া সব আঁধারে পরিণত হতে লাগল—দিন যখন ভীষণ,—শীতের দীর্ঘরাত্রি যখন আরম্ভ হোল—তখনি এর পরিবর্ত্তনের আরম্ভ! প্রেম

ও জীবন এ দেখতে পারে না - জানতে পারে না—হঠাৎ একদিন চমকে উঠে চীৎকার করে—"ভগবান—ভগবান—হারিয়ে ফেলেছি যে,—কোথায় সে ? তারা বুঝতে পারে না যে, তারা এই হাসিভরা জিনিসকে ঠিক অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় মরু পথে, কুয়াসায়—বরফে চালিয়ে নিতে পারে না,—তারা বুঝতে পারে না, তাদের পাশে যে চলেছে এই তাদের সেই আনন্দ, শুধু বড় হচ্ছে।"

গম্ভীর, মধুর, মোলায়েম জিনিস ঠাণ্ডা বরফের মধ্যেও অমন গরম, জনহীন মরুতে অত সাহসী এরই নাম সহানুভূতি এই পূর্ণ প্রেম !

দূরের বিশ্বে।

অনেক দূরের তারকারাজির মধ্যে একটি দেশ আছে, সেথায় যেমন সব ব্যাপার ঘটে আমাদের এদেশে তেমন নয়। সেই দেশে একজন নারী আর একজন পুরুষ ছিল, তারা দু'জনে ছিল বন্ধু, এক কাজ তাদের, এক সঙ্গেই তারা অনেক সময় চলাফেরা করিত। অমন ব্যাপার আমাদের এদেশেও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু সেই তারা-জগতে এমন একটা কিছু ছিল যা আমাদের এ জগতে নাই।

সেথায় একটা ঘন বন ছিল, গাছগুলো সব এমন পাশাপাশি উঠিয়াছিল যে সূর্য্যকিরণ সেথায় কচিৎ প্রবেশ করিতে পারে—এমনি জায়গায় একটা মন্দির ছিল। দিনের বেলায় সেথায় সব শান্ত স্থির—কিন্তু রাত্রিতে যখন চাঁদ বা তারার আলো গাছের উপর ছড়াইয়া পড়িত, তখন কেউ যদি তার বক্ষবাস উন্মুক্ত করিয়া বেদীর উপর জানু পাতিয়া বসিয়া বক্ষের রক্ত দিয়া কিছু প্রার্থনা করিত তো তার সে প্রার্থনা কখনো অপূর্ণ থাকিত না।

পুরুষ আর নারী সব সময় এক সঙ্গেই চলিত,—নারী সব সময়ই পুরুষের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিত, একদিন রাত্রে চাঁদের কিরণে গাছের পাতাগুলো যখন ঝকমক করিতেছিল আকাশে যেন রুপোলী তরঙ্গ খেলিতেছিল—নারী একাকী সেই বনের ভিতর চলিতেছিল। অন্ধকারে ঢাকা বনপথ, শুধু তার মাথার উপরের ঘন ছাওয়া শাখার ফাঁকে ফাঁকে এক একটু

কিরণ আসিতেছিল, ক্রমেই বন গভীর হইতে লাগিল—চাঁদের কিরণও ক্রমে মিলাইয়া গেল। নারী মন্দিরে আসিয়া জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, কোন উত্তর আসিল না, তখন সে তার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ পাথর দিয়া আঘাত করিল—রক্ত ফিন্‌কি দিয়া পাথরের উপর পড়িল। কাহার স্বর শোনা গেল—"কি চাও তুমি ?"

নারী বলিল "একজন পুরুষ আছে, সে সব চেয়ে আমার নিকটতম, সব চেয়ে যা ভাল জিনিস তাই আমি তাকে দিতে চাই।"

স্বর শোনা গেল "কি সে জিনিস ?"

নারী বলিল "সে জানি না—কিন্তু তার পক্ষে যা সব চেয়ে ভাল যাতে সে সেই পায় তাই আমি চাই।"

স্বর শোনা গেল "তোমর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, সে তাই পাবে।"

নারী উঠিয়া বনপথ বহিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইতে লাগিল, পদতলে শুষ্ক পত্র মড় মড় করিয়া উঠিল। সাগর তীরে মৃদু বাতাস বহিতেছিল, চন্দ্রালোকে বালিরাশি ঝিকিমিকি করিতেছিল, তীরে দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল।

জলরাশির মধ্যে কি যেন কি একটা অনেক দূরে নড়িতেছে। সে চোখ মেলিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। একখানি নৌকা চন্দ্রালোকিত সাগরের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কে একজন তার উপর দাঁড়াইয়া আছে, চন্দ্রালোকে মুখখানি পরিষ্কার না দেখা গেলেও সে মূর্ত্তি সে চিনিল। নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে, চন্দ্রালোকে সে স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইতেছিল না, —নৌকা তীর ছাড়িয়া অনেক দূরে গিয়াছিল। দ্রুতগতিতে নৌকা ক্রমেই দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া যাইতেছিল। সে তীর ধরিয়া ছুটিতে লাগিল কিন্তু নৌকার কাছে একটুও আগাইতে পারিল না, পরিচ্ছদ তাহার খুলিয়া যাইতে লাগিল—সে বাহু প্রসারিত করিয়া—তাহার দীর্ঘ মুক্ত-কেশ-পাশে চন্দ্রালোকে খেলিতে লাগিল।

তাহার কানে সেই স্বর যেন বলিল—"কি হয়েছে ?"

নারী চীৎকার করিয়া উঠিল "আমার রক্ত দিয়ে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ আমি তার জন্য কিনেছি, তাকে আমি তাই দিতে এসেছি, আর কি না সে আমার ছেড়ে চলে যাচ্ছে!"

স্বর কোমল কণ্ঠে কহিল—"তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, সে তাকে দেওয়া হয়েছে।"

নারী চীৎকার করিয়া বলিল "কি সে ?"

স্বর বলিল "সে সেই শক্তি—যার বলে সে আজ মুক্ত—যে আশীর্ব্বাদ বলে সে আজ তোমায় ছেড়ে যেতে পেরেছে !

নারী স্তব্ধ অসাড় হইয়া গেল।

নৌকা তখন চন্দ্রালোক ছাড়াইয়া দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেছে। স্বর কোমল কণ্ঠে কহিল "খুসী হয়েছ কি তুমি ?"

নারী বলিল "হয়েছি—খুব খুসী হয়েছি আমি।" তাহার পদতলে সাগর তরঙ্গ লুটাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে যেন তাহারি প্রাণের সুর মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছিল !

Olive Schreinerর Dreams হইতে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

মন্দির।

যত পার হান শেল—হবে না'কো কোন ক্ষতি মোর·
বজ্রসম অতি সুকঠোর
নিশিদিন মৌন থাকি' উদাসীনা ধরিত্রীর মত
অসহ্য আঘাতে তব মাথা মোর করি দিব নত,
মূক মৌন উদাসীন মত্ত-সম আপনার মনে
কুড়ায়ে সকল শেল নির্ব্বিবাদে অতি সযতনে
বসি নিরজনে
রচিব মন্দির এক উচ্চ চূড়া তুলি'
আপনারে ভুলি।

চিরদিন রবে এই যত্নে গাঁথা মর্ম্মর মন্দির
তুলি উচ্চ শির।
হৃদি রক্তে সিক্ত হয়ে বায়ুভরে উড়িবে পতাকা
করুণ কাহিনী মোর একে একে রবে তাতে আঁকা,
মণি মুক্তা বিনিময়ে শুধু এই নয়নের জল
পাষাণ-ফলকে থাকি ঝলকিয়া রহিবে উজ্জ্বল
শুধু অবিরল।
এহেন মন্দির গড়ি' তুলিব আপনি—
জীবন-কাহিনী।

স্বরগের দেবদেবী কোন দিন রবে না হেথায়—
প্রয়োজন নাহি দেবতায়।
তোমারি মূরতি গড়ি' বসাইয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে
মন্দির পবিত্র করি—ধন্য করি এই অভাজনে
পূজিব আপনা ভুলি' সারা বিশ্ব করি অবহেলা
পূজিতে পূজিতে মোর শেষ হবে জীবনের খেলা—
আঁখি জল ফেলা।
চাহি না পূজিতে আমি স্বরগের দেবী—
চাহি যে মানবী।

কুসুমে হবে না পূজা—সুবাসিত চন্দনের রেখা—
ও চরণে রবে না ও লেখা,
ধূপ ধূমা ক্ষীণ ছায়া—কাঁপিবে না পাষাণের 'পরে
ধ্বনিবে না মন্ত্র হেথা কোন দিন মনোমুগ্ধ স্বরে ;

শুধু রবে ব্যথাহত হৃদয়ের তাপিত নিঃশ্বাস
ঘুমায়ে রহিবে শুধু বিরহের ব্যাকুল উচ্ছাস—
বেদনার বাস।
পূজারী নয়ন মুদি' এই উপচারে
পূজে প্রতিমারে।

এ নহে মন্দির শুধু—সুকঠিন পাষাণের কায়া
এ যে পূত প্রণয়ের ছায়া।
বিরহী আসিবে হেথা হেরিবারে এই তীর্থ ভূমি,
বিরহিণী ধন্যা হবে মন্দিরের পদতল চুমি'
প্রেমিক গাহিবে গীতি নিজ মনে আসি' চিরদিন
শিখিবে প্রণয় গান প্রেম ভালবাসা যত প্রেমহীন
সৌভাগ্যবিহীন।
গড়িনু মন্দির এই—ধন্য করি' সবে
অতুল গৌরবে।

ধরা মাঝে যত আছে প্রণয়ের পবিত্র আলয়
সবা হ'তে এই শ্রেষ্ঠ হয়।
রাধিকা-পরশে পুণ্য দূরে সেই যমুনার তীরে
প্রেমের মুরতি ধরি আছে তাজ আজো উচ্চ শিরে
ব্যাকুল বিরহে গাঁথা, প্রণয়ের নীরব নিদান
হেরিয়া মন্দির এই অপমানে হ'য়ে ক্ষুণ্ণমান
রবে ম্রিয়মান
এ হেন মন্দির আমি করেছি সৃজন
প্রণয়ের ধন।

প্রতিমার পদতলে মুদি আঁখি বসি চিরদিন
ধ্যানে শুধু হ'য়ে যাব লীন।
তার পর এক দিন জীবনের মহা শুভক্ষণে
পূজিতে পূজিতে তোরে আত্মহারা ধ্যানমগ্ন মনে
বাসনা বিহীন মোর এ নীরব তপস্যার বলে
পাষাণ হইয়া যাব—রব পড়ে চরণের তলে
নিজ কর্ম্মফলে।
পাষাণে পূজিতে আমি হইব পাষাণ—
আত্মবলিদান।

যবে কোন শুভলগ্নে নিজ মনে আসিবে হেথায়
হেরিবারে এই প্রতিমায় ;
যখন আপন মূর্ত্তি নিরখিয়া পাষাণের গায়
বিস্ময়ে নির্ব্বাক রবে জ্ঞানহীন মূক মৌন প্রায় ;
আকুল অতীত স্মৃতি ফুটি উঠি করিবে অস্থির
ঝরিয়া পড়িবে যবে দুই বিন্দু নয়নের নীর,
তখন মন্দির—
ধন্য হবে—হবে মোর সার্থক সাধনা
প্রাণের কামনা।

শ্রীরেণুকা দাসী।

অভিভাষণ। *

মির্জ্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে যখন আমি সভাপতির আসন গ্রহণে আহূত হই, তখন এক দিকে অযাচিত সম্মান, অন্য দিকে নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া তাহার একটা সদুত্তর প্রদান আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সম্মান যখন আপনা-হইতেই উপস্থিত তাহা গ্রহণ না করা বিশেষ অব্যবহারিকের কর্ম্ম হইবে এবং সভায় সভাপতিকে অনেক মাসিক পত্রের সম্পাদকের মত দায়িত্ব জ্ঞান অতি অল্পই গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভরসায় আমি সভাপতি হইবার সম্মতি প্রদান করি, মনে করিয়াছিলাম যে দৈনন্দিন কর্ম্ম-স্রোতের মধ্যে এক দিন বিশ্রাম লাভ করিব এবং সম্মিলনীর যাহা কার্য্য তাহা প্রধানতঃ অন্য যে সকল সাহিত্য-সেবী উপস্থিত আছেন তাঁহাদিগের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে, কিন্তু এই আশা দুই দিন পরে আপনাদের সম্পাদকের দ্বিতীয় পত্রে তিরোহিত হইল। তাহাতে আমাকে সম্মিলনীর এই আদেশ জ্ঞাপন করা হয় যে আমাকে সভায় লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিতে হইবে। ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন আদেশ বলিয়া বোধ হইল, তখনই বুঝিলাম যে সম্মিলনী আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমার পাঠাবস্থায় কিম্বা কর্ম্মজীবনে এমন এক পরিচ্ছেদও নাই যেখানে আমার ভবিষ্যৎ জীবন-চরিত লেখক—যদিও এমন হতভাগা জীবন-চরিত লেখকের আবির্ভাব হয়—সাহিত্য চর্চ্চার কোনও চিহ্ন খুঁজিয়া পাইবেন, কিন্তু একবার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া পরে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিবার ভয়ে পিছাইয়া পড়া—রণক্ষেত্র হইতে পলায়নের ন্যায় অসম্ভব বিবেচনায় এবং সভাপতির অভিভাষণে যাহা ত্রুটি হয় তাহা অন্যকার প্রবন্ধ পাঠকগণ সারিয়া লইবেন, এই ভরসায় অদ্য আমি আপনাদের নিকট সসঙ্কোচে উপস্থিত। আমার অভিভাষণে কোনও গবেষণার বা নূতন কথার পরিচয়ের আশা আপনারা ত্যাগ করিবেন। আমি সাহিত্য-সম্মিলনীর সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি বশতঃই এবং সম্মিলনীর আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই এখানে আসিয়াছি,

---

* মির্জ্জাপুর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

এই কথাটী স্মরণ করিয়া আপনারা আমার অন্যান্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ সানুরোধ।

মির্জ্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্য্য বাস্তবিকই বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। দেশে নবভাব আসিয়াছে, আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদিগকে ক্রমেই স্বায়ত্ত-শাসনের ভার দিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন, ভারতবর্ষ যাহাতে তাহার অতীত গৌরব লাভ করিতে পারে এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির সমদ্বন্দ্বী হইতে পারে, সেই শুভ দিনের আবির্ভাবের কামনায় রাজা প্রজা সকলেই অনুপ্রাণিত, কিন্তু এই মহান্ গৌরবের অধিকারী হইতে গেলে আমাদের নিজেদের পরিশ্রম ও চেষ্টার আবশ্যক, যেদিন হিন্দু রাজত্বের লোপ পাইয়াছে সেই দিন হইতে ইংরাজ-রাজের শুভাগমন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত যেন এক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, ইংরাজরাজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও জাতীয়জীবনে ক্রমেই নবশক্তির সঞ্চার হইতেছে। এই শক্তি কেবলমাত্র সহরে সহরে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, এই শক্তিকে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক সাহিত্যিক প্রত্যহ দৈনিক কর্ম্মের মধ্যে প্রবাহিত করিতে হইবে। বাস্তবিক যদি আমাদের জাতীয়জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন করিতে না পারি তাহা হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলন সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র! জগতের অন্যান্য জাতির ন্যায় political right বা শাসন বিষয়ের অধিকার পাইতে হইলে প্রথমতঃ সুশিক্ষার প্রয়োজন, আজ ৪০।৫০ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদিগকে অধিকতর অধিকার দিতে প্রস্তুত, আমাদের যেন মনে না হয় যে কেবল মাত্র এই আন্দোলনেই আমাদের রাজপুরুষগণ মুক্ত-হস্ত হইতেছেন, আন্দো-লনের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের কৃতিত্বের প্রমাণ না হইত তাহা হইলে আমাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবার সুযোগ হইত না, দেশে যদি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী প্রভৃতি মনীষীগণের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে আমাদের আন্দোলন কেবলমাত্র কথায় পর্য্যবসিত হইত। অতএব ইহা নিশ্চিৎ যে আমরা যতই নিজের উপযোগীতা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে দেখাইতে পারিব তাহা ততই আমাদের জাতীয় জীবনের অনুকূল হইবে। এখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মত এই যে

কেবলমাত্র আবেদনের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং প্রকৃত কার্যোর দিন আসিয়াছে, ইংরাজ-রাজ আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তদপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম ইহা আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রমাণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান যে স্বায়ত্ব-শাসনের আইন জারী করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের কার্য্যদক্ষতার পরীক্ষা দশ বৎসর পরে গ্রহণ করা হইবে। প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিরই দেখা কর্ত্তব্য যাহাতে আমরা এই পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহারই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে জ্ঞানের শলাকা উদ্দীপিত করিতে হইবে, যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা ধন্য। মির্জ্জাপুর সৎ-সাহিত্য-সম্মিলনীও এইরূপ স্বদেশ সেবায় ব্রতী হইয়া ধন্য হইয়াছেন। রেলরোড হইতে ৪৪ মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র এক পল্লীর অধিবাসীবৃন্দের লোক-লোচনের অন্তরালে অনাড়ম্বর কার্য্যাবলী সহসা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারে কিন্তু কালে সামান্য অঙ্কুর যেমন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র বালক যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নামে খ্যাত হয় তেমনি ইহাতে ভরসা করা যায় যে সাহিত্য-সম্মিলনীর সামান্য চেষ্টার ফলে কোনও বিদ্যোৎসাহী যুবকের প্রতিভার কিরণ একদিন সমগ্র দেশকে চমৎকৃত করিয়া দিবে।

কিন্তু এখনও কি মির্জ্জাপুর গ্রামের তাহার অতীত স্মৃতির গৌরব করিবার কিছুই নাই, এই মির্জ্জাপুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দরিয়াপুর গ্রাম এক দিন তাহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে এমনই সজীব করিয়া দিয়াছিল যে তাহারই ফলে এমন একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল যাহার সৌরভ বঙ্গীয় কাব্যকাননকে চিরদিনের জন্য আমোদিত করিয়া রাখিল। অতি অল্প দিন হইল সেই মহাপুরুষের স্মৃতি-রক্ষার্থ আমরা দরিয়াপুরে সম্মিলিত হই এবং তাহার মানস-কন্যা কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করি। বঙ্কিম-স্মৃতি-জড়িত দরিয়াপুর বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদের পীঠ স্থান হইবার যোগ্য। তীর্থ পরিদর্শনে সাধুদিগের ভগবদ্ভক্তির উদ্রেকের ন্যায় দরিয়াপুরের সন্নিহিত মির্জ্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর সভ্যগণের হৃদয়ে সাহিত্য চর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা অধিকতর প্রবল করিয়া দিবে।

মির্জ্জাপুর সৎ-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যুদয়ে আমার ব্যক্তিগত একটু শ্লাঘার বিষয় আছে, ব্যক্তিগত কথা সভা-সমাজের সুরুচি বিরুদ্ধ হইলেও আমি একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। ভারতবর্ষীয়গণের স্বভাব এই যে—তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার তাহাদের নিজের কৃতিত্ব থাকুক বা না থাকুক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া তাহারা গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে, আমিও যদি সেই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দেখিতে চাই যে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় প্রভৃতি বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীগণের প্রতিষ্ঠাপিত সাহিত্য-পরিষদের পথাবলম্বন করিয়া আজ বাঙ্গালার দেশে দেশে সাহিত্য-পরিষদের শাখা ও সাহিত্য-সম্মিলনী স্থাপিত হইতেছে। তাহা যে আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা তাহা বলাই বাহুল্য। আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কামনায় আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ Bengal Academy and Literature নামধেয় এক সভার পত্তন করেন, পরিশেষে আমার পিতৃদেব সেই সভার সাহিত্য-পরিষৎ এই নামকরণ করেন। সেই সময় হইতে অনেক জেলায় সাহিত্য-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মির্জ্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনী ঐ সাহিত্য-পরিষদের শাখা না হইলেও একই উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সম্মিলনী যে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য প্রসার করিতে যত্নবান্ তজ্জন্য আমি তাহার পৃষ্ঠপোষকগণকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

আজ মির্জ্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। এই বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্য-জগতে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান কোথায় তাহার সমালোচনা স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের মাপকাঠি স্বরূপ, যে জাতি যত উন্নত তাহার সাহিত্যের প্রসারও তদনুরূপ, বর্ত্তমান যুগে ইংরাজ জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। ইংরাজ রাজত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যেরও অধিকতর প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি ইংরাজি জানেন তাঁহার নিকট জ্ঞানের সকল ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ হিন্দু রাজত্বের চরম উন্নতির সময় সংস্কৃত ভাষাই সকল জ্ঞানের সোপান স্বরূপ ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি সবই সংস্কৃতে রচিত হইয়া তাহার

প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। সেই হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্য এখনও অনেক বাকী আছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরেজাধিকারের পর হইতে যেরূপ বিস্তৃত লাভ করিয়াছে ইহাতে তাহার ভবিষ্যত অত্যন্ত আশাপ্রদ। ইংরাজ রাজ আমাদের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন—বঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনও তাহার অন্যতম। ইউরোপে রোমক যাজকদিগের কবল হইতে জ্ঞানের ভাণ্ডার মুক্ত হইয়া এক সময় সমস্ত দেশকে ছাপাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারই ফলে সেক্ষপীর, বেকন, মিল্টন প্রভৃতি লেখকের আবির্ভাব হয়। সেইরূপ ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানস্পৃহা ও শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতেছে। এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে ইংরেজী শিক্ষার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য একেবারেই ছিল না। অন্ততঃ সৎ সাহিত্যের মধ্যে তাহার স্থান ছিল না। তাহার পর ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গসন্তান রামমোহন রায় তাঁহার সর্ব্বদিকৃস্পর্শী প্রতিভার বলে বাঙ্গালা গদ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকগণ বঙ্গালা ভাষাকে অধিকতর সুললিত ও ব্যাকরণের নিয়মাধীন করিয়াছেন। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনীতে বাঙ্গালা গদ্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষাকে গঠন করেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে বসনভূষণ পরাইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেন। এদিকে গদ্য সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতারও প্রসার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইংরাজী সাহিত্যের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালা কবিতা, গীতি-কাব্য, ও পয়ার রচনায় উন্নতির চরম সীমায় পঁহুছিয়া ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি গীতিকাব্য রচয়িতাগণ বা কাশীরাম, কৃত্তিবাস প্রভৃতি পয়ার রচয়িতাগণ বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালার পদ্য সাহিত্যকে অমরত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কবিগণের লেখার বিশেষত্ব এই যে তাহাদের আদৌ কষ্ট-কল্পনা নাই, তাহা সহজ, সুন্দর ও সরল ভাষায় এমনইভাবে রচিত যে তাহাতে হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, এবং সে রচনা বুঝিতে বা তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে শ্রোতাকে লেখকের ন্যায় পণ্ডিত হইতে হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা কবিতার পূর্ব্বেই এরূপ উন্নতি সাধন

হইলেও ইংরেজী সাহিত্যের নিকট বাঙ্গালা কবিতাও যে অনেক পরিমাণে ঋণী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজীর অনুকরণে বাঙ্গলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যের যুগান্তর করেন। তিনি অমানুষিক শক্তি প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় এমন এক মধুচক্র নির্ম্মাণ করেন যাহা হইতে বাস্তবিকই "গৌড়জন আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি," অবশ্য মাইকেলের পর কেহই আর ঐরূপ গ্রন্থ লিখিতে পারেন নাই। তাহাতে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। কারণ,—শৈলে শৈলে ন মাণিকং মৌক্তিকং ন গজে গজে। যাহা অত্যুৎকৃষ্ট তাহার নিয়ম এই যে তাহার নিজের একটা বিশেষত্ব আছে এবং তাহা অনুকরণীয় তাহা বহুল পরিমাণে মিলিবে না। ইংল্যাণ্ডেই বা মিল্টনের পর আজ ৪০০ বৎসরের মধ্যে প্যারাডাইজ লষ্টের ন্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ কোথায়? কিন্তু মাইকেলকে ছাড়িয়া দিলেও পৃথিবীর কোন্ দেশের সাহিত্য হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের ন্যায় কবির জন্মগ্রহণে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে নাই? তাহার পর বর্ত্তমান সাহিত্য সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ আবার গদ্য ও পদ্য রচনা উভয় ক্ষেত্রেই নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির হীনতার চিন্তায় ক্লিষ্ট ও মর্ম্মাহত তাঁহারা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারিবেন। ইংরেজাধিকারের সংশ্রবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিতে গিয়া মুসলমান নরপতিগণের সংশ্রবে বাঙ্গালা কবিতা রচনার পথ কতদূর পরিষ্কার হইয়া যায় তাহা চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে বাঙ্গালার পরাধীনতার ইতিহাস একেবারেই শ্রীহীন নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে মোটামুটি দুই যুগের অন্তর্বর্ত্তী করা যাইতে পারে পদ্য যুগ ও গদ্য যুগ, ইংরেজাধিকারের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অভ্যুদয় হইতেছে তাহাকে গদ্য যুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা পদ্য যুগ মুসলমান রাজত্ব মধ্যেই আরম্ভ হয়। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোনরূপ সাহিত্যই ছিল না। মৌখিক রচনা ও গান ব্যতীত অন্য রচনার কোন প্রমাণ লক্ষিত হয় না। সেকালে যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা সংস্কৃত চর্চ্চাতেই রত থাকিতেন। অতঃপর মুসলমান নরপতিগণ সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য কৌতূহলী হইয়া দেশীয় পণ্ডিতগণকে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে উৎসাহিত করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি দেশীয় রাজন্যবর্গ

ও জমীদারগণ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই সময়েই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত রচিত হয়। অনেক মুসলমান লেখকও সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন, উদাহরণ স্বরূপ হুসেনসাহী মহাভারত ও ছুটীখাঁর মহাভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাকে আমাদের জাতীয় কর্ম্মজীবনে দৈনন্দিন ব্যাপারে লাগাইতে হইলে ইহার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, ইতিহাস, দর্শন বিশেষতঃ বিজ্ঞান চর্চ্চা বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও অধিক পরিমাণে হওয়া আবশ্যক, কেহ কেহ দুঃখ করেন যে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমেই লঘু হইয়া পড়িতেছে এবং অধিকাংশ বাঙ্গালা পাঠক ছোট গল্প ও উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন, গল্প, উপন্যাস পাঠ সকল স্থলেই নিন্দনীয় নহে, ভাল গল্প ও উপন্যাস অপেক্ষা উপাদেয় পদার্থ আর কি হইতে পারে? রামায়ণ ও মহাভারত উচ্চ উপন্যাস ও গল্পের আদর্শ স্বরূপ, আমাদের শাস্ত্রের যত কিছু উপদেশ তাহা এই দুই মহাকাব্যের ভিতর দিয়াই এতকাল আমাদের জাতীয় চরিত্রকে গঠন করিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমের উপন্যাস এই কর্ম্মের অনেক সহায়তা করিয়াছে, উচ্চ অঙ্গের গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কনদ্বারা সাধারণ লোকের শিক্ষা শুষ্ক নীতিকথা অপেক্ষা অধিকতর চিত্তগ্রাহী ও ফলবতী হইয়া থাকে। অতি উচ্চ দরের লেখক না হইলে এরূপ চিত্রাঙ্কন সম্ভব নহে, সংস্কৃত সাহিত্যের সময়ও লোক শিক্ষার জন্য এইরূপ হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের ছোট ছোট গল্পের সৃষ্টি হয়, উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা পৌরাণিক হোমারের ইলিয়ড নামক মহাকাব্য রচিত হয়, অতএব যাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য মনোরম গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন তাঁহারা দেশের সুসন্তান সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে যে উচ্চ আদর্শ খাড়া করিয়াছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ যেন তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছেন, উপন্যাসসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—অলৌকিক ও সামাজিক অথবা ইংরাজীতে যাহাকে Romance ও Novel বলা যায়, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র ও ইংরাজী সাহিত্যে স্কটের উপন্যাসাবলী ঐ অলৌকিক বা Romance এর পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র দুইটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন—কৃষ্ণকান্তের উইল ও বিষবৃক্ষ, কিন্তু বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক গ্রন্থ তারক-

নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত স্বর্ণলতা, আজকাল সামাজিক উপন্যাসেরই কি ইউরোপে কি আমাদের দেশে সর্ব্বত্র ছড়াছড়ি; যাঁহারা সামাজিক উপন্যাসের পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে উপন্যাসের মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনা ও চরিত্রাবলী সমাবেশ না করিয়া সমাজের নিখুঁত ফটোগ্রাফ বা চিত্র তোলায় উপন্যাসলেখকের অধিক বাহাদুরি আছে, বাহাদুরি আছে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে অনেক সময় বাড়াবাড়ি হইবারও সম্ভাবনা আছে, ইংরাজ লেখক Reynolds ও ঐরূপ নিখুঁত চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া ভদ্র সমাজের তালিকা হইতে বহিস্কৃত হইয়াছেন। অন্য দিকে ঐরূপ নিখুঁত চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত Dickens সাহিত্য-জগতে চির সম্মানিত হইয়া রহিয়াছেন। সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে সমাজের পাপরাশিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইবে, এমন কথা হইতে পারে না। সেই বিশ্লেষণের ফলে অনেক লেখক তাহাদের পাঠকগণের হৃদয়ে কলুষিত ভাবের উদ্রেক করিয়া দেন তাহা কি তাঁহারা ভুলিয়া যান না কুরুচির প্রশ্রয় বাড়াইয়া তাহাদের গ্রন্থের অধিকতর কাটতি করিতে চাহেন? দুঃখের বিষয় বঙ্গসাহিত্যে আজকাল এই শ্রেণীর লেখক ও পাঠকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন যে ঐরূপ উপন্যাসের পত্রাবলী মসলা বাঁধিবারও যোগ্য নহে, কারণ ইহা মসলার সঙ্গে অন্তঃপুরে নীত হইয়া সেখানেও পূতিগন্ধ বিস্তার করিতে পারে। যদি এইরূপ গ্রন্থের অধিকতর আদর হয় এবং লেখকগণ লোকশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাহিত্যের বাজারে কিছু গুছাইয়া লইবার চেষ্টাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমাদের জাতীয় চরিত্র শীঘ্রই অবনতির দিকে ধাবিত হইবে। সম্প্রতি কয়েকটী প্রতিভাবান উপন্যাস লেখকদের আবির্ভাব হইয়াছে। সুলেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা বঙ্গভাষাকে নানা ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহার ভাষায় সকল প্রকার ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ প্রতিভাবান্ লেখকও সকল সময় চরিত্রাঙ্কনে পবিত্রতার আদর্শ বজায় রাখিতে পারেন না। একদিকে তাঁহার পল্লীচিত্র, বিন্দুরছেলে, সুমতি ও বড়দিদি পাঠ করিয়া যেরূপ মুগ্ধ হই অন্যদিকে তাঁহার চরিত্রহীনের চরিত্রাবলীর অস্বাভাবিক সমাবেশে সেইরূপ নিরাশ হইতে হয়। দারিদ্র্য পীড়িত

পল্লী-গৃহস্থের সতী সাধ্বী বিরাজ বউর উজ্জ্বল চিত্র দেখিয়া লেখককে ধন্যবাদ দিতে না দিতেই পরক্ষণেই East Lynneএর বিলাতী নায়িকার অনুকরণে বিরাজবউএর অস্বাভাবিক অধঃপতনের ছবি দর্শন করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতে হয়। প্রতিভাবান্ লেখকের হস্তে আদর্শ-চরিত্র এইরূপে কলুষিত হইয়া পড়িলে অশ্রুজলে ধরাতলাভিষিঞ্চন্, হা হতোস্মি, হা ভগবান বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শরৎচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্ লেখকগণের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন, যেন ক্ষণিক ও সাময়িক করতালির জন্য মোহে পতিত না হইয়া বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী যশের ভাগী হইতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বঙ্গ সাহিত্যে উচ্চ আদর্শপূর্ণ গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে যাহা দেখা যায় তাহা যে অধিক পরিমাণে সমাদৃত হইয়াছে বলিতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' ও চন্দ্রশেখর করের "অনাথ বালক" উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গাল উপন্যাস রচনার কয়েকটী লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। ভরসা করি শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তি" আধুনিক লেখক ও লেখিকাগণের মধ্যে উপন্যাস রচনায় বাস্তবিকই মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল।

বাউল।

—:*:—

(ঐ দেখ) ব্রহ্মানন্দের বাজার বসেছে।
(হেথা) মেলে নিত্য-ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং ব্রহ্ম যাহা বিলাচ্ছে ॥
এ রাজার নূতন বাজার,　　হেথা সবার অধিকার,
প্রবেশ নিষেধ কেবল দেখি "আমি" ও "আমার",
(এই) "আমি আমার" নাই রে যার তার তরে দরজা খোলা আছে।

(হেথা) অন্য পণ্য নাই, (কিন্তু) যা চাই সবই পাই,
চাহিতেও দেখি আমার কিছুই ত হয় নাই,
(ঐ) ব্যাকুল প্রার্থনার অর্থে (নিত্য) পরমার্থ বিকাচ্ছে।
নিরানন্দ যে থাক, (এসে) যাচাই করে দেখ,
সরল প্রাণে ভক্তের মাকে মা বলে ডাক,
ডাকতে ডাকতেই পাবে ব্রহ্মানন্দ, 'জীবন-বেদে' তার প্রমাণ আছে॥

দীনসেবক—শ্রীব্রহ্মানন্দদাস।

পাষাণী।

(১)

সাধক চন্দ্রশেখর শর্ম্মার নাম জানিত না সে জেলায় তখন এমন লোকই কেহ ছিল না, একথা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অত্যুক্তি দোষে পড়িতে হইত না। অথচ তিনি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়, কোন অলৌকিক ক্ষমতাও কখনো তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এমন কথাও কেহ বলে না। সাধনতত্ত্বজিজ্ঞাসু বা মুক্তিকামেচ্ছু কেহ কখনো তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে এমন কথাও শোনা যায় নাই! সাধক আখ্যাটি যে কোন্ সর্ত্তে তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও কখন মতদ্বৈধ বা বাক্যের অপব্যবহার জনিত ব্যঙ্গ ভাবও সাধক মহাশয়ের উদ্দেশে কখনো প্রযোজিত হয় নাই। কোন্ মৃগনাভি কর্ণাক্রান্ত বস্তু যে জগতের ব্যক্তি বিশেষকে এই নামে পরিচিত করিয়া তুলে তাহার কারণ সাধারণের নিকট প্রায় এমনি অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়, কেবল সকলে অসঙ্কোচে তাহার গন্ধটিকে মাত্র স্বীকার করিয়া বসে। তাই সাধক শর্ম্মা কাহাকেও

মন্ত্রদান, লোক-আকর্ষণকারী কোন কর্ম্ম (যথা রোগ উপশম করা বা ঔষধাদি প্রদান এই সমস্ত কার্য্যের) কিছুই না করিলেও সে জেলায় "সাধক মহাশয়" বলিলে তাঁহাকেই সকলে চিনিত। অথচ তিনি একজন রীতিমত গৃহস্থ, গৃহে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত গৃহদেবতা গোপীবল্লভ বিগ্রহ স্থাপিত, সচলা গৃহদেবী গর্ভধারিণী মাতা, সহধর্ম্মিণী গৃহিণী, এবং দুইটি পুত্র ও কন্যা বর্ত্তমান।

পঞ্চাশ বৎসরের আগের কথা। সে সময়টাকে এখন অনায়াসে সেকাল বলা চলে। সেই সেকালের গৃহস্থ পরিবারের নিত্যনিয়মিত পূজার্চ্চনা ব্রত নিয়ম দান অতিথিসেবা এবং বার-তিথি পর্ব্বে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতিতে এই পরিবারটি এবং পরিবারের প্রধান চন্দ্রশেখর শর্ম্মা দেশকালকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিলেন। অথচ তিনি এমন সঙ্গতিপন্নও ছিলেন না। কয়েক শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও কিছু লাখেরাজ জমী এবং দু'একখানা বাগান পুষ্করিণী ইহাই মাত্র তাঁহার সম্পত্তি কিন্তু তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়াকলাপ সে অঞ্চলের একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে তান্ত্রিক শাক্ত, কিন্তু গৃহদেবতা গোপীবল্লভ ও শালগ্রাম শিলার জন্মাষ্টমী, দোল, ঝুলন প্রভৃতি পর্ব্বোৎসবগুলি কখনো বাদ যাইত না এবং "বারো মাসে তেরো কালী" সে জেলার গ্রামের মধ্যে এই সাধকবাড়ীতেই পূজা হইত। দীপান্বিতা, রটন্তী, ফলহারিণী প্রভৃতি পূজা ছাড়াও মাসের প্রতি অমাবস্যায় সাধকের কালীপূজা নিয়মিত ছিল। নিশীথ রাত্রে যখন ঢাকের বাদ্য ক্রমে থামিয়া আসিত তখন গ্রামবাসী বুঝিত এইবার সাধক-বাড়ী হইতে মহামায়ার প্রসাদ ভোজনের আহ্বান আসিতেছে। পূজার অগ্রে তিনি কখনো কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতেন না, কিন্তু পূজা অন্তে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার সাদর আহ্বান ও প্রসাদের দুর্ল্লভতা স্মরণ করিয়া গ্রামবাসী সে রাত্র অন্য কাহারো নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিত না। সে অঞ্চলের যত দুর্ল্লভ বা বহুমূল্য মিষ্টান্ন ও ফলাদি সমস্তই এই মহামায়ার প্রসাদে তাহারা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইত। সাধক ধনী ব্যক্তি নন্—তথাপি ইহাতে কেহ আশ্চর্য হইত না। সাধক শর্ম্মার উপরে সেদিকের লোকেরা এতটা শ্রদ্ধান্বিত ছিল যে তাহাদের গৃহজাত মহার্ঘ বস্তুগুলি তাঁহার বাড়ীর দুর্গোৎসব বা শ্যামা পূজায় তাহারা নিজ নিজ জাতি-ব্যবসা নির্ব্বিশেষে আনিয়া উপস্থিত করিত। কুমারে

স্বেচ্ছায় সাগ্রহে এমন প্রতিমা গড়াইয়া দিত যে গ্রামে তিনি "বড় ঠাকরুণ" নামে অভিহিতা হইতেন। মালিতে ডাকের সাজ আপনি আসিয়া পরাইয়া দিয়া যায়, ময়রারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্দেশ, গোয়ালা তাহাদের গৃহজাত নির্জ্জলা দধি দুগ্ধ ছানা ক্ষীর এবং যাহারা সাধক মহাশয়ের জমী করে তাহারা চাউল আদির ভার লয়। প্রজা ও গ্রামের অনেকে সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার গৃহে সে কয় দিন সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে। গ্রামের বৃদ্ধেরা এবিষয় অনেক গল্পও বলিয়া থাকেন। দেবী সাধক-গৃহে অচলা হইয়া প্রতিষ্ঠিতা আছেন এবং তাঁহার পূজায় যাহারা এইরূপে সাহায্য করে সম্বৎসরের ব্যবসায়ে নাকি তাহাদের প্রচুর লাভ হইয়া থাকে। তাই তাহারা স্বেচ্ছায় বিনামূল্যে এমন করিয়া তাহাদের সর্ব্বোত্তম দ্রব্য সাধকবাড়ীর পূজায় আনিয়া উপস্থিত করে।

গৃহে অতি শিশু পুত্র শঙ্কর এবং সাত বৎসরের কন্যা মহামায়া। পিতামহী "গৌরীদানের" ফল লাভ করিতে উৎসুক, কিন্তু পুত্র সে বিষয়ে চেষ্টিত নন। ইহাতেও এক অচিন্ত্য ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সেদিন জ্যৈষ্ঠমাসের অমারাত্রে ফলহারিণী কালিকা পূজা হইতেছিল। সন্ধ্যা হইতে মেঘ করিয়া একটু বেশী রকম ঝড় জলের উৎপাত বাধিয়াছে। সাধক এসব কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া একমনে পূজার রত হইলেন। দ্বিপ্রহরের পর পূজা অন্তে যখন তিনি উঠিলেন তখন দেখিলেন কন্যা মহামায়া ধূপাধারের নিকটে উপস্থিত নাই এবং পরিজনেরা যেন কিছু চঞ্চল। ঝড়বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীকে প্রসাদ গ্রহণের জন্য আহ্বানের আদেশ দিতেছেন এমন সময়ে কন্যা আসিয়া সংবাদ দিল সেই ঝড়জলের সময় সে দুই তিন জন অতিথি সংগ্রহ করিয়াছে। তাঁহারা ভিজিতে ভিজিতে পথ চলিতে-ছিলেন, চণ্ডীমণ্ডপের দ্বার হইতে সে তাহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের আহ্বান করিয়া বাহিরের ঘরে বসাইয়াছে এবং পিতা পূজায় ব্যাপৃত আছেন বলিয়া নিজে এতক্ষণ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত ছিল। পিতা প্রীতভাবে কন্যার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, এবং তাহার হস্ত ধরিয়া অতিথিবর্গের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাদরে তাঁহাদের অভিনন্দিত করিলেন। পরিচয়ে জানিতে পারিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহার গ্রামান্তরের প্রতিবেশী কিন্তু অন্য ব্যক্তিটি অনেক দূরের লোক এবং তাঁহারই একজন ধনী স্বজাতি। তিনি সেই দুর্যোগে অতটুকু

বালিকার অপরিচিত ব্যক্তিদের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হওয়া এবং ব্যাকুল আহ্বানের কথাগুলি বর্ণনা করিয়া পুনঃ পুনঃ সপ্রশংস বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পিতা সস্নেহ নেত্রে একবার কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন "মা যে আমার মহামায়া।" আগন্তুক ব্যক্তি সানন্দে উত্তর দিলেন "ঠিক্ই বলিয়াছেন। সেই মেঘ ঝড়ের মধ্যে আপনার এই স্থির বিদ্যুতের মত মেয়েকে আমার 'গৌরী' বলিয়াই ডাকিতে ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু তাহার পরে বুঝিলাম মা মহামায়াই বটেন।" সাধকের পরিচিত ব্যক্তিটি বলিলেন "না হবে কেন এই রকমই যে সাধক মশায়কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শুধু তো মাটীর মূর্ত্তিতে তিনি ঘরে পূজা লন্ না, সর্ব্ব স্বরূপে সর্ব্বেশে হইয়াই যে আছেন।" "কি রকম কি রকম" বলিয়া আগন্তুক আগ্রহ প্রকাশ করায় দ্বিতীয় ব্যক্তি সাড়ম্বরে গল্প জুড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া সাধক বিনীতভাবে তাহাদের প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যবস্থার জন্য নিজে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। কন্যা ঈষৎ সলজ্জভাবে অতিথিদের নিকটে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। গ্রামান্তরবাসী গল্প চালাইতে বলিলেন। "এদিকের সকলেই এ কথা জানে। উনি কি সাধে গৃহস্থাশ্রমী হইয়াছেন? মার আজ্ঞায়! জন্মান্তরের সাধক ব্যক্তি, অল্প বয়সেই সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছায় গৃহত্যাগ করেন, ঘরে গর্ভধারিণী মা একা, উনিই মায়ের ও বংশের এক সন্তান। পথেই দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া উঁহাকে ফিরাইয়া দেন, আর বলিতে গায়ে কাঁটা দেয়,— প্রতিশ্রুতি দেন্ যে তিনি তাঁর গৃহে সর্ব্বরূপে সর্ব্বদা পূজা লইবেন। তাঁর গৃহদেবতা মূর্ত্তিতে তাঁর মাতা স্ত্রী কন্যা পুত্র অতিথি অভ্যাগত দাসদাসী আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতি সর্ব্ব কর্ত্তব্য স্থানে সর্ব্বস্বরূপে তিনি বিরাজ করিবেন। তাঁহাকে খুঁজিতে সাধকের গৃহত্যাগের প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধ মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের কাঁদাইলে সাধক যাহাকে খুঁজিতে যাইতেছেন তাঁহাকেই তাঁহার কাঁদানো হইবে। এই জন্যই সাধক মহাশয় গৃহধর্ম্মেও অত্যন্ত মনোযোগী। তাঁর সর্ব্ব কার্য্যেই মহামায়া অধিষ্ঠিতা তাই পশু পক্ষী শৃগাল কুকুরেও তাহার আহ্বান মাত্রে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দত্ত প্রসাদ ভোজন করে। অতিথি অভ্যাগতে দেবতার মত পূজা পান্। সর্ব্বসাধারণের উপরই তাঁহার একভাব। দেখিবেন এই এত রাত্রেও তাঁর পূজার প্রসাদ পাইতে কাহারো আসিতে আলস্য হইবে না। বাপেরা রুগ্ন জীর্ণ শিশুদের পর্য্যন্ত নীরোগ করিবার জন্য প্রসাদ খাওয়াইতে লইয়া আসে। সকলে তাঁকে এত ভক্তি করে। ভাণ্ডারে তাঁর

লক্ষ্মী অচলা, কমীর ধান বৃক্ষের ফল অফুরন্ত অথচ এ সব বাহির হইতে কাহারো বুঝিবার উপায় নাই।"

শ্রোতা এক মনে সমস্ত শুনিয়া গেলেন এবং মাঝে মাঝে 'বটে,' 'সত্য নাকি!' 'আশ্চর্য্য' ইত্যাদি বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন। সকলের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহারা বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন তখন সাধক মহাশয় তাঁহাদের সে বিষয়ে কোন কষ্ট হইতেছে কিনা জানিতে আসিয়া এক অচিন্ত্য ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। ধনী অতিথি তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন "আমি এই রাত্রেই এ বিষয়ে কথা কহিতে চাই। আপনার এই কন্যারূপিণী মহামায়াকে আমার ঘরে প্রতিষ্ঠিতা করিতে চাই, আপনি সম্মতি দান করুন।" "এতরাত্রে এখন নিদ্রা যান্, আর এ কথা থাক্,—প্রাতে উঠিয়া বিবেচনা করিবেন" ইত্যাদি কথাতেও সাধক তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা মাতা ও স্ত্রীর সম্মতি লইয়া বলিলেন "যদি আপনার পুত্র অপাত্র না হয় তাহাকে আমি কন্যা দান করিব, কিন্তু ইহাতেও আমার একটী বক্তব্য আছে। আমার কন্যা মাত্র সপ্তম বর্ষীয়া। উপযুক্তা না হইলে দ্বিরাগমনের জন্য জেদ্ করিতে পারিবেন না। যদি এই সর্ত্তে রাজী হন তাহা হইলে আর কোন আপত্তি নাই। মাতা গৌরীদানের ফল লাভের জন্য বড় ব্যস্ত, নহিলে আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিতেই অনুরোধ করিতাম। আজিকার রাত্রেই আপনার এ প্রস্তাব ইহাও দেবীরই ইচ্ছা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার এই নিবেদনটি রাখিতে হইবে।"

ভবিষ্যত-বৈবাহিক একটু যেন দম খাইয়া গেলেন কিন্তু সেচ্ছায় যে প্রস্তাব করিয়াছেন আর তাহা ফিরাইয়া লইতেও লজ্জা বোধ করিলেন।

যথাকালে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহান্তে বধূকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার সময় ক্রোড়ে লইয়া শ্বশুর বলিলেন "দেখিও মা যেন পাষাণী হইও না, তোমার নাম যে মহামায়া তাহা মনে রাখিও। শীঘ্র আবার আমার ঘরে ফিরিয়া আসিও" সেই সদ্য বিবাহের রক্তবস্ত্র পরিহিতা সপ্তম বর্ষীয়া বধূ মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে শ্বশুরকে উত্তর দিল "বাবা যখন পাঠাইবেন তখন আসিব। তাহার পূর্ব্বে তো আসিতে পারিব না।"

শ্বশুর গৃহের লোকেরা বিস্মিত এবং শাশুড়ী রুষ্ট হইয়া উঠিলেন কিন্তু শ্বশুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন "কেমন বাপের কন্যা! আচ্ছা মা তাহাই হইবে"।

(২)

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বৎসরাধিক কাল হইতে সাধক মহাশয় মাতাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, গৃহে সহধর্ম্মিণী, পুত্রকন্যা ও গৃহ-দেবতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। সহসা সংবাদ আসিল কন্যার শ্বশুর মারা গিয়াছে, শাশুড়ী ঠাকুরাণী অবিলম্বে বধূকে লইয়া যাইতে চান্। স্বামীর অনুপস্থিতে গৃহিণী কন্যাকে পাঠাইতে সাহস করিলেন না, সংবাদবাহী রুষ্টভাবে ফিরিয়া গেল।

দুই বৎসর পরে ভারতের সর্ব্বতীর্থ সারিয়া মোক্ষদায়িকা সপ্ত-পুরী দর্শনান্তে মাতা পুত্রে যখন গৃহে ফিরিলেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব পাষাণময়ী প্রতিমা গৃহে আনীতা হইলেন। প্রতিমা দক্ষিণা-কালিকা মূর্ত্তি, পদতলের শিব হইতে উভয় পার্শ্বের ডাকিনী যোগিনী শিবা-সমন্বিতা দেবীমূর্ত্তিটি মাত্র একখানি প্রস্তর হইতে কঁ,দিয়া তোলা। শুধু তাহাই নয়, সেই সার্দ্ধ এক হস্ত পরিমিত সমগ্র প্রতিমাখানির শিল্প-চাতুর্য্যেও দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিল্পী সেই পাষাণময়ীর মুখে ও আকারে এমন একটি ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিল যে তখনো সেই অপ্রতিষ্ঠিতা দেবীমূর্ত্তিকে কেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। ভয়ে ভক্তিতে অভিভূত হইয়া সকলে যোড় হস্তে দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল তীর্থ হইতে সাধকের সঙ্গে প্রকট পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে দেবী তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন, দলে দলে লোক প্রতিমা দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। দেবীর মহিমায় সকলে এরূপ বিচলিত হইয়া উঠিল যে ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক শঙ্করকেও তাহার অনুভূতি আসিয়া স্পর্শ করিল। তাহার দিদি যখন তাহাকে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইতে ঠাকুরমার কথিত ছড়া বলিতেছিল "আমাদের মহারাজা রামকৃষ্ণ নিস্তারিতে কলি, লালবাগেতে নির্ম্মাইলেন জলদবরণ কালী" ইত্যাদি। তখন বালক উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল "আমাদের বাবাও তো সেই রকম 'মাকালী' এনেছেন। আমরাও এইবার থেকে বলব— 'আমাদের নৃত্যকালী নয়ন ভরি যেবা যখন দ্যাখে, সেই বলে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে কে আনিল মাকে।' "

সাধকের মনে হইল এই পাষাণময়ীর প্রতিপত্তির উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে তাঁহাকে গৃহে আনাই বৃথা। কিন্তু সে কার্য্য সহজ নয়। উপযুক্ত মন্দির শিব প্রতিষ্ঠা এবং ইহাকেও প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক অর্থেরই প্রয়োজন। তাঁহার অবস্থা লোকে যেরূপ সচ্ছলই দেখুক ঘরে নগদ এক পয়সা তো নাই, বাসগৃহ তো মৃত্তিকা খড় ও বংশনির্ম্মিত। জমীজমা ছাড়া অন্য সঙ্গতি কিছুই নাই। দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য সাধক সর্ব্বস্বই পণ করিয়া বসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন "কন্যা ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণা হইল। এইবার জামাতাকে আনাইয়া তাহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠানোর একান্ত প্রয়োজন। এতদিন না পাঠানোয় শাশুড়ী ঠাকুরাণী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এখন সে সহৃদয় শ্বশুর নাই, কন্যাকে দ্বিরাগমনে আর দেরী করা উচিৎ নয়। সে জন্য মহামায়ার পিতার উপযুক্তভাবে কন্যা দ্বিরাগমনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও ক্রয় করার প্রয়োজন।"

সাধক বলিলেন "এখনো মহামায়া সেরূপ বয়স প্রাপ্ত হয় নাই। আরও দু'এক বৎসর সে জন্য তাহাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। এখন উপস্থিত দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ ছাড়া আমার সম্মুখে অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই।" সহধর্ম্মিণী ক্ষুণ্ণ মনে নীরবে রহিলেন।

গৃহের সর্ব্বোত্তম স্থানস্থিত মৃত্তিকা নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ "চৌরী" ও "আটচালা" ঘর দুইখানি ভাঙিয়া সেই স্থানে মন্দিরের বনিয়াদ খোঁড়া হইল। জেলা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ রাজমিস্ত্রি আসিল। দুইটি শিব মন্দিরের মাঝে তিনটি বৃহৎ বৃহৎ খিলান যুক্ত দুইস্তরের নক্সা প্রস্তুত হইল।

গৃহে সঞ্চিত অর্থ নাই অথচ বহু মুদ্রার প্রয়োজন। অগত্যা সাধক জমিজমার কতকাংশ বন্ধক দিলেন এবং স্বতন্ত্র ঋণও করিতে হইল। তাহাতেও সংকুলান হয় না। চাষে এমন কিছু লভ্য হয় না, অনর্থক সম্বৎসর কৃষাণ মুনিষের ভরণ পোষণে বহুব্যয় হইয়া থাকে। চাষের সময় ঠিকাভাবে তাহাদের দ্বারা কাজ চালানো যাইবে, এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সাধক বারোমাসের চাষের সরঞ্জাম উঠাইয়া দিলেন, হাল গাড়ী বলদও বেচিয়া ফেলিলেন।

গৃহের ব্যয়ও সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সে বৎসর সাধক-বাড়ীর মাসিক কালীপূজা হইল না। অন্যান্য পর্ব্বেরও ব্যয় বাহুল্য সংক্ষিপ্ত হইল।

কড়িবরগাহীন দুই চত্বরের বৃহৎ মন্দির, ভিতর বাহিরের ভিত্তিগাত্রে শঙ্খের কাজ ও প্রস্ফুটিত পদ্মের মালার বেড়া, গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ গৃহ চত্বরের গাত্রে নানা বর্ণের বিচিত্র চিত্রে মণ্ডিত। সাধক শর্ম্মা মনের মত করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অর্থাভাবে কার্য্য তেমন শীঘ্র অগ্রসর হয় না, মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া পড়ে। এক বৎসর কাটিয়া গেল তথাপি মন্দির নির্ম্মাণ সাঙ্গ হইল না। ইতিমধ্যে গৃহের পূজাপার্ব্বণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রিত প্রতিপালিতের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে, অতিথি অভ্যাগতেরও তেমন সমাদর হইত না। গৃহে কেবল যত্র-তত্র ইষ্টকের রাশি, চুন সুরকি বালি এবং বহুমূল্য মসলার নির্য্যাস পূর্ণ গাদ্; (মন্দিরের গাঁথনি পোক্ত হইবে বলিয়া সেকালের মিস্ত্রিরা খদির হরিতকী প্রভৃতি ভিজানো জল ব্যবহার করিত,) চারিদিকে শুধু খট্ খট্ দুম্ দাম্ ঝন্ ঝন্ রব এবং সুতার মিস্ত্রির শালকাঠ সেগুনকাঠ কর্ত্তন ও ঘর্ষণের শব্দ। তাহাদের মাঝখানে স্নানাহার নিদ্রাতন্দ্রাবর্জ্জিত রুক্ষ শুষ্ক দেহ উদ্ভ্রান্ত-মুখশ্রী সাধক শর্ম্মা। শিল্পী ও সুতারদের লইয়া ইষ্টক প্রস্তরে ও কাষ্ঠে নানাপ্রকার শিল্প সমাবেশ করিতে তাঁহার অন্য সমস্ত কর্ত্তব্য দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল।

দেড় বৎসর পরে মন্দির শেষ হইয়া যেদিন তাহার চূড়ার পদ্মের উপর ত্রিশূলটি উজ্জ্বল হইয়া ঝকমক্ করিতে লাগিল এবং রাজ মিস্ত্রির দল সাধক শর্ম্মার গাত্রের শাল, ঘড়া প্রভৃতি বিদায় লাভ করিয়া চলিয়া গেল সেইদিন রাত্রে সাধকের অত্যন্ত জ্বর আসিল। সকলেই বুঝিল ইহা এই বৎসরাধিক কালের অশ্রান্ত পরিশ্রমেরই ফল কিন্তু সাধক একটু যেন বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জ্বরের ঘোরে কেবলই বলিতে লাগিলেন "তাই যদি হয়—আঃ মা,—আরও কিছুদিন্—তোমার প্রতিষ্ঠা করিয়া লই।"

সুস্থ সবল হইতে প্রায় মাসখানেকই লাগিল। এইবার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ কিন্তু সাধক এক একবার যেন বিহ্বল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। মন্দির নির্ম্মাণেই যে ঋণ হইয়াছে তাহা কতদিনে শোধ হইবে বলা যায় না। এই ঋণ-বদ্ধ সম্পত্তি কি দেবত্র বলিয়া

উৎসর্গ হইতে পারে? তাহাদের যে মুক্ত করিয়া লইতেই হইবে। তাহার পরে দেবতা প্রতিষ্ঠার ব্যয় - সেও তো অনেক! শূন্য মন্দির এমন করিয়া তাহার শূন্য হৃদয় লইয়া কতদিন মার প্রতীক্ষায় চাহিয়া থাকিবে!

অধীর অন্তর এক একবার পরামর্শ দিতে লাগিল, দেশে স্বধর্ম্মপরায়ণ ভক্তিশীল ভূস্বামী ও ধনীর তো অভাব নাই, মায়ের প্রতিষ্ঠাকার্যে তাঁহাদের কাহারো শরণ লইলে সাহায্য গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? আপনি চিরদিনের জাগ্রত বিবেক মাথা তুলিয়া উঠিয়া অন্তরের সে দীনতাকে তখনি নত করিয়া দিল। প্রতীক্ষা করা ভিন্ন উপায় নাই। "তাহাই হউক—দেখি কত দিনে মা সদয়া হইয়া গৃহে অধিষ্ঠান করেন।"

জননী, গৃহিণী, মিনতি করেন "তোমার শরীর দিন দিন অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে বৈদ্য ডাকাও—চিকিৎসা করাও। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে আর তাহাকে পিতৃগৃহে রাখা অধর্ম্ম। জামাতা ও তাহার মাতা বিষম রাগত হইয়া আছেন শুনিতেছি পাত্রের শীঘ্রই বিবাহ দিবেন, মহামায়ার দ্বিরাগমনের উদ্যোগে আর বিলম্ব করিও না।" সাধকের একই উত্তর—"মায়ের প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমার সম্মুখে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই। ইহাতে শরীর থাকুক কিম্বা যাউক্। কন্যাকে তাহারা এমনি লইয়া যায় যাউক আপত্তি নাই, দ্বিরাগমনের দ্রব্য দেবী প্রতিষ্ঠার পরে জামাতাকে পাঠাইয়া দিব।"

"এ কথা কেহ কি কুটুম্বকে বলিয়া পাঠাইতে পারে?"

"তবে কন্যা যেমন আছে তেমনি থাকিবে, ব্যস্ত হইও না।"

গৃহস্থ ধর্ম্মের দিন দিন ব্যত্যয়ে সে গৃহের গৃহলক্ষ্মী আর যেন বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারিলেন না। গৃহিণী সহসা আগন্তুক ব্যাধির আক্রমণে পরলোক গমন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্যাকে যাহাতে শীঘ্র স্বামী গৃহে পাঠানো হয় এ জন্য সাধককে পুনঃ পুনঃ মিনতি জানাইয়া স্বামীর একই উত্তর পাইয়াছিলেন "আমার উপস্থিত অন্য কর্ত্তব্য নাই।" মর্ম্মাহতা সাধ্বী, শাশুড়ী ও কন্যার হস্তে বালক পুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

দেবীপ্রতিষ্ঠার চিন্তায় উন্মত্তের মতই সাধক নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়েও জ্ঞানহীন হইয়াছিলেন। মাতার সতর্কতায়ও সে বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আসিতেছিল না।

কয়েক মাস অল্প অল্প জ্বর ভোগের পর আবার যে দিন শয্যাশ্রয় লইলেন মাতা সেদিন তাঁহার নিষেধ না মানিয়া কবিরাজকে ডাকাইলে কবিরাজ আসিয়া প্রায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। মাতাকেই তিনি জানাইতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহার পুত্রের অসাধ্য ক্ষয় রোগ ধরিয়াছে, পারেন তো এখনো ভাল রূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, অন্যথায় শীঘ্র তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে।

মাতার চিকৎসার উদ্যোগ দেখিয়া সাধক জানাইলেন "এ গৃহের এক কপর্দ্দক বা একটি শস্যকণাও অন্য কোন বৃথা কারণে ব্যয়িত হইতে পারিবে না। ইহার সমস্তই দেব-উদ্দেশে নিবেদিত। ইষ্টদেবীর চরণামৃতেও যদি তাঁহার রোগ শান্তি না হয় তাহা হইলে এ ব্যাধি আর অন্য কিছুতেই উপশম হইবে না। অতএব-বৃথা ব্যয় করিয়া তিনি মায়ের প্রতিষ্ঠার দিন আরও পিছাইয়া দিতে কিছুতেই পারিবেন না।

মাতার শত অনুরোধ অনুনয় বেদন আত্মীয় বান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহস্র উপরোধ কিছুতেই সাধককে টলাইতে পারিল না। রোগও উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সাধক এক দিন সেবারতা কন্যার পানে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন "মহামায়া মা, তুমি যদি আজ আমার পুত্র হইতে।" পিতার মর্ম্মোত্থিত গভীর নিঃশ্বাসের মূল্য বুঝিয়া কন্যা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল "তাহা হইলে কি হইত বাবা!"

"তাহা হইলে জান নাকি মা—পিতা নিজের জীবনের অসম্পূর্ণ ইচ্ছা পুরণের ভার পুত্রের উপর দিয়া যায়।"

হতোদ্যম রোগজীর্ণ পিতার মুখের পানে চাহিয়া কন্যা বলিয়া উঠিল "আমার ওপরও সে-ভার দিয়া যান বাবা! কন্যা কি সন্তান নয়? ছেলেরা যদি পারে মেয়ে কেন পারিবে না?"

"পারবি মা,—তুই পারবি মায়া?"

"কেন পারিব না! বলুন কি বলিতে চান্।"

"নূতন কোন কথা নয় মা, জানিস্ তো যাহার জন্য তোকে পর্য্যন্ত এখনো স্বামীর কাছে পাঠাইতে পারি নাই। মা-আমার জীবিত কালে এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন না, তবুও আমি তাঁহাকে ছাড়িব না। ও-পাষাণীকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্পত্তি যাহা কিছু

আছে সমস্ত দেবত্র করিয়া শঙ্করকে তাহার সেবাইত করিয়া দিয়া তবে তোর মুক্তি। তবে তুই স্বামীর কাছে যাইতে পাইবি।—পারবি মহামায়া?"

"পারিব।" কিছুক্ষণ পিতার রোগপাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কন্যা পুনরায় প্রশ্ন করিল—"কিন্তু যদি তোমার মত এমনি করিয়াই বিফল হই বাবা!—তাহা হইলে?"

"তাহা হইলে?" পিতা নিমীলিত নেত্রে কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর দিলেন "তাহা হইলে উহাকে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিও। আর যেন ও নিষ্ঠুরাকে কেহ ঘরে লইয়া যাইতে না পায়। এ মন্দিরও তুমি ধ্বংশ করিয়া দিও,—এ ভারও তোমার উপরেই রহিল।"

সাধকের জীবনীশক্তি দিন দিনই ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। মৃত্যুর দিন দুই পূর্ব্বে তিনি এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলেন। একটি বালিকা যেন তাঁহার শিয়রে বসিয়া ডাকিল—"চন্দ্রশেখর!"

সাধক উত্তর দিলেন—"কে তুমি মা?"

"সেই আমি যাহাকে খুঁজিতে তুই নবীন যৌবনে গৃহত্যাগ করেছিলি! সেই আমি—যে তোর গৃহে বহু দিন সর্ব্বরূপে পূজা পাইয়া আসিয়াছে। আমি তোর ইষ্টদেবী—গৃহদেবতা মাতা স্ত্রী কন্যা পুত্র আত্মীয় অভ্যাগত অতিথি ভৃত্য পশু পক্ষী। তিন বৎসর হইতে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুই যে সেই আমারই অপমান অবহেলা করিয়া আসিয়াছিস্। অবশেষে ছার অহঙ্কারের তৃপ্তির জন্য দেহ পর্য্যন্ত নষ্ট করিলি।"

চন্দ্রশেখর আর্ত্তকণ্ঠে স্বপ্নেই কাঁদিয়া উঠিলেন "মা তোমারি জন্য; তোমারি পাষাণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে যে, তাহা কি জান না! সে কি তুমি নও?"

"সেও আমি কিন্তু তবু আমি নই! স্বার্থ' আমার ছদ্মবেশে তাহার মধ্যে তোরই অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া নিজের স্বামী প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তোর বংশের প্রাণপণ চেষ্টায়ও তাহা সফল হইতে পারিবে না। কিন্তু এ তুচ্ছ কথা সাধক, ভ্রমান্ধ তুই তোর চিরদিনের সাধনা ত্যাগ করিয়া কতকালের মত যে আমায় হারাইলি তাহা কি এখনো বুঝিতে পারিতেছিস্ না।"

"তারা তারা" শব্দে উচ্চ চীৎকারে সাধকের জননী ও মহামায়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল সাধক শয্যা হইতে ধূলায় পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। মাঝে মাঝে কেবল অসংলগ্ন দুই একটা কথা ও 'তারা' শব্দ ছাড়া আর কোন কথা মুখ হইতে ফুটিল না। দুই দিন পরেই সাধকের মৃত্যু-সংবাদে সে জেলার লোক হাহাকার করিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সমস্যা।

—:*:—

তোমারে প্রকাশ সে ত সোজা কথা নয়,
আমাতে আমারি ছাঁচে　　আছ তুমি বড় কাছে
আমাতে ছড়ায়ে আছ হয়ে আমিময়
আমারে দিতেছ ব্যথা,　　জাগাইছ ব্যাকুলতা,
ঘুরাইছ দেশে দেশে আকুল হৃদয়;
ফিরাইয়া আনি ঘরে　　বসিতেছ কোলে ক'রে
আপনারে আনিতেছ আপন আলয়;
তোমারে প্রকাশ সে ত সোজা কথা নয়!

এই আমি আমি করি আর আমি নাই,
মিছে এই কলরব　　তুমি সব তুমি সব
নিমেষ ফেলিতে আমি তোমাতে মিশাই!

কে হাসায়, কে কাঁদায়, কে কারে খুঁজিতে চায়,
তুমি ত আমারি রূপে হতেছ উদয় !
কভু এক কভু দুই এই ধরি এই ছুঁই,
আবার তখনি হই তোমাতে বিলয় ;
তোমারে প্রকাশ সে ত সোজা কথা নয় !

ভাবি কভু আমি ছাড়া নাহি কিছু আর,
তুমি থাক ফাঁকে ফাঁকে কে তার খবর রাখে
আমারে পূজিবে শুধু এ ভব সংসার !
আবার কখন ফিরে ধরি ও-চরণ শিরে
তোমারে তোমার রূপে দেখি সাধ হয় ;
আমি থাকি দূরে সরি তোমার আরতি করি
নিজেরে নিজেই স্তব করি জয় জয় ;
তোমারে প্রকাশ সে ত সোজা কথা নয় !

তোমারে খুঁজিতে গিয়ে নিজেরে হারাই—
মোর সুখ, দুখ, শোক, এ নিখিল বিশ্বলোক,
কোথাও খুঁজিয়া কিছু দেখিতে না পাই !
আজো ত শিখিনি আমি কি নাম বলিব স্বামী,
একি তুমি ? একি আমি ? এ ত তাও নয় !
আমিও যা তুমিও তা এই জানি সাদা কথা,
তোমাতে আমাতে মিলি অরূপ চিন্ময় !
তোমারে প্রকাশ সে ত সোজা কথা নয় !

নারী সৃষ্টি।

যতদিন না পুরুষ নারীর সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে উঠ্‌তে পারচে, ততদিন পর্য্যন্ত নারীকে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিনীরূপে জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সমানভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে চলে আসতে নিমন্ত্রণ করা বাতুলতা মাত্র। যতই সৎ উচ্চ উদার আদর্শ সম্মুখে খাড়া থাক, সমস্তকে চুঁইয়ে সেই সনাতন পরস্পর ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধের কদর্য্য হিংস্রবৃত্তি বেরিয়ে পড়্‌বেই। আজ দেশ কালের অবস্থা সখ্ জাগাতে পারে কিন্তু সখ্ জিনিষটা এখানে প্রশ্রয়ের উপযুক্ত নহে। অভাব জাগাতে পারে কিন্তু সে অভাবকেও সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে হবে। অবশ্য এই অভাববোধ জেগেই একদিন দেশে স্ত্রীলোকের পুরুষের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রচার করতে হবে। সে অভাব কিন্তু অসামান্য অভাব। সে বোধমাত্রে পর্য্যবসিত নয়, সে একেবারে জীবনের অন্তঃস্তল থেকে উদ্রিক্ত একটা আহ্বান। সে অভাবের প্রসূতি-অবস্থা নহে—প্রকৃতি।

কথা হচ্চে এই যে প্রকৃতি আপনার মোহনতুলিকাস্পর্শে বাহির বল অন্তর বল সর্ব্বত্রই ক্ষণে ক্ষণে আপনার রঙ ফলাচ্চেন, তারই বর্ণবিকাশ আমাদের বর্ত্তমান সংস্কার অভ্যাস যা কিছু। সেখানে একটা রৌদ্র বীভৎস মিশ্রিত রসের মুখভঙ্গীর কল্পনা ফুটে উঠেই সমাজে এই নারী-নর সমস্যার উদয় হয়েছে। অর্থাৎ এই দুই জাতি সুখ ও জীবন উভয়ের আসক্তিতে পরস্পর পরস্পরের সুখ ও জীবনকে চেপে লড়াই কর্চ্চে; পুরুষের অস্ত্র পৌরুষ, আর নারীর অস্ত্র মোহিনীর মোহময় সম্মোহনকুহক। আমরা বুদ্ধির যথেষ্ট স্পর্দ্ধা রেখেও যেখানে মাথা ঘুলিয়ে ফেলে বলি ছলনা চাতুরী। এই দৃশ্য এখনি পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে যদি প্রকৃতি তুলির আঁচরে আবার নূতন কিছু টেনে বসেন। তিনি টেনেচেন।

আমরা যে অনুভব কর্চ্চি। সত্যই যে হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে আর একটা আহ্বানধ্বনি বেরিয়ে আসচে। এবার বুঝি সেখানে একখানি করুণা-ছল্ ছল্ আঁখি প্রীতিময়ী সুখের মৃদু হাসির লীলা বিলাস আঁকা হয়ে উঠেচে।

সেই অতীতের গৃহস্থালী পাতা রয়েচে—নারী এখনও তেমনি অন্তঃসারশূন্য। আমাদের সকল ছুরভিসন্ধি পূরণেরই উপায়রূপা, আমাদের হাতে উপায়হীনা সবই তেমনি, যেমনটী পেয়ে একদিন আমরা তাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে সুখের সংসার পেতেছিলাম। আমরা বই আর তাদের জীবনে কোনও অবলম্বন রাখিনি—তাদের সমস্ত আশা ভরসা ব্যাপ্তি আমাদের ধারণ-পোষণ ও রক্ষণেই যন্ত্রের মত নিয়োজিত করেছিলুম—তেমনি অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা করে সেবার সমস্ত বৃত্তিগুলি তাদের মধ্যে রয়েচে, তবুও একটা গোপন সলজ্জ অস্বস্তিতে আমরা ভরে উঠচি, আমাদের মন স্বীকার কর্ত্তে না পারলেও অন্তরে অন্তরে বুঝচে—"শূন্য দেখি শোভিত সংসার," আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হয়ে খুঁজে পাচ্ছে না—কিসে দুঃখী কি অভাব তার।

অবস্থাটা তারই চিহ্ন, যে দুইটী জাতির পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। মনের মধ্যে অস্বস্তি দেখ্‌চি—গৃহস্থালীতে বিশৃঙ্খলা দেখ্‌চি—সমাজে কর্ম্মক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকেই আমরা নিজেদের মধ্যে দেখ্‌চি অপূর্ণতা। চারিদিকেই অভাববোধ; জীবনের প্রত্যেক স্তরে এমনি করে অভাববোধ যখন বুঝতে পাচ্ছি' তখন স্পষ্ট হতে আর দেরি নেই, যে এ সেই প্রকৃতিরই অভাব যে প্রকৃতি আমাদের সমস্ত জীবনটারই প্রসূতি। সুতরাং এই অভাবকে আমরা অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।

অনেক উচ্চে প্রকৃতির নিভৃত ভাণ্ডারে যা সৃষ্ট হয়ে উঠেছে এখনও ত ধরণীতে তার অভিব্যক্তি পৌঁছায় নি। বিজ্ঞান যা দেখেচে মন প্রাণ তা সঙ্গে সঙ্গেই কি পেতে পারে? প্রকৃতি তাঁর নূতন ছবিখানির বর্ণসংযোগ শেষ করে ফেলুন। তবে ত আমাদের চোখের সামনে সেটা ফুটে উঠবে! আমরা দেখ্‌তে পাব। স্বভাব যখন স্বভাবতই পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠ্‌বে তখন সকলেই নারীকে নূতন চোখে দেখবে কিন্তু স্বভাব পরিবর্ত্তিত হবার আগে সেই চোখে তাকে দেখতে হলে এই চোখ নিয়ে ত হবে না, এই চোখকে সেই চোক করে নেওয়া চাইত।

একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষ ও নারী যোগযুক্ত হবে—বিধাতা এমনি একটা বিধান করে বসেচেন। সেই সহযোগ আজই যারা পেতে চায় তাদের সাধনা করে যোগযুক্ত হতে

হবে এও ভগবানেরই খেলা। সমস্ত সমুদ্র জমে ওঠবার আগেও একটা ছোট ছোট হিম শিলার বুদ্বুদ ওপরে ভেসে ওঠে। যে সমষ্টি যোগে সমস্ত জাত একদিন সহযোগ পাবে আজ ব্যষ্টির মধ্যে দু এক জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষারূপে তা ঘটে উঠতে থাকবে।

আজ তাই স্তব্ধ হয়ে আত্মপরীক্ষা কর, তোমাকে প্রেরণা টান্‌চে কি বাসনা টান্‌চে, কিসের জন্য তুমি সহসা ব্যথিত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচ. নারীর জন্য? যে গলায় বিবাহ রাত্রের ফুলমালা পরিয়ে এসেচ আজ সৌহার্দ্দের আবেষ্টনে সেখানে বাহু স্থাপনা করতে চাও, এ কার চাওয়া ভগবানের না তোমার?

তোমার স্বরূপ বেরিয়ে পড়েচে, স্বভাব ব্যক্ত হয়ে গেচে—সং সাজা একেবারে শেষ। এখানেও তাই। নারী গড়্‌তে চাও, তুমি যত দিন চাইবে গড়া হবে না, ভোগ করাই হবে। চাইবে সহযোগ, পাবে উৎকট আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। ভগবান চাইলে ফুটে উঠবে তোমার মধ্যে আর তোমার সংস্পর্শে নারীর মধ্যে শ্রদ্ধা ও শুদ্ধির প্রতিমা। যার যা কাজ সে ত কর্ব্বে। ভগবানের কাজ সৃষ্টি; তাঁর মধ্য দিয়ে না করলে' তুমি কি কর্ত্তে পার?

তাই নারী-গঠন আর কিছু নয়—নারীতে যোগযুক্ত হওয়া, নারীর মধ্য দিয়া ভাগবত উপলব্ধি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহজ করে বোঝাবার জন্য বল্‌তেন ওদের গঠন কে কর্ত্তে পারে, মহা-মায়ার অংশ বলে চিন্‌তে হয়। আরো সহজ করে কথাটাকে বুঝা চলে। মহামায়া আপনি না চেনালে কে চিন্‌তে পারে? চেন্‌বার বা শক্তি কই? আমাদের বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি বলুক ত জোর করে' সে আমাদের সে আমাদের বিশ্বরহস্যের কতটুকু বোঝাতে পারে? বুঝবো এইযে অহঙ্কার যাকে বুঝতে হবে তার পায়ের তলায় সঁপে দেওয়াই সোজা রাস্তা। নারীকে গড়বো চিন্‌বো এই যে অহঙ্কার, এটা নারীর মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়াই সোজা রাস্তা। এমনি করলেই অতি দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্র সরল হয়ে যেতে পারে।

নূতন স্বভাবের আভাস নারীকে প্রয়োজনের সূত্র ছিন্ন করে' জগতে আনন্দের বাঁধন পরে' গৃহপ্রতিষ্ঠাসকে জাতীয়তার মুক্ত বাতাসে প্রতিষ্ঠা করতে ডাক্‌চে—কিন্তু সে যে এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি—সে যে এখনও আভাস মাত্র, তাই, অভাবরূপে তার মন যা জাগাচ্ছে

—স্বভাবরূপে সেই মনই আবার তা ঠেকাচ্চে। তারা চাইতে ইচ্ছা করচে এক, চেয়ে বস্‌চে আর। যে মন নিয়ে অতীন্দ্রিয় সত্যের অভিমুখে তারা ছুটে যাচ্ছে আবার সেই মন নিয়েই তারা প্রত্যক্ষ বাস্তবের পদতলে ধুপ্ করে বসে পড়্‌চে। তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা খুঁজচে নারীত্বের লক্ষ্য কই? পরিণাম কি? হৃদয় বল্‌চে নারী যে এই। অভাববোধ স্বভাবের হাতে অবশেষ আত্মসমর্পণ করচে। জীবনযুদ্ধে শান্তির শুভ্র পতাকাতুলে ধরে' তারা পথহারা হয়ে যাচ্ছে! নারীত্বের মহিমামন্দির নির্ম্মাণ তাই এখন বিলম্বিত। নারীজাতি অপেক্ষা করচে—কে সেই পুরুষ, যে ভিতর ইট্ হয়ে কার্য্য আরম্ভ করে দেবে!

আর পুরুষ! সে অধ্যাত্মরাজ্যের যত উচ্চ স্তরেই উঠুক, পৌরুষের প্রতিকূলে পুরুষ হয়ে উঠে নারীর জন্য কেমন করে' আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারা যায়, এ সমস্যার সে মীমাংসা করে' উঠ্‌তে পার্চ্চে না। সেও তাই স্তব্ধ। তাদেরও তাই মনের কথা। ওগো মধুরহাসিনি সুকেশিনি তা হয় না! আমারই কণ্ঠলগ্না হয়ে যদি থাক—উন্নতিস্রোতে পৃথক করে' গা ভাসান, সে আর হয় না!

সোজাকথা এই যে মানবত্বের মধ্যে এর মীমাংসা নেই। মীমাংসা যেখানে সেখানে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনও দৃষ্টিই পৌঁছায় না। সেখানে আপনার দিক থেকে সব চেষ্টা গুঁড়িয়ে গেলে প্রকৃতি টেনে নিয়ে যান। এই প্রকৃতিই সহায়, এই প্রকৃতিই উপায়—তিনিই কালী।

চৈত্র। প্রবর্ত্তক।

লাক্ষা।

—•—

লাক্ষার ব্যবহার ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে। এমন কি পুরাণেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ভারতীয় কামিনীর বিলাস-সজ্জার ইহা একটা প্রধান উপকরণ। ইহা ব্যতীত নানা প্রকার শিল্পকার্য্যেও লাক্ষার ব্যবহার বহুকাল হইতে সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই পুরাতন পণ্যের উন্নতি না হইয়া ভারতে ক্রমেই ইহার অবনতি ঘটিতেছে; অথচ ইহার উৎপন্ন-প্রক্রিয়া এরূপ কঠিন ও জটিল নহে যে একটু চেষ্টিত হইলেই ইহার উন্নতি ও প্রসার না হইতে

পারে। সময় থাকিতে চেষ্টা না করায় আমাদের অধিকাংশ শিল্প-সম্ভারই মৃতপ্রায় ও বিদেশী পণ্য দ্বারা বাজার হইতে বিদূরিত হইতেছে। লাক্ষা উৎপন্ন করিবার বহু সুযোগ সত্বেও বিদেশীয় লাক্ষার আমদানী ভারতে প্রসার লাভ করিতেছে। আমেরিকায় লাক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো, পানামা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে এক প্রকার কীট হইতে গাঢ় রক্তবর্ণ রঞ্জক-পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহার নাম কচিনীল (Cochineal); নানা প্রকার ঔষধ, শিল্পদ্রব্য এবং বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। লাক্ষাও ঐরূপ "Cocas Indica" নামক এক প্রকার কীট হইতে উৎপন্ন হয় এবং ভারতবর্ষ ব্যতীত ব্রহ্মদেশ, মালয়, পেগু প্রভৃতি দেশেও অল্পাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতীয় লাক্ষা গুণাধিক্য বশতঃ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। তথাপি ইয়োরোপীয় বণিকেরা আমেরিকার কচিনীলের অধিকতর পক্ষপাতী, কারণ উহা তাঁহাদের আবিষ্কৃত জমীদারীতে উৎপন্ন সুতরাং মূল্যও অধিক; আর অসম ভারতের লাক্ষা ইংরেজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যের ফলে আত্মগোপনের অবসর পায় না। যাহা হউক অনেক বিচক্ষণ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের মতে কচিনীলের রং ঘোর হইলেও ভারতীয় লাক্ষার রং তদপেক্ষা অনেক অধিক কাল স্থায়ী; সুতরাং শিল্পরঞ্জন কার্য্যে অধিকতর উপযোগী; বস্তুতঃ দেখা যায় ভারতীয় মহিলারা বিনা দ্রব্যান্তর সংযোগে হস্তপদাদিতে যে অলক্তক ব্যবহার করেন, আর তাঁহারা যেরূপ সতত সলিল-সহায় কর্ম্মশীলা, তাহাতেও লাক্ষার চিহ্ন দশ বারো দিবসের কমে লোপ পায় না, যদি তাহাতে ক্ষার বা কষায়াদি সংযোগ করা যায়, না জানি তাহা কত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

লাক্ষার চাষ অতি সহজ ও স্বল্প পরিশ্রমসাধ্য। যে বৃক্ষে লাক্ষা কীটের অস্তিত্ব আছে, তাহার একখানি কীটসংযুক্ত ডাল, অশ্বত্থ, পলাশ, কুল বা বাবলা গাছে বাঁধিয়া দিলেই হইল। আর কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আপনি লাক্ষা কীট সেই বৃক্ষে গিয়া বাসা করিবে,—বাসা করিবে বলিলে ভুল হয়,—তাহারা ছড়াইয়া পড়িবে বলাই ঠিক; কারণ এই কীটদল বৃক্ষশাখায় ছড়াইয়া পড়িয়া উহার কোমল ত্বক আহার করিতে থাকে ও সত্বরই ত্বকে শত-ছিদ্র করিয়া ফেলে। এই সকল ছিদ্র মধ্যে তাহারা অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করিয়া অচিরে প্রাণ ত্যাগ করে। সে ডিম্ব হইতে আবার লক্ষ লক্ষ প্রাণী উৎপন্ন হয় ও উহারাও আবার অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়; এই প্রকারে অতি অল্পকাল মধ্যে এক

একটি বৃক্ষ লাক্ষা কীটে পূর্ণ হইয়া যায়। আমরা একটি কুল বৃক্ষে লাক্ষা বীজ সংযোগ করিয়া দিয়াছিলাম। বর্ষার পূর্ব্বে ছয় মাসের মধ্যে সেই বৃক্ষটির এমন শাখা প্রশাখা ছিল না, যাহাতে কীট না গিয়াছিল। লাক্ষা কীটই লাক্ষা—ইহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে যে লালা নির্গত করে, অনেকে তাহাকে লাক্ষা বলিয়া ভ্রম করেন, বস্তুতঃ উহা লাক্ষা নহে, উহা সব কীটের আহার উপকরণ, রংয়ের কিছু নহে; তবে লালার ন্যায় উহা নানা কার্য্যে উপযোগী না হইলেও লাক্ষার সহিত উহা মিশ্রিত করিলে, অনেক কার্য্যে লাগে।

বর্ষণবারি পতিত হইবার পূর্ব্বে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হয়। বৃষ্টির জলে লাক্ষার বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। রঞ্জনকার্য্যের জন্যই যখন লাক্ষার প্রধান উপযোগীতা তখন যাহাতে ইহার বর্ণ নষ্ট না হয়; সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা উচিত। লাক্ষা হইতে উৎপন্ন রঞ্জক অত্যন্ত ঘোর ও বহুবিধ প্রয়োজনসাধক বলিয়া বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

কীট নির্গমন বা বারি পতনের দ্বারা রং নষ্ট হইয়া গেলেও লাক্ষার উপযোগীতা নষ্ট হয় না; তখন উহা চালা, পাত-গালা প্রভৃতি অন্যান্য মূল্যবান পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া বিক্রীত হয়। কীটের দেহনির্য্যাস বায়ু সংস্পর্শে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলে লাক্ষা মিশ্রিত হইয়া নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই অংশ রঞ্জন ধুনা প্রভৃতির ন্যায়। ইহা দ্বারা বার্নিশ, শীলমোহরের গালা, গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। প্রকারভেদে লাক্ষার চারি পাঁচ প্রকার ব্যবসা চলে। যথাঃ—গালা (Stick lac), অলক্তক—আলতা, লাক্ষা বটীকা (Lacdyees laccaka), বীজ গালা (Seed lac) এবং চাঁচ বা পাত গালা।

অলক্তক-রং বাহির করিতে হইলে সংগৃহীত শাখাগুলি হইতে অস্ত্র দ্বারা লাক্ষা চাঁচিয়া একত্র করিতে হয়। পরে তাহা উদূখলে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জল সংযোগে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মন্থন করিলে জল ঘোর রক্ত বর্ণে পরিণত হয়, এবং পাত্রের নিম্নে তলানী পড়ে। উত্তমরূপে পেঁজা তুলা এই জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই আলতা প্রস্তুত হইল।

লাক্ষা-বটীকা;—সোডা বা পটাশের ক্ষার উক্ত জলে মিশ্রিত করিয়া পরে ফিটকারী মিশ্রণ (Alum solution) সংযোগ করিলে মিশ্রণটির গালা ও রঞ্জক দুইটিই থিতাইয়া পাত্র নিম্নে পতিত হয়। তখন উপরিস্থ পাল জল ভিন্ন পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়া রং ছাঁকিয়া লইতে হয়।

এই চাঁচনী মৃদু জ্বালে চড়াইয়া নাড়িতে থাকিলে ক্রমেই গাঢ় হইয়া আসে; তখন ফ্রেমে ফেলিয়া কসিয়া লইলেই লাক্ষা-বটীকা প্রস্তুত হইল। জল শুকাইবার জন্য বালুকা যন্ত্রই প্রশস্ত। বিলাতে এই বটীকাই রঙ্গনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় বণিকেরা এখান হইতে কাটী-গালা লইয়া গিয়া লাক্ষা-বটিকা প্রস্তুত করে। আর আমরা তাঁহাদের খোরাক যোগাই; আল্‌তা ও কাটী-গালা বেচিয়াই আমরা সন্তুষ্ট। আমরা দ্রব্যের উপাদান প্রস্তুত করিতে যথাসাধ্য করি; কিন্তু যেটী লাভবান প্রক্রিয়া সেইটিতে হাত দিতে ভয় পাই। বিদেশীগণ সেই ব্যবসায়ে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, দেখিয়া কেবল হায়, হায়, করি! কোন ধনী যদি উপযুক্ত রাসায়নিকের সহায়তায় লাক্ষা-বটিকার ব্যবসা খুলেন তাহা হইলে একটি নূতন আয়ের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট লাক্ষা বটিকা অতিশয় মসৃণ ও ঘোর বর্ণ বিশিষ্ট এবং ছুরিকা দ্বারা চাঁচিলে অতিশয় উজ্জ্বল ও রক্ত বর্ণ দেখায়।

রং বাহির করিয়া লইবার পর পাত্রের নিম্নে যে তলানী পড়ে ইহাই বীজগালা। আলতা ও বীজগালা এক সঙ্গে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা হইতে আমাদের দেশে নানা প্রকার চুড়ি, শিলমোহরের গালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পশ্চিম প্রদেশে ইহার খুব প্রচলন। আমাদের বঙ্গদেশে ইহার ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বিদেশী চুড়ি, বঙ্গবধূর চক্ষু ধাঁধাইয়া লাক্ষা চুড়িকে পদচ্যুত করিতে উপক্রম করিয়াছে; গুণের জন্য নহে, ফ্যাসানে। ভগবানের কৃপায় আমাদের সে দিন কাটিতেছে—এখন বঙ্গমহিলা লাক্ষার চুড়ির আদর করিলে অচিরেই লাক্ষার ব্যবসায় উন্নত হইবে। লাক্ষার চুড়িও দেখিতে খুব সুন্দর হয়। লাক্ষার সহিত নানা বর্ণের রং মিশ্রিত করিয়া ইহার বর্ণ অনেক প্রকারে করা হয় ও চুড়ির উপরিভাগে সোনা পাত মুড়িয়া সোনালী করা হয়। পশ্চিম দেশীয় রমণীগণ হাত ভরিয়া এই লাক্ষা চুড়ি পরিয়া থাকেন। এখনও পশ্চিমাঞ্চলের ছোট বড় অনেক সহরে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে 'লাহেরীর' কাজ করেন। দ্বারভাঙ্গার লাহেরিয়া সরাইয়ের নাম এই লাহেরীর কার্য্য হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে বহু লাহেরিয়ার বাসছিল।

বীজগালাগুলিকে একটি দৃঢ় এবং সচ্ছিদ্র জালার মধ্যে পূর্ণ করিয়া তীব্র অগ্নি উত্তাপ প্রদান করিলে উহা উত্তাপে গলিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হরিদ্রা বর্ণ অংশে (Flake)

পরিণত হয় ইহাই চাঁচগালা। চাঁচগালা দ্বারা বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। ১০ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট চাঁচ, পাঁচ পাউণ্ড সুরাসারের সহিত (Spt Rectif) মিশাইয়া সপ্তাহ কাল মাঝে মাঝে উত্তমরূপে নাড়িতে হয়, পরিশেষে উহা উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলেই বার্ণিশ হইল। ব্যয় সুলভের জন্য Spt Rectif না দিয়া mythylated spirit ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

দৃষ্টি-বিভ্রম।

(১)

ভট্‌চাযি গিন্নী দয়াময়ী ঠাকরুণ সেদিন পাঁচ রকম খাবার দাবার ক'রতে বড় ব্যস্ত, কেন না তাঁর পাশ-করা ছেলে পাঁচু বাড়ী আস্‌ছে। চার চারটে পাশ করা ছেলে যে তার বাপমায়ের কি গৌরবের জিনিষ তা শুধু বাপমায়েরাই বুঝ্‌তে পারেন!

পাঁচু—শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য কিন্তু এই গ্রামটাকে তিনি বড় বেশী প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। তার প্রথম কারণ এখানকার ম্যালেরিয়া একবার তাঁকে কাবার করবার যোগাড় করেছিল, ভাগ্যে তাঁর ভগ্নিপতি শরৎবাবু তাকে রাঁচি যেতে লেখেন, তাই সেবারে সে বেঁচে গিয়েছিল! নইলে দেশেই থেকে যেতে হ'ত!

পাঁচুগোপাল তার চেহারাখানাকে অপছন্দ করতো না, কেন না সেটা বেশ পছন্দসই ছিল, কিন্তু তার মস্ত আপত্তি ছিল ঐ নামটাতে! উপায় ছিল না, কেন না সেই পাঠশালা থেকে বরাবর ইয়ুনিভারসিটি অবধি এই নামটাই চলে এসেছে, তা নইলে সে হয় তো কোন্‌ দিন মাবাপের দেওয়া নাম বদলে একটা কোনো নূতন হাল ফ্যাসানের নাম রেখে নিত।

এম্‌-এ, পাশ করা হ'য়ে গেছে, তবু পাঁচুগোপালের বিবাহ করা আজও হয়নি, কেন না তাতেও পাঁচুগোপালের ভারি ভয় ছিল, পাছে নামের মত ফেলাও যায় না, গেলাও যায় না গোছেরই একটী বৌও মা জুটাইয়া দেন; তাই সে বরাবর মাকে দাদাকে শাসিয়ে এসেছে

যে বিয়ে সে নিজের পছন্দে ক'রবে, যতদিনে ইচ্ছা ততদিনে, এই ইচ্ছাটা হ'ল কিনা জানবার জন্যেই তার মা অনেক মাথার দিব্যি দিয়ে তবে গ্রামে আনাতে পেরেছেন !

রাত আড়াইটের সময় ট্রেণ আসে সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে, সেখান থেকে সাত মাইল গরুর গাড়ী বা পাল্‌কী ক'রে আসা যায়, ষ্টেশন থেকে মাইল-খানেক হেঁটে নদীর ধারে গেলে নৌকাও মেলে, কিন্তু পাঁচুগোপাল তার সঙ্গে সাইকেল এনেছিলেন তাইতে চড়েই অক্লেশে বাড়ী এসে যখন পৌঁছুলেন, রাত তখন তৃতীয় প্রহর !

আশ্বিন মাস, পূজোর ছুটি। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, কাজেই অন্ধকারে কষ্ট পেতে হয়নি। বাড়ীতে তখন কেবল দয়াময়ী দালানে প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে বসেছিলেন, আর মিনিটে চার বার ক'রে পথপানে চেয়ে দেখছিলেন আর সব ঘুমিয়ে। পাঁচুর জুতোর শব্দ পেয়েই দয়াময়ী বলিলেন "পাঁচু নাকি বাবা ?"

"হ্যাঁ, দুয়োর খোল।"

দয়াময়ী দুয়োর খুলে দিতেই পাঁচু মাকে প্রণাম ক'রে দালানের চৌকীখানাতে বসে পড়লো; পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে কপালের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে সে বল্‌লে "অনেক দিন পরে বাড়ী এলাম, নয় মা ?"

দয়াময়ী বলিলেন "অনেক দিন পরে বই কি, সেই যেবার রেণু হ'ল, সেইবারে এসেছিলি !"

"গাঁয়ের খবর কেমন তোমার ? সব ভালো তো !"

"হ্যাঁ, এবার তো এখনও জ্বরটর কোনো বাড়ী হয়নি, তাই তোকে লিখলাম আস্‌তে, কতকাল দেখিনি, মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল যেন।"

পাঁচু ততক্ষণে পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে দেখলে যে কটা বাজলো;—সাড়ে তিনটে দেখে বল্‌লে "আমি কোথায় শোব মা ? আমার বিছানা কোথায় করেছ ?"

দয়াময়ী বলিলেন "বিছানা তো ওই দক্ষিণ-ঘরে করা আছে, কিন্তু হাত পা ধুয়ে কিছু খাবি নে ? একটু কিছু খেয়ে নে।"

মাথা নেড়ে পাঁচু বললে "ওরে বাপ্‌রে, সদ্য কলেরা হয়ে মর্‌তে হবে তা'হলে। যা খাব একেবারে সকালে, এত রাত্রে আবার কিছু খাওয়া যায় ?"

দয়ামী এতটা রাত খাবার নিয়ে বসেছিলেন, বললেন "তা অমনি মুখেই শুবি, ক্ষিদে পায় নি ?"

"না আমি রেলে খাবার কিনে খেয়েছি, ক্ষিদে পায় নি, এখন একটু শুতে পারলেই বাঁচি !"

দয়াময়ী তখন তাকে আলো দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে যে ঘরে বিছানা ছিল সেইখানে পৌঁছে দিলেন, তার পর নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

(২)

ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে উঠেই পাঁচুর দাদার মেয়ে রেণু ছুটে গিয়ে ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করলে "হাঁ ঠাকুমা আমাদের কাকাবাবু আসে নি ?" দয়াময়ী পাঁচুর ঘর দেখিয়ে বললেন—"এসেছে, ঐ ঘরে ঘুমোচ্ছে।" রেণু আশ্চর্য্য হয়ে বললে "এখনো ঘুমুচ্চে ? ডেকে দি ঠাকুমা !" দয়াময়ী সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে বারণ করলেন, "ওরে না না তাকে ডাকতে যাস্ নি, সে শেষ রাতে এসে শুয়েছে।"

পাঁচুর দাদা সদানন্দ ভট্টাচার্য্য যাজকতা ক'রে আর পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির আয়ে কোনোরকমে সংসার চালান। গাঁয়ের জমিদারদেরও তাঁর ওপর মায়া-মমতা আছে! সদানন্দ পাঁচুর চেয়ে বছর দশেকের বড়, তা না হ'লে তো পাঁচুর নামটা আর একটু ভালোই হ'তে পারতো; সদানন্দ জন্মাবার পর তাঁর মায়ের চারিটি সন্তান নষ্ট হয়ে গেল ব'লে তিনি পাঁচু ঠাকুরের মানত করে তবে পাঁচুগোপাল তাঁর বেঁচেছিল।

সদানন্দের বয়স তেত্রিশ কি চৌত্রিশ, কিন্তু উড়েদের মত কামানো মাথা, আর চারি পাশে ছয় সাতটি ছেলেপিলে দেখে তাঁকে চুয়াল্লিশ বলেই ভুল হ'ত !

সদানন্দকে গাঁয়েরই তিন চার জন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক পাঁচুর জন্যে ধরেছিল, তিনি নিতান্ত সাধাসিধে সরল মানুষ, সকলকেই কথা দিয়ে রেখেছেন "আচ্ছা আগে পাঁচু বাড়ী আসুক !" এখন যে কা'কে কি বলবেন ভেবে বাহিরের ঘরে গিয়ে বসতেও তাঁর ভয় লাগছিল। যেদিন পাঁচু বাড়ী এল, তার পর দিনই নিবারণ মল্লিক মশায় ও তাঁর ভাই এসে

পড়লেন, তাঁর মেয়ের জন্যে, এদের কথা দিয়েছিলেন দয়াময়ী নিজে ; মেয়েটি দয়াময়ীর পছন্দ হয়েছিল, একটু ছোট হলেও সে সুন্দরী মেয়ে।

সদানন্দ বাড়ীর ভেতর এসে বললেন "মা, মল্লিক মশায় তো এসেছেন কি বল্‌বো বল,—একটা জবাব তো' দেওয়া চাই !"

পাঁচু প্রথমটা একথা শুনে একটু ভাবনায় পড়লো। কি বল্‌বে ঠিক ভেবেচিন্তে নিয়ে বল্লে "আমি নিজে মেয়ে দেখে তবে কথা দোব।"

"তা' বেশ !" বলে সদানন্দ বাহির থেকে ঘুরে এসে বল্‌লেন "এখন তুই চল, তো'কে ওঁরা দেখতে চাচ্ছেন যে !"

এইবারেই তো পাঁচুর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো ! মোটে বেলা ন'টা, না-হয়েছে স্নান না-হয়েছে মাথার পরিপাটী, একেই তো নামটাই তার পরম শত্রু, তাঁতে এমন চেহারা নিয়ে কি ভদ্রলোকের সামনে বের হওয়া যায় ?

পাঁচু বললে "আমাকে ? কেন আমি তো যাবই, তখন দেখবেন !"

সদানন্দ ধমক দিয়ে বললেন্ "এখন দেখ্‌তে চাচ্ছেন ওঁরা, তা কি বলবো ?"

মনে মনে সাজ পোষাকের হিসাব ক'রতে ক'রতে পাঁচু দাদাকে বললেন "আচ্ছা, আপনি যান্, আমি যাচ্চি।"

সদানন্দ চ'লে গেলে সে তাড়'তাড়ি একটা ফর্সা পাঞ্জাবী বের ক'রে পরে ফেল্‌লে, তার পরে চুল ঠিক করাও হ'য়ে গেল, তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে সে পা টিপে টিপে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ধরা পড়ে গেল !

সদানন্দের স্ত্রী নলিনীবালা তখন পান সাজ্‌তে বসেছিলেন তিনি তাকে দেখে খুব হাস্‌লেন, বল্‌লেন "বাঃ খাসা হয়েছে ! তুমি তো আর ক'নে নও, অত পরিশ্রম না কর্‌লেও পারতে !"

নলিনীবালা পাঁচুর সমান বয়সী, তাকে পাঁচু খুব সম্মান করেই চল্‌তো না, কথার উত্তর সে দিতই, কিন্তু তখন আর দেওয়া হ'ল না, মাথা হেঁট ক'রে একটু হেসে সে চলে গেল ! নলিনীবালা সেই বিয়ের ক'নে যেদিন এসেছিলেন সেইদিন থেকে আজ অবধি তাঁর কালো রং, মোটা গড়ন, এ সব নিয়ে কথা কইতেও তাঁর দেওরটি ছাড়েনি, এখন বড় হয়েছে তবু মায়ের

পছন্দের নাম শুনেই সে যেন আঁতকে ওঠে, এমনি ভাব দেখিয়ে খুব হাসে, আর ভাজকেও হাসায়,—কিন্তু কথায় জবাব দিতে সে কখনো কসুর করে না এই প্রথম ক'রলে !

নিবারণ মল্লিকের বাড়ী সেখান থেকে দেড় মাইল কি দু মাইল রাস্তা হবে, তিনি বিকেলে পাঁচু ও সদানন্দকে ক'নে দেখ্‌তে যেতে অনুরোধ ক'রে গেলেন। সদানন্দ তাঁর উদার সরল স্বভাব অনুযায়ী খুব এক মুখ হেসে স্বীকার ক'রে নিলেন। ভদ্রলোকেরা খুসী হ'য়ে বিদায় গ্রহণ ক'রলেন !

পাঁচু হাঁক ছেড়ে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে যে বাড়ী থেকে ময়লা জল সব বেরিয়ে যাবার জন্যে যে ড্রেণটার মুখ বাড়ীর পিছনে এসে শেষ হ'য়েছে, সেইখানে এক হাঁটু কাদা গোলা দুর্গন্ধ জলে নেবে তার দু'বছরের ভাইপোটী মাছ ব'লে নর্দ্দামার পোকা ঘাঁট্‌ছে,—ঘেন্নায় তার বমি আস্‌ছিল,—কাছে গিয়ে সে ভাইপোকে ধম্‌কিয়ে বল্‌লে "ওঠ্‌ শীগ্‌গীর !"

সে ছেলেটী সেই এক হাঁটু নর্দ্দামায় নাব্‌বার সময় নেবেছিল, কিন্তু উঠ্‌বার সময় উঠ্‌তে পারে না, কাজেই সে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে আবদার ক'রলে "উঠিয়ে দাও !"

পাঁচু ভাবলে বুঝি তার সেটা নষ্টামি, সে যে উঠ্‌তে পারছে না। বলেই উঠ্‌ছে না তা সে বুঝ্‌তে পারলে না, আরো বেশী রকম ধমকে বল্‌লে "উঠ্‌লিনে ? এই বারে মার খাবি তা হ'লে !"

খোকা কাকার মুখপানে চেয়ে বল্‌লে "কি ?"

পাঁচু হাতে চড় দেখিয়ে বল্‌লে "মারবো,—ওঠো শীগ্‌গীর !"

দু বছরের ছেলের নবাবি মেজাজ, সে মারের নামে ভয় পেলো না, উল্‌টে নর্দ্দামার কাদা জল সব শুদ্ধ ছুঁড়ে কাকার ধোপ পাঞ্জাবীর মাথা খেয়ে দিলে ! রাগে, দুঃখে, পাঁচুর ঘেন্না-পিত্তি সব ঘুচে গেল। সে তখন এগিয়ে গিয়ে ভাইপোর হাত ধরে টেনে নর্দ্দামার গর্ত্ত থেকে তুলে তাকে আচ্ছা ক'র এক ঝাঁকানি দিয়ে কাঁদিয়ে দিলে। আর একটু বয়স বেশী হ'লে সে মারই খেত সেদিনে, কিন্তু অত কচি গালে পাঁচুর মত লোকের হাতের চড়টা নেহাৎ সইবে না বলেই বেঁচে গেল। কিন্তু সদ্য পাট ভাঙ্গা নূতন ধুতি পাঞ্জাবীর দশা দেখে পাঁচুর নিজের গালেমুখে চড়াতে ইচ্ছে করছিল। সে তখন হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে কাদামাখা ছেলেটাকে এনে তার মায়ের সামনে হাজির করলে !

নলিনীবালা গরম জল করে নিয়ে স্নান করাবার জন্যে ছেলেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমন সময়ে, অপরূপ বেশে ছেলে দেখে সে খুব হেসে উঠ্‌লো। পাঁচু রাগে মুখ লাল করে বললে—"এই ত্যাখ বৌদি তোমার এই গাধা ছেলেটা আমার জামা কাপড়ের কি দুর্গতি করে দিলে,—এমন বাঁদর ছেলে!"

নলিনীবালা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "জামা কাপড়ের আর কি দুর্গতি হয়েছে, কাচ্‌লেই সাফ হয়ে যাবে, দুর্গতি তোমারই হয়েছে ভাই, সত্যিই ছেলেটা গাধা, এমন সময়েও কি না এই রঙ্গ করতে গেল!"

তারপর সে হাসি থামিয়ে বল্লে "কেমন করে এই দুর্গতি হ'ল তোমাদের বল দেখি? কোন নালায় কি খালে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি দু'জনে?"

উত্তরে পাঁচু সব কথা খুলে বল্‌তেই নলিনীবালার হাসি বেড়ে গেল, সে বললে "তবে তো খোকা বুদ্ধির কাজই করেছে, তোমার গায়ে কাদা না দিলে কি আর তুমি ওকে সে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে?"

"হাঁ, খুব বুদ্ধির কাজই করেছে বটে! ছেলেকে বেশী করে আদর ক'রো।" বলে পাঁচু পোষাক বদলাতে গেল! বাস্তবিক একটা অবোধ অবুঝ শিশুর কাণ্ড দেখেও সে তখন খুবই চটে গিয়েছিল, বিশেষ তার ওপর আবার নলিনীবালার ঠাট্টা-ভরা হাসি দেখে তার রাগ বেড়ে গিয়েছিল। কাপড়চোপড় ছাড়তে গিয়ে সে ভাবলে, নাঃ, এর চেয়ে স্নান করে ফেলাই ভাল, নইলে নর্দামা ছুঁয়েছি বলে মা এসে হয় তো ঘরশুদ্ধ আবার কাচাতে বস্‌বেন!

দড়ির আল্‌না থেকে গামছা পেড়ে নিয়ে সে সোজাসুজি নদীতে চলে গেল।

(৩)

নিবারণ মল্লিকের মেয়েকে সদানন্দ অনেকবারই দেখেছেন, তাই যদিও স্বীকার করেছিলেন যাবেন, তবু তিনি সেদিন গেলেন না, পাঁচু দূরসম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাইকে নিয়ে মেয়ে দেখতে গেল। সদানন্দের তখন জমীদার বাড়ী কি একটা তলব পড়েছিল, তিনি সেই দিকে গেলেন। সেদিক সন্তুষ্ট না রাখতে পারলে তাঁর ঢের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সমাগত দুর্গোৎসবে সে বাড়ীতে তিনি এক জন পুরোহিত—সুতরাং তিনি পাঁচুর সঙ্গী হতে পারলেন না।

পাঁচু তো মনে মনে বাঁচলো, সে যাবে তার নিজের জন্যে ক'নে দেখতে, দাদা সঙ্গে থাকলে কি আর তাতে সুবিধে হয় ? দাদার পছন্দই তাতে বজায় থেকে যায়, তার নিজের পছন্দ জাহির করতে গেলেই দাদা এক প্রচণ্ড ধমকে থামিয়ে দিতেন হয় তো ! বিশেষ নিবারণ মল্লিক তার সরল দাদাটিকে বড় কম খোসামোদ তো করেন নি !

পাঁচু যখন নিবারণ মল্লিকের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লো, তখন নিবারণ মল্লিক তারই পথ চেয়ে বসেছিলেন। ঠিক ক'নে দেখারই বেলা তখন, পশ্চিমের সোনালী রোদে চারিদিক সুন্দর দেখাচ্ছিল। মল্লিক মশায়ের বাড়ীর উঠানে দুটো স্থলপদ্ম ফুলের গাছ একেবারে ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল, সেই চটকদার রংয়ের ওপর রাঙা রোদ পড়ে বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল !

পাঁচ রকম জল খাবারের সঙ্গে পাঁচুর দর্শনীয় পদার্থটিও এসে পড়লো। এগারো বছরের মেয়ের গায়ে বাইশ চব্বিশখানা ভারি ভারি সোনার গহনা বোঝাই করা, গহনার ভারে তার সহজ স্বচ্ছন্দতা একেবারে রোধ হয়ে গিয়াছে, তার ওপর তার বেনারসি শাড়ীখানাও বড় কম ভারী নয়, এই সব বহুল্যতার মাঝে প'ড়ে মেয়েটি একেবারেই ঢাকা পড়ে গিয়েছে,— পাঁচুর কেবল গহনা আর কাপড়ই দেখা সার হ'ল। মেয়ের মুখের যেটুকু দেখা গেল, তাতে তার রংটুকু যে কালো নয় ফরসা, তা বোঝা যায়, কিন্তু সেটুকুও পাঁচুর চোখে লাগলো না, সে বিরক্ত হয়ে বিদায় নিলে !

পথে আস্‌তে আস্‌তে একটা বারান্দা থেকে তার ক'লকাতার বন্ধু নির্ম্মল ডাকলে "আরে পাঁচু যে ! কবে এলি ?"

পাঁচু পরম খুসী হ'য়ে এগিয়ে গেল, "এমন বনে যে এমন সঙ্গী সে পাবে এমন আশাও তার ছিল না ;

নির্ম্মল খানিকক্ষণ সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প ক'রতে ক'রতে হঠাৎ হেসে বললে "আঃ, বাইরেই থেকে গেলাম যে ! চল্ পাঁচু ঘরে গিয়ে বসি গে।"

পাঁচু বললে "না, ফিরি এইবার।"

নির্ম্মল যেন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে "এখুনি ? কেন, এত তাড়া কিসের ?"

"না তাড়া আর কিসের ! তবে যে পথ ঘাট, সাপখোপের ভয় হয় !"

"অত ভয় নিয়ে চলাফেরা করতে গেলেই হয়েছে ! তা হ'লে তো তোমার নন্দলালের

মত শুয়ে শুয়ে বেঁচে থাকতে হবে! ধরো, বিপদ নেই আর কোথায়? এই, রেগে কলিসান আছে”—

পাঁচু হাসতে হাসতে বললে “থামো, চল ঘরেই গিয়ে বসি গে।”

খুড়তুতো ভাইকে সঙ্গে ক'রে পাঁচু নির্ম্মলের ঘরের ভিতর গিয়ে বসলো। ঘরটা তখন প্রায় অন্ধকার হ'য়ে আসছিল তবে তত বেশী নয়; তিনখানা চেয়ারে তিন জনে বসে গল্প করতে আরম্ভ করলে!

একটু পরেই একটা ডিবলণ্ঠনের দম কমিয়ে বাড়িয়ে ঠিক ক'রে দেখতে দেখতে চোদ্দ পনেরো বছরের একটা মেয়ে এসে সেই ঘরে ঢুকে আলোটা দুয়োরের কাছে নাবিয়ে রেখেই চ'লে যাচ্ছিল, নির্ম্মল ডেকে বললে “ওরে উমি, আলোটা টেবলের ওপরে রেখে যা।”

মেয়েটি ফিরে এসে আবার আলোটা তুলে দম্ বাড়িয়ে টেবিলের ওপর খবরের কাগজ পেতে আলোটা রেখে দিয়ে গেল! তার ভঙ্গী আড়ষ্টও নয়, অনাবশ্যক চঞ্চলও নয়, ঘরে অচেনা লোক দেখে সে মিনিটখানিকও না দাঁড়িয়ে চ'লে গেল।

মেয়েটি সুন্দরী নয়, শ্যামা,—অপরূপ লাবণ্যময়ীও নয়, তবে নতুন যৌবনের রংয়ের ঢেউ তার অঙ্গে-অঙ্গে লহর তুলে খেলছিল। রূপ ছাড়িয়ে, রং ছাড়িয়ে, একরাশি রত্নাভরণকেও হারিয়ে এই জিনিষটার সৌন্দর্য্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে বেশী!

শরৎ সায়াহ্নের মলিন জ্যোৎস্নার সঙ্গে ঠিক যেন মানিয়ে তার সাড়ীখানিরও রং ছিল ‘চাঁদের আলো!’ পাঁচু গোপালের চোখ দুটী আড়ে আড়ে সমস্তটাই গিলে গেল! সে এমনই গ'লে গেল যে, ক্রোশখানেক রাস্তা এই বর্ষা শেষের কাদা ভেঙ্গে যে বাড়ী ফিরতে হবে; তা তার মনেই ছিল না! নির্ম্মলেরই একটা ঘড়ির দিকে চোখ প'ড়তে, তার খুড়তুতো ভাই তাকে হুঁস করিয়ে দিলে, তবে সে উঠলো!

নির্ম্মল তাকে খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করলে, কিন্তু সে তা শুনলো না! বললে “আর রাত বাড়িয়ে দিও না ভাই, দাদা হয় তো নিজেই খুঁজতে বেরোবেন তা হ'লে,—মা ভাববেন, আমি হারিয়ে গেছি!” অগত্যা নির্ম্মল তাকে ছেড়েই দিল।

(৪)

বাড়ীতে এসে রাত করে আসার জন্যে সদানন্দের কাছে পাঁচুর কোনো জবাবদিহী করতে হ'লো না, তিনি জমীদার বাড়ী থেকে ফিরতে তার চেয়েও বেশী দেরী করেছিলেন, সুতরাং সেদিকে পাঁচু বেঁচে গেল!

কিন্তু নলিনীবালা ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বেশ ধারালো ধারালো কথা জানতেন, তবে তাঁর কথার উত্তরেও পাঁচু এইটুকুমাত্র স্বীকার করলে যে, সে বন্ধু নির্ম্মলের সঙ্গে গল্প করেই এতখানি সময় কাটিয়েছে, নিবারণ মল্লিকের মেয়ের রূপ দেখতে দেখতে নয়।

নলিনীবালা হাসতে হাসতে বললে —"আমি ভাবছিলেম বুঝি এতক্ষণ ফিট হয়ে পড়েছিলে সেখানে!"

পাঁচু বললে "এ তোমাদের চোখ নয়, অত ধাঁধা লাগেনি আমা'র, ঐ তোমাদের অতুলনা সুন্দরী বুঝি?"

"ওমা! তোমার কি পছন্দ হয়নি নাকি? তুমি কি আকাশের পরী বিয়ে করবে ভাবছো? ও মেয়ে ছোট আছে তাই, বড় হ'লে, মোটা হ'লে, দেখো ওই কত সুন্দরী হবে!"

"হোক্! সে যখন হবে, তখন হবে!"

"তোমার পছন্দ হ'ল না?"

"না।"

"তাহ'লে এখনো তোমার বিয়ে কর্‌বার মতলব নয়, বললেই হয় সোজা কথা, এত ঘোর-ফের করবার কি দরকার বল?"

"তাহ'লে তো কথাই নেই, কিন্তু আসলে তা নয়!"

বাস্তবিক অমন সুন্দরী মেয়েকেও পাঁচুর পছন্দ হয়নি শুনে শুধু নলিনীবালা নয়, দয়াময়ীও রেগে গেলেন! সদানন্দ শুনে কেবল স্ত্রীর কাছেই বললেন "ওর সহুরে পছন্দ হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলেই পছন্দ করেনি!"

কিন্তু পাঁচুর খুড়তুতো ভাইটী বড় কম নয়! সে চুপি চুপি নলিনীবালাকে বলে গেল "নির্ম্মল মল্লিকের বোনটী কেমন জিজ্ঞেসা ক'র তো বউদি, কি বলে; তাকে বোধ হয় ভালো বলবে!"

নলিনীবালা আকাশ থেকে পড়লেন যেন, বললেন "নির্ম্মল মল্লিকের বোন্ কে কমলা?"

"না না, কমলা নয়, যে বড়, মামার বাড়াতেই থাকে যে, সেই বোন্ যে এসেছে দেখলাম মস্ত বড় হয়েছে সে, কি ভালো তার নামটা?"

"ও! সেই বড়টা, তার নাম বুঝি উমা, সেটা যে খুব বড়ই হয়েছে, কিন্তু নির্ম্মল মল্লিকের বোন্ আবার সুন্দরী নাকি? তার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করবো, পাঁচু চান স্বর্গের বিদ্যাধরী!"

"ওসব কিছু না, স্বর্গের উর্ব্বশী, মেনকারা পাখনা খসে মাটীতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, যে ইচ্ছে কর্‌লেই ক'নে হয়ে আস্‌বে, তুমি কথাটা একবার তুলেই দেখো, কি বলে শোন না!"

"আচ্ছা, তা তুলবো ।"

পাঁচু এসে বললে "কি তুলবে বৌদি ?"

নলিনীবালা হেসে ফেললেন, বললেন "কেন, ফুল তুলবো"

পাঁচু বুঝলে, এটা বাজে কথা, তাই বললে "ফুল ? তা বেশ, কি হবে সে ফুল দিয়ে,—পূজো ?"

"তা নয় তো কি,—শিবপূজো করে পার্ব্বতীর শিব স্বামী লাভ হয়েছিল তুমি গৌরী পূজো ক'রে দেখ যদি গৌরীর মত স্ত্রী পাও !"

"আমায় অত ভূতে পায় নি"

বলে পাঁচু চলে যাচ্ছিল, নলিনীবালা বললেন "ভালো ঠাকুরপো তুমি না কাল নির্ম্মলদের বাড়ী গিয়েছিলে ব'লছিলে না ?

"হ্যাঁ,—তা কি ?

নির্ম্মলের বড় বোনকে দেখেছ ? মাগো কি ছাই দেখতে সেটাকে, নয় ?"

পাঁচুর ফরসা মুখখানা লাল হয়ে উঠলো, কিন্তু সে সহজভাবেই বললে "কই, না"

"বিশ্রী দেখতে নয় ? তবে তুমি দেখ নি। খুব বড়-সড় হয়েছে ব'লে বোধ হয় বেরোয় নি ; সে মেয়ের যে কি ক'রে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই, নিবারণ মল্লিকের অমন মেয়েকেও তো তুমি পছন্দ করলে না আর সে মেয়ে—"

"দেখেছি আমি তাকে, নিবারণ বাবুর মেয়ের চেয়ে সে খারাপ দেখতে নয় তো,—বেশ তো দেখতে—"

"ও ! তাই বল, তুমি সেই মেয়ে পছন্দ ক'রে এসেছ !"

"তা বৈকি ! আমি তাদের বাড়ী ও-মেয়ে দেখতেই গিয়েছিলাম কিনা !"

"তা তুমিই জানো গিয়েছিলে কি করতে ; যাক্ সত্যিই বল না ঠাকুরপো ; তুমি কি উমাকে দেখেছ ? সে দেখতে ভালো সত্যি কথা ?"

"কেন, তুমি কি তাকে দেখনি কখনো ?"

"না, কি ক'রে দেখবো,—সে কলকাতায় তার মামাবাড়ীতেই ত থাকে, এখানে তো থাকে না তা আমি দেখবো কেমন কোরে ?"

"তবে ছাইপাঁশ বলছিলে কেন ? মন্দ দেখতে নয় !"

নলিনীবালার মারফত এ কথা দয়াময়ীও শুনলেন, কিন্তু খুসি হলেন না। নিবারণ মল্লিকের মেয়েটিকেই তাঁর বড় ভালো লেগেছিল, টুকটুকে সুন্দরী বৌ আনবার সাধ ছাড়তে

তাঁর কষ্ট হচ্ছিল; তা ছাড়া নিবারণ মল্লিকই বা কি মনে করবে? তার অমন সুন্দর মেয়েকে ছেড়ে যে পাঁচুর নির্ম্মল মল্লিকের কালো বোন্‌কে পছন্দ হয়েছে এ কথা কি আর তারা বিশ্বাস ক'রবে?

তা ছাড়া তাঁর পাঁচু তো আর দ্বিতীয় পক্ষ নয়, যে অত বড় চোদ্দ পনেরো বছরের বৌ আসবে। লোকেই বা কি ব'লবে? সাতপাঁচ ভাবনায় প'ড়ে দিন কয়েকের জন্যে তিনি ছেলের বিয়ের ভাবনা ভুলে গেলেন। পূজার ক'দিন তো সেই হাঙ্গামেই কেটে গেল। নিজেদের বাড়ী পূজো হ'ত না,—কিন্তু তা না হ'লেও যে জ্ঞাতিদের বাড়ী পূজো হ'ত, সেখানে গিয়ে দুর্গোৎসবের রান্নাবান্না কাজকর্ম্ম এ সব তো ক'রতে হ'ত। আজন্ম-কাল এই সব কাজ ক'রে ক'রে তাঁর হাত পেকে গিয়েছিল ব'লে সব বাড়ীতেই তাঁর ডাক প'ড়তো; না গেলে তাঁরও চলতো না তাদেরও চলতো না।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যে বেলা নির্ম্মল এসে দয়াময়ীকে প্রণাম ক'রে গেল। সে চলে গেলে তিনি বল্‌লেন "হ্যাঁ বৌমা, তোমরা এরি বোনের কথা বল্‌ছিলে?"

নলিনীবালা বল্‌লে "হ্যাঁ মা।"

"দুর্গা দুর্গা! সে যে কালো!"

নলিনীবালা একটু হেসে বল্‌লে "তা কি হবে মা, আপনার ছেলের পছন্দ!"

পাঁচ জনার মুখে পাঁচু যখন শুন্‌লে যে উমা কালো কুৎসিত, তখন সে আরো একবার তাকে দেখবার চেষ্টা করছিল। নির্ম্মল বোকা নয়, সেও সদানন্দের কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিল! সেদিন পাঁচু দেখলে নিতান্ত সাদাসিধে পোষাকে একটী সমান বয়সী মেয়ের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে উমা রুমালে ফুল তুলছে; পাঁচুর চোখ আজও উমাকে সুন্দরই দেখ্‌লে, খুঁত খুঁজতে গেলে প্রচুরই পাওয়া যেত, কিন্তু সে দিকে সে গেল না।

অগ্রাণ মাসে যখন পাঁচুর বিয়ে হ'য়ে গেল, তখন নলিনীবালা তাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে বল্‌লে "কি ঠাকুরপো তুমি না পরমা সুন্দরী বিয়ে কর্‌বে কথা ছিল?"

পাঁচু একটু হেসে উত্তর দিল "তাই তো কর্‌ছি বৌদি! একবার আমার চশমাটা দিয়ে দেখ!"

শ্রীনীহারবালা দেবী।

(নব পর্য্যায়)
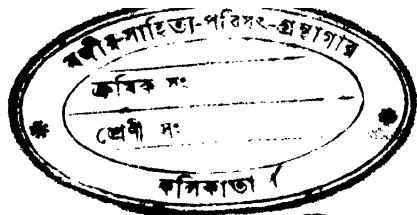
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৫ম বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩২৮ সাল। { ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

আমন্ত্রণ।

—•—

(চৌরপঞ্চশিখা হইতে।)

রাজসভা।

কত জন হেথা পরি নব বেশ
এসেছে আজ,
আমি আসিয়াছি বহুদূর হ'তে
পরিয়া এ দীন মলিন সাজ;

আজি রজনীতে কত সুধীজন
আসিয়াছে কত কবি অগণন
তারি মাঝে আমি বিরস বদন
এসেছি আজ ;—
বারণ আমারে করেছ তবু ত
এসেছি ছাড়িয়া সরম লাজ।

আজি রজনীতে আসিয়াছি আমি
লইয়া বীণা,
জানিনা এ সুর তব হৃদি-তারে
কাঁপিয়া গাহিয়া উঠিবে কি না।
বসেছিনু আমি সভার মাঝারে
চিনিতে কি তুমি পেরেছ আমারে ?
শুধায়েছিলে কি গোপনে কাহারে
মুছিয়া আঁখি
"এসেছে কি সবে আজ সভাতলে
এখনো কাহার আসিতে বাকি ?"

প্রথমে তোমারে পাইনি হেরিতে
খুঁজেছি কত,
কে জানিত তুমি বাতায়ন পাশে
বসিয়া নয়ন করিয়া নত—;

কে জানিত তব তড়িত আলোকে
থাকিয়া থাকিয়া চমকি পলকে—
আভরণ দেহে উঠিবে ঝলকে
এমন করি ;
ভেবেছিনু আমি দীন বেশে তুমি
আসিয়া আমারে লইবে বরি।

কত কবি-বীণা উঠিল বাজিয়া—
সমস্বরে
মোর বীণা শুধু শিথিল হইয়া
রহিল পড়িয়া কোলেরই 'পরে ;
আমি শুধু চেয়ে সজল নয়নে
তব পানে ওই দূরে বাতায়নে
শুধু ঘনশ্বাস উঠি ক্ষণে ক্ষণে
পড়িছে খসি' —
সঙ্গীত-হীন বেদনায় ভরা
ব্যথিত বক্ষে রহিনু বসি'।

জানিনা কখন ভেঙ্গে গেছে সভা—
থেমেছে গান,
আমি বসেছিনু চাহি তব পানে
ধরিয়া বক্ষে আকুল প্রাণ ;

সজল তোমার অনিমেষ আঁখি
আকুল আবেশে মোর পানে রাখি'
যতনে সরম সাম্না দেহে মাখি
বসিয়া একা.
আজি রজনীতে মোর সাথে তুমি
নয়নে নয়নে ক'রেছ দেখা।

কি জানি কি ভাবি' বাতায়ন ছাড়ি'--
উঠিলে তুমি,
নয়ন হইতে আসিয়া—অশ্রু
চুমিল তোমার চরণভূমি ;
ধীরে ধীরে ফিরি চাহি মোর পানে
কি কথা জানালে কেহ নাহি জানে
আমি বসি ফেলি সভা মাঝখানে
অশ্রুভার—
নয়নের জলে জানালে কি মোরে
নীরব তোমার তিরস্কার !

শ্রীরেণুকা দাসী।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

——:০:——

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস এল র‍্যামি সারাটা দিন একাই রহিলেন। ফেরাজ প্রভাতেই এগ্‌সওয়ার্থের নিকট চলিয়া গিয়াছে; কেহই সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই। এমন কি জ্যারোবাও আজ তাঁহার পাঠকক্ষে প্রবেশ করে নাই। খাতাপত্র ও গ্রন্থরাজির মাঝখানে একাকী বসিয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে লিখিয়া চলিয়াছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই;—ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিস্কুট-মাত্র আহার করিতেছেন! সন্ধ্যার ছায়া যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন এক টেলিগ্রাম-বাহকের ডাকাডাকিতে এল র‍্যামির সারাদিবস-ব্যাপী নির্জ্জনতা সহসা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; দ্বার খুলিয়া দিতেই তাঁহার হস্তে একখানি খাম প্রদত্ত হইল; তাহার ভিতর লিখিত ছিল—"আপনার ভ্রাতা আমার সহিত নৈশ-ভোজন করিবার জন্য আজ এই-খানেই রহিয়া গেলেন,—এগ্‌সওয়ার্থ"

পাঠান্তে কাগজখানাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গাঢ় চিন্তামগ্ন অবস্থায় এল র‍্যামি কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার কৃষ্ণ-তার নয়নযুগলে বিষণ্ণতার ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

"কি বিস্বাদ এই জগতখানা!"—অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমাকেও দেখছি তবে একলা থাকতে হবে! হুঁ,—মানব-জীবনের নিয়মই যে তাই। বয়োজ্যেষ্ঠ, যাদের স্নেহ-ভালবাসায় কনিষ্ঠেরা মানুষ,—তাঁদের সুখদুঃখে নবীনদের কি যায় আসে? নূতন চিন্তা নূতন দৃশ্য, নব নব আকাঙ্ক্ষার নিত্য আহ্বানে তা'রা আকুল হ'য়ে ছুটে যায়, পুরাণো নীড়ের দিকে আর ফিরেও চায় না। আমি নিজেই অধিকাংশ স্ত্রীলোককে ঘৃণা করি সত্য, কিন্তু মাতৃজাতির উপর আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। মাতৃত্বের সকরুণ চিত্র আমার মতে অত্যন্তই কষ্টকর। প্রসব বেদনা, শিশুপালন প্রভৃতি ব্যাপারে কত যন্ত্রণাই না তাদের সহ্য করতে হয়,—অথচ ঐ শিশুরাই কালে স্বার্থপর নরনারীতে পরিণতি লাভ করে থাকে,—

যাদের কাছে আপনাপন জীবনের জন্যেই ঋণী তাঁদের কথাও প্রায় মনে রাখে না। নির্ম্মম, —অত্যন্ত নির্ম্মম। এই যে জগতময় দুঃখ বা ভালবাসার এত অপব্যয় চলেছে, এর অবশ্যই কোনো কারণ আছে। যাই হোক্, আপাততঃ কিছু খুঁজে পাচ্ছি নে।"

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি ঘনায়মান সান্ধ্য-ছায়ার দিকে চাহিলেন; পরে যেন কোনো অদৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশে, বলিয়া উঠিলেন—"নিঃসঙ্গতা কি ভীষণ! এইটেই বোধ হয় প্রধান মৃত্যুভয়—কারণ, সকলকেই একা একা মরতে হয়। শয্যাপার্শ্বে আত্মীয়বন্ধুর যতই ভিড় হোক্ না কেন, মৃত্যু-মুহূর্ত্তে সকলেই একা। উঃ; সেই অজ্ঞাত সাগরকূলের প্রগাঢ় স্তব্ধতা কি ভীষণ!—মনে হ'লে সর্ব্বাঙ্গ যেন শিথিল হয়ে আসে। সেই মুহূর্ত্তে প্রেম যদি কোনো উপকারে আস্‌তো,—কিন্তু না, প্রেমও সে সময় ক্ষীণ হয়ে আসে!"

উক্ত প্রকার চিন্তা করিতে করিতে এল র‍্যামির মনের মধ্যে কেমন- যেন-একটা অস্পষ্ট আকুলতা জাগিয়া উঠিল। সহসা ত্বরিত চরণে উপরে উঠিয়া গিয়া তিনি বরাবর লিলিথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জ্যারোবা সেখানে বসিয়াছিল,—এল র‍্যামিকে প্রবিষ্ট দেখিয়া অভ্যস্ত কোণটা হইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে পার্শ্ব কক্ষে চলিয়া গেল; এল র‍্যামি শায়িতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, আজিকার সন্ধ্যালোকে লিলিথকে যেন আরও সুন্দরী দেখাইতেছে; অপরদিকে, তিনি ঝুঁকিয়া পড়িবামাত্র লিলিথ তাহার সুগোল সুঠাম বাহু দু'খানি তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিল,—তৎপরে হাস্য করিল। এল র‍্যামির হৃদয় স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল,—মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি লুপ্ত হইয়া গেল,—নিষ্পলক-নয়নে তিনি সেই সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতে লাগিলেন।

"পরীর নিপুণ করে কুঞ্চিত কেশরাশি,
উষার আলোক সেথা ঘুমায়ে পড়েছে আসি!"

উপাধান-কোলের তরঙ্গায়িত চিকুরগুচ্ছগুলি হাতে করিয়া তিনি উক্ত পংক্তি দ্বয় আবৃত্তি করিলেন; পরে ডাকিলেন—"লিলিথ! সুন্দরি!"

আহ্বান-মাত্র বক্তার দিকে পাশ ফিরিয়া সে যেন কিছু ধরিবার উদ্দেশ্যে বাতাসে হাতড়াইতে লাগিল। আবেগভরে এল র‍্যামি সেই হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন এবং আপন

মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিয়া, যেন কোনো অপূর্ব্ব উত্তেজনাবশে, উহা চুম্বন করিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, উক্ত স্পর্শে শায়িতা এমনভাবে সাড়া দিল যেন সে কোনো আহ্বানেরই উত্তর দিতেছে।

"এই যে আমি.........প্রিয়তম আমার!"

এল র‍্যামি চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল; "প্রিয়তম" শব্দের আঘাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীরের রক্তধারা মস্তিষ্কের দিকে তরঙ্গ তুলিয়া আসিল! অর্থ কি এ সম্বোধনের,—উদ্দেশ্য কি এরূপ উত্তরের? কিছুদিন পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল যে এল র‍্যামি তাহার বন্ধুও নহে; আর, আজ একেবারে 'প্রিয়তম' হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কি বিস্ময়কর,—কি ভীষণ! পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, হয়তো এই পরীক্ষা-ব্যাপারে নূতন কোনো পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; হয়তো লিলিথের আত্মা এতদিনে তাঁহার সহিত এমন কোনো নিকটতর সংবাদ-প্রদান সম্পর্কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহা আজও তাঁহার কল্পনার অতীত। কিন্তু উক্ত প্রকার চিন্তায় অন্তরের আবেগকে দাবাইয়া দিবার চেষ্টা সত্ত্বেও, এল র‍্যামি কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন; তিনি নিঃশব্দে পালঙ্কপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—কথা কহিতেও পারিলেন না, অথবা সরিয়া যাইতেও সাহসী হইলেন না। লিলিথও আর কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল; দেওয়ালের ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। এল র‍্যামির শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিল,—তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন,—ধৃত বাহুখানির উত্তাপ তাঁহার শিরায় শিরায় এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল যাহাতে তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

তাইতো,—একি হইল! কোথায় গেল তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি? প্রয়োগ করা দূরে থাক্, লিলিথের হাতখানি আপন হস্তে বিধৃত থাকায় তৎসম্বন্ধে চিন্তা করাও এক্ষণে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তবে কি সে আজ শক্তিতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠিল? এল র‍্যামি শিহরিয়া উঠিলেন,—কারণ সন্ন্যাসীর সেই উক্তিটী সহসা তাঁহার মনে পড়িল—

"পরিণামের জন্য সাবধান! ভালবাসার ভিতর দিয়া লিলিথের মুক্তিও আসিতেছে।"

কিন্তু লিলিথ হাসিল,—অতি মধুর সে হাসি; তাহার হাতখানি তখনও এল র‍্যামির হাতের উপর পড়িয়া রহিল। সেই নবনীত-কোমল বাহুলতাখানি পরিত্যাগ করিতে এল র‍্যামির যেন ইচ্ছাই হইতেছিল না। তিনি তাহার সেই নয়নরমা আননখানির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য, সেই মুদ্রিত ওষ্ঠযুগলের সুমধুর বঙ্কিম-ভঙ্গী এবং সুগঠিত নেত্র-পল্লবের মোহময় ভাবটুকু গাঢ়-অভিনিবেশ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একটা অস্পষ্ট তৃপ্তির সহিত কেমন একপ্রকার অভুতপূর্ব্ব আশঙ্কা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

অল্পে অল্পে বিক্ষিপ্ত চেতনাশক্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হোক্ এ রহস্য-জাল ছিন্ন করিতেই হইবে।

"স্বপ্ন দেখ্‌ছে না জেগে আছে?" ঈষদ্-কম্পিতকণ্ঠে তিনি আপনাআপনি বলিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখ্‌ছে!"

হঁ্যা, আনন্দের স্বপ্ন!" তৎক্ষণাৎ লিলিথ উত্তর করিল—তবে-কথা এই, যে আনন্দ 'স্বপ্ন' নয়! আমি তোমার স্বর শুনতে পাচ্ছি, স্পর্শ অনুভব কচ্ছি, প্রায় দেখ্‌তেও পাচ্ছি! তবু, এখনও আমাদের মাঝখানে একটু মেঘ রয়েছে,—কিন্তু ভগবানের কৃপায় এ মেঘটুকুও কেটে যাবে।"

বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে কথাগুলি এল র‍্যামি শুনিলেন; পরে বলিলেন—

"মেঘের কথা কি বল্‌ছো লিলিথ! তুমি তো শুনতে পাই পূর্ণ আলোকের মধ্যে আছ! কতদিন বলেছো, যে গৌরব-প্রভায় তুমি এখন নিমজ্জিত, সূর্য্যকিরণও তা'র তুলনায় ম্লান; তা' যদি হয় তবে ছায়ার ধারণা কোথায় পাও তুমি?"

"ছায়া তোমারই," লিলিথ উত্তর করিল, "আমার নয়। ইচ্ছা হয়, ঐ ছায়া সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে এই মহাবিস্ময় এই অপার সৌন্দর্য্য দেখিয়ে দেই। হায়,—আমার ও আমার প্রেমের মাঝখানে যদি এই নিষ্ঠুর ছায়াটা না থাক্‌তো!"

"লিলিথ! লিলিথ!" আকুলকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"প্রেমের কথা কেন এখানে নিয়ে আস্‌ছো?"

"তুমি কি প্রেমের কথা ভাবো না ?" লিলিথ উত্তর করিল—"তোমার অন্তরতম চিন্তায় সাড়া না দিয়ে কি আমি থাকতে পারি ?"

"সকল সময়ে তো তা' দাও না লিলিথ !" কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন ; ভাবিলেন, এই সুযোগে আপনার বিক্ষিপ্ত চিত্তটাকে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় নিয়মিত করিয়া লইবেন—"সাধারণতঃ তুমি সেই সকল বিষয়েই কথা কও যা' আমার অজ্ঞাত, যা' কোনোকালেই হয়তো আমি জানবো না—"

"নিশ্চয়ই জানবে !" কোমল অথচ সতেজ কণ্ঠে লিলিথ বলিল—"প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্রের প্রত্যেকটী বিশিষ্ট জীবন তা'র মূল ও চরম উদ্দেশ্যের কথা জানতে বাধ্য। আমার কাছে সমস্তই আজ পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে,—তোমার কাছেও একদিন হবে। তুমি জানতে চাও বলেই এ সম্বন্ধে আমি কথা কই ; কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর না,—হয়তো শেষদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পার্ব্বেও না।"

"শেষের জন্য সাবধান !"—এই কথাকয়টী এল র‍্যামির মনোমধ্যে সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ! এত স্পষ্ট যে, এইমাত্র যেন কেহ তাঁহার কানের কাছে উহা উচ্চারণ করিল। "কিসের শেষ ?" আগ্রহভরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

লিলিথ নিরুত্তর।

কিয়ৎকাল প্রতীক্ষায় থাকিয়া, এল র‍্যামি যেমনি তাঁহার হস্ত-ধৃত বাহুখানি পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ শায়িতার বক্ষোপরি রক্ষা করিতে যাইবেন, অমনি অঙ্গুলিগুলি মুষ্টির আকারে সংকুচিত করিয়া লইয়া লিলিথ সটান উঠিয়া বসিল ! নেত্র যুগল নিমীলিত থাকা সত্ত্বেও একটা প্রগাঢ় ভাবাবেগ তাহার আননমণ্ডলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

"নাও, লেখো," —পরিচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরের রৌপ্য-নিক্বণে কক্ষখানি অনুরণিত করিয়া সে বলিতে লাগিল—"লেখো, যে-জগতে তুমি বাস কর, সেখানকার অধিবাসীদের জ্ঞাতার্থে। জানিও তা'দের সমস্ত কার্য্যই অমঙ্গলকে আমন্ত্রণ করবার জন্যে, সুতরাং অমঙ্গলকে শিরোধার্য্য করতেও তা'রা বাধ্য। যা' তারা রুইছে, ঠিক তাই ফেরত পাবে,—এমন কি, অশ্রুপাতটী পর্য্যন্ত এই প্রতিদান-ব্যাপারে বজায় থাকবে। হায় রে অসভ্য জগত ! হায় রে হতভাগ্য

জগত ! যে-জগতে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পাপের উন্মাদনা, ঈর্ষার নির্য্যাতন, স্বার্থপরতার অভিশাপ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী দয়া-দাক্ষিণ্য-প্রেমকে উপহাস করে' চলেছে ! ওদের শৃঙ্খল-চাতুর্য্য এ-সমস্ত অনিয়মের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আছে—সেটা হচ্ছে ধ্বংস। যুদ্ধবিগ্রহে পৃথিবী ছেয়ে পড়বে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে জাতি উচ্ছন্ন যেতে থাকবে, পুত্রকন্যারা মাতৃপিতৃ হত্যা করবে এবং জগত জুড়ে চুরি ডাকাতির তাণ্ডব-নৃত্য চলবে। এর কারণ আর কিছুই নয়,—তোমাদের পৃথিবীটা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বাঁচতে চাইছে; কিন্তু ঈশ্বরহীন জগত একটা রোগ, যা'র মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উল্কাপিণ্ডের মত এ পৃথিবী তা'র কক্ষ থেকে খসে' পড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবে—অপরাপর গ্রহনক্ষত্র আর তা'র সন্ধানমাত্র পাবে না; কারণ পুনর্জ্জন্মে তা' নতুন হ'য়েই দেখা দেবে।"

উত্তেজনার আতিশয্যে প্রায় এক নিশ্বাসে উক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে লিলিথ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, মুখখানি পাণ্ডুর হইতে পাণ্ডুরতর হইতে লাগিল, অবশেষে পশ্চাত-স্থিত উপাধানের দিকে তাহার সমস্ত শরীর ঢুলিয়া পড়িল। সাহায্য করিবার জন্য এল র‍্যামি তাহাকে বাহুবেষ্টনে ঘেরিয়া লইলেন, কিন্তু তাহা করিবামাত্র এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে তাহার অবয়বখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"বিশ্বাস কর, প্রিয়তম, তোমার লিলিথের কথাগুলো বিশ্বাস কর !"—সে বলিতে লাগিল "জগত-ব্যাপারের যাবতীয় জ্ঞান একমাত্র নিয়মের অধীন; অন্যায়ের সাহায্যে অন্যায়ই সৃষ্ট হ'তে থাকে, এবং তা'র প্রায়শ্চিত্তও সে আপন বক্ষে বহন করে। মঙ্গলের সাহায্যে মঙ্গল সৃষ্ট হয় এবং চিরন্তনের বিকাশ-বীজ তার বক্ষে সঞ্চিত থেকে যায়। প্রেমই প্রেমকে আকর্ষণ করে, আর এই প্রেম থেকেই অমরতার জন্ম !"

যুবতীর স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং সম্পূর্ণরূপে সে শয্যাবক্ষে এলাইয়া পড়িল; তথাপি তাহার ওষ্ঠ দুখানি আর একবার নড়িয়া উঠিল এবং 'অমরতা' কথাটী যেন চাপা নিশ্বাসের মত অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। এল র‍্যামি আপনার বাহুবেষ্টন অপসারিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অপর হস্তখানিও যুবতীর করতল হইতে সরাইয়া লইলেন। তাঁহার এই কার্য্যে লিলিথ যেন অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল এবং যেন কি-হারাধনের অন্বেষণে কয় মুহূর্ত্ত বাতাসে

হাতড়াইতে লাগিল ; পরে তাহার হাত দু'খানি নির্জ্জীবভাবে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

অর্দ্ধ-বিস্ময়ে অর্দ্ধ-আগ্রহে এল র‍্যামি শামিতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন,—পূর্ণ-যৌবনার সেই নিটোল কোমল বক্ষের উপর নিবদ্ধ থাকিয়া অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডটী যে কি-ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল তাহা অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন ; আরও দেখিলেন, সেই সুগোল বক্ষের চতুষ্পার্শ্বে উক্ত হীরক-প্রতিফলিত বর্ণাভার রক্ত-রঞ্জন,—তন্নিম্নে, সূক্ষ্ম সিল্ক-ওড়নার অন্তরালে, পরিদৃশ্যমান স্তনাগ্রচূড়ার উপর উক্ত রক্তাভার স্নিগ্ধ দীপ্তি,—তারপর, —তারপর সহসা তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। কি অপরূপ এ সৌন্দর্য্য ! কি অলোক-সামান্য এই রূপরাশি ! —আর, এই রূপ এ-সৌন্দর্য্য কতই না অধিক পরিমাণে তাঁহার নিজস্ব !—হাঁ, নিজস্ব,—দেহ, মন, আত্মা সমস্তই তাঁহার শক্তির অধীন !

পরমুহূর্ত্তেই আপনার এই অবাধ্য চিন্তা-সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায় এল র‍্যামি চমকিয়া উঠিলেন ;—কি সর্ব্বনাশ, এ-সমস্ত অভিনব আবেগ, এই প্রমত্ত বাসনা যাহা শোণিতে শোণিতে অনল-প্রবাহ ছুটাইয়া দেয়,—ইহারা কোথা হইতে আসে ?···আপন চিত্তদৌর্ব্বল্যে আপনার উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, স্নায়ুমণ্ডলীকে তিনি বশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—নিজের সেই ভাবাবেগহীন সংযত স্থির চিত্তটীকে আবিষ্কার করিতে চাহিলেন,—কিন্তু হায়, সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। হৃদয়-বীণার কোন্ নিভৃত তারে কোথা দিয়া আজ ঘা পড়িয়া গিয়াছে, যাহাতে আশে-পাশের সকল তারগুলিই এমন করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাহা কে বুঝাইবে !

আবার,—আবার এল র‍্যামি লিলিথের দিকে চাহিলেন ; সেই অপার্থিব রূপরাশি আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাহার যুগল-গণ্ডে অবিশ্রান্ত চুম্বন-ধারা বর্ষণ করিবার এবং এইরূপে তাহাকে নর-জীবনের তিক্ত-মধুর চেতনালোকে জাগরিত করিয়া তুলিবার প্রবল প্রলোভনের সহিত প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন ; পরিশেষে, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে, পালঙ্কপার্শ্বে নতজানু হইয়া এবং শামিতার তৎকালীন প্রশান্ত সৌন্দর্য্যরাশির দিকে মিনতি-ভরা সজল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন :—

"দোহাই তোমার, সুন্দরি! তোমার ঐ দৌর্ব্বল্যের শক্তিই যদি আমার এই সবলতার শক্তির চেয়ে বেশী হয়, মার্জ্জনা কর—সদয় হও! তিরস্কার কর, অবিশ্বাস কর, ইচ্ছা হয় অবাধ্য হও,—কিন্তু দোহাই, আমায় ভালবেসো না! নারীর হাস্য, নারীর স্পর্শ যে-অজ্ঞ-সম্প্রদায়ের বিবেচনায় জীবনের চাইতেও প্রার্থনীয় বা জ্ঞানের চাইতেও মূল্যবান, আমাকেও তাঁদের দলে ভিড়িও না; ক্ষণিকের উত্তেজনায় আমার সারাজীবনের সঞ্চয় মিথ্যা ক'রে দিও না,—দোহাই। লিলিথ,—বালিকা,—যুবতি,—অপ্সরি! যেই হও তুমি,—সদয় হও, সদয় হও আমার প্রতি! তোমাকে ভালবাসতে আমার সাহস নেই!......না, না, না, একেবারেই সাহস নেই!"

বাক্য-শেষে এল্ রামি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং টলিতে টলিতে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন। দ্বিতীয়বার আর তিনি পশ্চাত ফিরিয়া চাহিলেন না; নতুবা দেখিতে পাইতেন, লিলিথের ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যমধুর হইয়া উঠিয়াছে। সে হাস্য স্বর্গীয়,—সে হাস্য জয়োল্লাস-দীপ্ত!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকক্ষে পৌঁছিয়া তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইবার পর বাম করতলে ললাট রক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতই না বিসদৃশ চিন্তা! বিনা অনুমতিতে তাহার মনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং দেখিতে দেখিতে মানুষকে দিশাহারা করিয়া দেয়। রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছিল, ফেরাজ তখনও পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরে নাই—কিন্তু তাঁহার অন্তরের মধ্যে এতই প্রবল যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল যে ভ্রাতার অনুপস্থিতি বা অপর কোনো বাহ্য-ব্যাপার সম্বন্ধে বুঝিবা তাঁহার খেয়ালই ছিল না। বরংবার তিনি আপন মনকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে অধিকাংশ অজ্ঞলোকের অতি সাধারণ হৃদয়াবেগ যদি তাঁহাকেও অভিভূত করিবে, তবে এতদিনকার বিজ্ঞান-অনুশীলনে কি লাভ? তিনি যে নিজেকে মানবপ্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়াই জানিতেন,—জীবনের তুচ্ছ সুখদুঃখকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারা ও রাজনৈতিক সামাজিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের বিচিত্র ভাব-ভঙ্গীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব অবলীলাক্রমে রাখিতে পারা যে তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ, এ অহংকারও

যে তাঁহার অল্প ছিল না ! তবে কিজন্য একখানি সুন্দর আননের স্বপ্ন-তাড়নায় ও তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠের 'প্রিয়তম' সম্ভাষণে তাঁহার সমগ্র সত্বার মর্ম্মকেন্দ্রটী পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল ! অপরকে তিনি বশীভূত করিতে সক্ষম, কিন্তু আপনাকে বশ করিয়াছেন কৈ ?

"না, এ কিছুতেই চলবে না,—" আচ্ছন্ন ভাবটা সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অধ্যয়ন চাই, কর্ম্ম চাই, যেমন করেই হোক এই দুর্নিবার চিত্তচাঞ্চল্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই ; লিলিথ মৃত—ব্যবহারিক অর্থে, পার্থিব প্রয়োজনের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ মৃত !"

সঙ্কল্পটীতে জোর দিবার জন্যই যেন তিনি ডেস্ক হইতে একখানি ছোট বাঁধানো খাতা টানিয়া বাহির করিলেন, গোড়া হইতে এ নাগাদ লিলিথসম্বন্ধীয় যা'কিছু পরীক্ষাফল উহাতে লিপিবদ্ধ ছিল। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই লিখিত হইয়াছে :—

"৮ই আগষ্ট, ১৮—রাত্রি নয়টা—লিলিথ, একটী আরব বালিকা, বয়স বারো, আমারই হাতের উপর মারা গেল। মৃত্যুর কারণ—জ্বর ও বিকার। আটটা দশ মিনিটের সময় হৃদ্‌স্পন্দন থামিল। মৃতদেহে রক্তের উত্তাপ থাকিতে থাকিতেই হৃদ্‌পিণ্ডের নিম্নে ধমনীতে 'বিদ্যুজ্জ্যোতি' সঞ্চারিত করিলাম। প্রত্যক্ষ ফল কিছুই দেখা গেল না।"

"রাত্রি ১১টা—আরবমহিলারা মৃতদেহটী সমাহিত করিবার জন্য বাহির করিল। বালিকার পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল যে সে পিতৃহারা ইতরজাতীয়, অশিক্ষিতা ও অশান্তপ্রকৃতিবিশিষ্টা। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনো শিক্ষা পায় নাই—অনুকরণ-প্রবৃত্তি ও স্বভাবিক প্রেরণাবশে প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিত মাত্র।"

"৯ই আগষ্ট, ভোর ৫টা—লিলিথের মৃতদেহ আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া পথিকেরা চলিয়া গেল। জ্যারোবা নাম্নী স্ত্রীলোকটী যায় নাই। ফেরাজকে কাল রাত্রে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পাঠাইয়াছি। জ্যারোবাকে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম। সে ভয় পাইলেও আমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত। লিলিথ তেমনিই প্রাণশূন্য। আবার ঔষধ-সঞ্চারিত করিলাম—এবার প্রধান প্রধান ধমনীগুলিতে। জীবনের কোনই লক্ষণ নাই।"

"১০ই আগষ্ট, দ্বিপ্রহর—হতাশ হইতেছি ; শেষ-চেষ্টা-স্বরূপ কয়েক ফোঁটা ঔষধ এবার মস্তিষ্কের সন্নিকটে সঞ্চারিত করিয়াছি ; এইটাই সমস্ত দেহযন্ত্রের প্রধান পরিচালন-কেন্দ্র ; এইটীকে যদি সচল করা যায়—"

"রাত্রি দ্বিপ্রহর—জয়লাভ ! মস্তিষ্কের ক্ষীণ স্পন্দন, সেই সঙ্গে হৃদয়েরও ক্রিয়া দেখা দিয়াছে। শ্বাস বহিতেছে কিন্তু বড় ক্ষীণ, অতি কষ্টে। পাণ্ডুর মুখে একটা বর্ণাভাও লক্ষিত হইতেছে। হয় তো বা সফলকাম হইব।"

"১৫ই আগষ্ট—এই পাঁচ দিনে লিলিথের শ্বাসক্রিয়া চলিয়াছে, এমন কি তাকে আংশিক জীবিতও বলা যায়। সে চোখ খোলে না বা নড়ে না—কখনও কখনও মৃতদেহের মতই মনে হয় ; একমাত্র ঔষধের বলেই যা'কিছু জীবন-লক্ষণ। অপেক্ষা করা যাক্।

"২০শে আগষ্ট—নাম ধরিয়া ডাকিয়াছি, সেও জবাব দিয়াছে—কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সে-সকল বিষয়ে সে কথা কয় তাহা শিখিল কোথায় ? সে বলে যে বাষ্পীয় মেঘ মণ্ডলে বিঘূর্ণিত ছোট্ট একটী গোলকের মতন এই পৃথিবীটা সে দেখিতে পায়, সর্ব্বত্র এক প্রকার সঙ্গীত শোনে এবং দূরে একটা আলোক-প্রভার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। কোথা হইতে কি উপায়ে এরূপ অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্ভব হয় ?"

এইখানে, বিপরীত পৃষ্ঠাখানিতে 'অনুসন্ধান' লিপিবদ্ধ—তাহার শিরোনামা ছিল এইরূপ—

"সমস্যা"

"দেওয়া আছে একটী শিশু-মস্তিষ্ক ; সে মস্তিষ্কে বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক পরিস্ফুট নয়, তা' ছাড়া নিছক বস্তুতান্ত্রিক ব্যতীত অন্যতর ধারণাও সেখানে নাই। যদি এই মস্তিষ্কে মৃত্যাচ্ছন্ন অবস্থায় বহুকাল রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে এমন সমস্ত বিষয় বা বস্তুর ধারণা সে কোথায় পায় যা' বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে অশক্ত ? এ-জাতীয় ধারণার বাহক কি আত্মা ? যদি তাহাই হয়, তবে আত্মা কি বস্তু, কোথায়ই বা থাকে ?"

বারংবার লিখিত অংশটুকু পাঠ করিয়া এল র‍্যামি অধীরভাবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন ও খাতাখানি মুড়িয়া সরাইয়া রাখিলেন। পরে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—

"যখন ওসব কথা লিখেছিলাম, তারপর থেকে এ-নাগাদ কত কথাই না সে বলেছে, কত খবরই না আমাকে জানিয়েছে! সেকালের শিশুমস্তিষ্ক প্রকৃতপক্ষে আজ পরিণত নারীমস্তিষ্ক হয়েই দাঁড়িয়েছে, অথচ বাহ্য উপায়ে কোনোরকম জ্ঞানই সে লাভ করেনি। তবু, এককালে যে চিন্তাশক্তিলেশহীন চঞ্চলা বালিকামাত্র ছিল সেই একই লোক আমার কাছে শুক্রগ্রহের সভ্যতা ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, মৃগব্যাধ নক্ষত্রের অধিবাসীবৃন্দ, ও অসংখ্য অদৃশ্য জগতের বিস্ময়-বারতা বিবৃত করেছে। সেই মানুষই আমাকে অমর ও ঐশী পদার্থের অপরিম্লান সৌন্দর্য্য-কথা, স্বর্গভূমির গৌরবগাথা ও এ-জগতের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-কাহিনী শুনিয়ে দিয়েছে। ভগবান জানেন, এ-ব্যাপার কতখানি বিস্ময়কর! তবু, আজ ছ'বছর আগে যে সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করেছি, তার মীমাংসা এতদিনেও বিন্দুমাত্র অগ্রসর হ'ল না। যদি বিশ্বাস করতে পারতুম— কিন্তু না, তা' পারিনে—চিরদিন আমাকে সন্দিগ্ধই থাকতে হবে; সন্দেহই কি সত্য আবিষ্কারের সহায় হবে না?"

এই সময় সদর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত-শব্দে সচকিত হইয়া তিনি তাড়াতাড়ি কাগজ-পত্রগুলো টেবিলের টানার মধ্যে রাখিলেন—এবং দ্বার মুক্ত করিবার জন্য বাহিরে যাইতে যাইতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া যখন দেখিলেন যে রাত্রি প্রায় দুইটা হইয়াছে তখন তিনি বুঝিতেই পারিলেন না—কোথা দিয়া কিভাবে এতটা সময় কাটিয়া গেল! দালান পার হইতে না হইতেই আর একবার কপাটের গায়ে অধীর করতাড়নশব্দ শ্রুত হইল—শব্দ থামিবামাত্র ধীরে ধীরে দ্বার মুক্ত করিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—

"ধৈর্য্য যে একটা গুণ একথা আশা করি তুমি কেভাবে পড়ে থাকবে। তোমার কাছে যে একটা গা-চাবী ছিল, সেটা কৈ? সেটাকে কাজে লাগাবার উপযুক্ততর সময় এর চেয়ে আর হ'তে পারতো না।"

কিন্তু দ্বার মুক্ত পাইবামাত্র ফেরাজ এতই ক্ষিপ্রগতিতে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল যেন কোনো বন্যপশু ব্যাধের ভয়েই পলাইয়া আসিয়াছে। নিরুদ্ধশ্বাসে দালানে দাঁড়াইয়া, দু'খানি আয়তোজ্জ্বল চক্ষুর বিহ্বল দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া অর্দ্ধস্বগতঃস্বরে সে বলিয়া উঠিল—"তা'হলে পালিয়ে আসতে পেরেছি—সত্যিই আবার বাড়ী এসে পৌঁছেছি!"

এল র‍্যামি স্থিরদৃষ্টিতে কনিষ্ঠকে নিরীক্ষণ করিলেন, শান্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন, পরে নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সারাদিন বেশ সুখে কাটিয়েছো ফেরাজ ?"

"সুখে !"—অধীরকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"সুখ হাঁ.........না ! হা ভগবান ! সুখ বল্‌তে তুমি কি বোঝো ?"

এল র‍্যামি আবার ভ্রাতার দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার কথার কোনো জবাব না দিয়া ধীর পদক্ষেপে পাঠকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফেরাজও তাঁহার পশ্চাত পশ্চাত আসিল।

"জানি তুমি কি ভাবছো"—ক্লিষ্টকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"তুমি ভাবছো যে আমি মদ্যপান করেছিলুম—সে কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি মাতাল হইনি। তা'রা আমাকে মদ খেতে দিয়েছিল—অতি বিস্বাদ সে মদ—সামান্য একটু পান করেছিলুম। কিন্তু সেজন্যে আমি তোমার ঘৃণাভাজন হবার ভয় করছিনে; যে জন্যে তোমার সাহায্য ও আশ্রয়-সন্ধানে বাড়ী ছুটে এসেছি"—

"রাত্তির ছটোর সময় 'বাড়ী ছুটে আসা' বেশ একটু অসময়ই বল্‌তে হবে"—শ্লেষের হাসি হাসিয়া এল র‍্যামি টিপ্পনী করিলেন—"তা ছাড়া, মদ ভালই হোক আর মন্দই হোক, তোমার কথাবার্ত্তা যে কতকটা বেহুর শোনাচ্ছে একথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না ফেরাজ।"

"দোহাই তোমার, আমাকে ঠাট্টা করো না !"—অধীর আবেগে ফেরাজ বলিল—"যদি কর, তা'হলে আমি পাগল হয়ে যাবো ! তুমি বল্‌ছো 'অসময়' ? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সময়ের কোনো জ্ঞানই আমার ছিল না। সেখান থেকে যখন পালিয়েছি তখন রাত দু'পুর—সেই থেকে একনাটা নক্ষত্রভরা আকাশের নীচে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

এ কথায় এল র‍্যামির ব্যঙ্গবৃত্তি লুপ্ত হইয়া তাহার স্থানে অনুকম্পা দেখা দিল। তাঁহার দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল ও দীপ্ত নয়নযুগলে স্নেহ উছলিয়া উঠিল।

"নক্ষত্রভরা আকাশের নীচে, একনাটা !" স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"এ ছুটো

জিনিস কি তোমার পক্ষে পরস্পর-বিরোধী নয়? নক্ষত্রদের কি তুমি তোমার সহচর, এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধু করেই তোলো নি?"

"না, না"—হতাশকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"এখন নয়—এখন নয়! এখন সমস্তই বদলে গেছে। জীবনের সঠিক চেহারা আমি দেখতে পেয়েছি—বিকট, কলুষিত, অপবিত্র, নিষ্ঠুর! যে-নক্ষত্র একদিন অত্যুজ্জ্বল মনে হোত আজ তা ম্লান হয়ে গেছে,—কোনোখানে আলো নেই, আশার রেখামাত্রও নেই; এত পাপের মাঝখানে কেমন করেই বা থাকবে? কেন আমাকে বলনি এল র‍্যামি—মানুষ যাকে জীবন বলে তার ভেতরকার এই আবর্জ্জনা-সম্বন্ধে কেন আমায় সাবধান করে দাওনি? আমার মনে হচ্ছে, আমি জীবিত ছিলুম না—ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম!"—একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে শ্রান্তভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং ভগ্নোৎসাহীর মত দুইহাতে মাথা গুঁজিল।

"তুমি জীবিত নয় একথা কে বল্‌লে ফেরাজ?" কনিষ্ঠকে উক্তবৎ ভঙ্গীতে উপবিষ্ট দেখিয়া ব্যথিত-কণ্ঠে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সর্ব্বপ্রথম বলে জ্যারোবা"—উদাসকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"সম্প্রতিশিল্পী এ্যান্সওয়ার্থও ঐ একই কথা বল্‌ছে। সংসারের মানুষদের চোখে আমাকে বুঝিবা খুবই নির্ব্বোধ দেখায়; কোনো বিষয়েই আমার অভিজ্ঞতা নেই; আমি এত অনভিজ্ঞ যে"—

"কি সম্বন্ধে?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন। "মদ্য, কুসঙ্গ, ঘোড়দৌড় আর জুয়াখেলা? হ্যাঁ, সেকথা ঠিক যে এসব বিষয়ে তুমি অনভিজ্ঞ, আর এই অনভিজ্ঞতার জন্যে ভগবানকে তুমি ধন্যবাদও দিতে পার। কিন্তু ঐ সমস্ত অভিজ্ঞ সংসারের জীব, যারা নাকি তোমার চাইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলেই জানে—তাদের জ্ঞানের উপাদানটা কি?"

ফেরাজ নীরবে চিন্তা করিতেছিল। সহসা সে ভ্রাতার দিকে চোখ তুলিতেই দেখা গেল, যে সে নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে।

"মনে হচ্ছে"—কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল—"মনে হচ্ছে, সেখানে না গেলেই আমি ভাল করতুম। তোমার সঙ্গসুখে সন্তুষ্ট থাকাই বুঝিবা আমার পক্ষে আরামের হতো।"

এল র‍্যামি একটু হাসিলেন, কিন্তু সেটুকু একটা ভিন্ন প্রকৃতির হৃদয়াবেগকে চাপা দিবার জন্যই।

"আমি তো আর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নই ভাই যে তোমাকে আঁচলের মধ্যে ঘিরে রাখ্‌তে চাইবো"—লঘুহাস্যসহ তিনি বলিলেন—"যাক ওসব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। এখন বল দেখি, মদ যদি না হয় তবে কিসে তোমার হঠাৎ এমন মন খারাপ হয়ে গেল ?"

"সব ব্যাপারেই"—আবেগভরে ফেরাজ উত্তর করিল—"সমস্তটা দিন যে কি যন্ত্রণায় কেটেছে তা' আর বলা যায় না। সকাল বেলা যখন বাড়ী থেকে বেরুই তখন কতই না আশা করেছিলুম,—ভেবেছিলুম শিল্পীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, সেখানে কতই না নতুন নতুন মনের খোরাক পাবো; হয়তো বা এমন কিছু অভিনব শিল্পসৌন্দর্য্য চোখে পড়বে যাতে আমার এই একঘেয়ে জীবনে একটা সাময়িক বৈচিত্র্য দেখা দেবে; হয়তো বা খ্যাতনামা শিল্পব্যবসায়ীর সঙ্গে গোটা দিনটা কাটালে লণ্ডনের শিল্পজগত সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতাও লাভ কর্‌তে পারবো। শিল্পাগারে যখন পৌঁছুলুম তখন এন্সওয়ার্থ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে—সে তখন একটা স্ত্রীলোকের—প্রতিচ্ছবি আঁকছিল।"

"তারপর ?" ফেরাজ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া এল র‍্যামি প্রশ্ন করিলেন।

"ঠিক—ঐ স্ত্রীলোকটা উলঙ্গ"—আরক্ত-আনন ফেরাজের লজ্জিত-কণ্ঠ হইতে নিম্নস্বরে উত্তর আসিল—"শীলতা বা আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ তার মধ্যে একটুও নেই। সে নাকি এন্স-ওয়ার্থের 'মডেল'—আর ঐভাবে নিজেকে আঁকতে দেবার জন্যে এর কিছু টাকাও নিয়েছে। তার দেহ-সৌন্দর্য্য মনোরম, যেন একখানি জীবন্ত পাষাণ প্রতিমা,—কিন্তু সে পিশাচী, এল র‍্যামি! নির্লজ্জ চোখ দুটোর ওপর তার কলুষিত মনের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল—কণ্ঠস্বরে তার অন্তরের বর্ব্বরতা ফুটে বেরুচ্ছিল—আমি—সে-দৃশ্যে যে কতখানি মর্ম্মাহত হয়েছিলুম তা' বলা যায় না।"

এল র‍্যামি নীরব; ফেরাজ বলিতে লাগিল—"আমি যেতেই এন্সওয়ার্থ আমাকে তার পাশে বসে ছবি-আঁকা দেখ্‌তে বললে। এ-অনুরোধে বিস্মিত হয়ে আমি তার কানে কানে বললুম 'অপরিচিতের সাক্ষাতে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীলোকটার পক্ষে নিশ্চয়ই আপত্তিকর

হবে ?' এঙ্গওয়ার্থ যেন আকাশ থেকে পড়ে বললে—'কার কথা বলছো ?' উত্তরে স্ত্রীলোকটীর কথা বলতেই সে তো হো করে হেসে উঠলো, আমাকে বললে 'গোবেচারী'—আরও বললে যে একসঙ্গে কুড়িজন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতেও সে অভ্যস্ত, সুতরাং আমার কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। অগত্যা আমি নিঃশব্দে বসে তার কাজ দেখতে লাগলুম, আর ভাবতে লাগলুম"—

"বটে ? কি ভাবতে লাগলে ?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অনেক কুৎসিত ভাবনা"—প্রত্যুত্তরে ফেরাজ সরলভাবেই জানাইল—"আর ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে পারছিলুম যে তা' কুৎসিত। তখুনি আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি যে মানুষ যখন অন্যায় করে তখনই সে টের পায় যে বিষয়টা অন্যায়, সুতরাং জেনে শুনে অন্যায় করার পর মার্জ্জনা-প্রত্যাশা করবার অধিকার তার নেই। সেক্ষেত্রে অপরাধের দায় বহন করতেও প্রস্তুত হওয়া, তা' ছাড়া ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার বদলে শাস্তি প্রার্থনা করাই তার উচিৎ।"

"কঠোর ব্যবস্থা"—এল র‍্যামি বলিলেন—"বিশেষতঃ যে যুবক জীবিত নয় কিন্তু স্বপ্ন-বিভোর, তার পক্ষে।"

"স্বপ্নে আমি কুৎসিত কিছুই দেখিনে"—ফেরাজ বলিল—"চিন্তাও করিনে। সেখানে সমস্তই সুসঙ্গত, সুশৃঙ্খল ও ঐশী নিয়মের অনুগামী। আজ যে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এ রকম জীবন-যাপনের চাইতে আমরণ স্বপ্ন দেখাই বাঞ্ছনীয়। যখন সেই স্ত্রীলোকটা শিল্পাগার থেকে চলে গেল তখন আমার মনে হল যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন কেটে গেল—মনে হল যেন একটা বিবসনা প্রেতিনী সৌভাগ্য বশতঃ দৃষ্টির সামনে থেকে মিলিয়ে গিয়েছে। এঙ্গওয়ার্থ সে সময় কাছে ডাকবামাত্র আমি সানন্দে এগিয়ে গেলুম। তখন সে আমাকে অর্দ্ধশায়িত ও অর্দ্ধউপবিষ্ট-অবস্থায় রেখে ছবি নিতে আরম্ভ করলে। প্রায় আধঘণ্টাকাল থাকার পর হঠাৎ কেমন আমার মনে হল যে আগেকার ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে কোনো ছবিতে আমাকে চিত্রিত করাই হয়তো তার অভিপ্রেত। তখুনি কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব পেলুম—'নিশ্চয়! আমার চিত্রশিল্পে তুমি ঐ মহিলাটীর প্রেমিক-রূপে চিত্রিত হবে।'—শুনেই,

এল র‍্যামি, আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো; লাফিয়ে উঠে সক্রোধে বললুম—"নিশ্চয়ই না; কোনোমতেই ওভাবে আমাকে আঁকতে পাবে না তুমি! যদি আঁকো তবে এইখানে দাঁড়িয়েই তোমার চিত্রপট আমি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবো! তোমার টাকার লোভে আমার ব্যক্তিত্ব বিক্রয় করতে আমি অক্ষম, কারণ আমি কোনো 'মডেল' নই।" এর পর অনেক হাসিঠাট্টা ও রাগারাগি হল; শেষে সে বললে—'বেশ, তোমার যখন এতই গুরুতর আপত্তি, তখন আমি কথা দিচ্ছি যে তোমাকে এ-ছবিতে দেখাবো না; তবে এভাবে অঙ্কিত হতে পেলে অধিকাংশ যুবকই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো, কেননা কোনো অভিনেত্রী কিম্বা বাইজীর সঙ্গে প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ বলে' নিজেকে না চালালে আজকাল 'মানুষ' বলে কেউ স্বীকৃতই হয় না। প্রকৃত জীবনই হচ্ছে এইখানে বুঝলে? অতএব লক্ষ্মী-ছেলেটীর মতন গোলমাল না করে' বসে থাক,—মুখভাবে নিদারুণ ঐ ঘৃণার আভাসটা ভারী চমৎকার মানাবে।' বারংবার যখন সে শপথ করলে যে ও-ছবিতে কিছুতে আমাকে আঁকবে না, তখন অগত্যা আমি আর আপত্তি করলুম না। ছবি শেষ করার পর সান্ধ্যভোজনের জন্যে সে আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল—সেখানে যেমন গোলমাল, তেমনি ভিড়। অনেক মেয়ে পুরুষ সেখানে মদ আর মাংস খাচ্ছে—সমস্তই ইতর শ্রেণীর—বিশেষ; কেউ কেউ এতই নির্লজ্জ-রুচি ও জঘন্য যে আমার চোখে তাদের মানুষের চেয়ে পোষাক-পরা বাঁদরের মতনই ঠেকল। এ্যান্সওয়ার্থকে সে কথা বলতেই সে হেসে উঠে বললে যে তাঁরা নাকি সভ্য সমাজের অত্যুৎকৃষ্ট নমুনা! আহারাদির পর আমরা ক্লাবে গেলুম—সেখানে অনেক লোক চুরুট খাচ্ছে আর তাস পিটুচ্ছে। আমাকেও খেলতে বলায় জানালুম যে আমি ও-খেলার কিছুই জানিনে; তারা বুঝিয়ে দিতে এলে যা' মনে হ'ল তা' স্পষ্টই বললুম; বললুম যে ও-খেলা টাকা ওড়াবার নিতান্ত হেয় উপায় ছাড়া আর কিছু বলে আমার মনে হয় না। তারা কিন্তু আমার কথায় হেসে উঠলো,—একজন বললে আমি 'আন্‌কোরা নতুন'; কি ভেবে তা' সেই জানে। আর এক জন এ্যান্সওয়ার্থকে জিজ্ঞাসা করলে যে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন, উত্তরে এ্যান্সওয়ার্থ বললে—'এ শতাব্দীর চরম বিস্ময়, অর্থাৎ যৌবনে যথার্থ একটী যুবককে তোমাদের দৃষ্টিগোচর করতে'—একথায় আবার তারা হেসে উঠলো।

এর পর সে আমাকে পার্কে নিয়ে গেল—সেখানে সেদিনকার সেই আইরিণকে তাঁর গাড়ীতে দেখলুম; একটা ঝোপের ধারে তাঁর গাড়ী থামতেই এ্যান্সওয়ার্থ এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে তিনি শুধু একটি কথা বললেন—'দুর্ভাগ্য আপনার যে আজ আপনি আপনার ভাইএর কাছছাড়া!' কারণ জানবার জন্যে আমি খুবই উৎসুক হয়েছিলুম কিন্তু বেশী কথা কইতে তাঁকে যেন অনিচ্ছুক বোধ হ'ল—কোচম্যানকে হাঁকাতে বলে' তখুনি তিনি পার্ক থেকে বেড়িয়ে গেলেন। এ-ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়ে এ্যান্সওয়ার্থ বিরক্তিভরে বললে—'এই সব বুদ্ধিমতীদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে! হিজিবিজি কতকগুলো লিখে এ ছুঁড়ীটা এত টাকা করেছে যে পুরুষদের কোন তোয়াক্কাই রাখে না—স্বাধীনা বলেই সে এতখানি উদ্ধত!'......তার মন্তব্যে অবাক হয়ে বললুম—'ঔদ্ধত্যের লক্ষণ কিছুই ত কৈ দেখলুম না।' উত্তরে সে বললে—'দেখলে না? পুরুষদের ভাল না বেসে সে অধ্যয়ন করতে চায়; এটা শুধু ঔদ্ধত্য নয়, অসহ্যও বটে!' সে এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে ও-প্রসঙ্গ নিয়ে আর বাড়াবাড়ী করতে আমার ইচ্ছে হ'ল না। এর পর সে আমাকে নৈশ-ভোজনের জন্যে পেড়াপেড়ী করতে লাগলো—আমিও রাজী হলুম, কিন্তু সেজন্যে এখন অনুতাপ হচ্ছে।"

"অনুতাপ কিসের?" কপট-বিস্ময়ে এল্ র্যামি বলিলেন—"যতদূর শুনলুম তাতে ত দেখছি, তোমার দিন বেশ ফুর্ত্তিতেই কেটেছে। বিবসনা নারী-দর্শন, হোটেলে আহার, আড্ডা-ঘরে আমোদপ্রমোদ, পার্কে সান্ধ্য-ভ্রমণ—এর চেয়ে আর কি বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে? এর মধ্যে নিদারুণ কিছুই নেই।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"বল কি তুমি! চতুর্দ্দিকের ঐ সমস্ত বীভৎস ব্যাভিচার আর পাপ-দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে পরিবেষ্টিত অনুভব করার মধ্যে 'নিদারুণ' কিছু নেই? নিজেকে ভগবৎ-সান্নিধ্য থেকে সুদূর অনুভব করার মধ্যে, আলোক-বায়ুহীন কারাগারের ভেতর নিজেকে আবদ্ধ জানার মধ্যে, ঘোরতর মিথ্যাচারের চাপে নিজেকে নিষ্পেষিত করার মধ্যে নিদারুণ কিছু নেই?"

"এই হচ্ছে জীবন, ভাই—" প্রশান্তভাবে এল র‍্যামি বলিলেন—"যা' তুমি দেখতে চেয়েছিলে, জানতে চেয়েছিলে, বুঝতে চেয়েছিলে।"

"না, এ জীবন নয়!"—উষ্মার সহিত ফেরাজ বলিল—"যে সমস্ত লোক তা' মনে করে তারা নির্ব্বোধ, তারা নিজেদের প্রতারিত করে। জীবন, যা' ভগবান আমাদের দান করেছিলেন তা' নির্ম্মল, সুন্দর ও মহত্তর ভবিষ্যতের দিকেই গতিশীল; কিন্তু আজ যে-সব নরনারীর জীবন-যাপন-প্রণালী দেখলুম, এর মধ্যে যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে এমন কথা নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বলতে পার না। একমাত্র ঐ আইরিশ ছাড়া এমন একটীও প্রাণী আমি দেখতে পাই নি যার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কওয়া যায়। মনটা যে কতখানি বিগড়ে গিয়েছে—"

"বিগড়ে যাবার কারণ?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ঠিক বলতে পারি নে—" চিন্তিতভাবে ফেরাজ বলিল—"তবে সমস্ত পৃথিবীটা'ই যেন কেমন বেসুরো মনে হ'ল, আশ্চর্য্য যে ভগবান নীরবে কোনো রকম প্রতিবাদ না করে' তাঁর সৃষ্টির অংশবিশেষেও এতটা অধঃপতন সহ্য করতে পারছেন"

"প্রতিবাদ নিত্য-সজাগ আছে—" এল র‍্যামি উত্তরে জানাইলেন—"নীরব কিন্তু নিত্য; কল্যাণের অস্তিত্বে ও অকল্যাণের অভ্যন্তরে তা' নিত্য সপ্রকাশ।"

ফেরাজ স্নেহবিচ্ছুরিত নয়নে ভ্রাতার পানে চাহিল; পরে সহসা বলিয়া উঠিল—"এল র‍্যামি আমাকে তোমার কাছে কাছে রাখ! আর কখনও ছেড়ে যেতে দিও না! যে রকম দেখা গেল, পৃথিবী যদি বাস্তবিকই তাই হয় তা' হলে আমি পাগল হয়ে যাবো—আমার জীবন তার এত বেশী বিরুদ্ধ। বাড়ী আসবার সময় এ-রাতে আজ এমন অনেক সুন্দরী ও যুবতী আমার চোখে পড়েছে যাদের নারীত্ববোধ বা রুচি এত বেশী হেয় যে তা'রা বুঝি বা ছদ্মবেশী পিশাচী। এমন অনেক কদাকার হতভাগ্য পুরুষ দেখলুম, যারা টাকার জন্যে যে-কোনো দুষ্কার্য্যের সুযোগ অন্বেষণে ওত পেতে আছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অনাহারে ছিন্ন বস্ত্রে পথে পথে বেড়াচ্ছে; জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য দুর্দ্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে কেউ বা পথের ধারে পড়ে আছে—এমন একটী পথিক নেই যে তাদের দু'টো মিষ্টি কথা বলে; সমস্তই যেন কলুষিত, অন্ধকার, হতাশাময়। তাই এখানে পৌঁছে আমার বোধ হ'ল—আহা, কি যে বোধ হ'ল তা

ভগবানই জানেন—বোধ হ'ল যেন তুমিই আমার বিধাতা, যেন এই আমার শান্তিনিবাস, যেন কোন্ অপ্সরী এখানে আবির্ভূতা থেকে চারি দিক নিরাপদ ও কল্যাণময় করে রেখেছে।"

একটা আকস্মিক অনুশোচনায় তাহার কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল ও সুন্দর নয়নদুটী অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

"লিলিথের কথা মনে পড়েছে!"—এ-চিন্তায় চকিতে এল র‍্যামির বুকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেমন-যেন-একটা ঈর্ষার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কোমলভাবেই বলিলেন—

"যদি একদিনের জাগতিক অভিজ্ঞতা আমাদের এই ক্ষুদ্র আবাসখানিকে তোমায় আগেকার চেয়েও ভালবাসতে শিখিয়ে থাকে ফেরাজ, তা' হ'লে সে তোমার পক্ষে খুবই মূল্যবান শিক্ষা জেনো। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে খুব বেশী আস্থাবান হওয়াটা কিছু নয়। ভেবে দেখো, একদিন আমার প্রভাব তোমাকে বিরক্ত করেছিল আর তুমি তা' থেকে মুক্তিই চেয়েছিলে। থাক্—আজ"—

"আজ আমি স্বেচ্ছায় তাতে ধরা দিচ্ছি"—ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া অবনত মস্তকে ফেরাজ বলিল—"এল র‍্যামি, ভাই আমার, বন্ধু আমার, আমাকে নিয়ে তোমার যা' খুসী তাই কর! আমার স্বপ্ন যদি তোমার প্রেরণা হয়, তবে ভগবান করুন, আমি যেন স্বপ্নই দেখি! যদি আমার আত্মার ওপর তোমার ইচ্ছাশক্তি-সম্পাত থেকেই সেই সঙ্গীত-নির্ঝর উৎসারিত হয় যা' আমার প্রাণমন আনন্দময় করে তোলে, তবে আমাকে তোমার ইচ্ছার চির-দাস করে রাখ! তোমার সংসর্গে আমি সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও আনন্দ যা' পেয়েছি তা' জগত-সংসার বুঝিবা কল্পনা করতেও পারতো না;—তোমার সঙ্গছাড়া হ'য়ে,—যদিও তা' একটী দিনের জন্যে,—আমি যা' পেলুম তা' শুধুই যন্ত্রণা। বিনিময়ে, আমার সম্পূর্ণ বশ্যতা তোমাকেই উৎসর্গ করতে আজ আমি ব্যাকুল; কেননা, তুমি যা' দিয়েছো, আমার সারাজীবনের আনুগত্যও তা শোধ করতে পারবে না।"

এল র‍্যামি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে আসিলেন এবং কনিষ্ঠের অংস-যুগলে দু'খানি হাত রাখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে চাহিলেন। পরে স্নেহবিগলিত

সুকোমল কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কি বল্‌তে চাইছো তা' ভাল করে ভেবে দেখ ভাই! যে আরবী-কেতাবখানা দৈবাৎ তোমার চোখে পড়েছিল, তাতে 'প্রভাবের' আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে কি লেখা আছে তা' স্মরণ কর। তাতে কতদূর কি বলা হয়েছে তা' সম্পূর্ণ বুঝেছিলে কি?"

ফেরাজ স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিল—"সম্পূর্ণ; সে সমস্ত কথা আমি এত পরিস্কার বুঝছি যে আমার এখনকার ধারণা হচ্ছে এই যে পৃথিবীতে যা' কিছু করা যায় তার মূলে আছে 'প্রভাব'। আমাদের প্রত্যেকেই হয় কোনো বস্তু বা ব্যক্তির প্রভাব-চালিত। এমন কি, আমার বিশ্বাস যে তুমিও এই সাধারণ নিয়মকে অতিক্রম করতে পারো নি, যদিও—আপন শক্তির অসামান্যতাবশতঃই তুমি বুঝে উঠ্‌তে পারো না যে সে শক্তির উৎস কোথায়। সে যাই হোক, আমি আবার বলছি এল র‍্যামি যে আমি নিঃশেষে নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করতে চাই,—এজন্যে পায়ে ধরতে হবে কি?"

ফেরাজ হাসিল; একটা আনন্দের দীপ্তিতে তাহার বিষন্ন নয়নদুটী ও ক্লিষ্ট আননখানি যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। আপনার শ্যামসুন্দর অঙ্গখানি সে দীপ্তির প্রতিফলনে অনুরঞ্জিত করিয়া কনিষ্ঠের ঘনকুঞ্চিত কেশগুচ্ছে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে এল র‍্যামি হাসিয়া বলিলেন—"জ্যারোবার পরামর্শের বিরুদ্ধেও?"

"হ্যাঁ, বিরুদ্ধেও" প্রফুল্লকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"আহা, বেচারী জ্যারেবা! দেখে মনে হয়, সে বড়ই দুঃখিনী। আমার আশঙ্কা হয় যে সে তোমাকে অসন্তুষ্ট করেছে?"

"না, না"—চিন্তিতভাবে এল র‍্যামি বলিলেন—"তা' করেনি; সে এতই বৃদ্ধা ও অসহায় যে তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া চলে না। বাস্তবিকই যদি সে অসুখী হয় তবে আমরা তাকে সুখী করবার চেষ্টা করবো আর সেই সঙ্গে নিজেরাও সুখী হব……কেমন?" অতি কোমলকণ্ঠে যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবে কথাগুলি বলিয়া সহসা তিনি ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন; পরে পরিস্কার সহজ স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা, তবে আজ এস ভাই; রাত হয়ে গেছে; এখন তোমার স্বপ্নরাজ্যে বিশ্রাম করগে!"

জ্যোষ্ঠের করচুম্বন করিয়া ফেরাজ কক্ষ-বিনিষ্ক্রান্ত হইবার পরও বহুক্ষণ শূণ্যদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"নিজেরাও সুখী হব !...... তা' কি সম্ভবে—এ জগতে যদি তা' সম্ভব হোত !"

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

নারীর দান।

—*—

ধরিবার যোগ্য যাহা মাতৃস্তনমুঠি,
সেবারত হের গো সে কচি হাত দুটি !
পাষাণ পড়িছে লুটি—এদিকেতে দেখ,
শতধারে – করিবারে একে অভিষেক !
সংসারে যে দুটি ধন দেয় গো রমণী—
স্নেহ, সেবা,—ওই ভাবে বিলায় গো ধনী
আপনি সে আপনারে !　তাই যবে তাহা
ছেড়ে যায়, জীয়ে রয় তারি মাঝে আহা !
তাই যবে পড়ে এই দেহখানা লুটি,
ব্যগ্র হয়ে ওঠে মরি, ক্ষুদ্র হাত দুটি !
সমস্ত সংসার তাই জিনিল যে জন,
ওই ক্ষীণ ফাঁদে তারে করিল বন্ধন !
মৃণাল মাতঙ্গে বাঁধে ; রাক্ষসের প্রাণ
থুইল কে লতামাঝে .—বিচিত্র বিধান !

———

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

অভিভাষণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

উপন্যাসের সহিত নাটকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। লোকশিক্ষার হিসাবে উপন্যাস অপেক্ষা নাটকের কার্য্যকারিতা আরও অধিক, এমন কি নিরক্ষরও নাটকের অভিনয় দেখিয়া কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে হয়ত তাহার মনে অক্ষর স্পৃহাও জন্মিতে পারে। এ কারণ যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি করিতে চাহেন তাঁহাদের নাটক ও তাহার অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় দীনবন্ধু, রামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, ও দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের যে আদর্শ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন আধুনিক নাটককারগণ তাহা হইতে একেবারেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। অভিনয়ের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণের কুরুচির প্রশ্রয় বাড়িতেছে, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বহুকাল হইতে যাত্রার অভিনয় চলিয়া আসিতেছে আমার মতে সৎ-সাহিত্যের প্রসারের জন্য যাত্রাগুলির সুসংস্কার হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশ দরিদ্র, রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটারের বাঁধা ষ্টেজের খরচ সর্ব্বত্র হইয়া উঠে না। সহরে যে কয়েকটী থিয়েটার আছে তাহাদের দৃশ্যাবলী বিলাতী থিয়েটারের নিকট হাস্যের উদ্রেক করাইয়া দেয়। তাহার পর থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যত দিন সমাজের পঙ্কিল স্তর হইতে গৃহীত হইতে থাকিবে তত দিন বিলাতী থিয়েটারের উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমকক্ষ হইতে পারিবে না। যাত্রা আমাদের খাঁটী স্বদেশী ও অল্প ব্যয়সাধ্য এবং যেখানে সেখানে দূরস্থ পল্লীগ্রামেও তাহার অভিনয় হইতে পারে। এই জেলায় যাত্রা বহুল প্রকার দেখিতে পাই কিন্তু অধিকতর উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে তাহার দ্বারা সাধারণের মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চার আগ্রহ জন্মিতে পারে। কোন কোনও গ্রামে আজকাল অবৈতনিক থিয়েটারের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা না-থিয়েটার না-যাত্রা। তাহাদের আস্বাদনকারীগণ চুণকাম করা দৃশ্যাবলীতে তাঁহাদের উদ্যম নষ্ট না করিয়া যদি যাত্রার সুসংস্কারে মন দেন তাহা হইলে অধিকতর সুফলের আশা করা যায়।

কিন্তু কথায় কথায় আমি আসল কথাটা ভুলিয়া যাইতেছি। আমি বলিতেছিলাম যে বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প, উপন্যাস ও নাটক ব্যতীত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল, ইহার প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মূলে ইংরেজী ভাষায় ব্যবহার হইয়া থাকে, যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত তাঁহারা বিজ্ঞান বা দর্শন চর্চ্চায় ইংরাজীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত তাঁহাদের মধ্যে ঐরূপ গুরুতর বিষয়ের চর্চ্চা অধিক নহে, কাজেই ঐ সকল বিষয়ের বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্যম অতি কম, বেনা-বনে মুক্তা ছড়াইতে কাহার প্রবৃত্তি হয়? জগদীশচন্দ্রের Stress on the Living and Unliving বা প্রফুল্লচন্দ্রের Hindu Chemistryর বঙ্গানুবাদকে কয় জন পড়িবে? ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থও দেশে গুণগ্রাহিতার অভাবে ইংরাজীতে লিখিত হয়, কিন্তু এ বিষয়ে আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না, আমরা স্বায়ত্ত-শাসন চাই, কিন্তু বিদেশীয় ভাষায় স্বায়ত্ত-শাসন কিরূপে হইবে জানি না, আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, যাঁহারা কিছু কিছু লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের জ্ঞানও বাঙ্গালা গ্রন্থ বা ইংরাজীর সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, এইরূপ মালমসলা লইয়া আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে, অতএব শীঘ্র সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নানা বিষয়ক পুস্তক প্রণয়নের অধিকতর আবশ্যক হইয়া পড়িবে। কঠিন বিষয় সরলভাবে সাধারণের নিকট প্রচার সুপণ্ডিত ও সুলেখকের কার্য্য, যাঁহারা মাসিকপত্রে দর্শন বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তাঁহাদের অধিকাংশই কঠিন বিষয়কে কঠিনতর করিয়া তোলেন তাহাতে লেখকের নিজের পাণ্ডিত্য জাহির ব্যতীত সাধারণের কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না, বিলাতে Huxley James প্রভৃতির ন্যায় সুপণ্ডিতগণ সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য ও গুরুতর বিষয়ের Primer বা প্রথম পাঠ রচনা করেন, বাঙ্গালাতে ঐরূপ প্রথম পাঠ রচনা হওয়া আবশ্যক, বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পাঠোপযোগী আমি কয়েকটী প্রথম পাঠ দেখিয়াছি, আমি সেগুলিকে আদৌ কাজের বলিয়া মনে করি না, তাহার অধিকাংশই প্রচ্ছন্ন অনুবাদ ও শিশুদিগের বুদ্ধির অগম্য, সেগুলি প্রধানতঃ অর্থোপার্জ্জনের জন্য রচিত বলিয়া মনে হয়—দেশের সাধারণের কাজে লাগিবে না Primer বা প্রথম পাঠের উদ্দেশ্য কেবল শিশুদিগের জন্য নহে, তাহা বুড়াদের কাজে লাগিবে, আমি

আশা করি আমাদের স্বদেশগত-প্রাণ উচ্চশিক্ষিত লেখকগণ সাধারণের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইবেন। হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের সরলভাবে ব্যখ্যা আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত অন্য কেহ চেষ্টা করিয়াছেন কি না জানি না, রজনীকান্ত গুপ্তের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় সুখপাঠ্য ইতিহাস কয়খানি আছে তাহাও জানি না, দর্শন ও ইতিহাসের পর বিজ্ঞানের কথা, সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিজ্ঞানের যে আলোচনা চলিতেছে তাহাও আমাদিগকে আয়ত্ব করিতে হইবে। বিধাতা বন্য পশুকে আত্মরক্ষার জন্য শৃঙ্গ ও নখ দিয়াছেন মানুষকে তদনুরূপ শারীরিক বল না দিয়া ধীশক্তি দিয়াছেন, সে ধীশক্তি প্রভাবেই মানুষ জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষায় সমর্থ। বিজ্ঞানই মানুষের বল—Knowledge is power ; রেলে চড়ুন বা জাহাজেই চড়ুন কয়লার খনিতেই নামুন, আকাশযানে শূন্যেতেই উঠুন বা মাটীতে মটরগাড়ী হাঁকান—ডাকে চিঠি পান বা তারে সংবাদ আনান, মূলে সকলই বিজ্ঞানের কর্ম্ম। অতএব গণিত, জ্যোতিষ, কৃষিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিকবিদ্যা, পূর্ত্তশিক্ষা, আইনশিক্ষা, শাসন-পদ্ধতিশিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই সরল সুখপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার 'জিজ্ঞাসা ও প্রকৃতি' পুস্তকে কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দারও এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন শাস্ত্রের অনেক বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারা রামেন্দ্রসুন্দর ও সমাদ্দার মহাশয়ের পথাবলম্বী হইলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হইবে, আজকাল পুরাতন পুঁথি সংগ্রহে অনেকের আগ্রহ দেখিতে পাই, সে কার্য্যের যে কোনও মূল্য নাই তাহা বলিতেছি না, তাহাতে অনেক সময় পুরাতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পুরাতনের দিকে যে পরিমাণে দৃষ্টি আছে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে বোধ হয় ততদূর নাই। সমগ্র জগৎ বিজ্ঞানের হাত ধরিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে কি বিজ্ঞানের এই নব নব আবিষ্কার হইতে বঞ্চিত থাকিবে? কবি গাহিয়াছেন :—

আগে চল্ আগে চল্ ভাই
প'ড়ে থাকা পিছে
ম'রে থাকা মিছে
বেঁচে ম'রে কিবা ফল ভাই ।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য চিরকালই কি বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ? বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা আমাদের জ্ঞান উপার্জ্জনের কতদূর অন্তরায় হইতেছে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? বিদেশীয় ভাষা শিখিতেই আমাদের দিন কাটিয়া যায়, আসল শিক্ষা হয় নাই, ইউরোপীয় দেশ সমূহে বৈদেশিক ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলিলে সোনার পাথর বাটীর ন্যায় হাস্যরসের উদ্রেক করিবে, অতএব যাঁহারা বহুপরিশ্রমে বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমি পুনরায় অনুরোধ করিয়া বলি যে পুরাকালে ব্রাহ্মণের বেদাধিকারের ন্যায় তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহার অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সহজ ও সরল বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করিতে যত্নবান হউন, তবেই তাঁহারা প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী হইতে পারিবেন, সাহিত্য সম্মিলনীর প্রতিও আমার অনুরোধ যে তাঁহাদের পুরস্কারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আলোচনার কথা যেন বিস্মৃত না হন ।

কিন্তু এই কার্য্যের সহায়তা করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে সকলের আয়ত্বাধীন হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে ইহাকে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিতে হইবে । কেহ কেহ আক্ষেপ করেন যে আজকালকার লেখকগণ ভাষাকে স্বাধীনতা দিতে গিয়া ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতেছেন । এই শ্রেণীর লেখকগণের চেষ্টায় ভীত বা নিরাশ হইবার কারণ নাই, কেহ জোর করিয়া ভাষাকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে পারিবে না । ভাবই ভাষার আধার । শরীরের মধ্যে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হইলে তাহাতে দেহের লাবণ্য হইতেই হইবে । তেমনি ভাষা যদি সুন্দর ভাবযুক্ত হয় তাহাতে ভাষার শ্রী আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে । সে ভাষা ক্রমেই সাধারণে আদর করিবে এবং তাহা যদি স্থলে স্থলে ব্যাকরণের গণ্ডী পার হইয়া যায় তাহা হইলে ব্যাকরণকেই ভাষার অনুসরণ করিতে হইবে । ভাষা

ব্যাকরণকে অনুসরণ করিবে না। Antony যখন Caesor এর হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রোমবাসীগণকে উত্তেজিত করেন তখন সেক্সপীয়ার Caesor এর আশৈশব বন্ধু ব্রুটাশ যে তাহার হত্যাকারী এই অরুন্তুদ বিষাদ কাহিনী বর্ণন করিতে Antonyর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "This was the most unkindest cut of all"। এখানে বৈয়াকরণিকের আপত্তি চলিবে না। কারণ কবির ভাষা এখানে ব্যাকরণের যুগ ছাপাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা যদি বাঙ্গালা ভাষাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি করিতে চাহি তাহা হইলে ভাষার স্বাভাবিক গতিরোধ করিলে চলিবে না। ভাষার ব্যাপকতা বাড়াইবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সবুজপত্রে যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। চলিত কথার সহিত গুরু গম্ভীর কথার সংযোগে অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহা অনভ্যাসের ফল—কালে টিকিবে না। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকাবলী পড়িয়াছেন তাঁহারা চলিত কথার সহিত সুসংস্কৃত কথার সংযোগ শ্রুতিকটু মনে করিবেন না। সাহিত্যের মধ্যে চলিত কথার অধিক প্রচলন হইলে অন্য দুইটী আপত্তি দেখা যায়—প্রথম—গুরু বিষয়ের আলোচনা চপলতা বা গ্রাম্যতা দুষ্ট হইয়া পড়িবে,—দ্বিতীয়—বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন চলিত কথার সমাবেশে লিখিত ভাষায় বহুল পার্থক্য লক্ষিত হইবে। প্রথম আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যদি বিষয় গুরু হয় তাহা হইলে চিন্তাশীল লেখকের হস্তে ভাষার অপব্যবহারের আশঙ্কা নাই। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে—চলিত ভাষার মধ্যেও এমন অনেক কথা আছে যাহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। আপাততঃ তাহা হইতে ভাষার কলেবর বর্দ্ধিত হইবে; পরে পরস্পর আদান প্রদানের মধ্য দিয়া ভাষার আয়তন আরও বৃদ্ধি পাইবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন যে কলিকাতার যে ভাষা তাহা হইতে লিখিত ভাষায় অনেক উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে। ঐ ভাষা একদিকে পশ্চিমের বাঁকুড়া জেলার ভাষা হইতে যেরূপ বিভিন্ন পূর্ব্বের চট্টগ্রাম হইতেও সেইরূপ বিভিন্ন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। যদি চলিত ভাষায় অধিক গ্রন্থ প্রকাশ হয়। ভাষার উপযুক্ত অবয়ব আপনা হইতেই গঠিত হইয়া উঠিবে। ফলকথা সরল ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন জ্ঞান বিস্তারের প্রধান উপায়। যাঁহারা স্বর্গীয় ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত সরল ডাক্তারী পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আমার কথার

সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই পুস্তকের সাহায্যে সামান্য লেখাপড়া জানা লোকও ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া একদিকে নিজেদের অর্থোপার্জ্জন ও অন্যদিকে পল্লীগ্রামে স্বল্পব্যয়ে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান যদুগোপাল বাবুর আত্মার কল্যাণ সাধন করুন।

আমার আর অধিক বক্তব্য নাই, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করা আমার অনধিকার চর্চ্চা, আপনারা আজ যে সম্মানের আসন প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। নিজে অকৃতী হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি আছে এবং তাঁহাদের নিকট দেশের উন্নতির অনেক আশা করিয়া থাকি, বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নত ও সর্ব্বদিক্‌-ব্যাপী না হইলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সাধন হইবে না।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে জগন্মান্যা ও জগৎপূজ্যা করিতে সচেষ্ট আছেন তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, রবিন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষাকে সাহিত্যজগতে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা সাহিত্যে এম, এ উপাধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাও বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে কম আশার কথা নহে ?

মির্জ্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকারের যে চেষ্টা করিতেছেন সেই চেষ্টা ফলবতী হউক, ভগবান সাহিত্য-সম্মিলনীর সম্পাদকের ও সভ্যগণের পুণ্যকার্য্যে সহায় হউন—ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আমি যাহা বলিলাম তাহার কোনটাই অকাট্য নহে, তাহা আপনাদের বিচারাধীনে, আমার ভরসার মধ্যে এই যে দোষান্ পরিত্যজ্য গুণান্ গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল।

গান।

—*—

মনে ভাবি তোমায় আমি
ভক্তি ভরে প্রতিদিন
যুক্ত করে করব প্রণাম
ভাবব তুমি অন্তহীন
প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা বেলা
নিত্য আমার কেবল খেলা
বেলার শেষে দেখি চেয়ে
ব্যর্থ হয়ে গেল দিন।

হয়না আমার পূজার সময়
লইনা কুসুম ডালা
সাঁঝের বেলায় ঘরে আমার
হয়না প্রদীপ জ্বালা—
তবু কি গো হৃদয় মাঝে
তোমার মোহন বীণা বাজে
সাজে তোমার আসনখানি
বিশ্ব ভুবন সঙ্গহীন।

শ্রীগিরিজানাথ চক্রবর্ত্তী।

পাষাণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যের মধ্যেই পিতামহী মহামায়াকে সংবাদ দিলেন "নাতিজামাতা আসিয়াছেন।" মহামায়া বুঝিল পিতামহীই সেখানে সংবাদ দিয়াছিলেন। শ্বশুরের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া তিনি শীঘ্রই আবার চলিয়া গেলেন। মহামায়ার সঙ্গে তাঁহার ভাল করিয়া সাক্ষাৎও হইল না। দিদি-শাশুড়ীকে কেবল বলিয়া গেলেন, এখন তাঁহারা শোকাকুল আছেন এখন কোন কথাই হইতে পারে না। কিছু দিন পরে আবার তিনি আসিবেন। মহামায়া বুঝিল এ আসা আবার কিসের জন্য—কিন্তু হায় আর তাহার উপায় নাই।

পিতামহী অশ্রু মুছিতে মুছিতে পুনঃ পুনঃ জামাতার রূপগুণের সৎবিবেচনার মধুরালাপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে করিতে মহামায়াকে বুঝাইলেন এই স্বামীর ঘর করিতে পারিলে এখনো তাহার নারীজন্মের সার্থকতার আশা আছে। তাহার বড় ভাগ্য যে এখনো তাহার এমন রূপ গুণাধার স্বামী তাহারই জন্য গৃহ শূন্য রাখিয়াছে। পিতামহীর অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে, তিনি শঙ্করকে বুকে করিয়া এই ভিটায় পড়িয়া থাকিবেন। ঋণ যাহা আছে তাহার জন্য চিন্তা নাই, শঙ্কর বড় হইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিবে। এখন মহামায়ার স্বামীর নিকটে বাস করাই শ্রেয়ঃ। স্বামী আসিলে এই বার তাহাকে শ্বশুরগৃহে যাইতেই হইবে। জামাতার যেরূপ ব্যবহার তাহাতে দ্বিরাগমনের দ্রব্য-সম্ভারের জন্য তেমন কিছু বোধ হয় আটকাইবে না।

এতক্ষণে মহামায়া কথা বলিল "কেন বাবার মত ব্যক্তির কন্যা হইয়া ভিখারীকন্যার মতই বা স্বামীর ঘরে যাইব কেন? তাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহা দিতে হইবে বৈ কি!"

পিতামহী ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন "তাহা হইলে এ বৎসরের ধানগুলার বিক্রয় করিয়া তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। তোমার বাবার কার্য্যে অনেক খরচ হইয়াছে, আর ঋণ করার উপায় নাই; দ্বিরাগমনে তাহা হইলে মাস কতক দেরী পড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।"

"মাসকতক নয় ঠাকুরমা বৎসরকতক!"

"বৎসরকতক! কি বলিতেছিস্ মায়া?"

ঠিকই বলিতেছি ঠাকুরমা! এ সম্পত্তি হইতে অন্য কোন খরচ তো এখন হইতে পারিবে না, এ সমস্ত দেবত্র সম্পত্তি। দেবতা প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে তবে সেবাইত শঙ্করের ভগ্নির শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে নয়।"

ঠাকুরমা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন "সেই সর্ব্বনাশা কথা তোমারও মুখে মায়া! বুঝিলাম এ বংশের আর কাহারও ভাল হইবে না।"

ভাল হউক মন্দ হউক ইহা ভিন্ন আর যে উপায় নাই ঠাকুরমা। বাবার এই পণে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগের কথা কি তোমার মনে হইতেছে না? তাঁহার জীবনপণের অর্থে তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য না করিয়া তাঁহার পুত্রকন্যার সুখসৌভাগ্যের জন্য তাহা অপচয় করিবার তোমারও অধিকার নাই।"

ঠাকুরমা আবার অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "তাহা যেন বুঝিলাম কিন্তু এই বৎসর-কতক কত বৎসর হইতে পারে তাকি ভাবিয়া দেখেছিস্? মন্দির নির্ম্মাণের ঋণই এখনো শোধ হয় নাই, এই ঋণ শোধ করিয়া ঠাকুর প্রতিষ্ঠার ব্যয়ের অর্থ সংগ্রহ করিয়া তবে একার্য্য সম্ভব হইবে। এত দিন কি আর রাধানাথ বা তাহার মাতা তোর অপেক্ষায় থাকিবেন? তাহারা বড় ভদ্র যে এখনো বিবাহ করে নাই।"

"তাহা ঠিক ঠাকুরমা, কিন্তু অন্য উপায়ও তো দেখছি না।"

"তবে কি তাহাকে প্রকারান্তরে বিবাহ করিতে বলিব সর্ব্বনাশি!"

মহামায়া নীরবে রহিল এবং ঠাকুরমাতা এ বংশের পুত্রকন্যাদেরও এরূপ খেদের পরিণাম ভাবিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

মাসখানেক পরে জামাতা রাধানাথ আসিলেন। ঠাকুরমাতা নাতিনীকে স্বামী দর্শনের উপযুক্ত বেশে সাজাইতে গিয়া নাতিনীর ভাবে কতকটা আশান্বিত হইয়া উঠিলেন, বুঝি বয়োধর্ম্মে মহামায়ার দার্ঢ্যতা কিছু শিথিল হইয়াছে। এমন স্বামী, তাহার ঘর করিতে ইচ্ছুক হইবে না সাধ্বী যুবতী স্ত্রীর পক্ষে একি সম্ভব? বাপের কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম অমন জেদ ধরিয়াছিল, এখন স্বামীকে বার বার আসিতে দেখিয়া মন বোধ হয় নরম হইয়াছে। ঠাকুরমা মনের মত করিয়া সাজাইয়া মহামায়াকে স্বামী দর্শনে পাঠাইয়া দিলেন।

স্বামী যখন পরিহাস করিয়া বলিলেন "চিনিতে পার?" তখন মহামায়া একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। স্বামী কিন্তু সে হাসিতে ভুলিল না, কথা আদায় না করিয়া সে ছাড়িবে না। অগত্যা মহামায়া উত্তর দিল "চিন্‌বার তো কথা নয় কিন্তু চিনাইয়াই যে আসিয়াছ, তাই চিনিতেছি।"

তুমি আমায় না চিনিতে পার আমি কিন্তু তোমায় যতদিন পরে যেখানে যে অবস্থায়ই দেখি না কেন নিশ্চয়ই চিনিয়া লইতে পারিতাম।"

মহামায়া আবার হাসিয়া বলিল "আমি যদি তোমায় চিনিতে না পারি তুমিই বা কিসে চিন্‌বে? তুমিও আমায় যতটুকু দেখিয়াছ আমিও তো তাই। তোমাদের বাড়ীতে সেই দু'চার দিন—সেও বুঝি আজ নয় বৎসরের কথা। এটুকুতে কি কেহ কাহাকেও চিনিয়া উঠিতে পারে?"

রাধানাথ সহসা স্ত্রীর একখানা হাত ধরিয়া বলিয়া ফেলিল "পরে যদি এই রকম বিদ্যুৎ-বর্ণ এই রকম মুখ তাহার চক্ষে সেই হইতে আর না পড়িয়া থাকে। মায়া এখনো আমি তোমাকে যেন সেই রকমই দেখিতেছি। শুনি তুমি আমি নাকি বড় হইয়াছি কিন্তু কৈ আমার তো সে রকম লাগিতেছে না। যেন সেই তুমি—সেই"—স্ত্রীর সঙ্কুচিত নত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া স্বামী তাহার উচ্ছ্বাসে যেন সহসা একটা বাধা পাইয়া একটু লজ্জা বোধ করিয়া হাতখানা ছাড়িয়া দিল এবং অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাইবার জন্য টানিয়া টানিয়া উচ্চারণ করিল "আর বুঝিতেই তো পরিতেছ সাত বৎসর ও ষোলো সতেরো বৎসরে প্রভেদ থাকে না কি? তুমি চিনিতে না পারিলেও আমার তাহা পারিবারই কথা যে।"

মায়া আর কোন প্রতিবাদ করিল না। কিছুক্ষণ উভয়ে নিঃশব্দেই কাটাইলে রাধানাথ আবার কথা কহিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। যৌবনের এই প্রথম সম্মিলনে উভয়ের মধ্যের এই নীরবতা সে আর বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না কিন্তু আবার কোন্ কথা বলা যায়? মায়াকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার কথাটা এমনি বলিয়া ফেলিতে রাধানাথের কেমন ইচ্ছা হইল না। আজন্ম পিতৃগৃহে অধিষ্ঠিতা কন্যা যদি তাহাতে কোন ব্যথা বোধ করে, ইহাদের বিরহ সম্ভাবনায় এমনি কাতর হইয়া উঠে তাহা হইলে প্রথম পরিচয়ের এই আনন্দ সন্ধিক্ষণটা যে বিফলেই কাটিয়া যাইবে। তাই সে আবার স্ত্রীর হাত ধরিয়া ডাকিল "মায়া।"

মায়া মুখ তুলিয়া বলিল "কি?"

"আমাকে তোমার মনে পড়িত?"

"হঁ্যা।"

"কখনো দেখিতে ইচ্ছা করিত না কি?"

মায়া আর সাড়-শব্দ দিল না দেখিয়া অধীর স্বামী আবার প্রশ্ন করিল "ইচ্ছা করিত না? বল না মায়া এটুকু কথায় আর লজ্জা কি? বল, করিত! স্বামীর চোখের সহিত চোখ্ মিলাইয়া মায়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল "ইচ্ছা করিয়া কি হইবে! দেখিতে পাওয়া তো সম্ভব ছিল না—তাই সে ইচ্ছা হইতে দিই নাই।"

"মায়া আমারও তো তেমনি তোমাকে পাওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না কিন্তু এ ইচ্ছা তো সর্ব্বক্ষণই করিত। এই নয় বৎসর প্রত্যহই বোধহয় এ ইচ্ছা হইয়াছে। তুমি এতদিন ছেলে মানুষ ছিলে তাই বোধহয় ইচ্ছা তোমার এত বাধ্য ছিল, না মায়া?"

"হইতে পারে। তাহা হইলে এখনো কি আমি ছেলে মানুষ আছি! ইচ্ছা কিন্তু আমার এখনো বাধ্য।"

স্বামী একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল সত্যই কি মায়া এখনো ছেলে মানুষই আছে! আজ তাহার এই রূপোজ্জ্বল মুখ প্রথম স্বামী-সমাগমে যেমন হইবার কথা তেমন যেন হয় নাই। মুখে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য্যের কঠিন আবরণ কিন্তু একি ছেলে মানুষে সম্ভব? যৌবনের অতীত এ গাম্ভীর্য্যে এ

সপ্তদশী যুবতী যেন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে! কেন এ কাঠিন্য! তবে কি মায়া স্বামী-সমাগমে তেমন আনন্দিত হয় নাই? সে কি তবে স্বামীগৃহে সত্যই যাইতে চাহে না? তাই কি তাহার এ ভাব?

স্বামীর বিস্মিত দৃষ্টি ক্রমে যেন ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছে দেখিয়া মায়া ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিল। কিছুক্ষণ পরে রাধানাথ সহসা বলিয়া উঠিল "মায়া আমি আসায় কি তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ?" মায়া মাথাও তুলে না উত্তরও দেয় না—কিন্তু স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মাথা তুলিয়া অগত্যা স্বামীর পানে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র, উত্তর দিতে পারিল না।

স্বামী সেটুকুর অর্থ বুঝিল, বলিল "আসায় অসন্তুষ্ট নাহয় না হইতে পারে কিন্তু আমার এ আসার উদ্দেশ্য অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ; সেজন্য কি কিছু বিরক্তি বোধ কর নাই? সত্য বল।"

মায়া এবার সত্য কথাই বলিতে চেষ্টা করিল,—বলিল "বিরক্তি নয়—কেবল দুঃখিত হইতেছি যে পাছে তোমরা আমার না যাওয়ায় দুঃখ বোধ কর।"

রাধানাথ অতিমাত্র বিস্মিতভাবে বলিলেন "সে কি মায়া, তুমি কি এখনো আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর না?"

"ইচ্ছার কথা তো প্রথমেই হইয়া গিয়াছে। আমার যাইবার উপায় নাই।"

"তোমার শিশু ভ্রাতা ও পিতামহীর একাকীত্বের কথা আমরাও ভাবিয়াছি কিন্তু ঠাকুরমা তো স্বেচ্ছায় তোমাকে আমায় দিতে সম্মত আছেন।"

"তিনি সম্মত হলেও আমি নই।"

রাধানাথ ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে ধীরস্বরে বলিতে লাগিলেন "মায়া, তুমি এখন আর নিতান্ত বালিকা নও, ভাবিয়া দেখ তোমার এখন—"

"স্বামীকে বাধা দিয়া মায়া বলিল "তুমি যাহা বলিবে সমস্তই যে ঠিক তাহাও আমি জানি কিন্তু তথাপি জানিও আমার এখান হইতে যাইবার এখন উপায় নাই।"

"উপায় নাই,—এ-কথার অর্থ কি তোমার মায়া? তোমার ইচ্ছা নাই এই কথাই তো?"

"এক রকম তাহাই বটে।"

"কিন্তু ইহার ফল কি হইবে তাহাও কি ভাবিয়াছ ? আমার মাতা ও আমি বহু দিন তোমার অপেক্ষা করিয়াছি, আর অপেক্ষা করা আমাদের সাধ্যাতীত। বংশের আমি একমাত্র সন্তান। আমায় এবার গিয়া বিবাহ করিতেই হইবে।"

"তোমাদের এই এত দিনের অপেক্ষাতেই লোকে আশ্চর্য্য হইতেছে তোমাদের ধৈর্য্যের জন্য ক্ষমা গুণের জন্য সকলে শত সুখ্যাতি করিতেছে! তুমি যে এখনো একথা আমায় জানাইয়া তবে নিজের কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য হইবে ইহাতেও আমি তোমার পায়ে শত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি বিশ্বাস করিও। আর তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করিও না,এ-বিষয়ে আমার মিনতি জানিও।"

রাধানাথ ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিলেন "তাহা হইলে তুমি সত্যই আমাকে চাও না, স্বামীর ঘর করিতে ইচ্ছা রাখ না ?"

"প্রকারান্তরে তাহাই দাঁড়াইতেছে।"

স্বামী এইবার অসহিষ্ণু হইয়া বলিল "ওসব ফের-ঘোরের কথা ছাড়, স্পষ্ট করিয়া বল আমার কাছে তুমি তাহা হইলে যাইবে না ?"

"এখন নয়।"

"এখন নয় তবে আবার কবে ? আর আমরা অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

"আমার অপেক্ষা আর করিও না, ফিরিয়া যাও—গিয়া বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতি-পালন কর। যদি সে দিন আসে—বাবার দেবীমূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত শঙ্করকে তাঁহার সেবাইত করিয়া আমি মুক্তি পাই, তখন তোমার গৃহের গৃহিণীর দাসী হইতেও সেখানে যাইব, কিন্তু এখন পারিব না।"

মুখে হস্ত আচ্ছাদন দিয়া মায়া উঠিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। বিস্মিত স্তম্ভিত স্বামী তাহাকে নিবারণ করিবারও সময় পাইল না।

(৪)

মহামায়ার পিতামহীর নিকট রাধানাথ সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্মিত অথবা ক্রুদ্ধ কি হইবে ভাবিয়া পাইল না তবে এটুকু স্থির বুঝিল যে তাহাকে ফিরিয়াই যাইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

বিদায় হইবার পূর্ব্বে রাধানাথ আর একবার মায়ার সহিত দেখা করিল, বলিল "আমি তোমার স্বামীর অধিকারে জোর করিয়া কিছু বলিতে চাহিতেছি না, সে অধিকারও তোমরা কখনো আমায় দাও নাই, কিন্তু গোটা দুইয়েক কথা মাত্র আছে, সেটুকু তোমায় শুনিতে হইবে।"

"বল।"

"প্রথম কথা তোমার পিতা আমাদের যৌতুকের ভিখারী মনে করিয়াই যে এত দিন তোমায় পাঠান নাই তাহা আমরা জানিতাম না। জানিলে তিনি-বর্ত্তমানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত। তোমারো মনে সেই ভ্রম আছে শুনিয়া একথা তোমায় জানানো কর্ত্তব্য মনে করিতেছি যে বিনা যৌতুকেও তুমি আমার গৃহে গেলে কেহ তোমার অসম্মান করিবে না।"

"তিনি যখন তাঁহার কন্যাকে ভিখারী-কন্যার মত স্বামীর ঘরে পাঠাইতে রাজী হন নাই তখন সেকথা আর কেন। আর আমারও এ-বাধা মুখ্য কারণ নয়—এটা গৌণ কথা মাত্র।"

"মুখ্য বা গৌণ যাহাই হোক ইহাকে বাধা বলিয়াই মনে করিও না এই মাত্র আমার বক্তব্য। তাহারও পরে তোমার যাহা মুখ্য বাধা সে বিষয়েও আমার বক্তব্য শোন। বান্ধবে পরামর্শ দিয়া থাকে,—অন্ততঃ আমার এই অধিকারটুকু মানিও, শোন না-শোন পরের কথা। আমার ঘর করিলে কি তোমার বাপের দেবী প্রতিষ্ঠা করা এতই অসম্ভব হইবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি বৎসরের মধ্যেই তোমার পিতৃঋণ সমস্ত শোধ ও দেবী প্রতিষ্ঠা করা যাহাতে সম্ভব হয় তাহার চেষ্টা দেখিব, উপায়ও করিব। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

"অপরের সাহায্য লইলে বাবাই এ কার্য্য সারিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার অনুমতি ও আজ্ঞা তাঁহারই এই সম্পত্তি হইতে এ কার্য্য আমারই সম্পন্ন করিতে হইবে। তবেই আমার মুক্তি—তবে আমি তোমার ঘরে যাইতে পাইব। এই-ই তাঁহার আমার উপরে শেষ আদেশ। তাঁহার নিকটে শপথ করিয়া এ প্রতিজ্ঞা লইয়াছি যে আমি তাঁহার পুত্রের কার্য্য করিব। তুমি আর আমায় বৃথা অনুরোধ করিও না—তাহা রাখিতে আমার সাধ্য নাই।"

"কিন্তু আমি যে মাতার পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া আসিয়াছি এখনো যদি তুমি না যাও এবার আমি বাড়ী গিয়া নিশ্চয় বিবাহ করিব। নহিলে আমি হয় ত এখনো তোমার অপেক্ষা করিতাম মায়া—"

মায়া মুখ ঢাকিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল "না, শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আদেশ পালন করিও, আমার জন্য—আর না"—এবারও মায়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। স্বামীকে শেষ বিদায় সম্ভাষণ করা বা পায়ের ধূলা লওয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না।

রাধানাথ চলিয়া যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে আবার মায়ার ও তাহার পিতামহীর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। নাতিনীর ব্যবস্থাতেই সংসার চলিত—শঙ্করের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইত, চাষ-আবাদ চলিত, ঠাকুরমাতা কেবল কলের পুত্তলীর মত গৃহকর্ম্ম করিতেন মাত্র। মায়া মাঝে মাঝে রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার খুলিয়া তাহার এক কোণে স্থাপিতা দেবীমূর্ত্তিটিকে দেখিয়া আসিত। পিতামহী শঙ্করকে সেদিক্ মাড়াইতে দিতেন না। বলিতেন "ও রাক্ষসীকে তোর দেখিতে হইবে না, দেখিলে তুইও হয় ত বংশের ধারা ধরিয়া ক্ষেপিয়া যাইবি। তোর দিদিই উহাকে লইয়া থাক্—তুই পড়াশুনা কর।" বালককে দেবী-সম্বন্ধে এইরূপ শ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিলে যে ভবিষ্যতে তাহারই ক্ষতি হইবে, শঙ্করকে যে তাঁহারই সেবাইত হইতে হইবে এ কথা পিতামহীকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া মায়া তাঁহাকে ঈষৎ অনুযোগও করিত তথাপি পিতামহীর বিমুখ মন তাহার কথায় ফিরিত না। শঙ্করও ক্রমে সেই পাষাণময়ীর সম্বন্ধে কেমন যেন ভীত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাধানাথ চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পরেই তাহার বিবাহের সংবাদ ইহারা শুনিয়াছিল। ঠাকুরমা সেদিন অন্নজল গ্রহণ করেন নাই কিন্তু মায়ার তেমন কোন ভাবান্তর বুঝা যায় নাই। কেবল মন্দিরে গিয়া সে সেদিন অনেকখানি রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিল ইহাই ঠাকুরমা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহাতে আর কি! উহার যদি সেই দুঃখই থাকিবে তাহা হইলে কি অমন স্বামীকে এমনি করিয়া ত্যাগ করে? মানুষের রক্তমাংসে উহাকেও ভগবান পাথরের অন্তঃকরণ দিয়াছেন ইহাই পিতামহীর অভ্রান্ত মত।

এক বৎসর পরে শঙ্করের উপনয়ন উপলক্ষে নাতিনীর সহিত তাঁহার আর একবার বিবাদ বাধিল। সে বেশী ব্যয় করিতে দিবে না, পিতামহীর ইচ্ছা গ্রামস্থ সমস্ত লোকগুলি খাওয়ান। সাধক বাঁচিয়া থাকিতেই দুই বৎসর হইতে এ সব কার্য্য যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এখন এই উপলক্ষে সে কার্য্যটা একবার করা উচিত। কিন্তু নাতিনীর সঙ্গে বিবাদে তিনি পারিয়া উঠিলেন না,—মাত্র দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া উপনয়ন সারিতে হইল।

ইহারও বৎসরাধিক কাল গত হইলে যেদিন মায়া হাসিমুখে তাহার ঠাকুরমাতাকে জানাইল যে সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এইবার দেবী প্রতিষ্ঠার ব্যয় সংকুলানের মত অর্থ জমিলেই তাঁহার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা এবং শঙ্করকে তাঁহার সেবাইত করিয়া দিতে পারিলেই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে, সেদিন ঠাকুরমাতা রাত্রে ঘুমাইতে পারিলেন না। কেমন একটা অশান্তি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। নিকটেই পৌত্র শঙ্কর শুইয়াছিল, সে এক সময়ে চেতন হইয়া পিতামহীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিল "ঠাকুরমা আজ কি ঘুমাওনি ?"

"না ভাই,—কি জানি কেন ঘুম আসিতেছে না !"

বালক একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আমি বলিব কেন ঘুম আসিতেছে না ?"

"তুমি বলিবে ? আচ্ছা বল।"

ঠাকুরমাতার নিকটে সরিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লইয়া তাহার দিদি যদি চেতন হইয়া থাকে যেন সে শুনিতে না পায় এমনি মৃদু স্বরে শঙ্কর বলিল "কালীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হবে যে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঠাকুরমা উত্তর দিলেন "তাতে ভাবনা কিসের ভাই ?"

"ভাবনা নয় ? আমায় যে দিদি উহার সেবাইত করিবে বলিল। আমি কিন্তু উহার সেবাইত কিছুতেই হইব না—তা তোমায় বলিয়া রাখিতেছি ঠাকুরমা।—ও ঠাকুরটাকে আমার একটুও ভাল লাগে না!—আমায় সেবাইত করিলে আমি কিন্তু পলাইয়া যাইব।"

নাতিনীর ভয়ে পৌত্রকে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পিতামহী বলিলেন "চুপ্ চুপ্।"

মাসের পর মাস যত অতিবাহিত হইতে লাগিল পিতামহী ও পৌত্রের এই অশান্তি ক্রমে আশঙ্কার আকারে পরিণত হইতেছিল! মায়ার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। সে ক্রমে

সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ হইতে সংক্ষেপতর করিয়া এবং নানা উদ্যোগে কিরূপে সেই দিনটিকে নিকটবর্ত্তী করিয়া আনিবে সেই চেষ্টায় দিনরাত নিযুক্ত থাকিত। সহসা একদিন পিতামহী রুক্ষমূর্ত্তিতে তাহাকে বলিলেন "ঐ রাক্ষসী তোর পিতাকে খাইয়াছে, আবার তুইও উহার গর্ভে শঙ্করকেও ডালি দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিস্ দেখিতেছি। আজ সাত আট দিন যে শঙ্করের জ্বর ছাড়িতেছে না তাকি তোর গ্রাহ্যে আসিতেছে না? তুই কি শঙ্করকে বাঁচিতে দিবি না?"

মায়া মৃদু স্বরে বলিল "তুমি তো বৈদ্য ডাকাইয়াছ তাহাকে নিয়মিত ঔষধ পথ্য দিয়া যত্নে রাখিয়াছ। আমি এর বেশী আর কি করিব বল।"

"কি করিবি? এখনো তুই ঐ রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছিস? তোর মনে কি ভয় হইতেছে না? এখনো যদি ভাল চাস্ এ ইচ্ছা মন হইতে দূর করিয়া দে। নহিলে দেখিস্—"

মায়া সজোরে ঠাকুরমাতাকে ধমক দিয়া উঠিল "তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান মাত্র নাই? শঙ্করের সাক্ষাতে এই রকম কথা বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছ? তাহার বাপের প্রতিষ্ঠিত দেবীর সম্বন্ধে কুসংস্কার তার মনে ঢুকাইয়া দিতেছ! শঙ্করের কি হইয়াছে! সামান্য জ্বর দুদিনেই সারিয়া যাইবে কিন্তু তোমার এই কুশিক্ষার প্রভাব চিরদিন তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। বাপের ইচ্ছায় যাহারা জীবন মন নিযুক্ত করিতে না পারে তাহারা কি পুত্রকন্যার উপযুক্ত? আমাদের দুই ভাইবোনের জীবন যে তাঁর কার্য্যেই উৎসর্গ করা আছে তাকি তুমি জান না?"

ঠাকুরমা নিঃশব্দ হইয়া গেলেন। একবার কেবল মৃদুভাবে বলিলেন "হ্যাঁ—নিজের যা করিয়াছিস্, ভাইটারও তাই করিতে চাস্!"

"তাহাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়—তারই বা আমরা কি করিতে পারিব। কেবল দেখিতে হইবে যথাসাধ্য নিজেদের ত্রুটী না হয়। শঙ্করের জীবনে এই দেবীর সেবাইত হওয়া ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য নাই।"

অসুস্থ শঙ্কর সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "ঠাকুরমা আমার কাছে এসে ব'স। আমি আর বাঁচব না।"

"বালাই যাদু আমার।" বলিয়া পিতামহী নাতির নিকটে সরিয়া গিয়া তাহাকে প্রায় বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে নাতিনীর দিকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "ভাইকে চাহিস্ তো এখনো ও-সকল ত্যাগ কর।"

মায়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে ক্ষীণ স্বরে বলিল "কিছুই চাহিবার আমার অধিকার নাই ঠাকুরমা।" তাহার পরে আবার একবার বলিল "শঙ্করকে এমন ভয় পাইতে দিও না ঠাকুরমা, ইহার ফল ভাল হইবে না।"

পিতামহীকে মায়া শেষ চেষ্টার মত মুখে একথা এখনো একবার বলিল বটে কিন্তু ইতি-পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল যে ঐ পাষাণ মূর্ত্তির উপর তাঁহাদের যে কিরূপ ভাব জন্মিয়াছে তাহা আর সংশোধনের উপায় নাই। শঙ্করের এই অসুস্থতায় সে বিশ্বাস তাঁহাদের আবার দৃঢ়ীভূত হইতেছে। শীঘ্র সে সুস্থ না হইলে মায়ার জীবনের এই একমাত্র উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করা কঠিন হইয়াই দাঁড়াইবে।

দেবীপ্রতিষ্ঠার আর বেশী দিন দেরী নাই, কিন্তু শঙ্করের ব্যাধি যে দিন দিন দুর্দ্দম হইয়াই উঠিতেছে। মায়া কোন্ দিকে মন দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কাহারো হাতে শঙ্করের ভার দিয়া সে যদি নিযুক্তভাবে কয়েক দিন মাত্র চেষ্টা করিতে পাইত তাহা হইলে সম্মুখের আগত শুভ দিনেই সে তাহার পিতৃ-আদেশ সম্পন্ন করিয়া লইয়া তখন শঙ্করকে কোলে লইয়া বসিয়া দেখিত কে তাহার শঙ্করকে কাড়িয়া লইতে পারে! কিন্তু কে এমন আছে? কাহার হাতে সে নির্ভরের সহিত শঙ্করের ভার দিতে পারিবে?

পিতামহী বলিলেন "ওরে এদিকের কবিরাজ তো সকলকেই দেখানো হইল, শুনি রাধানাথ নাকি এক জন অসাধারণ চিকিৎসক হইয়া উঠিয়াছে। যদিও আমাদের তাহাকে ডাকিবার মুখ নাই—কিন্তু সে কি এ বিপদের দিনে সেকথা মনে রাখিবে?"

তিনি মনে করিয়াছিলেন ইহা লইয়াও হয় ত নাতিনীর সহিত তাঁহার মতান্তর হইবে, হয় ত সে একথায় রাজীই হইবে না, যদিই হয়, সে বহু সাধ্য সাধনায়! কিন্তু ঠাকুরমা বিস্মিত

হইয়া শুনিলেন,—মহামায়া বলিল "না, তা তিনি কখনই মনে রাখিবেন না। তাঁহাকেই ডাকিতেছি।" যেন একথা সে নিজেই স্থির করিয়াছিল। ঠাকুমা কিন্তু ঈষৎ সংশয়াচ্ছন্ন ভাবে বলিলেন:—"আসিবেন বৈকি, আমি পাল্কী ও লোক পাঠাইয়াছি।"

পরদিনই রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মর্ম্মাহতা ঠাকুরমাতাকে কুণ্ঠা প্রকাশের অবসর মাত্র না দিয়া বালকের চিকিৎসার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিল। মায়া তখন পুরা-উদ্যমে দেবী প্রতিষ্ঠার কার্য্যে লাগিয়া পড়িল, সম্মুখের শুভদিন না পার হইয়া যায়।

ভ্রাতার ভার লইবার জন্য স্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া মায়া মুখে আর তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলে নাই বা ক্রটী স্বীকারের জন্য নিকটেও যায় নাই। স্বামীও কর্ত্তব্যমাত্র করিয়া যাইতেছিলেন। মায়া তাহার নিকটে আসিল না দেখিয়া তিনিও তাহার নিকটস্থ হন্ নাই। সেদিন রাত্রে নিবিষ্ট মনে কর্ম্ম করিতে করিতে মায়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল স্বামী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

স্বামীর শুষ্ক মুখের দিকে না চাহিয়াই মায়া নতমুখী হইল। সেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার চিরজীবনের ঈপ্সিত কার্য্যাবসানের একটা স্নিগ্ধ বায়ু-হিল্লোল যেন তাহার অন্তরের মধ্যে বহিয়া গেল। এইবার—এতদিনে তাহার মুক্তি বুঝি নিকটে। শঙ্করকে দেবীর সেবাইত করিয়া দিয়া তাহার পরে—মায়া নত নেত্রে স্বামীর পাদুকাহীন শুভ্র পা দু'খানির পানে মুক্ত স্থির নেত্রে চাহিয়া মর্ম্মর প্রতিমার মত স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

রাধানাথ ডাকিল "মহামায়া।" তাহার এ আহ্বানে মায়া চমকিয়া উঠিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিল। য'দিন তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে তিনি তো 'মায়া' ছাড়া কোন দিন পুরা নাম বলেন নাই।

"মহামায়া,—আমি আবার একটি ভিক্ষা লইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।"

'মহামায়া'—'ভিক্ষা'! মায়া বিমূঢ়ার মত ক্ষীণ স্বরে বলিল "কি?"

"দেবী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতে নিবৃত্ত হও।" মায়া তখনো মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল দেখিয়া সে আবার বলিল "কথাটি রাখিবে তো?" মায়া এইবার প্রশ্ন করিল "কেন?"

"অনুরোধ।"

"কিন্তু তবু কেন ?"

"তাহা শুনিবার দরকার নাই, শুধু কথাটি রাখ।"

মায়া এইবার শক্ত হইয়া বসিল। "তোমরা কি ভুলিয়া যাইতেছ ! এযে আমার অসাধ্য। শঙ্করকে দেবতার সেবাইত করিলে তবে যে আমি মুক্তি পাইব।"

"সে মুক্তিতে তোমার আর কিসের প্রয়োজন মহামায়া ! আর কেন সে কথা ? এখন শঙ্করকে—যে ক'দিন সে বাঁচিয়া থাকে তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দাও।"

"যে ক'দিন সে বাঁচিয়া থাকে ? তবে—তবে কি শঙ্কর বাঁচিবে না ?"

রাধানাথ মৌন হইয়া রহিলেন। মিথ্যা স্তোক্ দিতে আর তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। বরং মনে হইল এ সংবাদে যদি তাহার দার্ঢ়্যতা ভাঙে তো ইহা বোঝানই উচিত। সবেগে সজোরে স্বামীর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া চিরসম্বৃতা মায়া আর্দ্রকণ্ঠে প্রায় চেঁচাইয়াই উঠিল—

"সত্য কি এ কথা ? শঙ্কর আমার শঙ্কর বাঁচিবে না ? সত্য !"

স্বামীর শুশ্রূষায় কতক্ষণ পরে যে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল ত'হা মায়া জানে না,—কিন্তু বাকী সমস্ত রাতটা সে জড়ের মতই চাহিয়া রহিল মাত্র। প্রভাতে তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া রাধানাথ সপ্রশ্ন নয়নে তাহার পানে চাহিলেন প্রাণহীন শব যেন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল "এই দিনেই প্রতিষ্ঠা সারিতে হইবে। শঙ্কর একদিনের জন্যও পিতার আদেশ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করুক।"

রাধানাথ নূতন করিয়া আবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

কোন প্রকারে উদ্যোগ হইয়া গেল। কতক বিষয়ে মায়ারই মত লোকের এ জগতে বড় অভাব নাই তো,—তাহারাই সাহায্য করিতেছিল। প্রতিষ্ঠার দিন প্রত্যূষে স্নানান্তে মায়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াই বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে সজ্জিত নানা উপহার দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে শ্যামা সমন্বিত ঘটের উপরে বেদীস্থ দেবী মূর্ত্তি নাই ! শূন্য পীঠ হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে।

ক্রমে লোকসমাগম হইয়া মহা কোলাহল বাধিয়া গেল। কিন্তু সে কোলাহলে একটুও বিচলিতা না হইয়া মায়া ধীরে ধীরে মন্দির সোপান হইতে নামিয়া আসিয়া শঙ্করের ঘরে

প্রবেশ করিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া ঠাকুরমাতা উঠিয়া ভয়ে গৃহান্তরে পলাইয়াছিলেন। রুগ্ন শঙ্কর মুখ ঢাকা দিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিল। রাধানাথও তটস্থ ভাবে একটা কিছুর যেন প্রস্তুত হইয়া মহামায়ার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু মায়া কোন' দিক না চাহিয়া একেবারে শঙ্করের শয্যায় বসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। "শঙ্কর—শঙ্কর—মাণিক আমার—তুমি বাঁচ—তুমি ভাল হও,—আর ভয় নাই দাদা। সে রাক্ষসী আপনিই আমাদের মুক্তি দিয়াছে। এইবার তুমি ভাল হইয়া উঠ।"

(৫)

তথাপি শঙ্কর বাঁচিল না। কয়েক দিন মাত্র নিজের স্বাধীন জীবনকে ভোগ করিয়া লইয়া বালক ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। বহু যত্নে বহু চিকিৎসায়ও কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

পিতামহী ও মহামায়াকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিতে রাধানাথ আরও দিনকয়েক সেখানে রহিল। স্থির হইল বিষয়সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের দুই জনকে রাধানাথ কাশী রাখিয়া আসিবে। মায়া নিজের একটী ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহারা যাইবার পূর্ব্বেই মন্দিরটা যাহাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, সে-বিষয় রাধানাথ যেন সচেষ্ট হয়। মাথা নত করিয়া রাধানাথ তাহা স্বীকার করিল। কয়েক দিনের মধ্যেই সাধক চন্দ্রশেখর শর্ম্মার বাস্তু-ভিটায় উপরিস্থ তাঁহার বহু আশা বহু যত্নে নির্ম্মিত মন্দিরের গাত্রে হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল।

পিতামহী বলিলেন "আর আমার কাহাকেও অবলম্বন করিতে ইচ্ছা নাই,—মায়ার যদি জগতে কোথাও স্থান থাকিত—উহাকেও আমি সঙ্গে লইতাম না।"

পিতামহীর এ খেদোক্তিতে রাধানাথ কোন উত্তর দিল না কিন্তু মায়া প্রশ্ন করিয়া বসিল "এ-কি তোমার অন্তরের কথা ঠাকুরমা ?"

"হ্যাঁ মায়া এ আমার অন্তরেরই কথা।"

"তুমি একা থাকিতে পারিবে ?"

ঠাকুরমা ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমাকেও কি তুই এখনো একা থাকার ভয় দেখাস্ ?—কিন্তু মিথ্যা আলোচনা,—জগতে তোর আর স্থান কোথায় ?"

"কেন ঠাকুরমা, আমার শ্বশুরবাড়ীতে !"

শ্বশুরবাড়ী !—একথা তুই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলি ?"

"কেন পারিব না ? উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছাখ—এই রকমই কথা আছে কি না !"

"জানিস্ রাধানাথ বিবাহ করিয়াছে !—তাহার সন্তান হইয়াছে ?"

"কেন জানিব না—কিন্তু তাহাতে কি ? তুমি যখন একা থাকিতে পারিবে বলিতেছ তখন আমি সেইখানেই যাইব জানিও।"

পিতামহী ক্ষণকাল বাক্‌শক্তিহীনা হইয়া থাকিয়া পরে সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন রাধানাথ ধীরে ধীরে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "মায়া এ কি সত্য বলিতেছ ?"

কাতরতার হাসি হাসিয়া মায়া বলিল "যেভাবে আমার মুক্তি আমার প্রার্থনার মধ্যে ছিল সেভাবে না হইলেও এখন ত আমি স্বাধীন, তবে কেন এ কথায় অবিশ্বাস করিতেছ !"

"অবিশ্বাস নয় কিন্তু না মায়া,—তাহাতে আর কাজ নাই।"

"তোমার স্ত্রী পুত্রকে এক তিলের জন্যও অসুখী করিব না। মনে করিয়া ছাখো—আমি কি বলি নাই যে তোমার গৃহিণীর দাসীত্ব পদ ছাড়া বেশী কিছু দাবী আমি করিব না।"

ক্ষণকাল নির্ব্বাকভাবে থাকিয়া রাধানাথ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "কিন্তু সে গৃহ যে জান সে গৃহের তুমি কত কালের আকাঙ্ক্ষিত গৃহদেবী ! সেখানে দাসী বেশে ?—না মায়া না !"

স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া মায়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "ভিক্ষা দাও,—আমাকে এটুকু স্থান তোমায় দিতেই হইবে।"

পিতামহী রাধানাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "তাই যাক্ ভাই, ওর কষ্ট হইবে না, তুমি অমত করিও না। তাদেরও ওর দ্বারা অসুখী হবার সম্ভাবনা নাই, তাহা তো বুঝিতেছ। তোমার গৃহের গৃহ-দেবতার সেবায় উহাকে নিযুক্ত রাখিও - ও-ও ভাল থাকিবে—আর আমি,—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "হ্যাঁ, আমার কাছে থাকার অপেক্ষা তোমার গৃহে মায়া দাসী হইয়া থাকিলেও আমি এখনো শান্তি পাইব।"

মাথা হেঁট করিয়া রাধানাথ বলিল "তবে তাহাই হোক্।"

ইহাদের ব্যবস্থা করিতে যতদিন লাগিল তাহার মধ্যে রাধানাথ মাঝে মাঝে কিছু দিন

নিজ গৃহে গিয়া সেখানেরও বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছিল কেন না ঠাকুরমাতাকে কাশীতে রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে তাহার কয়েক মাসই অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা। তখন নৌকা ভিন্ন অন্য যান তো ছিলনা। স্থির হইল রাধানাথের গৃহে মায়াকে রাখিয়া ঠাকুরমা নাতিজামাতার সহিত তীর্থযাত্রা করিবেন। তাহাই হইল। তিনজনে একটা সন্ধ্যায় রাধানাথের গৃহে পৌঁছিলেন।

ঠাকুরমার শ্রমলাঘবান্তে তাঁহাকে শয্যায় শোওয়াইয়া মায়া তাঁহার পদতলে শুইয়া পড়িতেছে, এমন সময়ে স্বামী আসিয়া তাহাকে ডাকিল "মায়া"।

"কেন।" বলিয়া মায়া উঠিয়া বসিল।

"এদিকে এসো।"

ঠাকুরমাতা বলিলেন "উহাকে লইয়া গিয়া তোমার স্ত্রীপুত্রের সহিত পরিচিত করিয়া দাও তাহারা যে সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া রহিল।"

"সে পরিচয় পরে হইবে, আগে এ গৃহের গৃহদেবতাদের প্রণাম করিবে চল।"

"চল" বলিয়া মায়া স্বামীর সঙ্গে চলিল। রজনীর অন্ধকারেও এই গৃহ এবং ইহার দেব গৃহটিকে তাহার স্বপ্নের মতই মনে পড়িতেছিল। মনে পড়িবার কথা নয় তবুও মায়া দেখিল সে ভুলে নাই।

লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়াই মায়া সহসা শিহরিয়া উঠিল একি গৃহের অন্য এক দিকে নব নির্ম্মিত বেদীর উপরে ও কি মূর্ত্তি। সেই ঘন-ঘোর-মেঘ-নির্ম্মিতা অপূর্ব্ব-দর্শনা ক্ষুদ্র পাষাণময়ী-ই মা? সেই কৃষ্ণ আভা মায়ার হৃদয়ে চকিতে যেন বজ্রের করাল কালাগ্নির মতই প্রবেশ করিল। সে প্রায় চীৎকার করিয়াই স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল "একি! এ কে! এখানেও এ কাহাকে দেখিতেছি!"

"তোমারই জন্য মায়া। তুমি তো জানিয়াছ শঙ্কর ও ঠাকুরমাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমিই তোমার সেই চিরদিনের আরাধ্যাকে সরাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইতে দিই নাই। কিন্তু তোমার দেবীকে আমি তো ফেলিতে পারি না মায়া, তাই নিজের ঘরেই আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তুমি এঁর সেবা করিতে পাইলে এখনো বোধহয়—"

"যে বাবার সেবা লয় নাই শঙ্করের সেবা লইলনা সেই পাষাণিকে আবারও আমি সেবা

করিব ? এইজন্য সে যাবার সেই বজ্রপঞ্জরের তুল্য মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তাঁহার বংশনাশ করিয়া আবার ও আমার সেবা পাইতে এখানে আসিয়া বসিয়াছে ? কি চায় সে এখনো আমার ! আর তাহাকে দিবার আমার কিছুই নেই। উহার মুখ আমি আর তো দেখিতে পারিব না। না—না কিছুতেই না। চল হাঁ৷ আমায় এগৃহ হইতে ঠাকুরমার কাছে তাঁহার সঙ্গে কাশী লইয়া চল। আর না, এখানেও না।”

“মায়া স্থির হও, চল অন্যত্র যাই। যদি আমার ভুলই হয়ে থাকে নাই বা তুমি উহার নিকটে আসিলে।—চল—”

“হ্যাঁ চল,—কিন্তু একেবারে কাশীতে। আর এ গৃহেও নয়। এখনি ঠাকুরমাকে ডাক—”

“মায়া—মায়া !”

দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া মায়া স্বামীর পায়ের উপর পড়িল “এজন্মে নয়—জন্মান্তরে।—ঠাকুরমাকে ডাক !”

“মায়া, পাষাণি !—”

“হ্যাঁ,—ঐ পাষাণীই আমার রক্তমাংস সব পাষাণ করিয়া দিয়াছে। ও-ও পাষাণ ছাড়া কিছু নয় ! কোথায় ওর চিন্ময়ীত্ব ! শুধুই পাষাণ ! আমিও তাই পাষাণী হইয়া গিয়াছি।”

শ্রীনিরুপমা দেবী।

জুলুম।

তোমার ভাণ্ডারেতে কোন ধনের
নাইক অনটন
তবু লুটবে তুমি লুটবে রাজা
কাঙ্গালের এই মন ?

ঐটুকু যার ধনের পুঁজি
দীনের ঘরের ধনটি খুঁজি
অমর ক'রে রাখ্‌বে তুমি
এই তোমারি পণ !
লুট্‌বে তুমি লুট্‌বে রাজা
কাঙ্গালের এই মন ?

ছোট বড় সব না হ'লে
অমনি তোমার ক্ষোভ,
তাই অভাগীর এই মনের 'পরে
এতই তোমার লোভ।

যার মূল্য কিছুই নাইক বাঁধা
শুধুই ধূলা শুধুই কাদা
অমূল্য ঐ সোহাগ তারে
কর্‌বে সমর্পণ।
লুট্‌বে তুমি লুট্‌বে রাজা
কাঙ্গালের এই মন ?

খিলাফৎ।

(২)

ত্রয়োদশ কন্‌ষ্টাণ্টাইন্ যেমন ইচ্ছা করিয়াই সিংহাসনে অধিরোহণের সময়ে তুরষ্ক সম্রাট্ অমরথের সম্মতি লইয়া পূর্ব্ব সাম্রাজ্যকে তুরষ্কের অধীন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ১৮৪০ অব্দে তখনকার সুলতান স্বকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিলেন। সেই অব্দে তাঁহার সামন্ত ইজিপ্টের মহম্মদপাশা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, সম্রাট স্বকীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতে সাহসী না হইয়া ইংলণ্ড, রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া এবং প্রুসিয়া এই চারি রাজশক্তিকে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করিলেন অর্থাৎ তাঁহারা যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং পূর্ব্বের মত স্বেচ্ছাক্রমে সাম্রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আর রহিল না। ইহার পর হইতে প্রকৃত রাজক্ষমতা উক্ত শক্তিচতুষ্টয়ের হস্তগত হইল এবং ইউরোপে মুসলমান শক্তির স্থিতি ইউরোপীয় খৃষ্টীয় শক্তিগুলির উপর নির্ভর করিল।

কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যে তুরষ্ককে ইজিপ্টের পাশার অভিপ্রেত অঙ্গচ্ছেদ হইতে নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন এমন নহে। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে মুসলমান শক্তি চলিয়া গেলে খৃষ্টিয়ান রাজগণের রাজনীতিক ক্ষমতা অন্তর্হিত হইবে ইহা তাঁহারা অনুভব করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে পাশা যদি সুলতানকে কনষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে বিতাড়িত করেন তাহা হইলে তিনিও অচিরে তাঁহাদেরই মধ্যস্থ কোন রাজকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবেন, এবং তাহা হইলে সেই রাজাই ইউরোপের অন্যান্য রাজার প্রতি আদেশ চালাইবেন, যেহেতু কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ এমনই ক্ষমতাপ্রদ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত যে সকলেই মনে করিত যে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ যাঁহার অধীন হইবে তিনিই সর্ব্বোপরি অধিরাজ হইবেন। রুশিয়ার সম্রাট মহামহিম পিটরের লোলুপ দৃষ্টি চিরদিনই কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে ছিল। তিনি তাঁহার উইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের জন্য এই উপদেশ লিখিয়া গিয়াছেন—

"কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ এবং ইণ্ডিয়া অধিকার করিবার জন্য যত প্রকার চেষ্টা করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে (কেন না যিনি এই দুই স্থানের অধিকারী হইবেন তিনি সমস্ত পৃথিবীর উপরে প্রভুত্ব করিবেন।) তুরষ্ক ও পারস্যের মধ্যে যাহাতে অবিরত সমর হয় সেইজন্য উত্তেজনা

করিতে হইবে ; কৃষ্ণসাগরের উপর বড় বড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে ; অল্পে অল্পে সেই সমুদ্র শাসনে আনিতে হইবে ; বল্টিক সমুদ্রেও সেইরূপ অল্পে অল্পে অধিকার বিস্তার করিতে হইবে,—আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বল্টিকসাগর দুই প্রকারে আমাদের সহায় হইবে ; পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করিতে হইবে ; সম্ভব হইলে সীরিয়ার মধ্য দিয়া লিভাণ্টের লুপ্ত বাণিজ্য পুনঃ স্থাপন করিবে ; ইণ্ডিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে কেন না তাহা পৃথিবীর ভাণ্ডার।··· তুরস্ককে ইউরোপ হইতে দূর করা যে মঙ্গলজনক তাহা অষ্ট্রিয়ার রাজবংশকে বুঝাইয়া দিবে এবং ইউরোপের পুরাতন রাজগণের মধ্যে কলহ উৎপাদন করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ জয়ের সময়ে অষ্ট্রিয়ার রাজাকে জিতরাজ্যের কিছু ভাগ দিয়া তাহার অন্তর্বিবাদ প্রশমিত করিবে। তাহার পর সেই প্রদত্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা যাইবে।"

ইহাই ছিল সেই মহা খৃষ্টিয়ান রাজার সাধু-ইচ্ছা ও উপদেশ !

পিটার স্বয়ং তুর্কীদিগের নিকট হইতে আজফ্‌সাগর কাড়িয়া লইয়া নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে মহারাণী ক্যাথারাইন তাঁহাদের নিকট হইতে ক্রিমিয়া কাড়িয়া লইলেন। ১৮১২ অব্দে প্রথম আলেকজাণ্ডার মল্ডেভিয়া (Moldavia) ও বেস্ আরেবিয়া (Bess Arabia) অধিকার করিলেন। পরে নিকোলাস কৃষ্ণসাগরে ও ডার্ডানেল্‌সে (Dardaneles) এবং ডানিউব নদীতে স্বাধীনভাবে পোত প্রেরণের অধিকার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি অতিলোভ হেতু মল্ডেভিয়া হারাইলেন যাহার ফলে ক্রিমিয়ার সমর উপস্থিত হইল।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি রুশিয়ার দুরভিসন্ধিটা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি যখন সেণ্ট্‌হেলীনাতে কারারুদ্ধছিলেন তখন সেই কথা তাঁহার কারাধ্যক্ষ সার হাড্‌সন লো (Sir Hudson Lowe) কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সুতরাং খিলাফৎকে অন্তরিত করিবার চেষ্টা যে এখনই নূতন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে। অনেক দিন হইতে তাহা চলিয়া আসিতেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে খৃষ্টের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে দানিয়েল (Daniel) লিখিত পুস্তকে এবং বাইবলের শেষ পুস্তক প্রথম শতাব্দীতে লিখিত "প্রকাশিত বাক্যে" তুরস্ক কখন রোম সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিবে এবং কখন স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র হারাইবে তদ্বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী

আছে। বিশপ্ নিউটন্ এবং আরও অনেক বাইব্ল অধ্যয়ননিরত পণ্ডিত মনে করেন যে ড্যানিয়েলের ১১ অধ্যায়ে নেবুখদ্নিজারের (Nebuchadnezzar) সময় হইতে পারস্য, তুরস্ক ও মিশরে কি কি ঘটনা হইবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। "প্রকাশিত বাক্য" পুস্তকের ৯ম অধ্যায়েও তুর্কীদিগের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ৯ম অধ্যায়ের ৫ম বচনে আছে যে পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ পাঁচ মাস অর্থাৎ ১৫০ দিন চলিতে থাকিবে এবং ১৫ বচনে আছে যে সেই ১৫০ বৎসরের পর এক হোরা এক দিন এক মাস এবং এক বৎসর তুরস্কের স্বেচ্ছাতন্ত্র অব্যাহত থাকিবে। বাইব্লের অন্য এক স্থানে আছে যে বাইব্লের যে সকল ভবিষ্যৎ-বাণীতে দিনের উল্লেখ আছে সেই সেই স্থলে দিনের অর্থ বৎসর বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রথমকার ১৫০ দিনে ১৫০ বৎসর ধরিয়া লইতে হইবে।

১৫ বচনের হোরা $= \frac{১ \text{ দিন}}{২৪} = \frac{১ \text{ বৎসর}}{২৪} =$ ১৫ দিন। এক দিন = এক বৎসর। এক মাস = ৩০ দিন = ৩০ বৎসর। এক বৎসর = ৩৬০ দিন = ৩৬০ বৎসর সুতরাং ১৫ দিন + ১ বৎসর + ৩০ বৎসর + ৩৬০ বৎসর = ৩৯১ বৎসর ১৫ দিন। এখন দেখা যাউক ভবিষ্যৎবাণী কিরূপে পূর্ণ হইল। ১২৯৯ অব্দের ২৭ জুলাই বাসরে তুর্কীরা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ আক্রমণ করে। সুতরাং তাহার পর ১৪৪৯ অব্দের ২৭ জুলাই বাসরে ১৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। তখন হইতে ১৮৪০ অব্দের ১১ অগষ্ট পর্য্যন্ত ৩৯১ বৎসর ১৫ দিন হয়। এই ১১ অগষ্টেই তুরস্কের সুলতান স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করিয়া খৃষ্টিয়ান রাজাদিগের মতানুসারে চলিতে সম্মত হন। আমি আমার এই প্রবন্ধ Thoughts on Daniel এবং Thoughts on the Book of Revelation নামক দুইখানি পুস্তক হইতে সংকলন করিলাম। এই পুস্তকদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রকৃত কি না জানি না। এ বিষয়ে সাহিত্যিক আন্দোলন (academical discussion) হইলে বোধহয় মন্দ হয় না।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

টবের অশথ।

—:০:—

একটী অশথ গাছের চারাকে টবে বসানো হইয়াছিল। দশ বৎসরেও সে সামান্য ফুলগাছ অপেক্ষা অধিক বাড়ে নাই। সেইটীকে লইয়াই এ কবিতাটী লেখা হয়।

রুপেছে এক অশথ তরু ক্ষুদ্র মাটীর টবে
দশটী বছর আছে আরও দশটী বরষ র'বে।
কোথায় তাহার সে উচ্চ শির, কোথায় সবল শাখা,
ক্ষুদ্র কুসুম-পাদপ সম যায় যে আজি দেখা।
যখন চাহি তাহার পানে আমার মনে হয়,
রুদ্র এমন ক্ষুদ্র হয়ে কেমন করে রয়!
এ যেন গো 'ইন্দ্র'রাজা সংগ্রামেতে হারি'
মালীগিরি কর্‌ছে এসে রাবণ রাজার বাড়ী।
'মায়া'বাদের সাধ নাহিক অন্নাভাবের টানে,
'শঙ্কর' হায় লিখ্‌ছে যেন 'ঋজুপাঠে'র মানে।
কোথায় মানস অলকা আর সাধ্য নাহি যেতে
কালিদাসের কাট্‌ছে জীবন শ্রাদ্ধেরি শ্লোক গেঁথে
কোথায় গেল নন্দবংশ, চন্দ্রগুপ্ত রাজা,
চাণক্য গোমস্তা হ'য়ে শাসছে যেন প্রজা।
ক্ষুদ্র গ্রামের পাঠশালাতে ছাত্রদি'কে লয়ে
নেপোলিয়ন শেখাচ্ছে ড্রিল গুরুমশায় হয়ে।
এসব দেখে কাহার নাহি চক্ষু ভাসে জলে
রইল 'ভারত' 'বিদ্যা' সেজে 'গোপাল উড়ে'র দলে।

—

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মিলন-পথে।

-:*:-

"খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
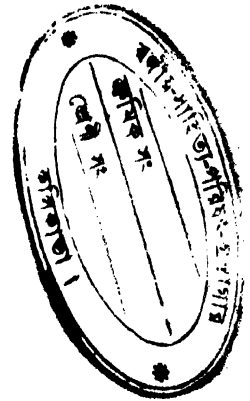
এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দু'জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।"

এইখানেই সমস্যা। বিধাতাপ্রদত্ত প্রবল অনুরাগ, অনুরক্তি সত্ত্বেও মিলন-পথে দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ-প্রাচীর এইটাই। 'দু'জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায়।' বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তির অভাবে দুজনেই দুর্ব্বোধ! অন্তরায় নহে—ক্ষণভঙ্গুর খাঁচা, অবরোধের বাহিক-প্রাকার। অন্তরায়—অন্তরে,—মনকেন্দ্রে! তাহাদের আজীবনের অভ্যাস স্বভাবকে এমনই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। পুরুষের প্রার্থিত পৌরুষ; প্রকৃতি

হারাইয়াছে শক্তি, সাহস, সত্বার অনুভূতি পর্য্যন্ত ! উভয়ের মনের গতি, ধারণা বিভিন্ন; 'দোহার ভাষা দুই মত।' এ অবস্থায় খাঁচাই ভাঙ্গুক, আর বন্ধনই টুটুক, মিলন-সাফল্যের আশা কোথায় ?

দুইটিই পাখী, সমজাতীয়, আসঙ্গলিপ্সা সুতরাং বর্ত্তমান—এই পর্য্যন্ত ! কিন্তু এক নহে ত তাহারা। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, বিভিন্নভাবে ভাবিবার অধিকার আছে উভয়েরই, হ'ক তাহা উন্নত বা অপকৃষ্ট, মনের সে ক্রিয়ার প্রভাব অজেয় ;—আসঙ্গলিপ্সার সহায়তায়, তাহাকে অবজ্ঞা অগ্রাহ্য করিবার প্রবৃত্তি যে ক্ষেত্রে বিরোধ তথায় অবশ্যম্ভাবী। বুঝাইব, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব না—এ যদি থাকে লক্ষ্যে লক্ষ বৎসরের প্রয়াসও ব্যর্থ হইবে সেখানে। 'তুমি আমার' এ-উক্তি নিরর্থক, বক্তা যেখানে মনপ্রাণে অনুভব না করিয়াছে,—'আমিও তোমার !' 'বনের গানই' চরম নহে, নহে প্রাণের ভাষার নিখুঁত অভিব্যক্তি। হইতে পারে 'শিখানো বুলি' নিকৃষ্ট,—পরের কথা, অন্যের নিকট হইতে ধারকরা ভাব—তথাপি তাহাতেই বক্তার হৃদয়, ভাব যতখানি ঝঙ্কৃত, উৎসারিত—তাহার সত্বার যতটুকু বিকাশ—তাহা গণনায় না আনিয়া, আত্মবিভোর যদি আপনভাবে বুঝিতে চায় তাহাকে, প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, তাহার মূলচ্ছেদনে মিলন যদি প্রার্থিত হয়, প্রাণের স্পন্দনের সম্ভাবনা কোথায় সেখানে ! প্রাণহীন দৈহিক সৌন্দর্য্যের স্পৃহা ! পণ্ড সমস্তই।

'আকাশ ঘননীল'—অবাধ অনন্ত, 'কোথায় বাধা নাহি তার'—পূর্ণ স্বাধীনতা—'আপনা ছাড়ি দাও মেঘের মাঝে একেবারে'—এ-সুখের তুলনা নাই ! জীবনকে উপভোগ করিবার এ মহা সুযোগ ত্যাগ করিয়া পঙ্গু হইও না কেহ ! স্বাধীন বন-বিহঙ্গের জীবনযাত্রার মনোমদ রঙিন সে কল্প-জগৎ ! ধন্য বনের পাখী ! কিন্তু শূন্যে কোথায় জীবনোপকরণ—'মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই !—' খাঁচার পাখীর এ-প্রশ্নের উত্তর উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। আশ্রয়কে, জীবন-উপকরণকে উপেক্ষা করিয়া উধাও হইলে জীবন রক্ষা হইবে কয় দিন ! স্বাস্থ্যহীন অন্ধকার গৃহকোণ,—আশ্রয়হীন অনন্ত আকাশ যতই সুখদ, যতই আরামদায়ক

হ'ক না কেন, জীবন-মূল অস্তিত্বহীন সেখানে। আরামের আনন্দে মূলে ভুল ঘটাইলে মিলন ত দূরের কথা—প্রাণ লইয়াই সমস্যা!

প্রাণের মূল্য, হৃদয়ের দাবী সর্ব্বোপরি। তোমারও যেমন, তাহারও তেমনি। তাহার অমান্যে মঙ্গল নাই কাহারও। সে কিছু নয়, তুমি সব, এ-মত, এ-নীতি অচল। স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিতে হইবে সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষণ। বলিতে দাও যাহা তাহার বলিবার আছে! বন্ধন হ'ক সহানুভূতি! তাহার ভাবে বুঝিয়া বুঝাইবার চেষ্টা কর পূর্ণ প্রেমানন্দে! যদি পাইতে চাও, দান কর তাহার শতগুণ; যদি বুঝ আছে তোমার প্রচুর,—তোমার প্রাচুর্য্যে মহত্বে তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া ফেল; তাহাতে যাহা গ্রহণীয় গ্রহণ কর,—সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিবার শক্তি দাও তাহাকে,—বল প্রয়োগে নহে—বিনিময়ের আনন্দে! সহানুভূতিহীন স্বাতন্ত্র্য যেমন উশৃঙ্খলতা--হৃদয়হীনতার নামান্তর, স্বাতন্ত্র্যহীন মিলনও তেমনি অধীনতা; অধীনতা জগতকে সাঙ্গ করিতে বসিয়াছে; আর না!

দেহের অধীনতাও বরং সহ্য হয়, মনের দাসত্ব-ইচ্ছা মারাত্মক। অন্তরাত্মাকে পর্য্যন্ত কলুষিত করে! প্রাণে যদি তাহার জন্য আনন্দ জাগরিত না হইয়া থাকে, প্রবৃত্তির বশে বচনে নয়নে সহানুভূতির কৃত্রিম কমনীয়তা আনয়ন করিয়া 'বচন-সুধায়' তাহাকে বিপথে টানিয়া লইও না, স্বাধীনতার নামে মনের চির অধীনতার আয়োজনে শিব নাই কাহারো।

ছন্দানুবর্ত্তী হইয়াই তাহার আজ এ দশা! কবে কোন্ অতীতে, কিসের মোহে সে অধীনতাকে ঝঞ্ঝাটহীন সুখ মনে করিয়া পোষ মানিয়াছিল,—শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল খাঁচার জীবন! নিজে পোষ না মানিলে কে কাহাকে পোষ মানাইতে পারে, প্রবল শক্তি জীবন-হীন করিতে সমর্থ কিন্তু স্বাধীনতাহীন করিতে পারে না। আফ্রিকার জেব্রাকে কে অধীন করিতে পারিয়াছে! আদিতে কেহবা তাহাদের খাদ্যের মোহে, কেহবা আরামের আনন্দে, বিলাসের উপকরণে আত্মবিস্মৃত হইয়া মনের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিল; কেহ ধনীর ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে অবনত হইয়া, কেহ ঋণদায়ে, কেহ আশু স্বার্থসিদ্ধির আশায় অন্যের আশ্রয় নির্ভর করিয়া আনয়ন করিয়াছে জাতীয় অধীনতা। বিজেতার গৃহে অবরোধের সম্মান লক্ষ্য করিয়া অনুকরণ স্পৃহায় স্ব-ইচ্ছায় মনের মরণ ডাকিয়া আনিয়াছিল; আজ যদি আবার অন্য বিজেতার

অবাধগতিকে স্বাধীনতা ভ্রমে তাহাদের অনুসরণ করিয়া উধাও. হইতে অভিলাষী হয়, তাথাপি সেই তুল্য ফল,—স্বাধীনতার নামে অধীনতা! মন জাগরিত না হইলে অনন্ত আকাশ মনের স্বাস্থ্য দান করিতে সমর্থ হইবে না কিছুতেই! দেহমনকে ক্লান্ত করিবে মাত্র।

মনের জড়তা দূর হয় যাহাতে, তাহারই বিধিমত আয়োজন হ'ক ; মনের শক্তি সংগ্রহ করুক অধীন, জীবন-বল উদ্বুদ্ধ হ'ক সর্ব্বশ্রেণীতে! সেই শিক্ষা বিধিমত অনুষ্ঠিত হ'ক আপামর সাধারণে, হুজুর-মুজুরের কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইতে হয় হ'ক—কিন্তু আকুতি হ'ক এক, লক্ষ্য হ'ক মনুষ্যত্ব, জাগিয়া উঠুক আত্মার অনুভূতি,—ব্যক্তিত্ব।

ধনী দয়াবশে বিগলিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন আজ নির্ধনকে—অস্পৃশ্য হইল পৈতা-ধারী ব্রাহ্মণের স্পৃশ্য,—অপার্থিব দৃশ্য,—ধন্য! ধন্য!—ধন্য? কে? ভগবানের জগতে কাহার সাধ্য ধন্য করে কে কাহাকে, ধন্য হইবার স্থান এ! মানুষ প্রার্থনা করুক মানুষকে, মনুষ্যত্বকে ; হৃদয় অন্তরের টানে উন্মত্ত হ'ক—সর্ব্ব-পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া মিলনোন্মুখ মনপ্রাণ দেহে সে অনুভব করুক,—

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্ম কাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।"

"জগত মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে!
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে!

ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিবে মিথ্যা তরাস
ভাঙ্গিবে জীর্ণ খাঁচা এ।"

মিলনের সকল বাধা সে মাহেন্দ্রক্ষণে অপসারিত হইবে,—সরস স্বাধীন মানবাত্মার আশ্রয় হইবে বিশ্বরাজের আশীর্ব্বাদে মহামিলন।

নবাগত।

—ঃ০ঃ—

ওরে শিশু মাণিক আমার
হাসির শতদল,
আঁধার ঘরের উজল-মণি
শান্তি-তরুর ফল!
—ওরে যাদু রতন আমার
দীর্ণ বুকের বল,
তপ্ত পাঁজর শীতল হ'ল
নয়ত এটা ছল?
পর ভেদাভেদ নাই কিছু তোর,
পবিত সুধায় পরাণটা ভোর
হেথা, স্বর্গ হ'তে পড়লি ঝ'রে
বিমল নির্ম্মল।
আঁধার ঘরের উজল-মণি
শান্তি-তরুর ফল॥

দর্শনে তোর প্রাণ মাতিল
কি আনন্দ গানে,
শূন্য হৃদয় পূর্ণ হ'ল
বিভুর মহাদানে।

তুই, কোন্ রাজ্যের আশীষ মেঘে,
নিলয়ে মোর উঠ্‌লি জেগে?
ছড়িয়ে দিলি আশার আলো
অনুপ উজ্জ্বল।
আঁধার ঘরের উজল-মণি
শান্তি-তরুর ফল।

শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়।

ব্যথা।

—•—

আর কত বার,...কতবার এ এগজামিন দেব...এর কি শেষ নেই! সং সাজব আর কতবার! রূপ গুণ যেখানে মিথ্যা, অর্থই সব, সেখানে আর এত যাচাই কেন!

আজ আবার পরীক্ষা! চাঁপা আমার বাল্য সখী—সুখ দুঃখের ভাগী; কিসেই যে সে সুখী হয় সেই জানে,—আজ আবার আমায় সং সাজাতে সে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। এসবে আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমনতর ওলট-পালট হ'য়ে যায়, আর মাথাটা আপনি যেন কেন নুয়ে পড়ে, কিছুতেই তাকে ধরে রাখ্‌তে পারিনে।

ঠাকুরমাও বল্লেন, "দেমা, বেঁধে দে তোর সইএর চুলটা। দেখিস্ ।"

সই আমার চুল বাঁধ্‌ছিল। ঠাকুরমা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লেন, "হায় ভগবান, এমন মেয়েরও আমার বর জোটে না, দেশটা হোল কি?" সখী হাসি ধরে রাখ্‌তে পারছিল না, সে হেসে ফেলল। আমার কিন্তু লজ্জায় মুখ চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছিল। ঠাকুরমা জোর দিয়ে বল্লেন, "সত্যি বল্‌ছি চাঁপা, তুই বল্‌লে বিশ্বেস্‌ করবি নে; আমাদের সময় এমনটী ছিল না, এই তোদের বেলাই যত। এই ধর না কেন তোর ঠাকুরদাদার কথাই; আট কুড়ি টাকা নিজে হাতে গণে দিয়ে তবে আন্‌তে পেরেছিলেন তিনি এ বাড়ীতে আমাকে। আজ সেকাল গেছে উল্‌টে। চাঁপা একটুখানি হেসে বল্‌লে, "সত্যি বল্‌চি ঠাকুমা, এবার তাড়াতাড়ি মরে যেন তোমাদের কালে জন্মি।" ঠাকুরমা অসম্ভব রকম মুখখানা বেঁকিয়ে বল্লেন, "তোর আবার কি লা? যত মরণ আমাদের এইটীকে নিয়ে।" চাঁপা আমার ওপর এ আক্রমণটাকে নিষ্ফল করবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো, "হ'য়ে যাবে ঠাকুমা, অত ভাব্‌চো কেন; এমন কাউকে দেখেচো যার বিয়ে হয়নি?"

ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন, "তা দেখ্‌বো না কেন? এই যে সেদিন স্নেহলতা কাণ্ডটা কর্‌লে, সেটা কি আমাদের কালে, না তোমাদের সময়কার তাই বল?" মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, "আর সেদিন যে 'দেবদাস' বলে বইখানা পড়্‌লে, তার শেষের দিকটায় যে একটা বুকভাঙ্গা দুঃখ গাঁথা রয়েচে সেটা কেন হোল, বল।" চাঁপার মুখের ওপর একটা প্রশ্নের চাপ তুলে দিয়ে সবাই চুপ।

আমি মনে মনে বলছিলাম, "ওগো দেবদাস আর পারুর মিলনের যে সামাজিক প্রতিবন্ধকটা সে তোমাদেরই আমলের, তোমাদেরই তৈরী।" কিন্তু আজ যে আমার জবাব দেওয়া ত দূরের কথা, কোন বিশেষ দরকারী কথাটী পর্য্যন্ত কইবার অধিকার নেই। আমি যে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, পোনেরতে পা বেড়িয়েচি। একেই তো এদের ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মগ্রহণ, তার পর আবার বেশী বয়েস।

আমি তেমনি করে মাথাটী নুইয়ে বসে বসে সব শুন্‌চি। একটা চাপা কান্না বার বার বুকের ভেতর থেকে ফুলে উঠচে। আজ যে আমার আবার দেখা! এমনি করে কতজনই তো দেখে গেল, কৈ, বাপমায়ের এই নিদারুণ দুঃসহ দুঃখের বোঝাটাকে তো কেউ সরিয়ে—

নিতে পারলে না। আমি তো চোখ বুঁজেই নিজকে সবার পায়ে বিলিয়ে দিতে চাই, কেউ তো ফিরেও তাকালে না। হাঁ, এমন একটা কথা থাকতো, যে নিজেরও একটা মতামত আছে, কিন্তু সে সব তো কিছুই চাইনি আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব, সবটুকু দিয়েও যদি বাপমায়ের ঐ ব্যথাটাকে একটু জুড়োতে পারতেম। কিন্তু তাঁরা তা শুনবেন কেন? তাঁরা যে তাঁদের ষোলআনা বুঝে চান্। তার এতটুকু ত্রুটী হলেও যে বাপমায়ের সেই ব্যথাটার ওপর সজোরে একটা ঘা দিয়ে কোথায় সরে পড়েন, এত ডাকা—এত সাধা—এত কাঁদা—আর ফিরেও তাকান না, তাঁরা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেচেন। এমনি আঘাতের ওপর আঘাতে বাপমা যে দিন দিন হতাশ হ'য়ে পড়্‌ছিলেন, সেকি আমি লক্ষ্য করিনি! কিন্তু কি করবো আমি তার?

আমার ব্যথা, আমার লজ্জা কি তাঁদের চাইতে কম? তাঁদের বুকের ব্যথা যে আমার বুকে দশগুণ বেশী হ'য়ে বাজ্‌ছিল। তখন যে এই ব্যথাকেই কত আরাধনা করেচি, "ওগো তুমি তোমার অনন্ত রূপ নিয়ে এসে আমার বুকের ওপর বস—তুমি আমায় ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাও,—তোমার ওটুকুতে তো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।" কৈ তাও তো হোল না?

এত দুঃখেও সে কেন ঐ রূপটুকু আর দেহটা তাদের সবটুকু মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার ভেতর এসে সেজেগুজে দাঁড়িয়েছে, তাই আজ ভেবে পাইনে আমি। এ তো কখনও চাইনি আমি। আজ কোথা থেকে এ যৌবন, আমার শত শত বাধাবিঘ্ন ভেঙ্গে চুরে দিয়ে বানের জলের মত তার অনন্ত রূপ নিয়ে আমাকে এমনি করে দশ জনের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দিলে। এতেই যে আমি আমার বাপমায়ের কাছে আরও বেশী অপরাধী হয়েছি "কেন আমি এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠলেম।"

হায় ঠাকুর! এ কি আমার হাত? আমার নিজের চেষ্টাতেই কি আর এত বড়টী হয়ে উঠলেম। তাদের এমনি কথার জালায় কত দিন যে না খেয়ে পড়ে পড়ে কেঁদেছি তবুও তো আমার এ যৌবন্ জোয়ারকে একটুও শিথিল করে দিতে পারি নেই!

সেই যেদিন ও-গ্রামের এক পক্ষহীন তৃতীয়পক্ষ এসেছিলেন আমায় দেখতে;—হায় হরি! সে কি......। আমার বুকের রক্ত যে সেদিন জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু

কি হবে তাতে? হোক্ না কেন তিনি যেমন তেমন দেখতে,—গঙ্গাযাত্রী—তবুও তিনি পুরুষ। একটা মেয়েতে আর তাঁতে যে ঢের তফাৎ। তিনিও আমার বুকের ওপর একটা লাথি মেরে চলে গেলেন; কিন্তু বিঁধল এই ব্যথাটা আমার নিরুপায় বাপমায়ের বুকে শেলের মত গিয়ে! রেগে মা বল্লেন, "ওরে তুই মর্ মর্, আর আমাদের জ্বালাস্ নে।" এত দুঃখেও যে কেন আমি তখনও বেঁচেছিলেম তা বুঝতে পারি নেই তখন—কিন্তু বুঝেছি এখন। তা না হলে আমার এই দুঃসহ দুঃখটা কাকে আমার মত করে বিঁধতো? কিন্তু মরাই ছিল শতগুণে ভাল।

হায় বিধি, আমরা কি তোমার সৃষ্টির বাইরে? আমাদের কি আর তোমার কাছে নিবেদন করবার কিছুই নেই?

ছোট ভাইটী বাইরে থেকে দৌড়ে এসে মার আঁচল ধরে বল্লে "মা, ওমা! দিদিকে দেখতে এসেচে, দিদির বর।"—আমার যে তখন লজ্জা! মা বল্লেন "যা, যাঃ, তোর দিদির কত বরই আসচে।" সে আরও জোর দিয়ে বল্লে,—"হাঁ মা, সত্যি তুমি দেখবে এসো, বেশ সুন্দর বর!"

কথাটা শুনেই বুকটা আমার দুর্ দুর্ করে কেঁপে উঠলো; কিন্তু কথাটা ভাইয়ের মিথ্যে নয়। সত্যি যিনি আমায় সেদিন দেখতে এসেছিলেন, বড় সুন্দর তিনি। আগে আমি কিছুই জানিনি, কিন্তু শেষে যখন শুনেছিলুম তিনি শুধু দেখ্‌তেই নন্, বিদ্যেতেও অনেকদূর, তখন আমার আনন্দের আন্দোলনটাকে থামিয়ে দিয়ে একটা দুঃখের স্পন্দন জেগে উঠলো। আমি যে তাঁর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই সব ভুলে একাকার করে দিয়েছিলেম। কেন তিনি তাঁর ওরূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন? আর যদি বা দাঁড়ালেন, সে কেন একটি নিমেষের তরে? কেন তাঁকে চিরদিনের তরে আপন করে নিতে পারলেম না। সেই একটি নিমেষের মিলনেই যে আমি তাঁকে আমার সব ধরে দিয়েছি। আমার,—কেন সবই ত এখন তাঁর। তবে কেমন করে আমি আবার আমাকে আর একজনের কাছে সঁপে দেব? আর যে কিছুই নেই আমার পরকে দেবার।

বল্‌বে একি কথা—বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে! স্বামী ধর্ম্ম—সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন! না চল্‌লে বেশী ক্ষতি আর হবে কি? কোন্‌টাই বা চল্‌ছে? মেয়ে যেখানে অচল, সমাজ

যেখানে অচল সেইখানে এ সচল মনটার কথা বলে ফেল্‌লে খাপছাড়া হবে না একটুও। মিথ্যা বলার পাপটা স্পর্শিবে না লাভ সেইটুকু। স্বামী যদি হন ধর্ম্ম—বুঝাপড়া হবে তার সঙ্গে; ধর্ম্মহীন সমাজ অমন রূপগুণকে সম্ভাব্য স্বামীরূপে যুবতীর সাম্‌নে এনে দিয়ে টাকার লোভে সরে পড়েন কোন্ ধর্ম্মে! বল্‌বে ধর্ম্মের সেরা সংযম,—সে ত চাই উভয়েরি।

তিনি এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে এল তাঁর আরও দু'জন কে। আজ যে আমার পা সরছিল না। চাঁপা বলে উঠ্‌লো, "হরি! এর সঙ্গেই যেন সখীর হ'য়ে যায়।" মা এসে বল্‌লেন, "নে নে কতক্ষণ আর ওদের অমনি করে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বি? এখন যা।" কি করি, তখন ও-বাড়ীর বৌদির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়ালেম। তাঁরা বল্‌লেন আমায় তাঁদের—সাম্‌নে বোস্‌তে। ব'সলেম। এইখানেই যে আমার একটা মস্ত ত্রুটী হ'য়ে গেল, তা বুঝলেম পরে, যখন তাঁরা চলে গেলেন। সত্যিই একটা করে প্রণাম কর্‌বার দরকার ছিল, অন্ততঃ তাঁকে।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন আমার নাম। আমার যে তখন কেমন ঠেক্‌ছিল। একদিকে যেমন এই তিনটী লোকের সাম্‌নে পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের মত আমাকে জবাব দিতে হচ্ছিল, এটা যেমন লজ্জা, আর একদিকে আমাদের বাড়ীর, প্রতিবেশীদের বাড়ীর কতকগুলো চোখ, কান সজাগ ছিল, আমার জবাবের জন্য,—এইটাই ছিল আমার বড় লজ্জা। মাথাটা আমার—ঝিম ঝিম করছিল, আমি আস্তে বললুম, "শৈল।"

আমায় একটা প্রশ্ন হোল, "লিখ্‌তে পারেন?" তখন আমার সেই ভারি মাথাটা আপনি বাঁ ঘাড়ের দিকে নীচু হ'য়ে পড়লো। খোকাটা আবার এমন বোকা, সে ছিল দাঁড়িয়ে সাম্‌নেই। তাঁরা ওকে ধরে বসলেন, "যাওতো খোকা,—একটা দোয়াতকলম নিয়ে এসো।" আনা হ'লে আমার সাম্‌নে সেগুলো রেখে দিয়ে বললেন, আমার পুরো নামটা লিখ্‌তে। একি! আজ যে আমার হাতটা অশান্ত ঘোড়ার মত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। কেন আজ এমনি করে কাঁপ্‌চে, লিখলেম, লেখাটা ভাল হ'ল না। তাঁরা বল্‌লেন, "বেশ লেখা।" তারপর কাগজটা ভাঁজ করে তিনি তাঁর নিজের পকেটে রেখে দিলেন। তাঁর সঙ্গীরা আমাকে আরও প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে যাচ্ছিল তিনি চুপি চুপি তাদের বল্লেন "আর কেন!" জুড়ুতে পেলেম,--মরে গেলেম লজ্জায়! তাঁর সঙ্গীরা ইঙ্গিত করলেন, অর্থ তার স্পষ্ট—হরি!

তাঁদের কথাবার্ত্তায় আর হাবভাবে মা, ঠাকুরমা সবাই এটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে আমি একরকম পাশ করেচি। ওঁরা চলে গেলে, সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে একটা সভা করে দাঁড়ালেন। ঠাকুরমা বলে উঠলেন, "সেটা এখন ওর বরাত। দেখলে না, দেখাটাই একটু নূতন রকমের। আজকালকার ছেলে!"

মা একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "ছাড় মা, এ সব ভগবানের হাত। এযে আবার ওর ভাগ্যে জুটবে!" ঘরের ভেতর চাঁপা আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে, "সখি এইটীই তোর বর।"

হাসি চাপ্‌তে পারলেম না! চাঁপা বল্লে "বল না।" বল্লেম, "আমার বলায় না-বলায় আসে যায় কি ভাই! বাঙলার মেয়ে আমরা।" দুই সখীতে তারপর অনেক কথা হ'ল,— পোড়ারমুখী আমি কখন কথায় কথায় সখীকে বলে ফেল্লেম, ওঁকে না হ'লে আমার জীবন বৃথা।

কথাটা চাপা রইল না। চাঁপা পোড়ারমুখী ঠাকুরমাকে গিয়া সব বলে দিলে; মার কানে পর্য্যন্ত পৌঁছিল! তখনি আমার মরণ হ'ল না কেন!

রাতে ঘটক এসে বল্‌লে, "দেখ মা, - ছেলের মেয়ে দেখে খুব পছন্দ হয়েচে, হয়ত হলেও হ'তে পারে।" আমার যে তখন কি একটা অব্যক্ত আনন্দের ব্যথায় হৃদয়টা ছাপিয়ে উঠছিল, তা আর এখন কি করে বোঝাব?

পরদিন বাবাও এসে বল্‌লেন, যে ছেলের বেশ মত আছে, এখন দেনাপাওনা ঠিক হলেই হ'য়ে যায়। এই যায়গাটাতেই তো কথা। সেদিন তাঁর যে বিদ্যাবুদ্ধি, ধনঐশ্বর্য্যকে তুলনায় এনে, মনে মনে নিজকে কত ধন্য ভেবেছিলেম, আর আজ তাঁর সেই গুণ-ঐশ্বর্য্য, একটা বিরাট শত্রুর মত, তার শুষ্ক প্রেমহীন, ভালবাসাহীন স্বার্থপরতা নিয়ে আমার এ ব্যথিত ক্ষুধিত ভালবাসার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

কিছুদিন পরে আবার একদিন বাবা এসে বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "না, তাঁদের সঙ্গে যখন কিছুতেই বন্‌ছে না,— তখন আর কি করে হয়?" হায় প্রভু! সেদিন যে এক নিমিষের ভেতর আমার সকল আশা ভরসা শরতের রঙিন মেঘখানার মত কোথায় মিলিয়ে গেল!

মা আমার কালো' মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বাবাকে বল্লেন, "একটু ভাল করে দেখ্‌লে হয়ত হলেও হ'তে পারে ; ছেলের যখন সম্পূর্ণ মত র'য়েচে।" বাবা রেগে বল্লেন, "আর কি ক'রে দেখ্‌বো ? তাঁদের পায়ে ধরতেও তো বাকী রাখি নি। মা বল্লেন, "কি চান তাঁরা ?"

বাবা বল্লেন, "ওঃ সে অনেক বেশী।" মা বল্লেন, "যা বোঝ কর। মেয়ের মনটা তো শুনেছ..."

এও আমার ভাগ্যে ছিল ! বাপমায়ের এ দুঃসহ, চির দুঃখের যন্ত্রণাটার ওপর যে আমি আবার নিজে হাতে কোন দিন এমনি নিদারুণ নির্ম্মমভাবে প্রহার করতে পারবো এটা তো কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি. আজও যখন এই কথাটাই মনে পড়ে তখন লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে মাটীর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। বাবা তখন গম্ভীর হ'য়ে সুর বদ্‌লে বল্‌লেন, "একটা ছেলে হ'য়ে এমনি কথা বল্‌তো, তাও না হয় আমি মাথায় করে নিতেম।"

এযে কত দুঃখে এ কথাগুলো আজ হৃদয় থেকে গলে গলে দশজনের সাম্‌নে দাঁড়াবার জন্যে কলমের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়েচে, তা আর কি করে বুঝিয়ে বল্‌তে পারি ! আমার সবটা দুঃখ যে বুকের কাছে একসঙ্গে জমে শক্ত হয়ে রয়েচে, যদি পারতেম সবটা একসঙ্গে বের করে দিতে—তবে বুঝতে এ ব্যথা কত গভীর, এ আঘাত কত শক্ত, আর আমার বুকটা কত খালি, কত শূন্য !

মা কিন্তু মেয়ের আশা পূরণ করবার জন্যে তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। তাঁর সব দিয়ে, নিজের গহনার পুঁটুলীটা পর্য্যন্ত আমার জন্যে তিনি ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁদের সে তৃষ্ণা মিটলো না। একটা ছেলেকে ইউনিভারসিটির আঁচে অমন করে গড়ে তুলতে, তাঁদের যতখানি ত্যাগ করতে হয়েছিল, আজ তাই তাঁরা সুদে আসলে বুঝে চান, আমাদের কাছ থেকে। এঁরাও যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন, তাঁরাও ততই পিছিয়ে যেতে লাগলেন। আমার বাপমায়ের ঝলকা ঝলকা বুকের রক্তে তাঁদের অর্থের পিপাসা আরও দাউ দাউ করে জলে উঠ্‌লো, কিছুতেই সে আগুন নিবলো না, সে পিপাসা মিটলো না। অবশেষে বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ নিয়ে, আমার কল্পিত, হৃদয়ে অঙ্কিত শ্বশুরালয় ছেড়ে এক আঁধার রাতে আর এক বাড়ী চলে এলেম।

পতি ধর্ম্ম,—দেবতা ; দেবতাই রক্ষা করবেন,—কিন্তু.

**　　　　　　　　**

শুনেছি আজও নাকি তিনি বিয়ে করতে রাজি হন নি

শ্রীকামাখ্যাচরণ মজুমদার।

কৃষি কথা।

১। পাটের উদ্ভিদ রোগ (ছত্রক পরগাছা)

গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ববঙ্গে অনেক রকম শস্যাদি "রাইজকটণীয়া" এক প্রকার বীজাণুরোগে সাংঘাতিকরূপে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে পাট গাছই বিশেষতঃ পীড়িত হয়।

রাইজকটণীয়া এক প্রকার মূলজ রোগ এবং মাটিতেই থাকে। গ্রীষ্মকালে অনেক রকম চারাগাছ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ শুকাইয়া মরিতে দেখা যায়। যদিও এই রোগের আক্রমণ দুর্ব্বল এবং সাধারণতঃ সামান্যভাবে এখানে ওখানে দৃষ্ট হয় তথাপি অনুকূল অবস্থায় ইহা ভীষণ ও বহুব্যাপক আকার ধরিতে পারে। গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা এবং রাজসাহী সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পাটের উপর ইহার আক্রমণ অতি ভীষণ হইয়াছিল। এই পীড়ার বীজাণু মাটিতেই থাকে এবং প্রথমতঃ গাছের শিকড় ধরে তৎপর গাছের গোড়ায় একটী বাদামী রংয়ের আবরণের মত পড়ে এবং তাহার উপরে ক্রমশঃ কাল রংয়ের অতি ক্ষুদ্র গোল গোল দাগ ফুটিয়া উঠে। এই কাল রংয়ের দাগের মধ্যেই এই পীড়ার বীজাঙ্কুর জন্মে এবং উপযোগী অবস্থায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পীড়ার বীজাঙ্কুরের এই কাল কাল কোরক হইতে সূক্ষ্ম সূত্রের মত বাহির হইয়া গাছের গোড়া হইতে তন্তুতে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ গাছের কাণ্ড, শাখা প্রভৃতি আক্রমণ করে। বীজ হইতে উৎপন্ন চারাগাছ রাইজ-

কটনীয়ার আক্রান্ত হইলে গাছের গোড়ায় একটা ঈষৎ হলদে দাগ পড়ে, ক্রমে ঐ দাগ কাল হইতে থাকে এবং তন্তুগুলি আস্তে আস্তে নরম ও দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়। ছোট ছোট চারাগাছেই এই পীড়া সহজে জন্মে। কিন্তু অনুকূল অবস্থায় পুরাণ গাছেও আক্রান্ত হইতে পারে। পাতাগুলি শুকাইয়া এবং ডগার রং কাল হইয়া গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে ঐ গাছটী রাইজকটনীয়ার আক্রান্ত হইয়াছে। রোগাক্রান্ত চারাগুলির তন্তু পচিয়া যায় এবং ডাঁটাগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এমন কি পাটের বীজগুলি পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়, এবং রোগের পূর্ণাবস্থায় বীজের উপর কাল ফোটকের মত দেখা যায়। সাধারণতঃ পুরাতন পলিপড়া লাল (পাথুরে) জমীতে এবং ক্রমাগত ৩৪ বৎসর উৎপন্ন পাটের জমীতেই এই রোগটা দেখা যায়; কিন্তু যে সকল পাট গাছ নিম্নভূমিতে ক্রমাগত অনেক বৎসর ধরিয়া জন্মিতেছে সেই সকল পাটগাছে রাইজকটনীয়ার আক্রমণ সামান্য হয়। পাট, শণ, তুলা, আলু, মুলা, কলাই, মটর, সীম, বাঁধাকপি, চীনাবাদাম, প্রভৃতি এই রাইজকটনীয়া দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই রোগের বীজাণু মাটিতে ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে, সুতরাং মাটিতে এই বীজাণু যাহাতে নষ্ট করা যায় তাহারই চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন। জমিতে চুণ দিলে এই রোগের প্রকোপ অনেকটা কমে বটে কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে লাল মাটিতে যাহাতে পটাশ্ (ক্ষার) খুব কম সেই মাটিতেই রাইজকটনীয়ার আক্রমণ প্রবল।

বঙ্গদেশের তন্তুবিশারদ (Fibre Expert) ঢাকার লাল মাটিতে যেখানে পটাশ্ ক্ষারের অংশ অতি কম এবং যেখানে পাট এই রোগে বিশেষ আক্রান্ত হইত; সেখানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কচুরী বা টগইর ছাই (যাহাতে পটাশ্ বা ক্ষার আছে) ব্যবহার করিলে পাট এই ব্যারাম হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পায় এবং পাটের ফলনও যথেষ্ট হইয়া থাকে।

কচুরীর বা টগইর ছাই আজকাল সহজলভ্য। কৃষকেরা প্রতি একর জমিতে তিন মণ করিয়া এই ছাই এবং সম্ভব হইলে প্রতি একরে দশ মণ করিয়া চুণ ব্যবহার করিতে পারে; কারণ এই সার দ্বারা কেবল যে এই রোগ নষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু শস্যের ফলনও খুব বৃদ্ধি হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে রোগাক্রান্ত বীজগুলি শতকরা দুই ভাগ তুঁতে ভিজান জলে পনের মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শুকাইয়া বীজ বপন করিতে হইবে।

"ডিপ্লোডিয়া" নামক পাটের আর একটা রোগ জন্মে। কখনও রাইজকটনীয়ার সঙ্গে কখন বা একাই ইহা পাটেতে দেখা যায়। ডিপ্লোডিয়ার বাহ্যিক লক্ষণ প্রথমতঃ অনেকাংশে রাইজকটনীয়ার মত সুতরাং অনেক সময় খালি চক্ষে ডিপ্লোডিয়াকে রাইজকটনীয়া বলিয়া ভুল করা হয়। কিন্তু একটু বিশেষ নজর করিলে ডিপ্লোডিয়া রোগাক্রান্ত গাছের ছালের উপর একটা মলিন কজ্জল কাল পদার্থ দেখা যায়। ডিপ্লোডিয়া দ্বারা সাধারণতঃ বড় বড় পাট গাছ আক্রান্ত হয়। সুতরাং উহা দ্বারা পাটের বীজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। বাতাসে এই রোগের বীজ বিস্তৃত হয়; সুতরাং শস্যের উপর তুঁতের জল অথবা তুঁতে ও ভাল চূণ (এক মণ জলে আধাসের তুঁতে ও ছয় ছটাক ভাল চূণ) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে রাইজকটনীয়া ও ডিপ্লোডিয়া রোগ নষ্ট হইতে পারে।

কৃষিসমাচার।　　　　শ্রীঅমৃতলাল সোম।

ট্রামে।

—❋—

রোজ ট্রামে যাই আসি। মোড়ের ডিপো হইতে শেষ পর্যন্ত আমার সীমানা। কত লোক প্রথম হইতে সঙ্গী হইয়া মধ্য পথে নামিয়া পড়েন, কেহ মধ্য পথে উঠিয়া শেষ সীমানায় যাইবার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়েন। আপিসের সময় ভিড় বেশী হইলে কেহ পেছনে দাঁড়াইয়া চলে, কেহ হাতল ধরিয়া ঝোলে। এইটুকু রাস্তা চলিতে রোজ কত রংবেরঙ্গের লোক দেখি, কত রকমারী বেশ ভূষায় সজ্জিত বিচিত্র ধরণের নরনারীর সঙ্গী হইয়া চলি; কেহ দু'দণ্ড মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায়, কাহারও দিকে শুধু দৃষ্টি পড়ে মাত্র, কাহারও দিকে তাহাও পড়ে না।

কত হাসি ঠাট্টা, রগড়ের কথা, কত বিয়োগবিধুর ব্যথিত হৃদয়ের করুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস এই আধ ঘণ্টার ভ্রমণে কানে আসে!

ট্রামে, কেহ পয়সা দিয়া চলে, কেহ বিনি পয়সায় চলে, কেহ বা ছ' পয়সার জায়গায় তিন পয়সা দিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করে। তবে একদিন দেখিয়াছিলাম এক বুড়ো ভদ্রলোকের

এক অস্বাভাবিক কাণ্ড। কণ্ডাক্টর বাবু 'টিকিট' বলিয়া হাত পাতিলে ভদ্রলোক একটি আনি ও দু'টি পয়সা তাহার হাতে দিলেন, কণ্ডাক্টর আনিটি রাখিয়া তাহার হাতে দু'টি পয়সা গুজিয়া দিতে ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া কহিলেন 'আজকাল কি টিকেট চার পয়সা করে হয়েছে?' কণ্ডাক্টর উত্তর দেবার কোন সুযোগ খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভদ্রলোক পয়সা দু'টি তেমনি হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন। কণ্ডাক্টর একখানি টিকিট কাটিয়া দিয়া তাহার হাতের পয়সা দু'টি লইয়া সরিয়া পড়িল।

সে দিন ট্রামে যাইতেছি, দু'টি ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়াই বসিলেন। ট্রামে বেশ ভিড়, কণ্ডাক্টর পাদানের উপর দাঁড়াইয়া দু'তিনবার 'বাকী টিকিট, বাবু বাকী টিকিট' হাঁকিল। দু'টি ভদ্রলোকের মধ্যে একজন মানিব্যাগ খুলিয়া সম্মুখে যিনি বসিয়াছিলেন তাহার হাতে তিন আনা পয়সা দিয়া বলিলেন—'টিকিট নাও যতী!' যে ভদ্রলোকের হাতে পয়সা দেওয়া হইল তিনি বলিলেন "কণ্ডাক্টর চলে গেছে, কি কাজ আর পয়সা দিয়ে, চুপ করে থাকা যাক্ না।"

ভদ্রলোক বলিলেন "না না টিকিট নিয়ে নাও।" যতী একটু বিস্মিত হইয়া কহিল "যেচে পয়সা দেবার তোমার এত ঝোঁক কেন বল তো হে! এ ভাবে পয়সা না দিয়ে ট্রাম চাপার ব্যবস্থা তো তুমিই আমায় প্রথম শিখিয়েছিলে?"

কণ্ডাক্টর আবার আসিয়া হাঁকিল 'বাবু—বাকী টিকিট বাবু'—ভদ্রলোক বলিলেন 'আচ্ছা তুমি টিকিট দু'খানা নিয়ে নাও তো তারপর বলছি।'

যতী টিকিট লইল। অপর ভদ্রলোকটি বলিলেন "দেখ ভাই রোজ রোজ টিকিট কিনলে বারটা পয়সা বের হয়ে যায়, একেবারে না দিয়ে যদি পারা যায় কিম্বা বারোর জায়গায় ছ'পয়সায় যদি হয়, ট্রামে উঠে প্রায়ই সেই চেষ্টা করতুম। সেদিন আর ডিপো থেকে ট্রামে উঠি নি, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের মোড়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়েছিলুম নেমন্তন্ন খেতে,—বেলা অনেক হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ট্রামে উঠলুম। ট্রামে তেমন ভিড় ছিল না, পেছনকার বেঞ্চখানায় আমিই একমাত্র আরোহী। কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইল, ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হোল লোকটা নূতন। প্রথমবার টিকিট চাইলে আমি বললাম 'দিচ্ছি।' একটু পরে আবার এসে পাদানের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্লুম "চল না যাওয়া

থাক্. যদি এর মধ্যে ইনস্পেক্টর ওঠে টিকিট নিয়ে নিলেই হবে, না ওঠে কিছু পাবে 'খন।" লোকটির মনে কিছু পাইবার লোভও জাগিতেছিল, আবার ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া পড়িতে পারে এ ভয়ও বোধ হয় হইতেছিল। ভয়ে ভয়ে "বাবু ইন্‌স্পেক্টর উঠে পড়লে মুস্কিল, নতুন লোক বহু চেষ্টায় কাজ পেয়েছি দেখবেন আপনারা বড় লোক।"

একবার ভাবিলাম ছ'টা পয়সা দিয়া টিকিটখানা নেই, নূতন লোক ভাবগতির কিছু জানে না শেষটায় বেচারী মুস্কিলে পড়িয়া না যায়। আবার ভাবিলাম তিন পয়সায় রফা করিয়াই যদি ছ'পয়সার কাজ হইয়া যায় কি কাজ তিনটি পয়সা বেশী খরচ করিয়া!

ইতস্ততঃ করিয়া টিকিট লওয়া হইল না, একটু পরেই ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া উপস্থিত, কণ্ডাক্টর আমার পেছনেই দাঁড়াইয়াছিল, ইন্‌স্পেক্টর তাহার নিকট হইতে টিকিটের নম্বর লইয়া একেবারে প্রথমেই আমার সম্মুখে উপস্থিত—'বাবু টিকিট।'

আমি হাতে তোলা রফার তিনটি পয়সা সরাইয়া ব্যাগটি খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া বলিলাম 'দেখি টিকিট।'

কণ্ডাক্টর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে বলিল 'এর মধ্যেই চুরি শিখেছ! চালাকি! আচ্ছা দেখছি।' কণ্ডাক্টরের মুখে আর কথা নাই। ইন্‌স্পেক্টরের কথাটি যেন বার বার আমাকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিন পয়সায় রফা করিবার লোভে সহজে চোর বনিয়া গেলাম।

ইন্‌স্পেক্টর নামিয়া গেলে কণ্ডাক্টর আমার পেছনে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল "নতুন চাকরীতে ঢুকেছি বাবু আমার রুটি মেরে গেল—" তাহার চোখের পানে চাহিতে পারিতেছিলাম না, মনে হইল গাড়ী শুদ্ধ লোক আমার দিকে চাহিয়া আমায় ধিক্কার দিতেছে। সহ্য করিতে পারিলাম না আর, তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে মধ্য পথেই নামিয়া পড়িলাম, ট্রাম চলিয়া গেল, মন পড়িয়া রহিল কণ্ডাক্টরের সেই কাতর মুখের উপর। কি হইয়া গেল—কি করিলাম। কাপুরুষ আমি কেন খুলিয়া বলিলাম না সব কথা।

তারপর ট্রামে চড়ি নাই কত দিন,...চড়িতে পারি নাই। ট্রাম পাশ দিয়া গিয়াছে,—চাহিয়াছি তার কণ্ডাক্টরের পানে, সে মুখ আর চোখে পড়ে নাই। বোধ হয় আমার অপরাধে তিন পয়সার প্রলোভনেই বেচারার চাকরীটি গিয়াছে। সেই থেকে ভাই আর বিনি পয়সায় রফা আমার পক্ষে রফা।"

বাস্তবিকই ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া মনটা আমারও কি হইয়া গেল। চাহিয়া দেখি গাড়ী মোড়ের মাথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

জর্ম্মণির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি ;—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। পকেট সংস্করণ, ৬১ পৃষ্ঠা; ছাপা সুন্দর; মূল্য ।০ চারি আনা।

সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত গূচ (Mr, Gooch) Contemporary Review পত্রিকায় "Evolution of German statecraft" নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, মহাসমরের সময় প্রকাশ করেন; এইটি তাহার সুন্দর অনুবাদ। ইহাতে জর্ম্মণ রাষ্ট্রনীতির উৎপত্তি ও মহাসমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি প্রণালীতে তাহার অভিব্যক্তি তাহা সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি অল্প কথায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। অনুবাদকের ভাষার গুণে সুপাঠ্য। ক্যাণ্ট জোরের সহিত বলিয়াছেন;—"মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেই স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়। আমাদিগের শক্তি সমূহ স্বাধীনভাবে ধীরতার সহিত ব্যবহারে আনিতে চাহিলে আমাদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত হইতে হইবে। এ বিষয়ের প্রথম চেষ্টার ফল স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ হইবে কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমরা ক্রমশঃ প্রকৃত পথ দেখিতে পাইব, কারণ ঈশ্বর মানব জাতিকে মুক্তিলাভের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।'—এ উক্তির ফলাফল বিচার ভারতে আবশ্যক হইয়াছে; বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকা শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তকাখানি পাঠ করিলে চিন্তা করিবার মত অনেক তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

চরকা শিল্প শিক্ষা প্রণালী ;—শ্রীমতী কুমুদিনী সিংহ শিল্পশাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। লেখিকা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত চরকাশিল্প শিক্ষালয়ে হাতেহাতিয়ারে চরকার ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া "শিল্পশাস্ত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও উপদেশের মূল্য আছে। তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। চরকা-শিল্পশিক্ষার্থীর ইহা উপকারে আসিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'
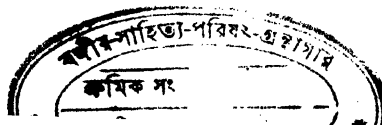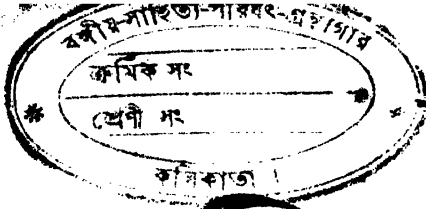
৫ম বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল। { ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

অগ্র পশ্চাৎ।

-:*:-

ভবিষ্যতের মন্দির হবে বর্ত্তমানের ঘর,
চন্দ্রমারি কিরণ হবে খর রবির কর।
দর্শনীয় খড়্গ হবে রক্ত-রাঙা অসি,
তত্ত্ববিদের বিদ্যা হবে বর্ত্তমানের মসি।
আজিকার এই রক্তারক্তি ভাবীর ইতিহাস,
ভবিষ্যতের সিদ্ধি হবে বর্ত্তমানের আশ।
অদ্যকার এ মৃণাল হবে ভাবীর শতদল,
ঊষারাণীর মুক্তা হবে নিশার আঁখি জল।

বর্ত্তমানের মরম বেদন ভবিষ্যতের গান,
ভবিষ্যতের মূলধনই যে বর্ত্তমানের দান।
বর্ত্তমানের আলোক হবে ভবিষ্যতের ছায়া,
ভবিষ্যতের মুক্তি হবে বর্ত্তমানের মায়া।
বর্ত্তমানের আকুল বেলা ভবিষ্যতের কুল,
ভবিষ্যতের নির্ম্মাল্য বর্ত্তমানের ফুল।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অহঙ্কার।

—:•:—

(১)

আমি সন্ন্যাসী! চর্ম্ম-চক্ষে সন্ন্যাসী দেখেন নি এমন লোক খুব কমই আছেন, কিন্তু সন্ন্যাসী হ'তে সকলেই তো পারেন না; আমি হয়েছি! কতবড় গৌরব আমার, প্রথম যখন নিজের ভাগের অর্দ্ধেক জমিদারী অম্লান মুখে বুক ফুলিয়ে দাদার হাতে তুলে দিলাম,—ওঃ সে কি দিন আমার, স্বর্গ থেকে যেন বিজয়-মুকুট আপনি মাথায় নেবে এল!

ভাবলে হাসি পায় গো, ভাবতে গেলে এখন হাসি পায় আমার! এখন বুঝতে পারি সে মুকুট কি দিয়ে তৈরী ছিল,—সে যে হাজারজনকার প্রশংসায় আমারই অহঙ্কার দিয়ে গড়া হয়েছিল, তার কর্ত্তা ছিলাম আমি, আমার কর্ত্তাকে তখনো আমল দিইনি তো!

বাবা মৃত্যুর আগে নির্জ্জনবাসের জন্য এই গঙ্গাতীরের আশ্রামটা তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন, এখন তাই আমার কাজে লাগ্‌ছে! পড়ার বাতিক চিরদিনই খুব ছিল, তাই এমন নির্জ্জনেও বেশ দিন কেটে যায়! আমার জীবনে যে কোনো একদিক খালি আছে

এমন বার্ত্তা তো আমার মন কখনো জান্‌তে পারতো না! যদি তা জানা থাকৃতো তা হ'লে আর আজ এ কাহিনী গ'ড়ে তুল্‌তে হ'ত না!

সন্ন্যাসী যে কা'কে বলে তা অবধি জানতাম না যখন, তখন এসেছিলাম এই পথে, ভাগ্যি এই জীবন-সমুদ্রের ধ্রুবনক্ষত্র কখনো কারো অগোচর হ'য়ে থাকেন না!

যখন বেরিয়ে আসি বাড়ী থেকে, তখন মাবোনেরা কাঁদ্‌ছিলেন; পিসিমা ছিলেন, তিনি তাঁদের আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে আমার এই দুদিনের খেয়াল আবার দুদিন বাদে সেরে যাবে; তাতে মা অত ভাবছেন কেন? কুড়ি বছর বয়সে মার পায়ে প্রণাম করে সেই যে ঘর ছেড়েছি, আজও তো ফিরি নি—!

আমি চিরদিনই সূর্য্যোদয়ের আগে গঙ্গার গর্ভে স্নান করতে নাবি, আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে ধ্বান্তারি দেবকে অর্ঘ্যদান ক'রে তারপর উঠে আসি! কি তৃপ্তি, কি শান্তিতে আমার বুক তখন কানায় কানায় ভ'রে ওঠে, সে অনির্ব্বচনীয়!

সে দিনও যখন—"ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে" বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিচ্ছিলাম সেই সময়ে হঠাৎ তীব্র একটা কান্নার শব্দে আমার শান্তির মাঝে দাঁড়ি টেনে দিলে! ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি একটী ভদ্রলোকের ছেলে হাতের রূপো বাঁধানো লাঠি দিয়ে ঘাটের ধারের জেলের বছর দশ বারোর ছেলেকে নিষ্ঠুরভাবে মারছে!

ছোট ছেলেটার কপাল কেটে গিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়্‌ছে বটে, তবু সে ছেলেটা জোর গলায় বিশ্রী রকম গালাগালিই দিয়া চলেছে এতটুকু নরম নয়, বাবু লোকটিও সে গালাগালির উত্তর দিয়ে চলেছেন লাঠিতে!

আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আগে ভাবতাম আমার কর্ম্মত্যাগ করেই বেঁচে থাকৃতে হবে, কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা তা হ'ল না, হৃদিস্থিত হৃষিকেশ আমার চুলের মুঠি ধরে কর্ম্মে টেনে নিলেন!

চোখের ওপর খুনোখুনি হয় দেখ্‌তে পারলাম না, ভিজেমাথায় ভিজেগায়েই তাদের মধ্যে গিয়ে প'ড়লাম! আমার গৈরিকবাসের ঝরাজল দরদর ক'রে ঝরতেই লাগ্‌লো; আমি তাদের ঐ কাণ্ড থামিয়ে দিলাম। বাবু লোকটী আমার দিকে ফিরে ইংরিজি, বাঙ্‌লা, হিন্দি মিশিয়ে ব'লে গেলেন যে, আমার মত ভণ্ড সাধু তিনি ঢের দেখেছেন, এবং আমার ভবিষ্যত বড় ভালো নয়!

তার সাম্‌নে কেবল একটু হাস্‌লাম, কি আর বল্‌বো ! কিন্তু আমি আজও অস্বীকার ক'রতে পারি নে যে আমার পূজাসনে সে দিন সমস্ত মনটাকে একত্র করে রাখ্‌তে আমি একটুও পারি নি !

যখন সন্ধ্যার আঁধার আমার নির্জ্জন আশ্রমখানি ভরিয়ে তুল্‌লে ; পত্র-ঘন গাছের ঝোপে ছায়ার তলায় জোনাকির আলোর ঝাঁক জ্বলে উঠ্‌লো, তখনো আমি বেলতলায় মাটীর ঢিপির ওপর চুপ করে বসে আছি ! সকাল বেলার ঘটনা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম !

হঠাৎ চোখে আলো লাগ্‌তেই চমকে উঠ্‌লাম ; আমার এখানে আবার আলো এল কোথা থেকে ?

একজন সাদা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এসে আমাকে ব'লে গেলেন যে সকাল বেলায় আমি যে ভদ্র যুবকটিকে অপমানিত করেছি, তিনি যে-সে লোক নন, এখানকার সুবিখ্যাত বড় লোক মাধব বাবুর ছেলে মণীশ বাবু !

জেলেটা নাকি ছেলে নিয়ে গিয়েছে হাকিমের বাড়ী, থানাতেও গিয়েছিল, যদি গোলমাল বাধে, আমি যেন বুঝে চলি !

হেসে ব'ললাম কি রকম বুঝে চল্‌তে বলেন আমাকে ?

ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন "তা আর বুঝলেন না, ! বড় লোকের মানপ্রাণ বজায় রেখে চল্‌লে কি আর লাভ ছাড়া লোকসান আছে ?

বল্‌লাম "আমার আবার লাভলোকসান কি আছে ?"

কুটিল হাসি হেসে সে বুড়ো লোকটি বললেন "ধরুন বড়লোকের সম্মান রক্ষায় সাহায্য ক'রে শ'কয়েক যদি পেয়ে যান সেটা কি লাভ নয় ?"

বড় হাসিটাই চেপে গেল্‌াম। দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি হেলায় ছেড়ে দিয়ে এ-সেছি শ' কয়েক টাকা হবে আমার লাভ ? বল্‌লাম "না আমার কাছে টাকা লাভের বিষয় নয়, কিন্তু আমি যা সত্যি তাই ব'লবো, মিথ্যে কথা কিছুই বলবো না, এইটুকু শুনে রাখুন !"

"ধার্ম্মিক, দেবতাস্বরূপ আপনি বাবা, ভদ্রলোকের মানপ্রাণের খাতিরে—"

"কিছুনা, কিছুনা আমার কাছে কেবল সত্যিকথাই পাবেন, তাতে ভদ্রলোকের মানও নেই, গরীব লোকের প্রাণও নেই! তবে যে বল্লেন আমি তাঁকে অপমানিত করেছি, একথার অর্থ কি তা বুঝতে পারলাম না,—আমি তাঁকে অপমানিত ক'রলাম কিসে?"

বুড়ো মানুষটি দেখলাম বেশ চটে উঠেছেন, বল্লেন "কিসে যে কি করেছেন, অত হিসেব আমার কাছে নেই, শুনি সন্ন্যাসীর ভড়ং ধ'রলেই ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সব নখদর্পণে দেখা যায়, তাই দেখুন না ভাবনা কি? আমি ভাল ভেবেই ব'ল্তে এসেছিলাম তা তো কর্ণপাত করা হ'লনা, মাধব বাবু বড় হাল্কা লোক নন!" সন্ন্যাসীর উত্তেজিত হ'তে নেই, অনর্থক বাদানুবাদ করতে নেই, তাই আমি চুপ করে রইলাম, ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক গম্ভীর মুখ ক'রে চলে গেলেন।

পলিত কেশ, গলিত দন্ত, শিথিল চর্ম্মে, যে মানুষ যাত্রা-পথে চলেছে এখনো তার মিথ্যের ভয় নেই? ছুটো টাকা! টাকা কি ওঁর সঙ্গে যাবে? এখনো নিজেকে অমর ভাবে, যুধিষ্টির সত্যি কথাই বলেছিলেন, "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"!

(২)

জেলের ছেলেটা আমাকে সাক্ষী মেনেছে! আমিও স্বীকার করেছি। আহা রক্তাক্ত বালকটার বড় আঘাতই লেগেছিল, আমি না থাকলে নর-পশুটা সত্যিই ওকে খুনই করতো বুঝি! জেলে, ছেলে নিয়ে হাঁসপাতালে আছে শুনলাম!

হায় রে তবুও আমি! এ ছাই অহঙ্কার কই যায় না তো! প্রাণের প্রাণ প্রিয়তম আমার! এ আমিত্ব চূর্ণ ক'রবে কতদিনে প্রভু! নিজেকে হারিয়ে তোমাকেই কর্ত্তা মনে ক'রতে পারবো কতকালে? সন্ধ্যায়ও সেদিন গঙ্গার ধারে ব'সেছিলাম। চোখের উপর একটী প্রদীপ্ত চিতা ধূধূ ক'রে জ্ব'লছিল, অনিমেষ চোখে তাই চেয়ে চেয়ে দেখিছিলাম!

চোখের সাম্‌নেই একটী ষোল-সতেরো বছরের গৌরকান্তি তরুণ যুবাকে ধরাধরি ক'রে চিতায় তুলে দিল, দেখ্‌লাম! সতেরো বছরের সযত্নপুষ্ট দেহখানার শেষ তো ওই এক মুঠো ছাই! রূপবান ব'লে আমারও খ্যাতি ছিল, তাই একবার নিজের দেহখানার দিকেও চেয়ে দেখ্‌লাম, চামড়াটা ফরসা ব'লেই ছাইতো, ছাইয়ের মতই ছাড়া অন্য কিছু হবেনা আমার!

অনন্ত ভাবনায় স্রোত বয়ে গেল মাথায়! একটু পরে যখন চিন্তার বৃহৎ আলোকটা স্তিমিত হ'য়ে আস্‌ছে দেখলাম, তখন আমি সেখান থেকে ফিরে আস্‌ছিলাম, পথে যে যায়গায় সেদিন সেই রক্তপাতটা দেখেছিলাম সেখানটায় একটু থম্‌কে গেলাম!

পায়ে যদি খানিক রক্তমাখা মাটী লেগে যায় তো তাতে আমি খুসী হবো না; কেন না রক্তের লালিমাকে কেন কি জানি, চিরদিনই কেমন ভয় ক'রেই আস্‌ছি, তাই আগে থেকে সাবধান হ'তে গেলাম, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলাম না, কোনো রকমে আন্দাজে আন্দাজে পাশ কাটিয়া এসে আশ্রমে এসে ঢুকে প'ড়লাম!

কোন্ কালে এই আশ্রমের উঠো'নে একটা যজ্ঞডুমুরের গাছ ঝড়ে ভেঙ্গে প'ড়েছিল; তার ডালপালা আর সব দেশের লোকে কেটে নিয়ে গিয়েছিল, কেবল প্রকাণ্ড মোটা গুঁড়িটা মাঝ উঠোনে প'ড়েছিল। সেটা কেউ নিয়ে যেতে পারেনি। মধ্যে মধ্যে সেটা আমার আসনের কাজ ক'রতো, শুধু আমি নই, দেশের ছেলে পিলেরাও কেউ কেউ তাকে ঘোড়া নাম দিয়ে তাতে চ'ড়ে খেলা ক'রতো!

আশ্রমে আমি ঢুকতেই সেই গুঁড়িটার ওপর থেকে ডাক এল "ঠাকুর, এলেন নাকি?"

আশ্চর্য্যভাবে বললাম "কে?"

সেই মাধববাবুর ছেলে মণীশবাবু এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন, বললেন "বসুন ঠাকুর, আমাকে আপনার দয়া ক'রতেই হবে, তা নইলে আমি আজ এখান থেকে উঠ্‌বো না, পুলিশ এসে আমাকে নিয়ে যায় তো সে আপনার সুমুখ থেকেই নিয়ে যাক্।"

রসহীন শুক্‌নো গলায় বল্‌লাম "আমাকে বৃথা এসব বলছো বাবা, আমি কাউকেই মারবার বা বাঁচাবার ক্ষমতা রাখিনে, পরিস্কার করে বল, তুমি কি আমাকে মিথ্যে কথা ব'লবার জন্যে অনুরোধ ক'রতে এসেছো?"

ছোকরা চুপ ক'রে থেকে একটু দম নিলে, বোধহয় বুদ্ধিবৃত্তিও একটু জাগিয়ে দেখ্‌লে, তারপর বল্‌লে "না হয় আপনি সত্যি মিথ্যে কোনো কথাই ব'লবেন না, তাতে তো আপনার আপত্তি হ'তে পারে না?"

"তাও পারে, আমি নিরপেক্ষ ঠিক হ'তে পারিনি, সত্যের দিকে সাক্ষী দেব স্বীকার করেছি যে!"

"আমার অনিষ্ট হ'লেই আপনি খুসী হ'ন দেখ্‌ছি! কিন্তু এত বড় লোকের ছেলে হ'য়ে যে আমি আপনার কাছে ভিখারী হ'য়ে দয়া চাইতে এসেছি এর জন্যে আপনি কিছুই ক'রবেন না?"

"কি ক'রবো বল, আমার ক'রবার তো কিছুই নেই, সর্ব্বশক্তিমান তো একজন আছেন, যদি অনুতপ্ত হ'য়ে থাক, বিপদে পড়ে থাক, তাঁকেই ডাকো।"

উগ্র জ্বালাভরা গলায় ছোকরা বল্‌লে "তুমিই ডাকো ঠাকুর তাঁকে, আমাকে উপদেশ দিতে এসো না,—আমি তোমার দয়া কিছু ওমনি চাইনি, পাঁচশো টাকা দাম দিতে রাজি আছি,—"

নিঃশব্দে উঠোন ছেড়ে ঘরে গিয়ে ব'সলাম,—আর যে সে কি কি বল্‌লে তা কান পেতে শুনলাম না, কেন না ওই লোকটাই যেন বিপদে প'ড়ে ক্ষেপে গেছে, আমি তো ক্ষেপিনি,—প্রলাপ শুনেও মন খারাপ হ'য়ে যাবে, শেষে হয়তো রাগও হয়ে প'ড়বে! রোগটাও কম ছোঁয়াচে নয় তো!

বহুক্ষণ পরে দেবমন্দিরের সেবকেরা আমার জন্যে নিয়মিত প্রসাদী শীতলী দিতে আস্‌লে পরে আমি আলো জ্বালালাম, দেখলাম মণীশ চ'লে গেছে! বাঁচলাম! সত্যিই আমার তখনও ভয় হচ্ছিল, যে, বুঝি বেরিয়েই আবার তাকেই দেখ্‌তে পাবো!

যারা শীতলী এনেছিল, তাদেরই জিজ্ঞাসা করলাম রাত ক'টা বেজেছে ব'লতে পারো?"

"পারি, এই একটু আগে থানার ঘড়িতে আট্‌টা বাজ্‌ল!"

"আট্‌টা মোটে!"

"হাঁ, আজ অন্ধকারটা বড্ড বেশী হয়েছে কিনা, তাই এখুনি রাত কত তা ঠাওর হচ্ছে না, আকাশ যে রকম মেঘ্‌লা হয়েছে খুব বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।" আকাশ পানে চেয়ে দেখ্‌লাম, তাই তো! একেবারে নিবিড় কালো মেঘে ঢাকা। দেবমন্দিরের লোকেরা চলে গেল। এ মন্দিরটি রঘুনাথ বিগ্রহের, এঅঞ্চলের একজন ধর্ম্মশীলা ধনী বিধবা এটা করিয়েছিলেন, আমার মত অনেক অতিথিই এখানকার শীতলীর ভাগ পেত, তবে আমি পেতাম ঘরে বসে, এই যা!

মন্দিরটী আশ্রম থেকে আধ মাইল দূরে, আরত্তির কাঁসর ঘণ্টার শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যেত, তবু লোকগুলি ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে গেল, পাছে মাঝ পথেই বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দ্যায়!

আমার কিন্তু এই বাদল রাতের সজল হাওয়া চিরদিনই ভাল লাগে, এমনি রাতে আমি গান গাইতে পারি! সব ভুলে গেলাম, এই যে কিছুক্ষণ আগে তুচ্ছ মণীশকে নিয়ে মনটা অনর্থক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল, মামলায় সাক্ষী দিতে হবে সেটাও অপ্রিয় মনে ক'রছিলাম, সব ভুলে গেলাম, যত নালিশ জমা হয়ে আছে সে সব তো—

"এমনি দিনে তারে বলা যায়।
ওগো এমনি ঘন ঘোর বরষায়!"

(৩)

এই সে দিন যে জেলেটা আমাকে অত জোরে সাক্ষী দেবার জন্যে সেধে গেল। ঘোর-ঘটা ক'রে মকদ্দমা করতে গেল, দেখে আমি তাকে বল্‌লাম যখন যে, "অত্যাচারীর শাস্তি ভগবানের হাতে ভার দিয়ে, তুমি ছেলের চিকিৎসায় মন দাও, ছেলে সেরে উঠলেই তো তুমি সব পেলে!"

তখন তার সে কি আস্ফালন! অন্যায়ের শোধ তুল্‌বে বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো, বল্‌লে "ঘরে আমার যে তিন পুরুষের জমানো টাকা আছে সব আমি খরচ করে দেখি সুবিচার পাই কি না?"

তাতেও আমি তাকে রাগের মাথায় কিছু করতে মানা করেছিলাম, কিন্তু গোঁয়ার চাষা সে আমার কথা তখন শুনলে না, নালিশ করতেই গেল!

আজ দেখি যে, সেই জেলেটাই মাধব বাবুর বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তাঁদের পিতৃ-পিতামহের গুণ কীর্ত্তন করছে। লোকের মুখে শুনলাম যে মকদ্দমা মিটে গেছে; মণীশ বাবুরা নাকি নগদ দু'শো টাকা দিয়ে জেলেটাকে ঠাণ্ডা করে ফেলেছেন! বেশ কথা, আমিও শুনে খুব খুসী হলাম, গোলযোগ থেমে যাওয়াই সর্ব্বথা মঙ্গল। আমাকে মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্য এঁরা পাঁচশো টাকা অবধি রাজি ছিলেন দিতে, মিটে গেল দু'শো টাকায়!

কিন্তু বুঝলাম, গীতা কেন বলছেন 'গেহহীন ভ্রমণ করতে হবে।' তা যদি করতে পারতাম তা হ'লে বোধ হয় ভালোই হ'ত! সহায়হীন, সম্বলহীন, ঘুরে বেড়ানোই ঠিক

কর্লাম! মনে হচ্ছে এই এক যায়গায় গোড়া-গেড়ে পড়ে থাক্লেই বন্ধু ও শত্রুর দল তৈরী করে ফেলবো!

সঙ্কল্প কাজেই পরিণত কর্লাম। হাঁটা পায়েই আশ্রমটা ছেড়ে দিলাম। সমস্ত রাত্রিটা হেঁটেই চলেছি, কোথায় যে থামবো তা ঠিক করতে পারছিলাম না, রাত্রের ঠাণ্ডায় কষ্টও বুঝছিলাম না তেমন। বেলা দশটা আন্দাজের সময় একটা নাগেশ্বরী ফুলের গাছের নীচে ব'সে পড়লাম।

সুমুখে মস্ত একটা মাঠ, মধ্যে একটা তালগাছ-ঘেরা পুকুর দেখা যাচ্ছিল। পুকুরের কিছু পূর্ব্বে একটা দোতলা বাড়ীর ছাতের আলসেয় খানকতক কাপড় ঝুল্ছিল, একখানা চওড়া লাল পেড়ে, একখানা রঙীণ ডুরে দেখে মেয়েদের কাপড় বলে চেনা যায়।

নাগেশ্বরীর ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়ছিল, তারি তলে আমি দু'চোখ বন্ধ করে বেশ বসে ছিলাম, একটী আধাবয়সী স্ত্রীলোক এসে আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রলে! তখন মনে হ'ল যে, এই গৈরিকের খোলস ছেড়ে এলেই বুঝি নিরাপদ হ'তাম! আমিও স্ত্রীলোকটীর প্রণামের উত্তরে যোড়হাত ক'রে নমস্কার কর্লাম, সে অবাক্ হয়ে একটু দাঁড়ালে, তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল!

বেলা ১২টার সময় একেবারে দলে দলে লোক এলো আমাকে দেখ্তে, যেন আমি কোন উদ্ভট জীব! বুঝ্লাম প্রথমা স্ত্রীলোকটীই রটিয়ে দিয়েছে যে মাঠে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। যে একথা শুনেছে সেই আমাকে দেখ্তে আস্ছে, আমিও একেবারে সত্যিকার শালগ্রামের মত অনড় অচল হ'য়ে ব'সে রইলাম, না থেকে আর কিই বা কর্বো!

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়, একটী ষোড়শী, বছর বারো-তেরোর একটী ছেলে সঙ্গে ক'রে আমার কাছে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালে! মেয়েটি দেখে ভদ্র ঘরের ব'লেই মনে হ'ল, আমি কিন্তু অনাবশ্যক কোনো প্রশ্ন কর্লাম না। ছেলেটি বললে "ঠাকুর, একবার এঁদের বাড়ীতে যাবেন?"

আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম "আমি?"

"হাঁ, এর মায়ের অসুখ হ'য়েছে, একটু দেখ্তে যাবেন? তিনি উঠে আস্তে পারেন না ব'লে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন!"

"আমাকে? কিন্তু আমি গিয়া কি ক'রবো বল, আমি তো ওষুধপত্র কিছু জানিনে আমার চেয়ে কোনো ডাক্তারকে নিয়ে যাওগে না কেন?

এইবার মেয়েটী কথা বল্‌লেন,—"ওষুধের জন্যে নয়, তিনি একটু দেখ্‌তে চান শুধু!

কি মুস্কিল! যাক্ স্বীকার কর্‌লাম, বললাম "চলো যাচ্ছি,—এই রাতেই যাব?"

তারা দু'জনেই বল্‌লে "চলুন।"

আবার এক ক্রোশ পথ হেঁটে ঘন বনের মধ্যে একটা অতি পুরাণো বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম।

বাড়ীটা এক কালে বোধহয় প্রকাণ্ড তিন চার মহল অট্টালিকা ছিল, এখন এমন দশা যে, অধিকাংশ ঘরেরই ভিত আছে ছাত নেই, একটা কি দুটো ঘরের ছাত আছে, কিন্তু ঢুক্‌তে ভয় হয়, বুঝি ছাত মাথায় ভেঙ্গে পড়ে! ভাঙ্গা ইঁটের উঁচু উঁচু ঢিপির ওপরে বড় বড় গাছ হ'য়ে বন হ'য়ে রয়েছে! মেয়েটী আমাকে সঙ্গে ক'রে এই বাড়ীতেই ঢুক্‌লেন!

একটা ঘরে ঢুকে দেখি কি সর্ব্বনাশ! একটী মরণাপন্না বুড়ী শ্বাস টান্‌ছে! এখন যে আমি কি ক'রে কি ক'রবো ভেবে পেলাম না! সে মেয়েটী তো তাঁর মায়ের মুখপানে চেয়ে কাঁদ্‌তে বস্‌লেন, আর আমিও চুপচাপ্ বসে ব'সে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লাম! আমাকে যে এ বুড়ী কেন দেখ্‌তে চাইলেন, তা জানিনে, কিন্তু আমি এলেও দেখা তো হ'ল না, কেন না ওঁর তো আর জ্ঞান নেই কিছু! সঙ্গে যে ছেলেটী দেখেছিলাম সে অন্য লোকদের ছেলে; সে পথে থেকেই নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে!

ব'সে বসেই রাত কাট্‌লো। স্ত্রীলোকটার যন্ত্রণাময় মৃত্যু চেয়ে চেয়ে বেশ ক'রে দেখ্‌লাম! সৎকারের ব্যবস্থার সময় তাঁর মেয়ে বল্‌লেন যে নদী বেশী দূরে নয়, নদীতে ডুবিয়ে দিলেই হবে! ভাবলাম; এরা তো হিন্দুই বোধ হচ্ছে তবে দাহ করা হবে না কেন? কোনো জ্ঞাতিও কি কোথাও নেই এদের? সকাল হ'য়ে গেল, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখ্‌তে পেলাম না!

একটা ছোট লোকের ঘরের খুব লম্বা, বিকট চেহারার মেয়ে এসে জোর গলায় হাঁক ডাক লাগিয়ে দিলে! তারই মুখে শুনলাম যে কাল রাত্রে মরেছে সে পতিতা, তাই এই মড়কে

অরা জনহীন দেশে মেয়ে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল! ওর সৎকারের জন্যে কেউ আসবে না! মাথা নীচু ক'রে পতিতা মৃতার মেয়ে তখনো খুব কাঁদছিলেন, তাঁর নির্ব্বাক কান্না যেন আর থামতে চায় না! মনে মনে বললাম এ আমায় কোথায় এনে ফেল্‌লেন ভগবান! এখনে তোমার কোন্ কাজে আমাকে যন্ত্র হ'তে হবে ব'লে দাও, বুঝিয়ে দাও!

সকাল থেকে বেলা দুপুর হ'য়ে গেল মরার গতি করতে। তারপর যখন কাউকে কিছু না বলে আবার বেরুবার যোগাড় ক'রছি, সেই মেয়েটী এসে পায়ের গোড়ায় আছড়ে প'ড়লেন! থ'মকে দাঁড়ালাম, ভাবলাম নিজেই বুঝি যা ব'লবার আছে—অ বল্‌বেন; কিন্তু তিনি কিছুই বল্‌লেন না!

বাধ্য হয়ে বল্‌লাম "কিছু বল্‌বেন আমাকে?"

"ভগবানের দূত আপনি, আমারও একটা গতি করে দিয়ে যান, আমি কোথায় যাবো?"

"তার জন্যে আমি কি করতে পারি বলুন, আমাকে যদি কোনো কাজে লাগাতে পারেন তো তাতে আমার এতটুকুও আপত্তি নেই, বলুন আপনি কোথায় যেতে চান?"

"কোথায় যেতে চাইব আমি, আর যে আমার কোনোখানে একটু দাঁড়াবারও ঠাঁই নেই!"

"তবে?"

"কিন্তু জানেন না দেবতা আপনি জানেন না যে, এই প'ড়ো বাড়ীতে একা থাকা আমার পক্ষে কি ভয়ানক! আমি পতিতার সন্তান বলে নিজেও তো তাই নই, এখানে অসহায় থাকলে বাধ্য হয়ে তাই হতে হবে আমায়! রক্ষা করুন! আপনি আমায় নিয়ে চলুন!"

"আমি কোথায় নিয়ে যাব? আমি হয় তো মাঠে বসে রাতের পর রাত দিন বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে কাটাবো,—"

"তা হ'লেও আপনাকে কিছু বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে, আমাকে কাশীতে রেখে আস্‌বেন? মার গুরু আছেন সেখানে, তিনি হয় তো আমাকে একটু আশ্রয় দিলেও দিতে পারেন,—এখানে থাকা যতখানি অসম্ভব, যাওয়ার জন্যে সঙ্গী সংগ্রহ করাও ঠিক ততখানি অসম্ভব।"

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে ভাবলাম। আমি এই মেয়েটীর এই উপকারটুকু কর্‌তে পারি কি না? যদি লাভ ক্ষতি বিচার কর্‌তে যাই তো আমার লাভ এই যে এ তল্লাটের লোকে সচরাচর গেরুয়া রং দেখলেই ভণ্ড জোচ্চোর এই সব বলে থাকে, আমি এই মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমার প্রতি এঁরা আরো সরস বচনই বলবেন নিশ্চয়! চিরদিনের জন্য কি সন্ন্যাসী নামে কলঙ্ক দেব?

মুহূর্ত্তের মধ্যে মনের সে অবস্থা সাম্‌লে নিয়ে ভাবলাম—দূর হ'ক, আমার আবার নিন্দে অপমানের ভয় কি? ভয় করবো যা আসল সত্যিতে আর ধর্ম্মকে! সাধ্যি থাক্‌তে এঁর এতবড় অনিষ্টের মধ্যে আমি এতটুকু সাহায্যের চেষ্টা ক'রবো না? বললাম "আচ্ছা, তাই চলুন। এখান থেকে কি রকম করে ষ্টেষণে যাওয়া যাবে আমিতো জানিনে." "আমি জানি নৌকো ক'রে যেতে হবে, চলুন নদীর ধারে নৌকো মিলবে, বেলা চারটেয় একটা ট্রেণ আসে তাইতে যাওয়া যাবে! এই ট্রেণেই আমরা সেবার কাশীতে গুরুদেবের কাছে গিয়েছিলাম, তাই জানি।"

প্রশান্ত মনে বল্‌লাম "তা বেশ, তবে তাই চলুন।"

নৌকোয় করে যখন নদী পার হচ্ছিলাম তখন তীরে কত লোক আমায় দেখে ঠাট্টা করে হাস্‌ছিল দেখলাম, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আমাকে শুনিয়ে বলছিল যে "বাবাজী রোজগার ক'রে চলেছ!" আমি যেন কানে তুলো দেওয়া গোছের ক'রে ঊর্দ্ধ প্রসারিত অনাদি অনন্ত নীল আকাশপানে চেয়ে ব'সে রইলাম! তবুও যে সঙ্কুচিত একটুও হইনি, এমন নয়!

মানুষ তো চিরকালই মানুষ। গেরুয়া পরে ত্যাগের পথে,—সংযমের পথে যেতে যত চেষ্টাই করুক, তবু সে দেবতা নয়, সে আর পাঁচ জনকার মতনই একটা মানুষ, মানুষের উপাদানেই তার দেহ গড়া!

ষ্টেষণে এসে সেই অগণ্য লোকের ভিঁড়ে হুড়োহুড়িতে আমার সঙ্গের সেই তরুণী মেয়েটি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর আমি তখন সত্যিসত্যিই একটী কাজের লোক হ'য়ে ছুটোছুটী ক'রে গেরুয়া কাপড়ের আর এক দফা অপমান করলাম! যখন একটা মেয়েদের কামরায় সে মেয়েটিকে তুলে দিয়ে নিজের স্থান খুঁজ্‌তে চাচ্ছি, তখন হঠাৎ একবার

সে কৃতজ্ঞভাবে আমার দিকে চাইলে, আমি না দাঁড়িয়ে চ'লে এলাম বটে, তবু মনে হ'ল মেয়েদের চক্ষের দৃষ্টিতে সত্যিই মাদকতা আছে !

(৪)

যে সন্ন্যাসী একটা ষোল বছরের রূপসী মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার ভাগ্যে এ সংসার যা চাপায় আমিও তাই পেয়েছি, সে অন্যায় নয়, অবিচার নয়, কিন্তু যথার্থ কিছুও নয় ; আমি কিন্তু এতে তাঁরই নিপুণতা দেখ্‌তে পাই, তাই চুপ ক'রে আনন্দ-ভোগ করি !

ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসি তখন যে শ্রদ্ধা সম্মানের মুকুট প'রে এসেছিলাম নিজেকে তারি জোরে মহৎ মনে ক'রতাম, অসাধারণ মনে ক'রতাম, সেই অহঙ্কারের বলেই বোধহয় অনেক অসুবিধা ভোগ করেও এ পথ ছাড়ি নি, তাই এতদিনে সে নকল মুকুট নাবিয়ে প্রভু আমাকে কলঙ্কের মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন দেখবেন আমি বইতে পারি কি না ?

কাশী এসে তো গুরুদেবকে পাওয়া গেল না। তাঁর খালি বাড়ীখানায় একটা বেহারী চাকর আর একটী খুব বুড়ী পশ্চিমে ঝি এই দুজনে ছিল, তারা বাড়ীর পাহারা দিচ্ছিল ! গুরুদেব ও তাঁর স্ত্রী গিয়েছেন শুনিলাম হরিদ্বারে। সেখান থেকে সম্ভবতঃ বদরীনারায়ণে যাবেন।

আমার সঙ্গের মেয়েটীকে এতক্ষণ আপনি বলে কথা বলছিলাম, কিন্তু সে তা পছন্দ ক'রলে না, বল্‌লে আমাকে নাম ধরে তুমি ব'লে কথা ব'লবেন্, আমি কি আপনার চেয়ে বড় নাকি ?

আমি হাসলাম, বললাম, "তোমার নাম তো আমি জানিনে।"

"আমার নাম রমা, আমায় রমা ব'লে ডাকুন।"

"আচ্ছা ডাকবার দরকার হ'লে ডাক্‌বো, এখন আমাকে কি করতে হবে ?"

"কি আর ক'রতে হবে ? এইখানে থাকুন না, যে ক'দিন গুরুঠাকুর না আসেন সে ক'দিন আমরা খালি বাড়ীখানারই অতিথি হ'য়ে থাকি, তিনি এলে অবশ্য আপনার মত সন্ন্যাসী মানুষের সমাদরের অভাব হবে না।"

গম্ভীর হ'য়ে বললাম, "অসম্ভব ! আমি এখানে মুহূর্ত্তমাত্রও তিষ্ঠুতে পারি নে।"

রমা খুব বেশী রকম আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে "কেন ? তিষ্ঠুতে পারেন না কেন ?"

"না,—আমি চ'ল্‌লাম,—তোমাকে তো পৌঁছে দেওয়া হ'ল, আর আমাকে আটক কর কেন ?"

"না, আচ্ছা, আপনাকে আমি আট্‌কাবো না. কিন্তু যদি কখনো আপনার দর্শন ইচ্ছা করি কোথার গেলে মিল্‌বে ব'লে দিয়ে যান।"

"কোনোখানে গেলে মিলিবে না ধরে রাখো রমা, আমি সপ্তাহ পূর্ব্বে ভাবি নি যে সপ্তাহের মধ্যে আমি কাশী আস্‌তে বাধ্য হবো, সুতরাং আমার কথা আমি কিছুই জানিনে।"

"কেন জানেন না বলুন তো ? আপ'নি সন্ন্যাসী হ'য়ে বেড়াচ্ছেন কেন তাইতো আমি ভেবে পাইনে, আচ্ছা আপনার কি সম্প্রতি স্ত্রী বিয়োগ হ'য়েছে ?"

হাসি সামলাতে পারলাম না! হাস্‌তে হাস্‌তে বললাম "না, ও ব্যাধি আমার হয় নি এখনো, এবং কখনোই হবে না, কেন না আমি বিয়েই করি নি।"

উঃ! 'নারীর মদির দৃষ্টি উড়ন্ত জীবকেও তীরের মত গেঁথে নাবিয়ে ফেলতে পারে,' তা ঠিকই! কি মায়ার পুতুল এরা ? এরা যে মা, মমতাই এদের অস্ত্র! আমাকে বিদায় দিতেও রমার চোখে ব্যথার অশ্রু ঘনিয়ে এলো। তবু আমি তো ওর কত অল্প দিনের পরিচিত, কোনো বাঁধনই আমার সঙ্গে ওর নেই; যা টান্‌তে গেলে লাগে এমন,—তবু মায়া!

রমা বল্‌লে "তবে আপনি বিরাগী হ'তে গেলেন কোন্ দুঃখে ? ঘরে ব'সে বুঝি আর ধর্ম্ম হয় না ?"

বল্‌লাম "এই কথা নিয়ে কি এখন তর্ক ক'রতে হবে ? কোন্ দুঃখে যে লোকে বিরাগী হয় তা আমি বল্‌তে পারি নে, তবে আমি হ'য়েছি সুখে।"

"সুখে ?"

"হ্যাঁ,—সুখ কি সবারি সয় ? আমার সইলো না, তাই ঘর ছেড়ে বেরুলাম, হ'ল তো উত্তর,—এবারে যাই রমা।"

"কোথায় যাবেন এখন ?"

"আবার! এক কথা কতবার শুন্‌বে বল তো! আমার কি যাওয়ার ঠিক আছে, না থাকার ঠিক আছে ?"

"তাও তো বটে! আমরা নিজেদের মতই সবাইকে মনে করি কিনা, তাই এক কথা একশো বার জিজ্ঞাসা করছি, যাক্ তবে একটু দাঁড়ান, একটা প্রণাম করি"

রমা বেশ ক'রে গলায় আঁচল দিয়ে আমাকে প্রণাম ক'রলে, আমি সেই গলির ভেতরকার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গার ধারের রাস্তায় চ'ললাম! এর আগেও মায়ের সঙ্গে, বাবার সঙ্গে আমি বার তিনেক কাশী এসেছিলাম। তখনো আমার নজর কেবল সাধু-সন্ন্যাসীদের খুঁজে ফিরতো, কাজেই অনেক আড্ডাই চেনা-শোনা ছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌তাম তিনি ব্রাহ্মণও নন পোষাক-পরা সাধুও নন, কিন্তু ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, জ্ঞানী, আগে অধ্যাপক ছিলেন, এখন পেন্সন পান। কলেজে সংস্কৃত পড়াতেন ব'লে এঁকে সবাই পণ্ডিত মশায় ব'লতো।

প্রথমে গঙ্গায় গিয়ে স্নান ক'রে দেহ মন ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে তারপর গেলাম তাঁর কাছে! তিনি তখন ঘরের মেঝেয় শীতলপাটি পেতে ব'সে আশী বছর বয়সেও বিনা চশমায় উপনিষদ প'ড়ছিলেন। তাঁর ঘরে এর আগে যতবার ঢুকেছি ততবারই প্রায় আড্ডা জমে আছে দেখেছি, এবার নির্জ্জন বাড়ী দেখে বাইরে থেকে ভয় কর্‌ছিলাম বুঝি ইনিও ঘরে নেই, ঘরে গিয়া দেখা পেয়ে কৃতার্থ হ'লাম।

তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "অতুল যে! এখানে হঠাৎ এলে কি রকম?"

বল্‌লাম "কেন, তীর্থস্থানে হঠাৎ আসা বুঝি আস্‌তে নেই?"

"আছে বই কি, খুব আছে,—তবে কারণ ভিন্ন তো কার্য্য হয় না, তাই একটা ওই ধরণের প্রশ্ন কর্‌লাম, তুমি তা হ'লে তীর্থ কর্‌তেই এসেছ বল।"

"না না, আমি ইচ্ছে ক'রেও আসিনি, তীর্থ কর্‌তেও আসিনি, যিনি সকল কার্য্য কারণের কর্ত্তা তিনিই কান ধরে টেনে এনেছেন আমায়,—আজই মুক্তি পেলাম।"

"কি রকম?"

রকমটা সমস্ত তাঁকে ভেঙ্গে চুরে বল্‌লাম। রমাকে তার সেই মায়ের গুরুর বাড়ী রেখে এসেছি শুনে তিনি বল্‌লেন "আমার এখানে আন্‌লেও পারতে, এ বাড়ীতে তবু স্ত্রীলোক আছে, মেয়েটি কি বিধবা?"

[stamp: ...সা-পরিষৎ-গ্রন্থাগার]
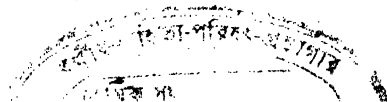
ব'ললাম "তাতো জানিনে।"

"কেন, এ তো দেখলেই বোঝা যায় ; সধবার বেশ কি বিধবার বেশ তাও চেনো না ?"

"চিনি, কিন্তু থান পরা নয় বোধহয়, অতো ভাল ক'রে দেখিনি, যাক্ আমি ত আশ্রয় মিলিয়ে দেব স্বীকার করিনি, গুরুর বাড়ী পৌছে দেব ব'লেছিলাম, তাই দিয়েছি, আপনার এখানে আনতে যাব কি করতে ?"

তিনি একটু হাসলেন। যাঁরা বল্‌বেন হাসি জিনিষটা হাল্‌কা, তাঁরা বোধহয় সব রকম হাসি দেখেন নি ; চব্বিশ ঘণ্টা যাঁরা গুরু-গম্ভীর বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান, উপনিষদ ও পুরাণ-গুলির আমূল ঘেঁটেঘুটে শঙ্কর ভাষাগুলির উপরও নিজের ভাষ্য চালিয়ে যাঁর রাতের পর রাত কাবার হ'য়ে যায়, তিনিই যখন বালকের মত কথায় কথায় হেসে ওঠেন, কত মিষ্টি যে সেই হাসি তার গভীরত্ব হাল্‌কা জিনিষ নয় !

তিনি ব'ললেন "ভালো,—এখন কিছু সেবাটেবা করবে ? মুখ তো শুকিয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি।"

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লাম "সেবা পেলে না বলিনে,—মুখ কিন্তু শুকোয় নি,—সন্ন্যাসীর মুখ শুকোতে নেই, কি প'ড়ছিলেন, পড়ুন না !"

"না আগে সেবা হ'ক তোমার, - ঘরে কিছু দুধ আছে খাবে ?"

"যা দেবেন !"

"তবে আগে চল, খেয়ে আসবে, তারপর তুমিই প'ড়বে, আমি শুন্‌বো।"

"আচ্ছা সেই ভালো, তা হ'লে চলুন।"

বাড়ীতে এঁর একটী বিধবা মেয়ে ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়া মেয়ে নেই, দুটী অনাত্মীয়া আছেন তাঁরা আশ্রিতা, এই বিধবা মেয়েটির বয়সই পঞ্চাশ হবে, আমার মায়ের চেয়েও ইনি বয়সে বড়, ইনিই আমার খাওয়ার জন্যে দুধ আর কিছু ফল এনে দিলেন।

পণ্ডিতমশায় আমার এই কাশী আসার কারণ বলবার সময় রমার কথাও মেয়েকে বল্‌লেন ; তাঁর মেয়েকেও আমি জবাব দিতে পারলাম না যে, রমা সধবা, না বিধবা, মনে মনে ভাবলাম একটু ভালো ক'রে লক্ষ্য করলেই হ'ত, রমা তো কই মাথায় কাপড় দিয়ে মাথাও ঢাক্‌তো

না চেষ্টা করলেই তো আমি দেখ্‌তে পেতাম, কিন্তু স্ত্রীলোকের মুখপানে চেয়ে কথা বলা অভ্যাস ছিল না, ব'লেই বোধহয় তা পারি নি ; তাছাড়া সে কুমারী কি বিধবা কিংবা সধবা এ-তথ্য জানবার তো আমার কোনো দরকারও ছিল না, আগ্রহও ছিল না !

আহার সেরে আবার যখন বাইরের ঘরে ব'সলাম তখন পণ্ডিতমশায় সন্ধ্যা আহ্নিক সারতে গেলেন। আগে তো দেখতাম ইনি এসব ক'রতেন না এখন দেখলাম করেন। ফিরে এলেন একটা জ্বলন্ত মোমবাতী হাতে ক'রে, বল্‌লেন "হারিকেনের চেয়ে মোমবাতিতে প'ড়তে সুবিধে বেশী হয়, নাও তুমি পড়া আরম্ভ করো আমি শুনি"

এমন আগ্রহ যদি শ্রোতার দেখ্‌তে পাওয়া যায় তো পাঠকের উৎসাহও বেড়ে যায়। আমি জান্‌তাম পণ্ডিতমশায় আমাকে পড়াতে বসেছেন, পড়া শুন্‌তে নয়, আমার কোনো কথায় যদি তিলমাত্র ভুলও হয়, তা উনি চোখ বুজে-বুজেই ধরে ফেলেন।

পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে, আনন্দে আমি আত্মহারা হ'য়ে প'ড়ে চ'ল্‌লাম, শীতের পর শুকনো নীরস মাটীতে শেষ মাঘের জলধারার মত আমার মনপ্রাণ ভিজিয়ে দিয়ে আনন্দের স্রোত ব'য়ে চললো ! চেয়ে দেখলাম পণ্ডিত মহাশয়ের মেয়েও মালা হাতে ক'রে এসে বসেছেন।

(৫)

নারায়ণ ! নারায়ণ ! একটী অসহায়া বিপন্না নারীর সাহায্যে লাগিয়ে আমাকে একি বিড়ম্বনায় ফেল্‌লে প্রভু ! এযে ছাড়ালেও ছাড়েনা, এমন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ালো আমার ! কে জান্‌তো যে এমন দশায় প'ড়বো, তাহ'লে আমি কখনোই উঠ্‌তাম না তখন সেই মাঠ থেকে !

গুরুর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে রমা আমাকে অনুরোধ করেছিল, আমি তাই তাকে সঙ্গে ক'রে কাশী এলাম, কোথায় গুরু ও গুরুপত্নী ! তাঁরা হরিদ্বারে গিয়াছেন শুনেও আমি সেই বাড়ীতেই রমাকে রেখে চলে এলাম ! দিন পাঁচছয় পরে অন্য কোনো একজন পরমহংসের সঙ্গে দেখা ক'রে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে ফিরছিলাম, রমার সঙ্গে দেখা হ'ল ! সে বেলা তিন প্রহরে স্নান ক'রে ফিরছিল !

আমাকে দেখে রমা থম্‌কে দাঁড়ালো, তারপর ভিজে কাপড়েই ঘাড় হেঁটকরে আমাকে প্রণাম করলে, বল্‌লাম "ভাল আছ তো রমা ?"

রমা হাস্‌লে, বললে "ভাল আছি বইকি,—"

"তোমার গুরুদেব ফিরেছেন ?"

"না, যেদিন আমি এলাম তার পরদিনই এবাড়ীতে অন্য এক নতুন ভাড়াটে বাবুরা এসেছেন, কি করি তাঁরা তো আমাকে খেদিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি ওঁদের রাঁধুনী হ'তে চাইলাম ওঁরা তাই রাখ্‌লেন, খাওয়া দাওয়া ছাড়া কিছু উপার্জ্জনও হচ্ছে, দু টাকা ক'রে মাইনে পাই"

"তুমি বামনী তো !"

"তা নইলে রেঁধে খাওয়াতে যাবো কেন ?

"কাজ ক'রতে ভালো লাগছে তো ! না লাগে তো আমার বাড়ীতে যেও তুমি বেশ থাক্‌বে"

পণ্ডিত মহাশয় আপনা হতে রমাকে এই কথা ব'ল্‌তেই রমার চোখ দুটী ভিজে উঠ্‌লো, সে বল্‌লে "বিপদে পড়লে যাবো বই কি ? তারপর বল্‌লে "আপনি ও কি এঁর বাড়ীতে থাকেন ?"

বল্‌লাম "একদিন আছি—"

"তা হ'লে একদিন গিয়ে দেখা ক'রে আসবো !"

হঠাৎ কাকে যেন দেখে রমা খুব ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো, তার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল দেখে মনে হ'ল খুব ভয় পেয়েছে কিন্তু কাকেই বা কি বলবো ভেবে আমি আর পণ্ডিত মহাশয় দুজনেই চলে এলাম।

পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে দিন কয়েক থেকে আবার আমি আমার সেই ত্রিদিবের আশ্রমে ফিরে এলাম। এইখানেই মাধব বাবুর ছেলের, জেলের ছেলের সঙ্গে মারামারির মাঝখানে প'ড়ে আমি অতিষ্ঠ হয়েছিলাম ! তবু পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেও দেখলাম, নিজেও দেখলাম যে নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রা না চল্‌লে মন কখনো স্থির

হ'তে পারেনা, আর অন্য কোনো গোলোযোগও এইখানে সবচেয়ে কম—তাই এখানেই ফিরে আসতে হ'ল।

আশ্রমের কাছাকাছি যারা থাকে সকলে আমাকে শ্রদ্ধা করে আনন্দ দান করে। সুমুখেই তরঙ্গময়ী পতিতপাবনী গঙ্গা বেয়ে চলেছেন, চিন্তার অবাধ অবসর এখানেই সব চেয়ে বেশী! এখানে ফিরে এসে শুনি যে রমাকে কাশী নিয়ে গিয়েছি ব'লে আমার নামে নানা রকম মিথ্যে দুর্নাম রটিয়ে দেশশুদ্ধ লোকে আমার ওপর লাঠি উঁচিয়ে আছে! আমি সত্যি কথা ব'লে কাকে বোঝাব?

আমার মুখোমুখী কেউ কোনো কথা না বল্‌লেও সব কথাই আমি শুনতাম। দিন দশ-বারো পরে একদিন বেলা দুপুরে গাঁয়ের লোকে আমাকে নোটিশ দিয়ে গেল যে, আর ঠাকুর বাড়ীর খাবার আমি পাবো না! আমার মন ভয়ানক বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো! একবার ভাবলাম, এ সেই আগুন, যে আগুনে খাদ পুড়িয়ে জিনিষকে আসল ক'রে দেয়,—কলঙ্ক দিয়ে ব্যাথা দিয়ে তবে তো শুদ্ধ হ'তো পাবো, কিন্তু এ ভাবনায় মনকে শান্ত করতে পারলাম না!

পণ্ডিত মশায়ের চিঠি পেলাম। রমাকে তার মনিবরা অনেক রকম অত্যাচারে কষ্ট দিচ্ছিল ব'লে তিনি তাকে নিয়ে গিয়ে মেয়ের কাছে রেখে দিয়েছেন, সে ভাল আছে আর আমাকে প্রণাম জানিয়েছে! বড় সুখীই কি হ'লাম আমি? কেন ম'রতে আমি রমাকে কাশী নিয়ে যেতে গেলাম!

আমি তখন সবে মাত্র গীতাখানা নিয়ে বকুলের ছায়ায় আসন পেতে বসেছিলাম, কিন্তু আমার তো স্বচ্ছন্দে দিন কাটতো,—মিছি মিছি আমি একি ছাই ক'রতে গেলাম। যদি এ-কাজ ভালো কাজ হ'ত, তা-হ'লে তো আমার আরো গৌরব পাওয়াই উচিত ছিল,—তা না হয়ে...।

অন্য মনে হাতের বইখানার পাতা উলটে-উলটে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। নিজের লাভক্ষতি খতিয়ে দেখ্‌ছে যে অহঙ্কৃত পতিত মন আমার; তার কি আর তখন গীতার মধুরতা বোধ থাকতে পারে? তবুও দুএকছত্র প'ড়ে গেলাম! আমি? আমি যে কাজ

করেছি—কে আমি? ঝোঁকে প'ড়ে কি একেবারেই গোড়া থেকে ভুল ক'রে চলেছি—মোহান্ধ চোখের সাম্‌নে গীতার অমৃতময় বাণী ফুটে উঠলো,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা—॥২৪॥

শ্রীনীহারবালা দেবী।

আহুতি।

জীবন-বেদীর 'পরে স্মৃতি বহ্নি জ্বালি
যে যজ্ঞ করিছ, হোতা, দিলাম গো ঢালি
এ প্রাণ আহুতি তাহে; জ্বলুক অনল—
শিখা তার হোক ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল!
সরবস্ব তুমি মম; আমি তোমা ছাড়া—
জলহীন নদী, যেন চক্ষু দৃষ্টিহারা!
অন্তর হতেই এসেছিলে বাহিরিয়া,
গিয়েছ গো পুন সেই অন্তরে ফিরিয়া।
এ জীবন—প্রতি দিবসের পাত্র ভরি,
যতনে তোমার তাই অধরেতে ধরি;
কর তুমি কর পান, প্রাণের দেবতা,
হউক সফল মোর সর্ব্ব ব্যাকুলতা।
যেমন চন্দন হয় ঘর্ষণে সফল,
ধূপের জীবন, মরি, অনলে কেবল!

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

যজ্ঞে।

—:*:—

মহাযজ্ঞের হোমাগ্নি আজ ভারতে প্রজ্জ্বলিত,—পাবক শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে দাউ—দাউ—দাও! আপামর সকলে প্রস্তুত হও,—অনন্যমনে—একাগ্রচিত্তে, যাহা কিছু আছে যাহার—আহুতি দাও পাবকে,—দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ কর সমস্তই! শত দরিদ্রের মিলিত শক্তি, মহাশক্তিতে পরিণত হইয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিয়োজিত হউক। ভুলিয়া যাও স্বার্থ, কেবল স্মরণে অক্ষয় হউক দেবতার কার্য্য, সার্থক হউক দেবতার সেবা! এ মহা বহ্নির মুখাগ্র হইতে তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করিতে হয় যদি করিবেন তিনিই,—ধ্বংশই যদি হয় মঙ্গলময়ের এ ব্রতের দান, রক্ষা করিতে পারিবে না কেহ। সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কর যজ্ঞেশ্বরে! মহাযজ্ঞ সাফল্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হউক—সর্ব্বকার্য্যে লক্ষ্য হউক তিনি—তুমি নহ।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি অকর্ম্ম, অকর্ম্মেতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম দর্শন করে, মনুষ্যগণ মধ্যে সেই বুদ্ধিমান্, সেই যোগী, সেই কর্ম্মানুষ্ঠাতা।

কর্ম্মে হও অকর্ম্ম,—কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের প্রাকৃতিক আহ্বানে ফলাভি-সন্ধানবিবর্জ্জিত হইয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, আপনার অজ্ঞাতে অনুসরণ কর তাঁহাকে! স্মরণে রাখ সর্ব্বক্ষণ, অনুকরণ উপচার নহে যজ্ঞ-সাধনা—উদ্দেশ্য নহে অনুষ্ঠান, লক্ষ্য তাঁহার মহাপূজা! মহাপূজায় যোগ দাও সকলে,—প্রাণপণ শক্তিতে লাগিয়া যাও! যে এ মহা-কার্য্যে যোগদান না করিবে তাহার রক্ষা নাই, উৎসবে মনকে জাগরিত রাখিতে হইবে সকলকেই, সর্ব্বান্তর্যামী মহাপুরুষ, জাগ্রত দেবতা আজ স্বয়ং আহ্বান করিতেছেন, নিজের স্বার্থ সুবিধা বিবেচনা করিবার অবসর আর কোথায়? ফলই বা কি? মূঢ়ের কথা শুনিও না,—মোহের বন্ধন মানিও না,—যদি শ্রবণে প্রবেশ করিয়া থাকে তাঁহার আহ্বান, প্রাণ অভিসারের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, সকল কর্ম্ম, সকল বন্ধন, সকল প্রাণীর সদগতি, আশ্রয় তিনি—যদি

মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিয়া থাক, ধাবিত হও তাঁহার উদ্দেশ্যে—তাঁহার হোমশিখায় সমস্ত আহুতি দিয়া তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার কার্য্যে আত্মসমর্পণ কর। সর্ব্বকার্য্যে যোগযুক্ত হও তাঁহাতে, জ্ঞান তিনিই প্রদান করিবেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥

এ সংসারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি কালে আপনাতে সেই জ্ঞান স্বয়ং লাভ করিয়া থাকেন।

স্মরণে রাখ— অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান, সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই, সুখও নাই।

স্বেচ্ছাচারের স্থান নহে তাঁহার জগত! কত মহা মহা রাজ্য সাম্রাজ্য, মহা মহা রথী, শক্তিমান পুরুষ ধ্বংশমুখে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে এই স্বেচ্ছাচারে, অতীত তাহার সাক্ষী,—ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দুরবস্থা তাহার জলন্ত প্রমাণ। সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার অনুভূতি, যে ভারতের বিশিষ্ট প্রকৃতি, প্রতিকার্য্য যাহার ধর্ম্মানুশ্লিষ্ট, লক্ষ্য যাহার ভগবান সেও আজ কোন পাপে স্বেচ্ছাচারে অসদগতি আনয়ন করিয়া চরম সীমায় উপনীত! যজ্ঞেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া অসুর প্রবৃত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই না এ ভোগ! দক্ষযজ্ঞের পুনরাভিনয়!

দক্ষ প্রজাপতি, স্বয়ং বিধাতা ব্রহ্মার মানসপুত্র, সর্ব্ব গুণের আধার, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, মহানায়ক;—সেই নেতৃত্বের অহঙ্কারে তিনি হইলেন আত্মহারা, বিস্মৃত হইলেন আত্মার সত্ত্বা, পরমাত্মাকে, চরম লক্ষ্যকে, সর্ব্বথবিদং ব্রহ্মজ্ঞান,—দেবতার অনন্ত রূপ তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল অহঙ্কারের অন্ধকারে। দক্ষের লক্ষ্য হইল আত্মসম্মান, পদগৌরব, প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা,—প্রার্থিত হইল আত্মসুখ! কামনায় জ্ঞান অপহৃত হইল, প্রকৃতিপরতন্ত্র হইয়া দক্ষ দম্ভে অহমিকার উপাসক হইলেন! গর্ব্ব হইল তাঁহার সর্ব্বস্ব! গর্ব্বিতের কর্ম্মে শিবের সহানুভূতি,

মহাদেবের আশীর্ব্বাদ লাভের আশা মরীচিকা! বিশ্বনাথকে, তাঁহার বিশ্বকে অন্তরালে রাখিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, সমষ্টি প্রতিহারে ব্যক্তিত্বের সাধনায় মেঘাবৃত করিয়া তুলিল দক্ষের তত্ত্বজ্ঞান! মনের অবস্থা যখন এইরূপ—নিমন্ত্রিত হইলেন তিনি অন্যতম প্রজাপতি ভৃগুর মহাযজ্ঞে! সর্ব্বদেবতা মহা মহা ঋষিগণ, সুধীগণ যে যজ্ঞাগারে সমবেত, ব্রহ্ম সাধনায়,—তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত, ভগবানের মহাসাধনামন্ত্রে সেস্থান মুখরিত—তাহাতেও দক্ষের বিশুদ্ধ সত্ত্বা উদ্ভূত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি যজ্ঞাগারে দর্শন পাইলেন না যজ্ঞেশ্বরকে,—তাঁহার নয়নে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল পদগৌরব। দেবতাঋষি সমূহকে যথ রীতি অভিবাদন করিলেন, দেহীর সম্মানে; শিব নত হইলেন না তাঁহার পদে; স্বয়ম্ভু শিব অন্তর্যামী, যজ্ঞেশ্বরের অনুগত, বিশ্বনাথকে অন্তরালে রক্ষা করিবার যাঁহার চেষ্টা—শিব তাঁহার বহুদূরে! তিনি দক্ষপদে নত হইবেন কিরূপে! এ অপমান অবজ্ঞার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না দক্ষ। শিব জামাতা, আত্মীয়, তাঁহার নিতান্তই অনুগত—এই ছিল মোহবশে তাঁহার ধারণা; সেই শিবের এ ব্যবহার!—অসহ্য! দম্ভীর বক্ষে দংশন করিল শিবের অবজ্ঞা, সহস্র বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালায়! তদ্দণ্ডেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন শিবের অবমাননা করিতে। শিববর্জ্জনে মহাসমারোহে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া হৃতগৌরবকে তিনি পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলেন কৃতকল্প।

দক্ষের যজ্ঞ,—মহাব্যাপার; ত্রিলোকের দেবতাঋষি তাহাতে নিমন্ত্রিত। মহা হৈ-চৈ ব্যাপার, জগতজোড়া সাড়া!—কেবল অনিমন্ত্রিত সেখানে শিব, আর শিবের শক্তি, জগন্মাতা শিবানী! অশিব-যজ্ঞ!—শক্তিহীন অনুষ্ঠান! তাঁহাদের অবজ্ঞাই যে সে-যজ্ঞের লক্ষ্য,—অহমিকা—পদপ্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য; দম্ভ, অহঙ্কার, দুরভিমান, কামনা, অভিলাষ, আসক্তি সাহসিকতা, আসুরিক বৃত্তিতে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস,—যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা তাহার উদ্দেশ্য নহে,—উপলক্ষমাত্র। দেবতা সে প্রতিষ্ঠানে কৃপণ, শিবশক্তির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব সে যজ্ঞে!

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

এরূপ তপস্যা, দম্ভীর যজ্ঞ—অকর্মীর কর্ম্ম, অনুষ্ঠিত হইল—দক্ষালয়ে! দেবতার নামে তামস ক্রিয়ার লীলভূমি সে যজ্ঞাগার!—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥

ভাবী শুভাশুভ, ক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ অপেক্ষা না করিয়া মোহবশতঃ যে তামস কর্ম্ম আরব্ধ, ফল তাহার তদ্রূপ!

অন্তরে অনুমোদন না করিলেও ঐশ্বর্য্যের আশু সমৃদ্ধির নিকট অবনত হইলেন অনেকেই, দম্ভকে কর্ম্মরূপে গ্রহণ করিল সাধারণ সকলে; দেবপ্রাণ দেবর্ষি নারদ কেবল হইলেন ক্লিষ্ট, পরিণামের মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিয়া তাহার জন্য হইলেন প্রস্তুত, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল যিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আরব্ধ কর্ম্মে শিবসংস্থাপনের চেষ্টায় নিক্রান্ত হইলেন;—বিভুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উপনীত হইলেন কৈলাসে,—শিবসদনে,—শক্তির পদপ্রান্তে!

ভোলা মহেশ্বর, সংহারের দেবতা—শিব, শুভাশুভ ওতপ্রোতভাবে মিলিত তাঁহার রাজ্যে, জগতের ক্রিয়া সক্রিয় হইয়াও নিক্রিয়, কর্ম্মফল বিশ্রাম লাভ করিয়াছে তাঁহাতে, ভোলা— ধ্যানী ভুলিয়াই আছেন যেন জগৎকে,—কোন খবরই রাখেন না যেন হইতেছে কি কোথায়!

সংবাদ দিলেন নারদ, মহাদেব হাস্য করিলেন—বলিলেন—সত্যই নারদ,—সার্থক তোমার নাম—

নাকারঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ দকারঃ পালকঃ সদা।
রেফ্ঃ সংহারকশ্চৈব নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

সংহার যে যজ্ঞের উদ্দেশ্য, সাধিত হইবেই তাহাই,—ভীত হইতেছ কেন নারদ! বিলীন হইবে একরূপে—সহস্রগুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে অন্য আকারে,—সার্থক হইবে তোমার চেষ্টা—নাম;—

নাকারঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ দকারঃ পালক সদা।

কিছুতেই আসন টলে না! কর্ম্মের দায়িত্বে, পরিণামে—সংহারের ভয়ে ভীত নহেন দেবতা, ত্রস্ত নহেন কিছুতেই, জাগরিতের নিদ্রা ভঙ্গ হইবার নয়, ভূতের অধিনায়ক—মান, অপমান, জ্ঞানের অতীত তাণ্ডব নৃত্যেই কি তাঁহার আনন্দ!

নারদ মানিলেন পরাজয়। মহাভক্ত মহর্ষি—ভক্তি-পথের পথিক তিনি, কর্ম্মশক্তি স্বতঃ প্রতিভাত নহে সে হৃদয়ে। মহাদেবের ঔদাসীন্যে হৃদয়ঙ্গম করিলেন নারদ তাঁহার ভ্রম।

দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ ভক্তাশ্রয় নহে আদিতে—কর্ম্মারম্ভে নহে শিবাশিব অভিজ্ঞান। ফলপ্রসূ কর্ম্ম, সাধন উদ্দেশ্যানুযায়ী ফলাফল, শুভাশুভ, শিবাশিবের প্রকাশ। শক্তি আদিতে, প্রেম অন্তরে—শিব অন্তে! নারদ শরণাপন্ন হইলেন শক্তির, বর্ণনা করিলেন দেবীর পিত্রালয়ের পর্ব্বকাহিনী,—সমারোহ ব্যাপার,—উদ্দেশ্য, বর্জ্জননীতি দক্ষের। শঙ্কা ছিল বড়—সে কাহিনী শ্রবণে দেবী নাজানি করিয়া বসেন কি! ক্রোধ, অভিমান, অপমানের কালিমা আদ্যাশক্তির বদনে নয়নে প্রতিফলিত হইল না একটুকুও! প্রশান্ত প্রসন্ন জ্যোতির্ম্ময়ী জগন্মাতা—জনকের তাঁহার কার্য্যকলাপের উল্লেখমাত্র না করিয়া ভক্তের নিকট শুনিতে চাহিলেন—ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তন! নারদ গায়ক,—তাঁহার বীণায় অনুরণনা—ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ের সুধাস্রাবে প্লাবিত হইল কৈলাসধাম আনন্দতরঙ্গ উথলিল—সংসারের কথা স্মরণে রহিল না কাহারও, আনন্দ,—আনন্দ,—আনন্দ! মহাদেব মাতিলেন তাহাতে,—গাহিল গঙ্গা—কুলু-কুলু-কুলু!—বহিয়া গেল অমৃতধারা, মাতৃক্ষীর হইল ক্ষরিত,—নারদ প্রত্যক্ষ করিলেন সতীতে মাতৃমূর্ত্তি!—কীর্ত্তনে-নর্ত্তনে কালকে কবলিত করিয়া—অমল বিমল আনন্দ জগতে বিলাইতে, ব্যাকুল নারদ হরিগুণ গানে দিগন্ত মুখরিত করিয়া বিদায় হইলেন!

নারদ হইলেন বিদায়। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই সতীর, পিতার কার্য্য,—দক্ষ হইয়া শক্তি ত্যাগের ইচ্ছা! শিবের হতাদর কি সম্ভব সংসারে? অহংজ্ঞান কি আনয়ন করিতে পারে এরূপ মোহ! সতীর সে-ভাব না কাটিতেই উপস্থিত হইলেন কৈলাসে তাঁহার অশ্বিনী ভরণী, কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশ ভগিনী; জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাদের রূপ, উৎসব-বাসরে অধিষ্ঠিতা হইতে সুসজ্জিতা, ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। পিত্রালয়ে চলিয়াছেন কন্যাগণ, উল্লাসে দীপ্ত—সতীকে লইয়া যাইবেন সঙ্গে। সতীপ্রকৃতি স্তম্ভিত; দুরন্ত অভিমানে অন্তর তাঁহার পূর্ণ! মহাভক্ত নারদের মুখে বিভু গীতি শ্রবণে যে দারুণ অভিমান সতী দূরে রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—ভগিনীগণ সমক্ষে তাহা রাখিতে পারিলেন না দূরে! কেন? কি জন্য? এ ব্যবহার পিতার? কেন এ দুর্ম্মতি, পিতৃ-ধর্ম্মের প্রত্যবায়, কন্যার প্রতি প্রতিশোধ—তাঁহারই কৃতকর্ম্মের—সতী-সম্প্রদানের জন্য এ অনুশোচনার আয়োজন! সেই স্থানে অধিষ্ঠান হইবেন সতী! নিদারুণ মনস্তাপে অভিমানে বিদায় দিলেন সতী ভগিনীগণে।

সতীর সম্বল পতি,—ভগিনীগণ বিদায় হইলে সপ্রকাশ হইলেন সতী স্বামীর সমক্ষে তখন স্বমূর্ত্তিতে! জনকের আলয়ে যজ্ঞ, কর্ম্মোৎসব, কন্যা কি থাকিতে পারেন দূরে! পিতার দুষ্কৃতি আকুল করিয়াছে তাঁহাকে; মনে পড়িয়াছে প্রসূতির মুখ, জননীর মর্ম্মবেদনা, বড় আদরের কনিষ্ঠা কন্যা যে তিনি, তাঁহার অবজ্ঞা কিরূপ কঠোর কুলিশাঘাত করিয়াছে জননীর স্নেহময় বক্ষে! সতী হইলেন আত্মহারা, বিস্মৃত হইলেন আত্ম-অপমান—মাতৃদুঃখ পূর্ণ তখন তাঁহার হৃদয়মন—সন্তাপ হরণ করিতে কন্যার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।—

"যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ।"

সতী অনুমতি ভিক্ষা করিলেন পতির—

"নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥"
"শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥"

স্বামীর মত স্বামী যিনি, উপযুক্ত তাঁহার এ আশঙ্কা, নিজের অপমানের কথা জাগিল না তাঁহার মনে, তাঁহার বুকে বিঁধিয়াছে সতীর হতাদর! প্রেমের ধর্ম্ম,—সতীও মর্ম্মাহতা স্বামীর অপমানে, নিজের মানাপমানের প্রতি দৃষ্টি নাই তাঁহার। শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিলে সে ব্যবহারের নিরাকরণ কোথায়? প্রেমের সম্মান রাখিতেই হইবে, বুঝাইতে হইবে জগৎকে,—দুষ্কৃত যিনি, তিনি, দক্ষই হউন বা অদক্ষই হউন, ব্যক্তিগত স্বার্থ যাঁহার লক্ষ্য—শিবহীন তিনি নিশ্চিত, যেরূপ কর্ম্মে যিনি ব্রতী, সঙ্কল্পানুযায়ী তাঁহার গতি—কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবেই তাঁহাকে! শক্তিহীন হইয়াও শক্তিস্বামীকে অপমান করিবার প্রয়াস, অবিমৃষ্যকারিতা, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান—সমুচিত শাস্তিভোগে তাঁহার যজ্ঞাহুতি! সতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পতি-মনমোহিনী সতী, কূট প্রশ্নের অবতারণা না করিয়া উত্তর দিলেন;—

"সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥

স্বামীকে সম্বোধন করিলেন "মহাপ্রভু"! অসীম যাঁহার বল, যিনি বিশ্বের অবাধ অপ্রতিহত গতির কারণ, সেই আদ্যাশক্তি সতী স্বামীর অনুগত, সহধর্ম্মিণী, তাঁহার অনুমতি চাই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব-কার্য্যে স্বামী মহাপ্রভু তাঁহার, স্বামীই তাঁহার ধর্ম্ম, প্রকৃতির তাঁহার প্রাণ, শক্তির কর্ম্মকেন্দ্রের

অনুপ্রেরণার মূল ; স্বামীর ধর্ম্ম—অনুজ্ঞা—ইচ্ছা তাঁহার সর্ব্বাগ্রগণ্য ! অনুমতি কর মহাদেব, পিত্রালয়ে উৎসব,—বঞ্চিত কর না !'

"উৎসব—কিসের উৎসব ? পরিণামে নাই যেখানে মঙ্গল তাহাও কি উৎসব ? অমঙ্গলের মধ্যে কেন ঝাঁপ দিতে যাও সতি !"

"জন্মস্থান মাতৃভূমি—প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিয়াছি যেখানে, অমঙ্গলের আলয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে কে ? মর্ম্মের প্রকৃতি বিস্মৃত হইতেছ কেন স্বামি !"

না, কিছুতেই না—অসদ্ উদ্দেশ্য যেখানে—শিব নহেন সেখানে তৎপর কখনই, অনুমতি দিতে রাজী নহেন শঙ্কর কোনক্রমেই ! সতী ভাবিলেন,—বটে ! মহাপ্রেমে বিভোর হইয়া ভুলিতে চাও কর্ম্মময় জগতকে—অমঙ্গলের তুমি নহ শিব ! শক্তি বর্ত্তমান থাকিতে শিবের ঔদাসীন্য ! অশুভের অন্তরে কি শুভ নাই লুক্কায়িত ! না,—কঠোর পুরুষ, শক্তির ক্রিয়া বাধা দিবার নহ তুমি কেহ ! স্বামীর—শিবের সম্মতি আদায় করিতেই হইবে। এখানেও সতী অনুগত, কবলা প্রবলা হইলে সাধ্য কাহার রোধে গতি ! সে-প্রলয় বেগ ধারণ করিতে সংহার-কর্ত্তাও নহেন সমর্থ ! সতী অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া প্রয়াণোন্মুখ হইলে সাধ্য নাই শিবের বিঘ্ন হন তাঁহার ! কিন্তু শিব নাস্তি যে তাহাতেও, তাহাও যে শিবহীন যজ্ঞ—শক্তিশিব মিলিত,—নিত্যযুক্ত—তাহার ব্যত্যয় করিবেন আদর্শসতী শঙ্করী ? কিন্তু অনুমতি যে চাই-ই—স্বামীর ; ছন্দানুবর্ত্তিনীরূপে নহে, সতীর স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখিতে ! তাঁহার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম—মহাব্যক্তিত্বের সম্মান রক্ষার্থ। প্রকৃতিতে সতী স্বাধীন, শিবসহধর্ম্মিণী প্রকাশ হইলেন শক্তিরূপে !

স্বরূপের হইল সুপ্রকাশ—দশমহাবিদ্যায়,—ক্রোধে হইলেন ভয়ঙ্করী কালী,—কোথায় সে স্বর্ণবর্ণ—প্রমদা-প্রাণদা ? কি ঠাকুর, ভাবিয়াছ কি তুমি—সতী তোমার পদানত ! চাহিয়া দেখ—শিব তুমি পদতলে,—সতীর একান্ত করতলগত ;—মহাদেব-বরণ হরণ করিয়াছে, অবলোকন কর, জগতের জ্যোতি ; মুক্তকেশে সমাচ্ছন্ন গগনপট—তিমিরে স্তিমিত চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র—রুধিরধারে অধর রঞ্জিত, নরমুণ্ডে তুণ্ডে বক্ষ বিকট !—

গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে॥
আর-বাম করেতে কৃপাণ খরশান।

বল বল প্রাণ কাঁপে কিনা, কিন্তু কম্পিত নহে উহাতেও শক্তির হৃদয়, কেশ পরিমাণেও নহে ত শক্তির—মাতার—শিবানীর প্রাণ বিচ্যুত—প্রলয়েও বরদা—দক্ষিণ হস্ত বিতত, কল্যাণ দানে সদা প্রস্তুত! বদন ফিরাইলেন স্বামী। সতী ধরিলেন তারা-রূপ ;—

নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্রে পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাত্তি সমুণ্ডখর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥

তোমারই রূপ দেবতা! তোমারই সজ্জা.—ভীত হইও না—প্রীত হও, সদয় হও!—সতীতে নিরীক্ষণ কর আত্মরূপ।—তাঁহারই রূপ কি সেই? ভীত হইলেন পশুপতি!—সতীর বিভূতির শেষ নাই, একের পর আর একটি, কখনও প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্করী সাক্ষাৎ শমন-ত্রাস—কখন শান্ত,—ভুবনেশ্বরী, মনোমোহিনী—বিশ্বরাণী—ভার্য্যা—কন্যা—মাতা! শঙ্কর হইলেন স্তম্ভিত, নত, মোহিত! সতীর তাঁহার এত শক্তি! পতিত হইলেন চরণতলে,—কালী সংহরণ কর বিভূতি তোমার, শিব কখন সতীর অবাধ্য?—পুরুষ বড় না প্রকৃতি? না না কেহ নহে শ্রেষ্ঠ—একে প্রলয়—মিলনে শান্তি, স্বস্তি! মহাপ্রেমে পালিত জগৎ—শিব শক্তি, শক্তিই শিব, অধীন নহে কেহ কাহারও। ব্যষ্টিতে নহে শুভ, প্রেম অনুবন্ধে অমৃতধারা, অমরত্ব দান করিয়াছে মরজগতকে! শিবশক্তি একমন একপ্রাণ—ধ্বনিত হইল ;—

"যেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে,"

* * *

মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥

অনুমতি গ্রহণে পিত্রালয় প্রয়াণের আয়োজনের আরম্ভ! দম্ভী দক্ষ—ঐশ্বর্য্যের উপাসক, ভগবানে প্রার্থনা তাঁহার মদ—দেবতাকে প্রকট হইতে হইবে সেই মূর্ত্তিতে! ত্রিভুবনের রাণী,

অপূর্ব্ব সজ্জায় হইলেন সজ্জিত—ভুবন-ভরা রূপ-ঐশ্বর্য্যে প্রতিভাত হইল দশদিশ,—হরমনোহারিণী সজ্জিতা হইলেন বিশ্ববিনোদিনী বেশে!—ধনেশ্বর কুবের-ভাণ্ডার দেবীর প্রসাধনে নিয়োজিত! প্রলয়ে প্রবাহিত হইল মলয় মারুত! ঐশ্বর্য্যপরিবৃতা সতী নন্দীপ্রমুখ অনুচর-সহ প্রয়াণ করিলেন পিত্রালয়ে!

ত্রিভুবন হইল ঐশ্বর্য্যমুখ, দেবী বলিলেন, "না—এখন নহে এ রূপ; প্রশ্রয় নহে প্রায়শ্চিত্ত। সংহৃত হইল সে বেশ,—সতী সজ্জিতা হইলেন যোগিনী বেশে, রুদ্রাক্ষ শোভিল অঙ্গে, পুষ্পে হইলেন পুষ্পিতা, পবিত্রতা হইল যেন মূর্ত্তিমতী!

সতী উপনীত হইলেন দীন বেশে মাতৃসদনে! প্রসূতি উন্মাদিনীপ্রায় ধারণ করিলেন কন্যাকে হৃদয়ে। অশ্রুতে প্লাবিত হইলেন উভয়ে!

আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ॥

আয় মা, আয়—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে,—

জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥

মার থাকো মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বর হইয়া॥

কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥

সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি জানে কর্ম্ম চন্দনে ভস্ম গেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে কুকুরে আপনে শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥

মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে ছি ছি একি দশা তোর।
আমি মহারাজ তোর এই সাজ মাথা খেতে এলি মোর॥
বিধবা যখন হইবি তখন অন্নবস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে তার মুখ না দেখিব॥

'আমি মহারাজ',—ধন গর্ব্বে এতই আত্মহারা! ও ঐশ্বর্য্য কাহার? কোথা হইতে উহার উদ্ভব! মহারাজ তুমি কাহার? দীন প্রজা কি তোমার কেহই নয়? ও মহারাজত্বে কি নাই তাহাদের অধিকার? দীনা বলিয়া আত্মজাকে এত ঘৃণা! পিতৃধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম স্নেহমমতা—হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়া ঘোর তামস আসুরিক ভাবে জয়ী হইতে চাহিতেছ পিতা! সতাই তাহাতে শিব নাস্তি! তাঁহার সংহার মূর্ত্তি কেন প্রার্থনা করিতেছ মহারাজ! যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে কি কহিব তুমি বাপ। গর্ব্বীর আয়ু হরণকারী হর,—রুদ্র, তাঁহার দ্বন্দ্বে শুভ নাই পিতা!

দম্ভী দক্ষ ক্রোধে ঘৃণায় অট্টহাস্য করিলেন;—অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন "ছিঃ ছি—ভিখারিণি, যজ্ঞালয়ে ভিখারী অকর্ম্মী পতির জন্য ভিক্ষা মাগিতে আসিয়াছিস! ধিক্ তোকে,—লজ্জা হইল না তোর, এ বেশে আসিতে!"

বার বার ঐ কথা,—গর্ব্বান্ধের আত্মশ্লাঘা,—গুণীর অপমান—ধনের জয়জয়কার। শক্তির স্বামী তাহাতেই বা হীন কিসে! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর তিনি—ত্যাগে না যোগী! তাঁহার শক্তির নাই ঐশ্বর্য্য! ঐশ্বর্য্যের সাফল্য কি ভোগে? সার্থকতা তার ত্যাগে—পরার্থ।

ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবী হইলেন প্রকট। মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইল সতীর বেশ। 'রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী।' কি অপরূপ সজ্জা, কি বিশ্ববিমোহিনী বেশ! বসন ভূষণ, সম্পদ্ সম্ভারের চরম বিকাশ। বিশ্ব ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত দেবীর অঙ্গে অঙ্গে। তাহার প্রভাবে দক্ষের ধন ঐশ্বর্য্য, হইয়া গেল নিষ্প্রভ, ছায়াবৎ মলিন, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ! সতীর বেশভূষার সমুজ্জলতায় নিষ্প্রভ হইল হোমাগ্নি শিখা—নির্ব্বাপিত যেন। দেবতাগণ হইলেন আতঙ্কিত,—ঋষিগণ হইলেন স্তম্ভিত,—কণ্ঠ স্বর থামিয়া গেল, ওঙ্কারধ্বনি উচ্চারিত হইল না আর। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের তাড়নায় দেবকার্য্যের ঘটিল প্রত্যবায়। দেবোদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম—যজ্ঞ হইল পণ্ড। ভীত দক্ষ কম্পিত হইতে লাগিলেন কদলীপত্রবৎ।

সতী হইলেন ধ্যানস্থ—বিশ্বনাথের ধ্যানে—শিবের আরাধনায়। খসিয়া পড়িল দেবীর বেশভূষা! অঙ্গারে পরিণত হইল পার্থিব ঐশ্বর্য্য। জ্যোতিতে শোভিত, দেবী আপনাতে শক্তি সংহরণ করিয়া লইলেন বাহ্যশক্তি,—দেহ হইল নিষ্ক্রিয়—করিলেন দেহত্যাগ।

চতুর্দ্দিকে হাহাকার।

সতীদেহ ত্যাগে　নন্দী মহারাগে　সত্বরে গেল কৈলাসে।
শূন্যে রথ লয়ে　শোকাকুল হয়ে　নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥

শঙ্করীহীন শিব,—সংহার মূর্ত্তি,—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম ভভম্ভম সিঙ্গা ঘোর বাজে।
লাটাপট জটাজুট সঙ্ঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা।
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উরে সর্পবাণা।
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞনাশে
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে।
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।

মহাপ্রলয়,—রক্ষা নাহি কাহারও। দেবতা ঋষি—অসৎ সংসর্গে শক্তিহীন—শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবেই।

ভার্গবের সৌষ্টবের দাঁড়ি গোফ ছিণ্ডিল।
পুষণের ভূষণের দন্তপাতি পাড়িল॥

শাস্তির সকলের একশেষ। দক্ষের গর্ব্বিত মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে হইল পতিত গর্ব্বের শেষ অহংজ্ঞানের চরম শোচনীয় পরিণাম।

প্রসূতি করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন শিব সমক্ষে। সতীর প্রসূতি তিনি, স্বামীধর্ম্মে, আত্মস্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিতা শক্তি মাতা তাঁহার অমঙ্গল ঘটিতে পারে কি মহাপ্রলয়েও। শিব প্রণত হইলেন তাঁহার পদে। ধর্ম্মের নিকট শিব সর্ব্ব অবস্থাতে অনুগত, শিব প্রসূতির পুণ্যে পুনর্জ্জীবন দান করিলেন দক্ষকে, অজমুণ্ড সংযোজিত হইল দক্ষের দেহে, দম্ভ চিরকালের তরে হইল বিলীন, অজ—জন্মরহিত! সে মস্তিষ্কে স্থান নাই আর অহঙ্কারের, রসনায় নাই দেবনিন্দা, ঘোষিত হইল তাহাতে ভগবানের নাম; চিহ্নিত হইলেন তিনি দেবতাহীন যজ্ঞের কর্ম্ম-ফল-রূপে। মহাপ্রেমিক মহাদেব সতীদেহ লইলেন স্কন্ধে, প্রেমিকের নিকট, প্রেমাস্পদের নশ্বর দেহরজবিন্দু যে উপেক্ষার বস্তু নহে—ধূলি মুষ্টিও মহা প্রেমিকের প্রেমস্পর্শে অতুল, অবিনশ্বর। উন্মাদ হইলেন মহা উন্মাদ, শক্তিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে।

ভারতের ভগবত-উদ্দেশ্যহীন যজ্ঞের সেই অবসান; শক্তির সঞ্জীবনের মহাযজ্ঞে আজ স্বয়ং শিব অবতীর্ণ, তাঁহার কর্ম্ম-প্রবাহে জগৎ সচঞ্চল। অমরী মহাশক্তির বিনাশ কোথা বিশ্বে? দেবপীঠ ভারত নহে শক্তিহীন; শক্তির পুনর্জ্জন্ম—তাঁহার সুপ্রকাশ এই ভারতেই। ভারতের পুণ্যে প্রকটিত তাহার ধর্ম্ম। দেবকার্য্যে—পরার্থপরতায়—কর্ম্মে তাঁহার বিকাশ।

ভারতসন্তান, মজ্জাগত ধর্ম্মপ্রকৃতির প্রবৃত্তির উদ্বোধন করিয়া সমাহিত হউন সকলে তাহাতে,—শিব শক্তি বিরাজ করিবে ভারতের মন্দিরে মন্দিরে—সফল হইবে যজ্ঞ—আরাধনা—ভারতের পুনর্জ্জাগরণ। *

* কোচবিহার মহিলাসমিতির বিগত বার্ষিক-অধিবেশন উপলক্ষে মহিলা সভ্যবর্গের অভ্যর্থনায় 'সতীর দেহত্যাগের' মূক অভিনয় সুসম্পাদিত হয়। অভিনয়শেষে ভারতমাতার গৌরব-চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই অভিনয় উপলক্ষ করিয়া লিখিত।

ছিটে ফোঁটা।*

আর্টে যে কেবল আর্টিষ্টেরই আত্মপরিচয় দেয় তা নয়—যে দেশে বা যে জাতিতে আর্টিষ্টের আবির্ভাব হয় তারও একটা মূর্ত্তি ধরে দেয়। তাই দেখা যায় আদিম অসভ্য জাতিরা ভূতের উপাসক সেই কারণেই হোক বা অরণ্যের নানান বিভীষিকার মধ্যে বাস করার জন্যেই হোক তাদের আর্টে বিস্ময়কর ও ভয়াবহ ভাবটাই বেশী ফোটে। তাদের আর্ট ধর্ম্মের জন্যে বা সৌন্দর্য্যবোধের জন্যে প্রধানতঃ নয়, তাদের মানসিক রুচির বা সংস্কারের স্ফুর্ত্তিই তাদের আর্টে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। চিত্র পরিকল্পনাগুলিতে তাই বাঘের গায়ের ছোপ বা ডুরে চিহ্নের মত এবং নানাপ্রকারের ভীষণ ভাবের মূর্ত্তি ইত্যাদি আঁকা থাকে। এগুলি তাদের অমানুষিক বৃত্তি ও অরণ্যবাসের সঙ্গে বেশ খাপ খায়।

শিল্পী বা কবি মৌখিকভাবে বিশ্বমৈত্রীর ভাব প্রচার না করলেও যুগে যুগে তাঁদের কলায় ও সৃষ্টির মধ্যে সেই ভাব প্রকাশ করে আসচেন। তাঁদের কাজে বিশ্বজনীন ভাব ফুটে ওঠে বলেই তাঁরা কেবলমাত্র দেশের দশের জন্যে বিশেষভাবে কিছু করতে পারেন না—তাঁরা যা করেন বিশ্বের দরবারে গিয়ে পৌঁছয়। র‍্যাফেলের চিত্র, সেক্সপীয়রের কাব্য প্রভৃতি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাই এত আদর পাচ্চে। তাদের কাজ খুসীর কাজ। ব্যবসাদারের মত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে পুঁজি করার কাজ নয়—তাদের কাজ দুনিয়ায় তাঁরা যা আনন্দ পান দুনিয়ার কাছেই তার ঋণ শোধকরা। অবশ্য যাঁরা ব্যঙ্গচিত্র বা ব্যঙ্গ কবিতা (যেগুলি দেশের দশের চোখ ফোটাবার জন্যে) লেখেন, তাঁদের রচনা সাময়িক উত্তেজনায় কোনো

* অনেক দৈনিক পত্রে ও মাসিক পত্রে এখন দেখচি এই নামটি গ্রহণ করে বিবিধ প্রসঙ্গে ছাপা হচ্ছে কিন্তু নামটি যে কোথা থেকে নেওয়া হ'ল সেটা কেহই—দুঃখের বিষয় উল্লেখ করেন না।

এক বিশেষ কালে ও বিশেষ সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়—তার আর প্রাণশক্তি থাকে না।

* * *

প্রকৃতি (Nature) ও অন্তরের বোধশক্তির নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন হলেই তখন ছন্দ আপনি বেজে ওঠে—তখনই মানুষের সৃষ্টি ধাতার সৃষ্টির রস রচনায় ফোটাতে পারে।

* * *

আমাদের পূজনীয় কবি নোবেল পুরস্কার ও জগৎজোড়া খ্যাতিলাভ করার পূর্ব্বে (যখন তিনি বিশেষভাবে বাঙলারই কবি ছিলেন) আমাদের বলেছিলেন যে Fine artএর ভাষা universal ভাষা, সেটা বুঝতে হলে কোনো জাতীরই বাধা নেই। কবিদের পক্ষে কিন্তু তাদের ভাষাটাই তার একটা মস্ত অন্তরায়। যে দেশের কবি যে ভাষায় রচনা করবেন সেই ভাষা-ভাষী লোক ছাড়া অপর জাতি তার রসগ্রহণ করতে পারবেন না। নিজের দেশেই তাঁর কাব্যকলা আবদ্ধ হয়ে থাকবে। একথা ঠিক্ হলেও আমাদের কবির কাব্যকলা সভ্যজগতের সকল ভাষায় তার প্রচার ও আদর যে হয়েচে তা আমরা আজ দেখতে পাচ্চি। এ থেকে বোঝা যায় আগুণ যেমন ছাইচাপা থাকে না, সত্য যেমন অগোপনীয়, তেমনি আর্ট যে দেশের, যে কালের, যেখানকারই হোক না লুকিয়ে থাকতে পারে না।

* * *

আর্ট যতক্ষণ সৃষ্টির পূর্ব্বে আর্টিষ্টের মনের ভিতর থাকে ততক্ষণই সেটা আর্টিষ্টের নিজের জিনিষ থাকে—সেটার অভিব্যক্তি কবিতায় বা চিত্রে হয়ে গেলে পর তখন artistএর তার উপর যতটা দাবী থাকে আর সকলেরও ঠিক ততটাই থাকে।

* * *

শ্রী জিনিষটা চারদিকে ফুলে ফলে, আকাশে বাতাসে, আলোকে আঁধারে যে দিকে তাকান যায় ছড়ানো আছে—সেটাকে ধরবার বা নিজের মত করে পাবার চেষ্টাই হ'ল শিল্পীর সাধনা—তাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করবার জন্যে নয়।

* * *

শোনা যায় শিল্পীরা রূপের উপাসক। তাঁরা কি বাহ্যরূপ বা চেহারার উপাসক?—তা নয়। তাঁরা মানসনেত্রে যেরূপ দেখতে পান তারই পূজা করেন; দশজনের চক্ষে যেটি সুন্দর সেটির সঙ্গে তার বড় কারবার নেই। আসলে শিল্পীরা ঠিক্ রূপের উপাসক নয় রসের উপাসক।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

প্রেমের সমাধি।

ঃ০ঃ-

আন্‌মনে সে নীপের বনে
একলা বসে গাঁথ্‌ছে মালা,
আপন ভুলি আবার কভু
কুসুম তুলি ভর্‌ছে ডালা।
উদাস ভাবে নয়ন তুলি
আকাশ পানে রয় সে চেয়ে,
উঠ্‌ছে কাঁপি উন্মনা গো
মলয়েরই পরশ পেয়ে।
শঙ্কিতা সে কিসের ভয়ে,
বক্ষ কেন উঠ্‌ছে দুলি;
বিভোর হয়ে এমন করে
ভাব্‌ছে কারে সকল ভুলি?
কাঁপ্‌ছে হৃদি, টল্‌ছে চরণ,
চল্‌ছে পথে বক্ষ চাপি,—
উৎসারিত অশ্রু এ কি
ঝর্‌ছে দুটি নয়ন ছাপি!

আশায় ভরা তরুণ যুবা
আস্‌ছে ধীরে তাহার পাশে,—
হাতটি ধরে গভীর প্রেমে
বল্‌ছে তারে মধুর ভাষে ;—
"ক্ষম আমার সব অপরাধ,
রূপের দেবি হৃদয়-রাণি !
আন্‌ল ফিরে আকুল করে
মোহন তব দৃষ্টিখানি।"
"কে গো তুমি" বল্‌ছে বালা
চমকে তুলি তরুণ মুখ,
"হায় গো কেন আমার প্রেমে
সিক্ত হল তোমার বুক ?
তুমিই কি সে দেব্‌তা মম ?
—নও গো তাহা, নও কভু,
মিথ্যে কেন তাহার মত
প্রেমের কথা কও তবু ?
প্রিয় আমার আস্‌বে যে গো
জয়ীর বিজয়-মুকুট শিরে,
পরিয়ে দেব মালা আমার
দু হাত দিয়ে কণ্ঠ ঘিরে।
যাও গো ফিরে, চাইনে তোমায়"—
উন্মাদিনী ত্রস্তে উঠি

চল্‌ল ছুটে মাল্য হাতে
প্রিয়ের স্নেহ বাঁধন টুটি।
বিস্ময়েতে তরুণ যুবা
দেখ্‌ছে চেয়ে আকুল পারা
উন্মাদিনী গহন বনে
ছুট্‌ছে বেগে আপনহারা।
পথের কাঁটায় কোমল পায়ে
পড়্‌ছে ঝরি রক্তধার,
চল্‌ছে ছুটে ঝড়ের মত,
পড়্‌ছে লুটে বারম্বার।
ডাক্‌ছে বালা—"হে মোর প্রিয়
লুকিয়ে রলে কোন্ খানে,
আনন্দেরি নন্দনে কি—
উর্ব্বশীরি প্রেম্ টানে ?
চোখের জলে ধৌত মালা
পার্‌বে না কি ?" এই বলে—
চুকিয়ে দিতে বুকের জ্বালা
ঝাঁপিয়ে পড়ে নীল্ জলে।
"এস প্রিয়া, এই যে অধম"—
ছুট্‌ল যুবক তার পানে,
পাগল পারা অধীর চিতে
পড়্‌ল নদীর মাঝ্‌খানে।

উঠ্‌ল তীরে,—বিধির শাপে
বাজ্‌ল বুকে বিষম ব্যথা,
বক্ষে তাহার লুটায় এ কি
পরাণ-বিহীন স্বর্ণলতা!

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, ফেরোজ যখন তাহার সংক্ষিপ্ত সামাজিক অভিজ্ঞতার ক্লান্তি-ভারে তখনও নিদ্রিত, এল র‍্যামি জ্যারোবার নিকট উপস্থিত হইলেন। লিপিথের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষখানির পার্শ্বকক্ষে সে তাহার প্রভুকে যথোচিত সৌজন্যের সহিত অভ্যর্থনা করিল; তাহার মুখখানিতে আজ একটা বিষাদ-কালিমা, বেদনা ও আত্মগ্লানির ছায়া সুস্পষ্ট। এল র‍্যামি তাহার দিকে চাহিলেন—সে চাহনি করুণা ও সহানুভূতিব্যঞ্জক।

"মনের মধ্যে রাগ পোষণ করা আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর,"—পূর্ব্বপ্রথামত তিনি শ্লেটের উপর লিখিলেন—"আর তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই; আবার বলছি—বিশ্বস্ত হও, অবাধ্য হয়ো না; এর বেশী আমি কিছুই চাই নে; আজই তোমার মৌন ওষ্ঠ থেকে যাদু-প্রভাব অপসারিত হবে।"

জ্যারোবা সন্দিগ্ধভাবে লাইন কয়টীর উপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া গেল এবং তাহার শীর্ণ শরীরখানি যেন শিহরিয়া উঠিল। সোৎসুক বিস্মিতনয়নে সে প্রভুর পানে চাহিল; অপরপক্ষে এল র‍্যামি কি-যেন-একরূপ সঙ্কল্পভরা অপলক দৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে

চাহিয়া রহিলেন। মিনিটখানেক পরে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পুনরায় লিখিলেন— "কথা কও ; তুমি মুক্ত"।

ভয়ে ভয়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে অনুনয়ের ভঙ্গীতে উভয় হস্ত প্রসারিত করিল এবং এল র‍্যামি বাধা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িয়া সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল—"ক্ষমা কর, প্রভু, ক্ষমা কর ! অপরিসীম তোমার শক্তি—ভয়ঙ্কর, আশ্চর্য্য, রহস্যময় ! তোমার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ভগবানের দান,—সাধ্য কি এই অতি তুচ্ছ ক্রীতদাসীর যে সে আদেশের বিদ্রোহী হয়। তবু, জ্ঞানের ফল সুখ নয়—কিন্তু দুঃখ ও যন্ত্রণা। সত্য কথা বলতে কি এল র‍্যামি, বিদ্রোহী অবস্থাতেও আমি কামনা করেছি যেন প্রেমের আনন্দে তুমি পরিপূর্ণ হও। কিন্তু যাক্, আমার বাচালতা ক্ষমা কর—প্রতিজ্ঞা করছি যে দ্বিতীয়বার আর বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ আমার পক্ষ থেকে ঘটবে না—"

জ্যারোবা মস্তক অবনত করিল এবং পুনরায় পদস্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেই এল র‍্যামি বাধা দিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন ; পরে লিখিলেন—"ক্ষমা করতে আর বাকী নেই ; তোমার জ্ঞান সম্ভবতঃ আমার চেয়ে বেশী ; আমি জানি যে ভালবাসার চাইতে প্রবল জগতে কিছুই নেই, সম্ভবতঃ উৎকৃষ্টতরও কিছু নেই ; কিন্তু প্রেম হচ্ছে আমার শত্রু যাকে পরাজিত করাই আমার জীবন-ব্রত—অন্যথায় সে-ই হয়তো আমাকে হার মানাবে!"

প্রচ্ছন্ন চিত্তদৌর্ব্বল্যের অর্দ্ধ-স্বীকারোক্তিভরা ঐ পংক্তিগুলি দেখিতে জ্যারোবার উভয় চক্ষু যখন সকৌতুক আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল, সেই সময় এল র‍্যামি ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিলেন।

সেইদিন অপরাহ্ণে ঐ ক্ষুদ্র আবাসখানির উপর কেমন যেন একটা সানন্দ শান্তির ভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সুমিষ্ট স্বরলহরীতে বায়ুমণ্ডল হিল্লোলিত ; গাঢ়-নিদ্রার পর শরীরে ও মনে যথেষ্ট তাজা হইয়া পিয়ানোর পার্শ্বে উপবিষ্ট ফেরাজ তাহার অনুকরণীয় নিজস্ব ধরণে আশ্চর্য্য সুর-সঙ্গীত উদ্ভবন করিতেছে ; অপর পক্ষে এল র‍্যামি, আপন আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সাইপ্রস দ্বীপের সেই সন্ন্যাসী-কথিত "তৃতীয় রশ্মিরেখা"র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ একখানি সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহার বন্ধু ক্রেমলীনকে লিখিয়া চলিয়াছেন।

"এই পর্য্যবেক্ষণ-ব্যাপারে খুব বেশী পরিশ্রম করো না"—তিনি লিখিতেছিলেন—"সকল দিক থেকেই, চুম্বুকচক্রের গায়ে বর্ণনার অনুরূপ এই চকিত-রশ্মি-সম্পাত অনুসরণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার হবে, এবং তোমার নিরাপদ সাফল্য-সম্বন্ধেও আমার মনে আশঙ্কা রইল অনেকখানি। এই প্রচেষ্টায় কেন যে আমি বিপদ আশঙ্কা করছি তার কোনো সন্তোষজনক কারণ দেওয়া শক্ত, কেন না কিছুরই পরিসমাপ্তি নেই এইটেই যদি স্বীকার করা যায় তা'হলে চাই কি মৃত্যুকেও বিপদ বলা চলে না; অবশ্য এইটেকেই 'সমাপ্তি' বলে ধরে নিতে আমরা অভ্যস্ত হলেও হয় তো এমনও প্রমাণ হতে পারে যে আসলে ওটা একটা 'আরম্ভ' মাত্র। কিন্তু 'মৃত্যু' বা 'বিপদের' কথা ছেড়ে দিলেও একটা 'পরিবর্ত্তন' যে তোমার ঘটবে, এ ধারণা আমার মনে থেকেই যাচ্ছে; আর তুমি যখন তোমার বর্ত্তমান কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনোরকম অদলবদলে সম্ভবতঃ এখন ইচ্ছুক নও, তখন তোমার প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে এই যে 'তৃতীয় রশ্মির' গতিপথ খুব সাবধানে অনুসরণ ক'রো।"

এইখানে সহসা তাঁহার লেখনী থামিয়া গেল; তিনি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন ফেরাজ উন্মত্তভাবে গাহিতেছে:—

নিভে আসে যদি বাসনার দীপ ভালবাসা পেলে প্রিয়া গো,
নাহি বহে আর অনল তরল শিরা উপশিরা দিয়া গো;
প্রেম-সুধা-পান-অবসানে যদি জেগে থাকে প্রাণে অবসাদ,
আদর সোহাগ মান অভিমান শেষ করে দিতে যদি সাধ—
বল তবে, সখি, খুলে বল মোরে, তোমার মনের কথাটী
দেখি কোথা পাই মরিবার ঠাঁই না শুকাতে হৃদি-লতাটী;
দেখিতে দেখিতে ও-মুখমাধুরী দু'খানি নয়ন ভরিয়া
না ফুরাতে প্রেম মধুর মরণে আগেভাগে যাই মরিয়া;
ভালবাসা-ভরা এ হিয়া যখন, ভালবাসা-হারা মরু না
আছে বিশ্বাস ঈশ্বর-পাশে লভিব এটুকু করুণা।
লক্ষ্য করিয়া বার বার আজ পেরেছি সঠিক জানিতে
প্রেমালিঙ্গনে কোনো সাড়া আর জাগে না ও-বুকখানিতে;

চুম্বনে আর নাহি কোনো রুচি ; সম্ভাষ শ্রুতি-জুড়ানো
বিহগকাকলী মধুর হলেও পাহাড়েরি মত পুরানো ;
শৃঙ্খল যদি হলো এ সকল—হও তবে সখি স্বাধীনা
প্রীতিলেশহীন প্রাণমন লয়ে বন্দিনী হ'তে সাধি না ;
আমারে হারালে অল্পই তব হারাবে গো সুধাভাষিণি,
তাই তো হৃদয় মাগিছে বিদায় হৃদি-শতদল-বাসিনি !
একদিন তবু ভালবেসে, সখি, আনন্দ-ঘন চুমাতে
ভরে দেছ হিয়া, সে কথা স্মরিয়া চলিনু লো সুখে ঘুমাতে ।

*   *   *

ভুলে যাও মোরে দীপ্তি-মধুর ওগো প্রেমদীপ-শিখাটি !
খুলেও দেখো না অতীত-দৃশ্য ভুলে স্মৃতি যবনিকাটি ;
যদি কোনোদিন আমারে স্মরিয়া আঁখি ভরে আসে জলে গো,
তপ্ত-নিশাস-পরশের তাপে ও হৃদয়-শিলা গলে গো—
চকিতে মুছিয়া ফেলো আঁখি অয়ি চকিতা-হরিণী-লোচনা,
ঝেড়ে ফেলে দিও প্রাণ হ'তে যত অতীতের অনুশোচনা !
মরণের পারে সমাধি-আঁধারে তোমারি প্রতিমা স্মরণে
কাটিবে আমার দিবা বিভাবরী ; মৃদু মন্থর চরণে
হয় তো বা কভু চলে যাবে তুমি সে সমাধিভূমি দিয়া গো
গাঢ়তর ঘুমে ডুবাইয়া মোরে স্বপনবাসরে প্রিয়া গো ।
শ্রান্ত প্রাণের প্রীতিটুকু চাহে বিশ্রামে হ'তে সরসা,
সব ভালবাসা ফুরাইলে, সখি, মরণই যে শুধু ভরসা !

সঙ্গীত থামিয়া গেল ; কিন্তু, গায়কের কণ্ঠস্বর কক্ষব্যাপী স্তব্ধতাকে তরঙ্গায়িত না করিলেও, তাহার অঙ্গুলি পিয়ানোর চাবীগুলির উপর তখনও সঞ্চালিত থাকিয়া যেন পাপিয়ার আকাশ-ভুবন-ভাসাইয়া-চলা স্বর-মাধুর্য্যে বায়ুমণ্ডল বিকম্পিত করিতে লাগিল।

এল র‍্যামি আপন অজ্ঞাতসারে এই সময় একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং ফেরাজ তাহা শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চাহিল।

"তোমাকে বিরক্ত করছি কি?" সে জিজ্ঞাসা করিল।

"না; তোমার গান শুনতে আমি ভালবাসি; কিন্তু, অধিকাংশ কবি-যুবকের মতন তুমিও এমন বিষয়ের গান গাও যার কিছুই তুমি জানো না; প্রেমের দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক; প্রেমের কিছুই তোমার জানা নেই।"

আমার মনে হয়, আছে "চিন্তিতভাবে ফেরাজ উত্তর করিল—"এমন কি আমার মানস-প্রতিমাকে চিত্রিত করতেও আমি পারি; সে হচ্ছে—"

"সুন্দরী অবশ্য!" সস্নেহে হাসিয়া এল র‍্যামি টিপ্পনী করিলেন।

"হ্যাঁ সুন্দরী; একরাশ সোণালী এলোচুলের জমীর ওপর যত্নে আঁকা এক লাবণ্যময় তনুগরিমা; নির্ম্মল হাস্যে ঈষৎ-দীপ্ত তার আনন; বেশী লম্বা নয়—কেননা –"

"যাক্, কি কি গুণ তোমার ঐ কল্পিতা সুন্দরীটীর থাকা দরকার?" কনিষ্ঠের বর্ণনায় ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অনেক, অনেক; সে আমি বর্ণনায় কুলিয়ে উঠ্‌তে পারবো না। তবে একটী গুণ সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করে' এই বলতে পারি যে এ পৃথিবীতে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতীক্ষা করবার ধৈর্য্য অবশ্যই আমার আছে। আমি জানি যে কোনো না কোনো সময়ে আমরা পরস্পরকে খুঁজে বের করবো। ইতিমধ্যে 'প্রেম' সম্বন্ধে কল্পনা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট, কেননা কল্পনায় আমি প্রায় তা' অনুভব করে' থাকি।"

ফেরাজ পুনরায় বাজাইতে আরম্ভ করিল এবং এল র‍্যামি ক্রেমলীনের উদ্দেশে লিখিত চিঠিখানি শেষ করিয়া, ডাকে দিবার উপযোগী করিয়া তুলিলেন। এই সময় ফেরাজের বাদ্যযন্ত্রোত্থিত সঙ্গীতের অবকাশে বহির্দ্বারে মৃদুকরাঘাত-শব্দ শ্রুত হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি যন্ত্র ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং অনতিপরেই ফিরিয়া আসিয়া ঈষৎ উত্তেজিত-কণ্ঠে জানাইল—"আইরিণ ভেসিলিয়াস।"

এল র‍্যামি উঠিয়া বিনীত অভিবাদনে তাঁহার নবীনা অতিথিটীকে আহ্বান করিলেন।

"এ আমার পক্ষে আশাতীত আনন্দের কথা" অকৃত্রিম আনন্দে আননখানি দীপ্ত করিয়া তিনি বলিলেন—"এ আমার মহৎ সম্মান, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।

অতিথি ঈষৎ হাসিয়া এল র‍্যামির করতলে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হাতখানি রাখিলেন, পরে ফেরাজ কর্ত্তৃক আনীত ও টেবিলের নিকট রক্ষিত একখানি চেয়রে উপবিষ্ট হইয়া এল র‍্যামির উদ্দেশে নম্র মধুরকণ্ঠে আরম্ভ করিলেন—

"আমার আগমনকে ব্যাঘাত মনে করে' আপনি যে মনে মনে বিরক্ত হবেন না এ বিশ্বাস আমার আছে, তবু নিছক কৌতূহলের বশেই যে আমি এসেছি তা' নয়। আমার ভূত-ভবিষ্যত-সম্বন্ধে সজ্ঞান হবার জন্যে কোনো প্রশ্ন তুলে আপনাকে বিরক্ত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি নিতান্তই একা একা থাকি, বেশীর ভাগ লোকই আমাকে পছন্দ করে না, তা' ছাড়া সাহিত্যিক জীবনে আমাকে এত বেশী বাধার সঙ্গে যুঝতে হয় যে সময়ে সময়ে সামান্য একটু সহানুভূতির জন্যে প্রাণের ভেতরটা বুঝিবা কেঁদেও ওঠে। দুটী একটী সমস্যা, যা' মাঝে মাঝে আমার মাথা ঘুলিয়ে তোলে, তার জবাব বোধহয় আপনার কাছে মিলতে পারে। যদিও সে সব সমস্যা খুবই সাধারণ, তবু আপনার অভিমত জানলে আমি সুখীই হব।"

"আপনার অসাধারণ প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টি যে-'সাধারণ' সমস্যার মর্ম্মভেদ করতে পারেনি, আমার চেষ্টাও কি তাতে সমান ব্যর্থ হবে না?"

"তার কোনো মানে নেই" এল র‍্যামির মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আইরিণ বলিলেন—"কারণ পুরুষ আপনারা স্ত্রীলোকের চেয়ে সব সময়েই বেশী জ্ঞানের দাবী রাখেন।"

"আমি অবশ্য এ বিধানকে চূড়ান্ত মনে করিনে, তবু আমি ঠিক 'দৃঢ়-চেতা' নই; আমি শুধু সুবিচার-প্রত্যাশী।..... আপনি জানেন," আইরিণ বলিয়া চলিলেন—"যে আমি, অন্ততঃ সাধারণের অনুমান অনুসারে, পৃথিবী যাকে বলে 'প্রথিতযশা', তাই। অর্থাৎ আমি বই লিখি, সাধারণে তা' আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, আর সেজন্যে আমার প্রচুর অর্থাগমও হয়ে থাকে। ফলে, ভাল খেয়ে পরে, সচ্ছলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে,' সমাজের অন্যতম 'অলঙ্কার'-রূপে পরিচিত

থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। এখন, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই যৎসামান্য সম্মানটুকুর জন্যে, জ্ঞানে ও প্রাণে শ্রেষ্ঠতার দাবী নিয়েও নারীর খ্যাতির বিরুদ্ধে পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয় কেন ?"

"ঈর্ষা ?"—সন্দিগ্ধ দ্বিধাভরে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বল্‌তে চান যে—"

"যা' বলেছি ঠিক তাই আমি বল্‌তে চাই" প্রশান্তকণ্ঠে আইরিণ বলিলেন—"তার একটুও বেশী বা কম নয়। ঈর্ষাপরায়ণ কথাটাই আমি ব্যবহার করেছি। যে সমস্ত নীচতা ও অন্ধ অহঙ্কার নারীকে পুরুষের লালসা ও নির্ম্মমতার ক্রীতদাসী করে' তোলে সেদিকে উৎসাহদান অথচ কামিনীত্ব ও পশুমতিত্বের হাত থেকে নিস্কৃতিলাভ করে' মনীষা ও মানসিক উন্নতির পথে তাদের যাত্রী হবার চেষ্টায় যতদূর সম্ভব বাধা প্রদানে তাদের এত আগ্রহ কেন ? 'স্যাফো' থেকে আরম্ভ করে এ-যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোনো যশস্বিনী মহিলার ইতিহাসের দিকে চাইলে, তাঁদের সম্বন্ধে পুরুষের উক্তি দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। জর্জ্জ ইলিয়ট্, জর্জ্জ স্যাণ্ড্ প্রভৃতি লেখিকারা পুরুষের নাসিকাকুঞ্চন ও নির্ম্মম আক্রমণ থেকে তাঁদের ভাবশিশু-গুলিকে রক্ষা করবার জন্যে পুরুষের ছদ্মনামে আত্মগোপন করে' তবু কতকটা নিরাপদ হয়েছিলেন। বল্‌তে পারেন, কেন এমন হয় ? কেন এই জাত্যভিমানে 'শ্রেষ্ঠ' প্রভুরা 'নিকৃষ্টতর'দের ওপর নিন্দার শিলাবর্ষণ না করে' পারেন না—তা' এঁরা চরিত্রনিষ্ঠা ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে ঐ সব প্রভুদের চাইতে যত বেশীই উন্নত হোক্ না কেন ?"

আইরিণের বাক্যে আন্তরিকতা ও চক্ষে আবেগ-জনিত দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল ; আভ্যন্তরিক অনুভূতির উদ্দীপনায় প্রদীপ্ত হইয়া সেই আননখানির দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। অধিকাংশ প্রাচ্য-দেশীয়দের ন্যায় নারী ও নারীশিল্প-সম্বন্ধে তাঁহার মনেও কতকটা অবজ্ঞা ছিল। কিন্তু, তবু লিলিথ-সম্বন্ধে কি বলা যায় ? তাহার সহায়তা না পাইলে আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াগুলি কি আর এতদূর অগ্রসর হইত ? ইহার পরও কি নারী জাতিকে 'পুরুষেতর' বলিবার অধিকার তাঁহার বা অপর কাহারও থাকিতে পারে ?

"দেবি !" নম্রকণ্ঠে, এবং বুঝিবা কতকটা বিহ্বলভাবেই, তিনি বলিলেন—"আমাদের জাতির বিরুদ্ধে আপনি এমন একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছেন, যার প্রতিবাদ অসম্ভব।

কারণ এ-সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। পুরুষেরা স্ত্রীজাতির বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে বা চরিত্র-নিষ্ঠা পছন্দ করে না।"

ঈষৎ থামিয়া এল র‍্যামি অভ্যাগতার মুখের দিকে একবার চাহিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন—"চরিত্র-নিষ্ঠ নারী হচ্ছেন পুরুষ-সমাজের পক্ষে মূর্ত্ত তিরস্কার; মনস্বিনী নারী চিরদিনই পুরুষের চক্ষে বিরক্তির উৎস, কেননা সে শোষোক্তের চেয়ে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ আমি বল্‌তে চাই এই যে নারী যখন প্রতিভা-মণ্ডিতা হন, তখন সে প্রতিভা সকল দিক থেকেই সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে। কিন্তু পুরুষের প্রতিভা সাধারণতঃ সর্ব্বতোমুখ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—কোনো শ্রেষ্ঠ কবি, চিত্রশিল্পী বা সঙ্গীতবিশারদ তাঁদের আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে বড় হ'তে পারেন, কিন্তু একটা না একটা দিকে তাঁর ত্রুটী থেকে যায়। কিন্তু নারী-প্রতিভা অন্যরূপ। সেই জন্যই পুরুষ ত'কে অপছন্দ করে' নাচ ঘরের বিলাস-পুত্তলীদের কাছে সান্ত্বনার জন্যে ছুটে যায়, কেন না সেখানে মদ্য ও অর্থের লালসায় তারা এদের প্রার্থনার অতিরিক্ত স্তুতিবাদেও কার্পণ্য করে না। পুরুষ চায় স্তুতি; এজন্যে তাদের এত তাগিদ যে এজন্যে সে পয়সাও খরচ করে!"

"অনুকম্পা হয় যে তারা নিজেদের স্তুতি পাবার যোগ্য করে' তুলতে একটু অধিকতর মনোযোগী হয় না"—একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আইরিণ উত্তর করিলেন।

"ঠিক কথা—কিন্তু অধিকাংশ পুরুষই, তা' সে যতই কদাকার ও নির্ব্বোধ হোক্, নিজেকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে করে"।

"আপনি করেন?" আইরিণ সহসা প্রশ্ন করিলেন।

"আমি নিজেকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে করি কিনা?"—ঈষৎ হাসিয়া ও মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"দেখি, যদি আপনার কাছে বা নিজের কাছে সরলভাবেই মন খুলে বলতে হয়, তবে আমার জবাব হচ্ছে 'হ্যাঁ'! আমিও আমার জাতের অন্য সকলের মতন একই মাটীতে গড়া—সুতরাং আমিও নিজেকে এই সৌরজগৎবাসিনী যে-কোনো মহিলার হৃদয়াসন-লাভের যোগ্য মনে করি! কদাকার, কুব্জপৃষ্ঠে একজন রাস্তার ঝাড়ুদারকে জিজ্ঞাসা করুন, ব্যক্তিগত যোগ্যতা-সম্বন্ধে তার ধারণাও বুঝিবা অন্যরকম হবে না।"

ফেরার এই সময় হাসিয়া উঠিল; সকৌতুক হাস্যে আইরিণেরও চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"পুরুষের স্বভাব থেকে এ ধারণা কোনোমতেই আপনি উৎপাটিত করতে পারেন না"—এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"যে, আমাদের অভিপ্রায়, তা' সে যতই অপরিচ্ছন্ন হোক্ না কেন, নারীপ্রকৃতির রুচিকর হ'তেই হবে। প্রথিতযশা স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পুরুষজাতি যে সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে তার মূলরহস্য আপনি এইখানেই পাবেন। মনীষাসম্পন্না মহিলা তাঁর নিজের ও পশুমতিদের মাঝখানে এমন একটা সীমারেখা টেনে রাখেন, যার পার থেকে চীৎকার করা চলে, কিন্তু যা' ডিঙিয়ে যাওয়া চলে না—আর সেইজন্যেই তাদের আক্রোশ। আপনি শুধু প্রতিভা-সম্পন্না নন, পরমাসুন্দরীও বটেন; আপন মর্য্যাদা-গৌরবে, পুরুষের সাহায্য-নিরপেক্ষ হয়ে, আপনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এই যথেষ্ট প্রমাণ যে আপনি তাদের নীচ ও ইতর মনোবৃত্তিকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। ফলে, নিজের সাফাইএর জন্যে তারা'ও যে আপনাকে অপছন্দ করবে, এ তো ধরা কথা। যদি তাদের প্রশংসা পেতে চান,—কোনো লম্পটের সঙ্গে ভেসে পড়ুন, গোটাকতক স্বামী যোগাড় করুন, নারী-মর্য্যাদা আহত হয় এমন কোনো কাজে নামুন; শকুন কিম্বা কীট হোন—কিন্তু নক্ষত্র থাকিবেন না; মানুষের হৃদয়ে নক্ষত্রের ঠাঁই নেই—তারা বড় দূরের, বড় ঠাণ্ডা, অসহ্য পবিত্র!"

"আপনি বিদ্রূপ করছেন, না অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে একথা বলছেন?"—আইরিণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে, দেবি"—চেয়ার হইতে স্মিতাননে উত্থিত হইয়া ও আইরিণের পূর্ণ-সম্মুখীন ভাবে দাঁড়াইয়া এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"পুরুষ সাধারণতঃ পশু! দলের মধ্যে আমরা কাজ করি ভাল, কিন্তু একলা নয়। সেনানী, নাবিক, রাজমিস্ত্রী, এঞ্জিনিয়ার, কারিগর প্রভৃতি যে কোনো কাজে, দলের মধ্যে আমরা ভাল। "দশে মিলে করি কাজ" এই নিয়মই পুরুষের সাফল্যের পক্ষে সত্য; 'নিজের নিজের চরকা' পুরুষ সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে না। পুরুষের সাফল্য পরস্পরের বা কোনো নারীর সহায়তার অপেক্ষা রাখে। অধিকাংশ পুরুষেরই সাফল্যের মূলে নারীহস্তের নিপুণ পরিচালনা ও নারীচিত্তের অপরিসীম

ধৈর্য্য প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, কিন্তু তা' স্বীকার করবার উদারতাটা পর্য্যন্ত আমাদের নেই। এখানে আমরা শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, নির্ব্বোধও বটে। তবু, ব্যক্তিগতভাবে আমি একথা স্বীকার করাকে গৌরব অনুভব করি, যে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়াগুলির জন্যে আমি কোনো এক নারীর বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ও অসামান্য দূরদর্শিতার কাছে ঋণী।"

"তা' হলে"—ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি কোনো একজনকে ভালবাসেন নিশ্চয়ই ?"

এল র‍্যামির মুখভাবে একটা চিন্তার ছায়া ঢেউ খেলিয়া গেল।

"না দেবি, ভালবাসার শক্তি আমার নেই, অন্ততঃ বিশ্বসংসার যে ভাবে তাকে বুঝে চলেছে সেভাবে। ভালবাসার অস্তিত্বে অবশ্যই সংশয় নেই, কিন্তু মানব জগত যেভাবে তা' গ্রহণ করছে, তা' সে নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, পুরুষ কোনো নারীকে ভালবাসে ; সে মারা গেল ; পুরুষ ক্রমে তা'কে ভুলে গেল, আর একজনকে ভালবাসলে—এই রকম চল্‌লো। একে ভালবাসা বলা যায় না, যদিও মানব সমাজ এইতেই সন্তুষ্ট। এরকম একটা চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে যে আপনি অশ্রদ্ধা করেন, সে ঠিকই করেন। যে-দাবী আপনার স্বভাব-সঙ্গত, তার কাছে এ-জিনিস পর্য্যাপ্ত নয় ; আপনি খুঁজছেন অধিকতর স্থায়ী কিছু।"

"যা' কখনও হয়তো আমি পাবো না"—নতমুখে ধীরে ধীরে আইরিণ বলিলেন।

"যা' আপনি পাবেন নিশ্চই পাবেন"—দৃঢ়কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন। "সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, তা' সে ভাল বা মন্দ যাই হোক্ না কেন, একদিন পূর্ণ হ'তে বাধ্য, কেননা বিশ্বপ্রকৃতির মিতব্যয়িতার অপব্যয়ের স্থান নেই। সেইজন্যেই কোনো বাসনাকে প্রশ্রয় দেবার আগে তার ফলাফলের ওজনবোধ বিশেষভাবে দরকার। আপনার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা আমি পরিস্কার বুঝছি—তার মধ্যে আছে চাঞ্চল্য আর অসন্তোষ। আপনি দেখ্‌ছেন যে আপনার যশোমুকুট কণ্টকময় ; বেশ তো, হোক্ না—সগৌরবে তা'কে শিরে বহন করুন, এমন কি ছিন্ন ললাট থেকে রক্তধারা ঝরে পড়লেও! সময়ে সময়ে নির্জ্জনতা আপনার পক্ষে বিরক্তিকর মনে হয় ? শিল্পকলার সেবকসেবিকাদের এইটেই হচ্ছে নিয়তি—তিনি আধখানা মন চান

না, সমস্ত হৃদয়টাই তাঁর কাম্য। যদি আমাকে কোনো ভাগ্যবতী মহিলার নাম করতে বলা হয়, তা' হ'লে বুঝিবা আমি আপনারই নাম করবো, কেননা জ্ঞানমার্গে উন্নতি-সত্বেও আপনি আপনার বিশ্বাস রক্ষা করতে পেরেছেন।"

"আমার ধর্ম্ম রক্ষা করতে পেরেছি, এই বলাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়"—আইরিণ বলিলেন—"তবে বলা ভাল যে সে ধর্ম্ম কোনো 'সমাজ-মন্দিরের' নয়।"

এল র‍্যামির মুখভাবে একটা অধীরতা ফুটিয়া উঠিল। তিনি উত্তর করিলেন—"সমাজ-মন্দিরের ধর্ম্ম যে শুধুই লোক-দেখানো" তা' আমরা সকলেই জানি। আমি 'বিশ্বাস রক্ষা' করার কথা এই অর্থে বলেছি যে আপনি নিঃসংশয় প্রমাণ না পেয়েও ভগবানে বিশ্বাস করতে পারেন। এ-যুগে এই ক্ষমতাটাই একটা মস্ত ক্ষমতা। আমার যদি এ-ক্ষমতা থাকতো!"

চকিত-বিস্ময়ে আইরিণ বক্তার দিকে চাহিলেন।

"অবশ্যই আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?"

"প্রমাণ করতে যতক্ষণ না পারছি ততক্ষণ নয়!" এল র‍্যামির চক্ষে একটা বিদ্রোহের দীপ্তি প্রকাশ পাইল। "পাপের জয় ও পুণ্যের পরাভব আমার কাছে তাঁকে পরিস্কার করে না। যন্ত্রণা ও মৃত্যু আমার চিত্ত-দর্পণে তাঁর লোক-প্রসিদ্ধ 'প্রেম ও সততার' কোনো অর্থ বহন করে' আনে না। তাঁর প্রহেলিকা আমি অপসারিত করবো; তাঁর অভিপ্রায়ের মর্ম্মভেদ করবো—জনস্রোতের স্তবস্তুতিতে যোগ দেবার কথা তার পরে।

"হে ভগবান, তুমি কল্যাণের উৎস, তোমার সৃষ্টি আনন্দ-সুন্দর ও অপরূপ"—মানবদৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে একথা বিঘোষিত করবার আগে আমি বুদ্ধির দ্বারা জানবো ও অন্তরের অন্তরে অনুভব করবো যে ঐ ঘোষণাবাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য!"

এল র‍্যামির কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ও উক্তিতে একটা অপূর্ব্ব তেজ ফুটিয়া উঠিল। আইরিণ আপন অজ্ঞাতসারে তাঁহার তৎকালীন মর্য্যাদাসুন্দর ভঙ্গীটির দিকে প্রশংসা-বর্ষী-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

"স্রষ্টার পরীক্ষা গ্রহণ বা তাঁর সৃষ্টির মূল্য-বিচার করবার দায়িত্ব অঙ্গীকার করা অবশ্যই অসমসাহসী হৃদয়ের লক্ষণ"—মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন।

"যদি কোনো স্রষ্টা থাকেন,"—এল র‍্যামি বলিলেন—"আর যদি একথা সত্য হয় যে সমস্ত বস্তুই তাঁর মধ্যে থেকে আসে, তবে আমার এই অনুসন্ধিৎসাও অবশ্য তাঁরই প্রেরণা। দানবে আমার বিশ্বাস নেই, তবু, যদি এরকম কিছু থাকে, তবে তার জন্যেও জবাবদিহির দায়িত্ব ঐ স্রষ্টারই। এখন আপনার প্রশ্নেই ফিরে আসা যাক্; এই যে বিশ্বব্যাপী নারীচরিত্রের ব্যভিচার, এর জন্যে ভগবানকে কি আমরা কিয়ৎপরিমাণে দায়ী কর্‌বো না? এ পাপ জগতজোড়া, অথচ একে তিরস্কৃত করবার অতি অল্প চেষ্টাই এ-যাবৎ করা হয়েছে, কারণ পুরুষেরা, অর্থাৎ ঐ ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতারা, এখানে আইনকর্ত্তা। ইংরাজেরা, এমন কি সাধারণতঃ ইউরোপীয়মাত্রেই, নারীর জীবন ও স্বাস্থ্যস্বাচ্ছন্দ্য এমনভাবে নষ্ট করে চলেছে যা' যে-কোনো বর্ব্বরজাতির অনুরূপ বলা যেতে পারে। বেশীর ভাগ নারীজীবনই প্রকৃতপক্ষে পাশব; কৈশোরে চিত্তাকর্ষক হবার চেষ্টায় পরিচ্ছদের পারিপাট্য, অঙ্গের প্রসাধন, আদপ-কায়দা ও চালচলন শিক্ষাতেই তাদের দিন কাটে; যৌবনে সঙ্গী-শিকারের পর থেকেই তার দ্বিতীয়-কর্ত্তব্য দাঁড়ায় ঐ সঙ্গীকে সন্তান উপহার দেওয়া; পালিত সন্তানদের সংহারে পাঠিয়ে তার তৃতীয় কর্ত্তব্য হয়—কুঞ্চিত, স্থূল, দন্তহীন ও কলহ কুশল বার্দ্ধক্যে প্রবেশ। মোটের উপর, তাদের সারাটা জীবনই বুঝিবা বাঘিনী বা অন্য কোনো বন্যপশুর চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়। যে-নারী এ সমস্ত অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠে, তাকে পুরুষ পছন্দ করে না, কেননা তাদের আর কামের দাস্যে নিয়োগ করা চলে না।"

আইরিণ ক্ষণকাল নীরবে ও নতনেত্রে বসিয়া রহিলেন পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিষন্নকণ্ঠে বলিলেন—"তা' হলে এ-জাতির সাধারণ ভাগ্য থেকে নিজেকে একটু ভিন্নরকম কর্‌তে চেষ্টা দেখ্‌ছি নিরর্থক; নিজেকে নিজের অবলম্বনটীর যোগ্য করে' তোলবার চেষ্টায় যদি ঘৃণিতই হতে হয়"—

"ভুল করছেন; সাহিত্য যে আপনার অবলম্বন, একথা পুরুষ কখনও স্বীকার কর্‌বে না! গণ্ডা ছয়েক সন্তান-সন্ততির ভারে পিষ্ট হ'তে হ'তে মরণের পথে আপনার অগ্রসর বরং দেখ্‌তে পার্‌বে, তবু আপন যশোগৌরবে তাদের আকাঙ্ক্ষা নিঃপেক্ষ হয়ে চলা তাঁ'রা আদৌ সহ্য করতে পারবে না। সে যাই হোক্—আপনার ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই—কেননা, আপনি

যে শ্রেষ্ঠতর পথ বেছে নিয়েছেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই ; যদিও আমি ঠিক বল্‌তে পারিনে, কেমন করে' বা কেন আমার এরকম মনে হচ্ছে।"

"কেন বা কেমন করে' মনে হয় তা' না বল্‌তে পারলেও, যদি কোনো-কিছুর সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়"—ফেরাজ সহসা বলিয়া উঠিল—"তা' হ'লে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও 'কেন বা কেমন করে' না বলতে পেরেও নিশ্চিত হওয়া কি সমান সহজ নয় ?"

"চমৎকার তোমার উদ্ভাবনা, ফেরাজ"—প্রফুল্লহাস্য এল র‍্যামি বলিলেন—"কিন্তু এটা মনে রেখো যে তোমার বা উপন্যাস-রচয়িত্রী আইরিণের পক্ষে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস যতটা সহজসাধ্য, আমার পক্ষে ঠিক ততটা নয়। আমি তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত নই ; আমি তাঁকে দেখিনি বা তাঁর সম্বন্ধে সচেতনও নই। ভগবান-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া আর কল্যাণ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া একই কথা ; কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে আমাদের মধ্যে বুঝিবা কেউই এ-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় নয়। অথচ আমার বিশ্বাস, যদি বাস্তবিকই আমরা ভগবান-সম্বন্ধে নিশ্চিত হতুম তাহ'লে অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও জগত থেকে বিলুপ্ত হোত। রহস্যই হচ্ছে এই যে কিজন্যে তিনি তাঁর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত করেন না ? এ-কাজ করা নিশ্চয়ই তাঁর সাধ্যায়ত্ত, এবং এতে তাঁর ও আমাদের সকলেরই সুবিধা, কেননা এতে মানব-জগত একটা অপরিসীম দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়।"

ফেরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল ; বিরক্তিপূর্ণ স্বরে সে বলিল—"তোমার উক্তিগুলোতে এত নির্মম 'নিশ্চয়তা' না থাক্‌লেই আমি খুসী হই ; এত জোরের সঙ্গে কথা কয়ে লাভ কি ? এতে মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়।"

"ন্যায়সঙ্গত ধারণা যুক্তির সঙ্গে প্রচারিত দেখে মন খারাপ হওয়া ঠিক কি ?" সংযতকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"তোমার সাম্‌নে যিনি বসে রয়েছেন তাঁর মন নিশ্চয়ই খারাপ হয়নি।"

"না"—ধীরকণ্ঠে আইরিণ বলিলেন—"তবে আমি আপনাকে আধ্যাত্মশাস্ত্রেই অধিক আস্থাবান্ মনে করেছিলুম"—

"দেবি"—গাঢ়স্বরে এল র‍্যামি বলিলেন—"আমি আধ্যাত্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু তা' এইভাবে ; আমি বিশ্বাস করি যে এ-জগৎ বা সকল জগতই 'প্রাণ' ও 'বস্তু'র সমবায়ে

গঠিত—শুধু বিশ্বাস কেন, এ-সত্য আমি জানি। আমাদের চতুর্দ্দিকের এই আকাশ, এমন কি সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ এই প্রাণ আর বস্তুর সংযোগফল। প্রত্যেক জীবত প্রাণীই এই দু'টী পদার্থের মিশ্রণে গঠিত। প্রাণ, যা' নাকি বস্তুরই অংশ ও বস্তুরই অণুপ্রবিষ্ট, তার ওপর আমার কিছু কিছু প্রভাবও আছে। যারা আমার অবলম্বিত পথের ভাবী পথিক, সম্ভবতঃ তাদের শক্তি আমার চেয়েও বেশী হবে। মানুষের প্রাণে আমি শক্তি-সঞ্চার করতে পারি, বায়ুমণ্ডলকে আমার প্রভাব-চালিত করতে পারি, পৃথিবীর বুক থেকে এমন একটা বাষ্প-মূর্ত্তি উত্থিত করতে পারি যা' আপনার কাছে কোনো মৃতের প্রেতাত্মা বলেই মনে হবে; কিন্তু যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে প্রাণ-সম্বন্ধীয় এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ঈশ্বর বা ঐশী-বিভূতির প্রমাণ কিনা, তবে আমার জবাব হচ্ছে—না। তাঁর তেজ নিয়ে খুসী মত খেলা করবার অধিকার মানুষকে তিনি দিতে পারেন না—কিন্তু আগুন থেকে, জল থেকে, মাটী থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাণ-সত্তা আকর্ষণ করে আমি আমার যা' খুসী করতে পারি। এই মুহূর্ত্তেই আমি অসংখ্য ঐন্দ্রজালিক মূর্ত্তি সৃষ্টি করতে পারি, আপনার শ্রুতিসুখের জন্যে বায়ুবক্ষ থেকে এমন সব সঙ্গীত ধ্বনিত করতে পারি যা' বহুকাল-আগে মৃত নরনারীর সন্তোষ উৎপাদন করে' গিয়েছে। এডিসনের ফনোগ্রাফের চেয়ে বাতাস উৎকৃষ্টতর ফনোগ্রাফ তো বটেই, তা' ছাড়া এর সুবিধা এই যে এ-জিনিস অনাদিকালের।"

"কিন্তু এ সব শক্তিও অদ্ভুত!"—বিস্ময়-উজ্জ্বল চক্ষে আইরিণ বলিলেন—"কেমন করে আপনি এ-শক্তি লাভ করেছেন তা তো আমি বুঝতেই পার্চ্ছিনে।"

"ঠিক তেমনি, আপনার চেয়ে যারা অল্পশক্তিসম্পন্ন, তারাও বুঝতে পারে না যে আপনি কেমন করে' সাহিত্যকলায় সুনিপুণা হতে পেরেছেন। সমস্ত আর্ট, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত আবিষ্ক্রিয়াই অধ্যবসায় আর ইচ্ছাসংযমের ফল। আপনি যাকে আমার 'শক্তি' বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তা' খুবই সামান্য। যে-সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছিলুম স্বভাবের মধ্যেই তার কারণ মেলে,—এ-সমস্ত ব্যাপারেরই একমাত্র চাবী হচ্ছে এই প্রকাণ্ড সত্যটী যে ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই হারায় না। আমার এ-কথাটী মনে গেঁথে রাখবেন। আলোক সমস্ত দৃশ্য সঞ্চিত রাখে, বাতাস সমস্ত শব্দ ধারণ করে; তা' যদি হয়, তবে বায়ুতরঙ্গের ওঠানামা বা আলোক-স্পন্দনের পৌনঃপুনিকতা অনুসরণ করবার নৈপুণ্য যার আছে, সে যে সেগুলিকে ঘুরিয়ে

আনতে সক্ষম হবে, এতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই। এমন ভাব্‌বেন না যে সামান্ত একটা চিন্তা, যা' স্বভাবতঃই আপনি নিতান্ত নিজস্ব মনে করেন, তা' তার জন্মস্থান মস্তিষ্কেই আবদ্ধ থাকে। এমন কি, যখন আপনি চিন্তা করছেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তার সূক্ষ্ম নির্য্যাস আলো বাতাসে চারিয়ে যেতে থাকে।"

"আপনি বল্‌তে চান যে চিন্তা কারুর নিজস্ব নয়, তা' সর্ব্বসাধারণের?" আইরিণ বলিলেন।

"হাঁ, ঠিক তাই,"—এল র‍্যামি বলিলেন—"আমার মতে, যদি দেবতা থাকেন তবে চিন্তাই তার প্রতিচ্ছায়া, কারণ চিন্তা স্বাধীন, আত্মতন্ত্র, সর্ব্বশোষক, সৃজনদক্ষ, অবাধগতি ও অক্লান্ত। চিন্তাই হচ্ছে একমাত্র প্রচলিত শক্তি যা' মানুষকে দেবতা করতে সক্ষম।"

তাঁহার উক্তি ও বলিবার ধরণে অভিভূত হইয়া আইরিণ ক্ষণকাল স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন; পরে নম্রকণ্ঠে বলিলেন—

"চিন্তাকে যে আপনি সম্ভাব্য ঐশী-প্রতিচ্ছায়া বলে' স্বীকার করছেন এতে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি—তা' এই ভেবে যে আলো কোনোখানে থাক্‌লে আলোর প্রতিফলনও থাকতো না। আমি একটা মানসিক অশোয়াস্তি নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলুম—এখন সেটা কেটে গেল। নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকাই বোধ করি আমার উচিৎ—নিশ্চয়ই আমি অধিকাংশ স্ত্রীলোকের চেয়ে ভাগ্যবতী।"

"নিশ্চয়ই,"—আইরিণের দিকে সস্নেহে চাহিয়া স্মিতমুখে এল র‍্যামি বলিলেন—"ভগবান আপনাকে যে ভাগ্যের অধিকারিণী করেছেন, আশা করি আপনার বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা তা' নষ্ট করবে না। এখন বিবাহ করবেন না—তার ফল আপনার পক্ষে ভাল হবে না। প্রেমানুভূতির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য নষ্ট করবার পক্ষে অল্পমাত্র গদ্যের স্পর্শই যথেষ্ট; প্রত্যেক বিবাহিতই জানে যে পরিণয় আগাগোড়াই গদ্য—একেবারে নীরস গদ্য।"

ঈষৎ হাসিয়া ও বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আইরিণ বলিলেন—"কাল আপনার ভাইকে এ্যাস্‌ওয়ার্থের সংসর্গে দেখলুম, কিন্তু বুঝ্‌তে পারিনি কেমন করে' এই দুটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতিতে মিশ খেয়েছে।"

"না, না, আমরা মিশ খাইনি, একেবারেই না"—ফেরাজ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"পরস্পরের সঙ্গে আর বড় বেশী পরিচয় আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"একথা শুনে আমি সুখী হলুম"—সস্নেহে ফেরাজের দিকে চাহিয়া আইরিণ বলিলেন—"আপনি যুবক, কিন্তু এ্যান্সওয়ার্থ বুড়িয়ে গিয়েছেন,—বয়েসে নয়, অন্তরে। একালের আধুনিক দুঃখবাদের ছোঁয়াচ লাগা আপনার পক্ষে শুভ হবে না।"

"কিন্তু"—একটু ইতস্ততঃ করিয়া ফেরাজ সসঙ্কোচে বলিল—"আপনিই কি এ্যান্সওয়ার্থকে তার ছবির জন্যে আমাকে 'মডেল' করার কথা বলেননি?"

"আমিই বলেছিলুম বটে"—ঈষৎ হাসিয়া আইরিণ উত্তর করিলেন—"কিন্তু আপনি তা'তে রাজী হবেন এমন কথা আমি ভাবিনি। তা' ছাড়া আমি নিশ্চিত জানতুম যে, যদিও বা আপনি রাজী হন, তবু সে আপনার যথার্থ রূপটুকু কিছুতেই আঁকতে পারবে না—কেননা তার চিত্রশিল্প দেহকে মাত্র আঁকতে পারে, আত্মাকে নয়; ফলকথা, তার কাছে ও-রকম প্রস্তাব করা আমার কাছে বেশ কৌতুককরই মনে হয়েছিল।"

"ঠিক্—নারীজনোচিত বটে,"—এল র‍্যামি বলিলেন—"তাকে এমন একটা কার্য্যভার অর্পণ করে' আপনি আমোদ পেয়েছিলেন যা' করা তা'র পক্ষে সম্ভব হবে না। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকদের যে কেন সাধারণতঃ পছন্দ করা হয় না, তার আর একটা কারণ এইখানেই পাওয়া যাচ্ছে—তারা চায় বেশী কিন্তু দেয় কম।"

"আপনি আমাদের ওপর অবিচার করছেন"—ক্ষিপ্রকণ্ঠে আইরিণ উত্তর করিল—"যখন ভালবাসি, তখন আমরা কিছুই হাতে রেখে দিইনে।"

"এও একটা বাড়াবাড়ি!"—গম্ভীরকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"নারীমাত্রেরই এটা সাধারণ দোষ। সমস্ত দিয়ে না ফেলে কিছু হাতে রাখাই আপনাদের উচিৎ। 'মোহিনী' হ'তে গেলে 'প্রহেলিকা'বৎ হওয়াই দরকার। হেঁয়ালীটা যদি একবার পুরুষকে বুঝতে দেওয়া যায়, তা হ'লেই রহস্যজাল ছিঁড়ে পড়ে। পুরুষের খাতের ওপর শক্তি-বিস্তার করতে হ'লে শান্ত, নির্ব্বিকার বা একঘেয়ে ভালমানুষীভরা নারীপ্রকৃতি বড় বেশী কাজে লাগে না। এ্যান্টনীকে ক্লিওপেট্রাই গোলাম করতে পেরেছিলেন, নিরীহ বা সাদাসিদে অক্টেভিয়া নয়।"

হাসিতে হাসিতে আইরিণ বলিলেন—"এ-জাতীয় নারীতত্ত্ব-মতে, অপ্সরীরা নিশ্চয়ই খুব নিরীহ, এমন কি অবাঞ্ছনীয় প্রাণীই হবে।"

চিন্তার প্রগাঢ়তায় এল র‍্যামির নয়নদ্বয় সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল—"অপ্সরা-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিতান্তই হীন ও ভ্রান্ত; অজ্ঞ পুরাণকারের অলস কল্পনাই হ'চ্ছে তার ভিত্তি। আমার ধারণা-অনুসারে অপ্সরা হচ্ছে বিদ্যুতের মতই স্বাধীন, উজ্জ্বল ও চঞ্চল। নব নব জীবনের, নব নব প্রেমের অনুসন্ধানে তারায় তারায় সে ভ্রাম্যমানা—তার কণ্ঠে সঙ্গীত, নয়নে বহ্নি,—তার অমর জ্যোতিঃদেহের প্রত্যেকটী তন্ত্রী, যা-কিছু সম্পূর্ণ যা-কিছু তার অস্তিত্বের সমধর্ম্মী সে সমস্তকেই পাবার নেবার জন্য আকুল অথচ অনাবিল বাসনায় স্পন্দিত। সৌন্দর্য্য, ঔজ্জ্বল্য, উদ্দাম, গরিমা, চিন্তা ও ভঙ্গী-বৈচিত্র্যের অপরিসীমতা—এই সমস্ত উপাদানের বদলে দু'খানি ডানা-বার-করা নারীমূর্ত্তিই যদি অপ্সরার স্বরূপ হয়, তবে স্রষ্টার ভাণ্ডার নিতান্তই দরিদ্র বল্‌তে হবে!"

"আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন এ-জাতীয় কিছু আপনি দেখেছেন?"—বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে আইরিণ বলিলেন।

এল র‍্যামির আননমণ্ডলে কি-যেন-একটা চিন্তার ছায়া দেখা দিল।

"না, দেবি—শুধু একবার—স্বপ্নে!.. আপনি যাচ্ছেন—আচ্ছা বিদায়! সুখী হোন,—আপনার মধ্যে যে অপ্সরাধর্ম্ম নিহিত, তাকে বিকশিত করুন,—যদি স্বর্গ কোথাও থাকে, তবে যে-পথে সেখানে পৌঁছোনো যাবে সেই পথেই আপনি চলেছেন।"

"আপনার এই বিশ্বাস?"—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আইরিণ বলিলেন—"এ বিশ্বাস যেন সত্য হয়; কিন্তু আমার কখনও কখনও ভয় হয়, কখনও বা সন্দেহ হয়। আপনার আশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ,—জীবনে এই প্রথম আমি পুরুষের কাছ থেকে এতখানি করুণা, সহৃদয়তা ও স্নেহ লাভ করলুম। বিদায়!"

আইরিণ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন;·দ্বারদেশে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল—ফেরাজ তাঁহাকে তুলিয়া দিয়া, চিন্তিত চিত্তে ধীরে ধীরে ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

"ইনি যে-রকম বলে গেলেন, বাস্তবিকই কি পুরুষেরা নারীর ওপর ততখানি অত্যাচার করে?" সে জিজ্ঞাসা করিল।

এল স্বামি মুহূর্ত্তকাল নীরবে রহিলেন,—পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"হ্যাঁ ফেরাজ, তা' করে; যতদিন জগত সচল থাকবে, তত দিন করবে! ভগবানই এর বিহিত করুন!—তিনিই এই নারীপীড়ন-নীতির প্রবর্ত্তক, আমরা নই!"

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

কবির কৈফিয়ৎ

-:•:-

এখন আমার পালা আমি গেয়ে যাব, হেসে যাব,
কেঁদে, ভালবেসে, ছুটে, তবেই শেষে বস্‌তে পাব।
শিশু যখন চল্‌তে শেখে তখন সে তো কতই পড়ে
পড়ে' পড়ে' চল্‌তে শিখে, ছোটে শেষে এব্‌লা ঝড়ে;
কবি যে গো চির-নবীন, নেহাৎ কাঁচা তাহার প্রাণ
বিশ্বমাঝে সেই সে শিশু নেইক' তাহার অভিমান।
হাসে সে যে উচ্চ হাসি, কাঁদে যখন ভূমে লোটে,
তোমরা সবাই হাস্‌চো, কবির লক্ষ্য তাতে নাইক' মোটে।

সবার সাথে যুক্ত কবি কান্না হাসির সকল সুরে
বিশ্বগীতির কেন্দ্র-কুহর কবিরই সে চিত্ত-পুরে;
অবিশ্বাসী হাস্‌চে শুনি, কেউ বা বলে নেহাৎ ছল,
নিন্দুকেরা দিচ্ছে গালি, করে ভীষণ কোলাহল।

পৃথ্বী বিপুল ক্ষুদ্র আমি, সবই কাঁচা ইহার কাছে
কাযেই আমার সবই কাঁচা, হৃদয়টা যে কাঁচাই আছে !
পাকার দাবী করি নি, ভাই, শীঘ্র এত পাক্‌ব' কেন
পড়্‌তে হবে পাক্‌লেই, নয় অকালপক্ক বল্‌বে হেন !

কাঁচার সময় কাঁচাই ভাল, পাকতে গেলেই গুরুপাক
কাঁচা পাতাই গাছের জীবন, কাঁচাসোনাই রঙের জাঁক।
কাঁচা মুকুল গন্ধে ভরা, কাঁচা মাটিই ঠাকুর গড়ে'
কাঁচা বাঁশই নোয়ায় ভাল, পাকলে তাতে ঘূণও ধরে।
বিশ্ব-সভায় লক্ষ্মা কাঁচা, ইন্দু কাঁচা,—বল' তবে
মন্দরটাই শ্রেষ্ঠ, কারণ সেই পুরাণো, বলতে হবে।
পাকাই যদি তোমার প্রিয়, বন্ধু, চিরকাঁচাই পাকে,
হিংসা সে যে জন্ম-পাকা, দুদিন বাদে তাই না-থাকে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৺কামাখ্যাধামের পথে।

আজ আমার বড় আনন্দের দিন। বহুদিনের আশা অদ্য ফলবতী হইবে বলিয়া ভরসা করিতেছি; সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই জড়ভরত দেহটা বেশ একটু সচল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্য সময়ে যে কার্য্য ত্রিশ মিনিটে করিতাম তাহা পাঁচ মিনিটে করিতেছি। তৎস্থানাগত বন্ধুবর্গের তত্রত্য উৎসাহ-জনক গল্প ও পথ-বৃত্তান্ত শ্রবণে এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় বৈষয়িক কার্য্যের উপদেশ প্রদানে অতি বিলম্বে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল। যাত্রার নির্দ্দিষ্ট

সময় উপস্থিত হইলে আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি, মাতার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ এবং জনৈকা আত্মীয়ার উদ্বেগ চিন্তা অথচ প্রেমপূর্ণ সজল আঁখি দুটীর 'শীঘ্র আসিবে' এই কাতর প্রার্থনা এবং কিঞ্চিৎ অর্থ পাথেয় লইয়া যাত্রা করিলাম। পুষ্কর রথে আরোহণ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম তখনও মেল আসিতে বিশ মিনিট বাকী। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সাদর সম্ভাষণে এবং যাত্রীগণের নানাবিধ মুখভাব দর্শন ও আলাপন শ্রবণে অবহেলে সময় অতিবাহিত হইল;—মহাবেগে সশব্দে বাষ্পীয় শকট উপস্থিত হইলে আমরা যে যার দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যস্তভাবে আরোহীকে অবতরণের সুযোগ না দিয়াই গাড়ীতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। গাড়ী এস্থানে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে সুতরাং ব্যস্ততা অনাবশ্যক।

আমাদের মহামান্য মহারাজ শ্রীশ্রীভূপ বাহাদুর মহোদয়ও এই গাড়ীতে কলিকাতায় যাইতেছেন। আমরা স্ত্রীলোকদিগকে যথা স্থানে উঠাইয়া দিয়া ট্রাঙ্ক ব্যাগ প্রভৃতি দ্রব্যাদি লইয়া যে গাড়ীতে উঠিলাম তাহাতে বসিবার স্থান অতি অল্পই ছিল। অন্য গাড়ীর সহিত তুলনায় এই গাড়ীতে লোক অল্পসংখ্যক লক্ষ্য করিয়া একটী মৃদু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম। কিন্তু এ স্বস্তি অধিকক্ষণ বোধ করিতে পারিলাম না;—মহারাজ সাহেবের ভৃত্যবর্গ ক্রমে সেই গাড়ীতেই উপস্থিত হইতে লাগিল এবং ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় অন্যান্য যাত্রীগণ যাহারা অন্ততঃ সান্তাহার যাইবে না তাহাদিগকে নামিতে আদেশ সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নামিতে অনুরোধ করিলেন এবং উহাদিগকে বসাইয়া দিলেন। গাড়ীতে থু ক্যারেজ লিখা ছিল না কিম্বা থাকিলেও আলোর অভাবে পড়িবার সুযোগ ছিল না বিধায় বুঝিলাম ইহা থু ক্যারেজ।

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় অন্য গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে চাহিলে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং একমাত্র পুরুষ সঙ্গী খুড়তুত ভাইয়ের সাহায্য দ্রব্যাদি অন্য গাড়ীতে উঠাইয়া নিজেরাও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কারণ বসিবার স্থান আদৌ ছিল না। বলা বাহুল্য আমরা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী।

অনেক দিনের কথা যখন ৺বৈদ্যনাথ হইয়া পুরীধামে গমন করি তখন তৃতীয় শ্রেণীর মর্ম্ম অসুবিধা ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মনে করিয়াছিলাম আর কখন তৃতীয় শ্রেণীতে

যাতায়াত করিব না। উহা একমাত্র রাজা জমিদার সাহেব ও সম্ভ্রান্ত বাবুদিগের ভৃত্যের এবং কুলী মজুর প্রভৃতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের জন্য মধ্যম শ্রেণী। অনর্থক অধিক পয়সা দেওয়া সম্বন্ধেও একটা অনুকুল যুক্তি আসিল। কোম্পানী আমাদিগের জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অথবা করিবেন আমরা ত তাহাই দিতে বাধ্য! আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থ বাঁচাইবার প্রত্যাশায় তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলে কোম্পানী কি করিবেন? তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দুর্ভোগ অদৃষ্টে অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু কথা হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী যাহা রাজা জমিদার সাহেব সুবার জন্য; তাহাতে অধিক নাই। আর তাঁহারা মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মত আট জনের জায়গায় ষোল জন বসিবেন না কিম্বা সঙ্গে এত অধিক সংখ্যক ভৃত্য থাকে না অথবা কুলী মজুর এত অধিক থাকে না যাহাতে সাধারণ যাত্রী হইতে অন্ততঃ চা'র গুণ হয়। অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী দুই একখানা, মধ্যম শ্রেণী একখানা, অবশিষ্ট সমস্ত গাড়ী তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এখন আমাদের মত সাধারণ লোক (ভদ্রলোক বলা যাইতে পারে না, নিজে নিজেকে বড় বলিলে কি হইবে উহারা ত ভদ্রলোক বলিয়া মনে করে না) ভৃত্যবর্গের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য (এই উক্তি সার্ব্বজনীন না হওয়াই সম্ভব। তবে বঙ্গদেশের কিয়দংশে এবং কোচবিহারের সর্ব্বত্র এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। এখানে ব্যবসায়ী, জোতদার, মহাজন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা ভৃত্যের সম্মান অধিক। বলা বাহুল্য তাঁহারা নীচ শ্রেণীর ভৃত্য নহেন, কর্ম্মচারী বলিয়া আখ্যাত। কিন্তু কৃষিজীবি কিম্বা সামান্য ব্যবসায়ী দরিদ্র অথবা কিঞ্চিৎ অর্থবান্ সাধারণ লোক অপেক্ষাও যেন মনে হয় নীচ শ্রেণীর ভৃত্য যথা খানসামা বাবুর্চ্চি পেয়াদা প্রভৃতি সম্মানার্হ) যদি মধ্যম শ্রেণীতে নীচে আট জনের জায়গায় ষোল জন উপরে দ্রব্যাদি রাখিবার তক্তায় বারো জন মেঝেতে আট জন দরজার সাম্‌নে চা'র জন করিয়া আট জন প্রত্যেকেই স্কন্ধে ও ক্রোড়ে দুই জন করিয়া লোক লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাশি জন লোক আরোহণ করেন তথাপি বোধহয় এক চতুর্থাংশ লোক আরোহণ করিতে পারিবে না। মেলা উপলক্ষে ত ততকিম্। এতাদৃশী অবস্থা অবশ্য কখনও সম্ভবপর নহে; তবে কখন কখন উহার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ বাইশ জন লোক উঠিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ প্রকাশ এবং নিজ নিজ প্রিয়-মুখ কিম্বা সুখ দুঃখাদি চিন্তা করিয়া সময়ের দৈর্ঘ্যহেতু তাৎকালিক কষ্ট ভুলিতে চেষ্টা করে।

অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া "দেড়া মাশুলকা গাড়ী উধার যাও" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগে আমাদেরই কাহাকে বিতাড়িত করারূপ দম্ভকে প্রশ্রয় দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুবিধা কিম্বা সুযোগ আছে এরূপ অবগত নহি।

এখন যে সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইব সেই সরিষাতেই যদি ভূত থাকে তবে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া সে সরিষা আহরণের প্রয়োজন?

আমার বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ অনর্থক অধিক ব্যয় করিতে হইল না তজ্জন্য কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিয়া যে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম সৌভাগ্যক্রমে তাহার দরোজায় দাঁড়াইতে এটুক স্থান পাইয়া ধন্য হইলাম। প্রিয়-মুখ চিন্তায় মনকে ব্যাকুল না করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগে মনকে ব্যস্ত, (কেন না গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে) রাখিয়া অনভ্যাসজ কষ্ট নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইলাম।

শ্রীকরুণাময় ভট্টাচার্য্য।

শ্রাবণে।

আজিকে শুধু পড়িছে মনে এমন শ্রাবণে
আকাশ ছিল এমন ধারা নিবিড় মেঘে ঢাকা,
এমনিতর দিনের শেষে বরষা গগনে
বলাকা কত উড়িয়া গেছে সিক্ত করি পাখা।

জাগিছে মনে এমন ধারা বাদল ঘন সাঁঝে
ভীরুর মত আসিয়াছিল ভরিয়া চোখে জল,
নয়ন দু'টী করিয়া নত কি জানি কেন লাজে
নীরবে শুধু ভিজায়ে দিল আপন হৃদি তল।

যতনে তা'রি হাতটী ধরি আপনা ভুলিয়া
শুধাসু যবে—একি এ লীলা—কেন এ তব বেশ ?
সজল দু'টী করুণ আঁখি কাঁপায়ে তুলিয়া
কহিল—"আজি বিদায় মাগি—সকল কর শেষ !"

জানি না আমি কেমনে গেল শিথিল করি' পাশ
নীরবে শুধু দাঁড়ায়েছিনু নয়নে ভরি' জল,
নাহিক মনে—তখন যেন ফেলিয়া ঘন শ্বাস
নিমেষ তরে উঠিয়াছিল শিহরি ধরাতল।

সেদিনও ছিল এমন ধারা আকাশ মেঘে ঢাকা
এমনি ব্যথা গোপন বুকে উঠিয়াছিল জাগি',
এপারে হেথা এমন ক'রে সিক্ত করি' পাখা
বিরহী চখা কাঁদিতে ছিল পারের প্রিয়া লাগি'।

রসাল স্নেহ-মিলন-পাশ শিথিল করিয়া
সে দিনও লুটি' পড়িয়াছিল ব্রততী ধরা' পর,
এমন সাঁঝে সে দিনও তরু প্রিয়ারে স্মরিয়া
ঝরায়ে ছিল অশ্রুধারা নীরবে ঝর ঝর।

বাদল সাঁঝে জাগিছে মনে অতীত কাহিনী
গোপন বুকে করুণ ব্যথা উঠিছে ফুটিয়া,
বেদনা-মাখা ব্যাকুল-করা বিরহ রাগিণী
হৃদয় তারে মুরছি আজি পড়িছে লুটিয়া।

জাগিছে-মনে এমনি সাঁঝে বিদায় মাগিয়া
নীরবে সে যে গিয়াছে চলি নয়নে ভরি জল,
জানিনা কোথা—কভু কি সেথা আমার লাগিয়া
অশ্রুপাতে ধন্য করি তুলিছে ধরাতল ?—

শ্রীরেণুকা দাসী

স্বাস্থ্যের-কথা।

—:*:—

বদ্ধ বায়ুর কুফল।

যে ঘরের বায়ু বদ্ধ অর্থাৎ চলাচল করে না, সে ঘরে কিছুকাল থাকিলে আমরা কিরূপ অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়ি, এবং বাহিরের খোলা বাতাসে গমন করিলে আমরা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া লইয়া অচিরে কিরূপ সুস্থ ও সতেজ হইয়া উঠিতে পারি তাহা সকলেই বোধহয় জানেন।

এরূপ উত্তপ্ত, বদ্ধ বায়ু কেন যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য আমাদিগকে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। দেহের মধ্যে যে দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, বায়ুতে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইডের আধিক্য তাহারই ফল। মানুষের দেহের উত্তাপের দরুণই বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বায়ু কেবল গরম হয় না—তাহা নরদেহ ত্যক্ত জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হইয়া আর্দ্র হইয়া উঠে। এইরূপ বায়ুতে যখন যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প সঞ্চিত হয়, তাহার পর ঐ বায়ু আর গৃহমধ্যস্থ লোকদিগের দেহ হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব, মানুষের দেহের চর্ম্মের উপর হইতে ঘর্ম্ম বায়ুতে মিশিয়া গিয়া দেহ শীতল হইতে পারে না। এই কারণেই দেহ হইতে তাপ, হয় আর বাহির হইতে পারে না, কিম্বা কম পরিমাণে বাহির

হয়। কিন্তু দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে এই ঘর্ম্ম এবং তাপ বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেহ হইতে ঘর্ম্ম অদৃশ্যভাবে বাহির হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। মানব-দেহের ইহা একটী স্বাভাবিক ও শাশ্বত ধর্ম্ম। দেহের মধ্যে অক্সিজেনের ক্রিয়া না হইলে তেজ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং দহন ক্রিয়া ভিন্ন অক্সিজেনের কাজও চলিতে পারে না। এই কারণেই—বায়ুতে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইডের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন—বদ্ধ বায়ুতে অবস্থানকালে মানুষের তেজ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আর্দ্র উত্তাপের দরুণ মানুষ যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ঐ একই কারণে ঐ একই ফল উৎপন্ন হয়—অবশ্য বেশী পরিমাণে। বায়ু যদি আর্দ্র না হইয়া শুষ্ক হয়, এবং বদ্ধ না হইয়া প্রবহমান থাকে, তাহা হইলে সেই বায়ুতে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইডের পরিমাণ বেশী হইলেও তাহা অনায়াসে সহ্য করা যায়। ডোবা জাহাজে (submarines) এই সত্যটীর যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

প্রবহমান বায়ুর উপকারিতা।

স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে কেবল যে বায়ুর তাপ এবং আর্দ্রতাই বিবেচ্য, তাহা নহে। বায়ুর গতিশীলতাই স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। একজন মানুষ একটী ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। সেই ঘরের বায়ু শীতল এবং শুষ্ক। কিন্তু যদি সেই বায়ু বদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহার গতিশীলতা না থাকে, তাহা হইলে, লোকটি স্বভাবতঃ যে পরিমাণে সুস্থ থাকিতে পারিত, ঐ বদ্ধ বায়ুতে সে কিছুতেই ততটা সুস্থ থাকিতে পারিবে না। বায়ু-স্রোত কিম্বা প্রবহমান বায়ুকে যাহারা ভয় করে, এবং তাহা সহ্য করিতে না পারে, তাহাদের জীবনী-শক্তি যতটা কমিয়া যায়, তাহাদের তেজ যতটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এতটা আর অন্য কোন কারণে ঘটিতে পারে না। মানবদেহের সমস্ত তেজ স্নায়ুর উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয়। এই সকল স্নায়ু চর্ম্মের নিম্ন হইতে মস্তিষ্কের ও মেরুদণ্ডের শক্তি উৎপাদক কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লক্ষ লক্ষ স্নায়ুর প্রান্ত চর্ম্মে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুতরাং চর্ম্মেই অসংখ্য স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই উত্তেজনাই শক্তি সঞ্চালনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইহারাই দেহের তেজকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল উত্তেজনা নানা কারণে

ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকাংশের কারণ গতিশীল বায়ুর স্রোত। বিভিন্ন তাপের অবস্থায় এই বায়ুর গতিশীলতা ধর্ম্ম স্নায়ুপ্রান্তকে উত্তেজিত করে। যখন কোন লোক চতুর্দ্দিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত স্থানে অবস্থান করে, যাহার জন্য ঘরের বায়ুর তাপ সমান ভাবে থাকে,—তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না—যখন বায়ুর আদৌ গতি থাকে না—বায়ু স্থির অচঞ্চল থাকে—তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ লোকটী মূর্খতা বশতঃ নিজেকে স্বাস্থ্যকর উত্তেজক, বলবর্দ্ধক পদার্থের উপভোগে বঞ্চিত করিতেছে। বায়ুর এই উত্তেজকশক্তি সাধারণতঃ অনুভব করা যায় না। যখন অনুভূত হয় তখনও তাহা বেশ প্রীতিকর হয় না—তখন তাহাকে বায়ুস্রোত বলা হয়। কিন্তু এই বায়ু স্রোত যে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন সে সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। যখন কোন মানুষ নিজেকে দুর্ব্বল বোধ করে, এমন কি তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, তখন যদি তাহাকে পাখার বাতাস করা যায়, তাহা হইলে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে যদি কেহ নিজেকে অবসন্ন ও ক্লান্ত বোধ করে, তখন সে যদি কোন বাগানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করে তাহা হইলে বৃক্ষগুলির ভিতর দিয়া মৃদু বায়ু সঞ্চালিত হইয়া তাহার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া দেয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই গতিশীল বায়ুর গুণে তাহার স্বাস্থ্যের উপকারই হইবে; ঐ বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড থাকিলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

বায়ু-সঞ্চালন।

প্রায় সর্ব্বদাই লোককে এই কথা বলিতে শুনা যায় যে, তাহারা টাট্‌কা তাজা বায়ু ভালবাসে। কিন্তু তাহারা বায়ুর স্রোত আদৌ পছন্দ করে না। তাহারা গৃহমধ্যে বায়ু সঞ্চালন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বায়ুর গতি এত মৃদু হওয়া আবশ্যক যে যেন হাওয়া গায়ে লাগিয়া তাহা অনুভূত হইতে না পারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পুস্তকাদিতে দেখা যায়, গায়ে হাওয়া লাগিবে না, বায়ুর অনুভূতি জন্মিবে না, অথচ গৃহমধ্যে বায়ু সঞ্চালিত হইবে এইভাবে বায়ু সঞ্চালনের নানা উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা মূর্খতা বা বোকামি আর কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতি আমাদের দেহের চর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই চর্ম্মে অসংখ্য স্নায়ু সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। এই

স্নায়ু নানা বিচিত্রগতিতে ক্ষুদ্র শিরাসংলগ্ন মাংসপেশীগুলিতে, শ্বাস প্রশ্বাসের কেন্দ্রে এবং দেহের অন্যান্য অংশে টেলিগ্রাফের মত সংবাদ বহন করিয়া থাকে। সেই চর্ম্ম যখন আমরা তুলা ও পশমজাত বস্ত্রাদির দ্বারা আবৃত রাখি, এবং সেই অবস্থাতেই আমরা সার্সি জানালা সমন্বিত কাচাধারের মধ্যে অবস্থিতি করি, তখন বুঝিতে হইবে, মূর্খতা বশতঃ আমরা আমাদের দৈহিক তেজ ও শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছি।

অধিকাংশ স্থলেই ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখিলেই বায়ু সঞ্চালনের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হয়। এই উপায়েই ঘরের মধ্যে প্রবল বেগে বায়ু স্বতঃই সঞ্চালিত হইতে পারে। বায়ু সঞ্চালনের যে সকল কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই খারাপ। কারণ, তদ্দ্বারা আমাদের দেহ কৃত্রিম অবস্থার বশীভূত হইয়া পড়ে; আমাদিগকে বদ্ধবায়ুতে বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং সে বায়ুর তাপের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না ঘটায়—সর্ব্বদাই তাহার তাপ সমান থাকায়,—সে বায়ু আমাদের চর্ম্মে আহত হইয়া তন্নিম্নস্থ স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

বহু লোককেই জীবনের অধিকাংশ সময় বদ্ধ, আর্দ্র, উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে বাস করিতে হয়। স্বাস্থ্য যে কি সুখের জিনিস,—এই সব লোক তাহা জানে না। তাহাদের গাত্রচর্ম্ম নিম্নস্থ স্নায়ুমণ্ডলীকে নিয়মিত ভাবে উত্তেজনামূলক কোন কার্য্য করিতে হয় না। যদি দৈবাৎ তাহার দেহে ঠাণ্ডা লাগে, তবে ঐ সকল অকর্ম্মণ্য স্নায়ু যথাস্থানে সতর্কতাসূচক সংবাদ পাঠাইতে পারে না। কিন্তু, পাঠাইলেও, স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল অভ্যাসের অভাবে সেই সংবাদ বুঝিতে পারে না। সুতরাং ঠাণ্ডা হাওয়ার অপকারিতা নিবারণের জন্য তাহারা কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারে না। কাজেই, ঠাণ্ডা লাগিয়া লোকটির শরীর অসুস্থ হয়, তাহার প্রাণশক্তি ক্লিষ্ট হইয়া উঠে। অসহ্য গরমে কিছুদিন ছটফট করিবার পর তাহার দেহ কি রকম করিয়া তাপ উৎপাদন করিতে হয়, তাহা যেন ভুলিয়া যায়। তার পর সেই ব্যক্তি তাহার গায়ে পাছে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে এই ভয়ে এত ভীত হয় যে, পুড়িয়া লাল হওয়া লোহার ডাণ্ডাকেও সে ততটা ভয় করে না। তাপ উৎপাদক শক্তি নষ্ট হইলে কাজ করিবার শক্তিও কমিয়া যায়।

সময়ে সময়ে শরীর যে শৈত্য বোধ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিয়ৎ পরিমাণে শৈত্য বোধ খুব প্রীতিকরই হইয়া থাকে। অত্যন্ত বেশী পরিমাণে ঠাণ্ডা না লাগিলে, সামান্য পরিমাণ ঠাণ্ডায় শরীরের কোন অনিষ্ট ত হয়ই না,—বরং তাহা বলকর ও স্বাস্থ্যকর। তবে গাত্রচর্ম্ম সংলগ্ন স্নায়ু মণ্ডলীর ক্রিয়া ব্যবহারের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিলে অবশ্য আলাদা কথা।

এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনুষ্য-বাস হেতু যখন কোন গৃহের বায়ু উত্তপ্ত ও আর্দ্র হইয়া উঠে, তখন বায়ুর উপাদানভূত কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে—পীড়িত ফুসফুস ও চর্ম্ম হইতে নিঃসৃত দূষিত পদার্থের দ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ চর্ম্ম মধ্য দিয়া যে ঘর্ম্ম বহির্গত হয়, তাহাতে এ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ, ক্যালসিক ফসফেট, ফেরিক অক্সাইড, উদ্বায়ী স্নেহজাতীয় এসিড, কখনও কখনও ভ্যালেরিয়ানিক ও ক্যাপ্রোরিক এসিড, এবং কখনও বা লিউসিন থাকে। ইহা ছাড়া আরও কোন কোন পদার্থ থাকিতে পারে। এই সকল দ্রব্য বায়ুকে দূষিত করে। একটি রেলগাড়ীর কক্ষে আট জন লোককে গাদাগাদি ঠেসাঠেসি করিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা কাটাইতে হইলে, এবং ঐ কক্ষের দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া রাখিলে অসংখ্যবার পরস্পরের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস বায়ু পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসরূপে টানিয়া লইতে হইলে, কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা কেহ অনুমান করিতে পারেন কি? থিয়েটার, বায়স্কোপ, যাত্রা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের স্থানে শত শত লোক তিন চারি ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া যে বিষ বায়ু সেবন করিয়া থাকেন, তাহার কথা ভাবিলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

আষাঢ়, ১৩২৮। —————— স্বাস্থ্য-সমাচার।

কৃষি-কথা।

—•—

পাটের বিছা পোকা।

এই হলুদ রংএর বিছা পোকা কৃষক মাত্রেই দেখিয়া থাকিবে। ইহা বঙ্গদেশে পাটের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। বিছা পোকা মটর, তিল, সরিষা, কফি, গাঁজা, শণ, পাট প্রভৃতি

অনেক শস্য খায়। পোকা বেশী হইলে ইহারা গাছের পাতা খাইয়া কেবল ডাঁটা রাখিয়া দেয়। ১৯১৭ সালে এই পোকা ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায় পাটের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছিল। অন্যান্য অনেক জায়গা হইতেও এই পোকা যে শস্যের বিশেষ অনিষ্টকারক এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

জীবন-বৃত্তান্ত :—স্ত্রী প্রজাপতি রাত্রে পাতার নীচে ৫০০ হইতে ১,০০০ ছোট হলুদ রংএর ডিম একত্রে পাড়িয়া থাকে। ২।৩ দিন পরে ডিম ফুটিয়া ছোট কীড়া (বিছা) বাহির হয়। ছোট বিছাগুলি একত্রে থাকিয়া পাতার সবুজ অংশ খায় কাজেই পাতাগুলি একটু লালচে হয় এবং দূর হইতেই ইহা দেখা যায়। কীড়াগুলি বড় হইলে ইহারা ছড়াইয়া পড়ে এবং তখন কেবল সবুজ অংশ না খাইয়া সম্পূর্ণ পাতা খায়। এই সময় ইহারা সকালে এবং বিকালে দল বান্ধিয়া এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেতে যায়। মধ্যাহ্নে বা বৃষ্টির সময় ইহারা চলাফেরা করে না। ২।৩ সপ্তাহ পরে যখন কীড়াগুলি পূর্ণবয়স্ক হয় তখন ইহারা মাটীর ঢিলের বা ঘাসের মধ্যে আপন লোম দ্বারা একটি কেয়া (রেশমের গুটির ন্যায়) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে পুত্তলি আকার ধারণ করে। পুত্তলি হইতে এক সপ্তাহের মধ্যেই হলুদ রংএর প্রজাপতি বাহির হয়। সময় সময় এই প্রজাপতিগুলিকে আক্রান্ত ক্ষেতে বা আশে পাশে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। খাদ্যের অভাব না হইলে ইহাদের বৎসরে আট বংশ পর্য্যন্ত হইতে পারে তবে এত বেশী বংশ প্রায় হয় না। ১৯১ সালে ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের পাটে বিছা পোকার তিন বংশ দেখা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় বংশই সকলের চেয়ে বেশী অনিষ্টকারী হইয়াছিল। ডিমগুলি প্রজাপতিতে পরিণত হইতে গ্রীষ্মকালে ৫ সপ্তাহ এবং শীতকালে প্রায় ২॥ মাস সময় লাগে।

বিছাপোকার শত্রু :—এক প্রকার ছোট কাল বোল্‌তা এই বিছা পোকার শত্রু। ইহা বিছার গায়ে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিয়া যে কীড়া হয় তাহা বিছাকে খাইয়া মারিয়া ফেলে এবং অবশেষে এই কীড়া বোল্‌তা হইয়া বাহির হয় এবং অন্যান্য বিছার গায়ে ডিম পাড়ে। শত্রু পোকা বেশী হইলে ইহারা অল্প সময়ের মধ্যেই বিছার বংশ ধ্বংস করিতে পারে। অন্য এক প্রকার কাল বোলতাও এই বিছার শত্রু। সময় সময় দেখা যায় বিছার গায়ে শাদা রেশমের গুটীর ন্যায় ছোট ছোট গুটী লাগিয়া আছে। সেগুলি এই শত্রু পোকারই গুটী।

সাধারণ মাছির ন্যায় বড় এক প্রকার মাছিও ইহার শত্রু। হলুদ রংএর সাধারণ বোলতাও এই বিছা ধরিয়া খায়। কচ্ছপের ন্যায় এক-প্রকার ছোট পোকাও বিছার গায় ইহার লম্বা ঠোঁট ঢুকাইয়া দিয়া বিছাকে খায়। এই সকল উপকারী পোকা মারিতে নাই।

প্রতিকার:—পাটক্ষেতে মধ্যে মধ্যে দেখিতে হইবে এবং পাতায় ডিম দেখা গেলে তাহাদিগকে তুলিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিবে। ডিম দেখা না গেলেও ছোট পোকাগুলি সহজেই ধরা পড়ে কারণ উপরোক্ত লালচে পাতা দেখা গেলেই বুঝা যায় পোকা লাগিয়াছে। এই সময় পোকা দেখা ও মারা সহজ এবং যদি প্রত্যেক কৃষক তাহার নিজ নিজ ক্ষেত দেখে তবে তাহার এক বিঘা জমির অধিকাংশ পোকা মারিতে আধ ঘণ্টা আন্দাজ সময় লাগিবে। তাহা না করিলে পোকাগুলি বড় হইয়া পাটের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে; কারণ ৭।৮ দিন পরে পোকাগুলি ক্ষেতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং সম্পূর্ণ পাতা খাইতে থাকে। পোকা ছোট থাকিতেই মারা খুব সহজ, ছড়াইয়া পড়িলে একটি একটি করিয়া পোকা মারা বড়ই কষ্টকর।

বিছাগুলি যখন কেবল এক জায়গায় থাকে তখন সম্ভব হইলে সেই জায়গার চারিদিকে একটি নালা করিবে যেন পোকাগুলি ঐ নালা পার হইয়া অন্য ক্ষেতে যাইতে না পারে। নালাটা এক ফুট চওড়া এবং এক ফুট গভীর হওয়া আবশ্যক। এক ক্ষেত হইতে অন্য ক্ষেতে যাইবার সময় পোকগুলি নালায় পড়িলে তাহাদিগকে সহজেই সংগ্রহ করিয়া মারিতে পারা যায়। অথবা সম্ভব হইলে নালাটা জলের দ্বারা পূর্ণ রাখিয়া তাহাতে কিছু আল্‌কাতরা মিশাইয়া দিবে যেন পোকা উহাতে পড়িলেই মরিয়া যায়।

যে সব আগাছায় বিছাপোকা লাগিতে দেখা যায় তাহা নষ্ট করিবে যেন কোন সময় পোকা তাহাতে থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে না পারে।

কৃষি-সমাচার।　　　　শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

বিকাশ।

—ঃ*ঃ—

অন্ধকারের ঘোম্‌টা টুটিয়া
আলোর কমল উঠ গো ফুটি,
বিথারি তোমার শুভ্র পর্ণ
অন্তর-রস নেও গো লুটি।
উলসি বিলসি উঠ গো বিকশি
বিশ্বভুবন উদ্ভাসি,
শঙ্কা-সরম দুঃখ-ভরম—
পুণ্য-কিরণ দিক্‌ নাশি।
গন্ধ তোমার গৌরব ঘোষে,
সৌরভ তব মর্ম্মজয়ী;
বর্ণ তোমার পঙ্ক আঁধার
চূর্ণ করে গো মঞ্জুময়ী!
বিশ্বভারতী বক্ষে তোমার
সৃষ্টি করিল আসন তার;
মর্ম্মে লুকানো গঙ্গা জ্ঞানের,
কণ্ঠে শোভিছে গীতির হার।
তোমারে ঘিরিয়া নৃত্য করিছে
কবির মানসী-সুন্দরী,
চিত্ত-চকোর মত্ত-বিভোর
সুধার গাগরী লাভ করি।

ভক্তি আনিলে—মুক্তি দানিলে,
শক্তি ঢালিলে মানব-মনে ;
জ্ঞান ও প্রেমের তীর্থ রচিলে
গঙ্গা-যমুনা সম্মিলনে।
নিখিল ভুবন লীলার সাগরে
নিত্য যাঁহার দীপ্তি ভায়,
আলোক-কমল-বিকাশ-বাসরে
এ কবি তাঁহার প্রসাদ চায়।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

সঙ্কটমোচন।*

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিক মহাসংকটের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক মহাসংকটের ভিতর দিয়াও আমাদের দেশ যে চলিয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। বলিতে কি, ধর্ম্মবিষয়ক মহাসঙ্কটের কারণেই রাজনৈতিক প্রভৃতি মহাসংকটও আসিয়াছে। রাজনীতিই বল, সমাজনীতিই বল, সকল নীতিই যে ধর্ম্মেতেই অবলম্বিত হইয়া আছে। ধর্ম্মের নিকট যদি আমরা খাঁটি থাকি, তবে তো সকল ক্ষেত্রেই আমরা খাঁটি থাকিব ; তখন কাজেই কোন বিষয়েই সংকটের অবস্থা আসিবার অবসরই আসিবে না।

আমাদের উপাস্য দেবতা পরব্রহ্মের শক্তিমত্তা যদি সত্যসত্যই উপলব্ধি করি, হৃদগত করিতে পারি, তবে মুহ্যমান হওয়া দূরে থাকু, আমরা আশান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিব না।

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বিগত সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত প্রবন্ধের মর্ম্ম

আমাদের উপাস্য দেবতা, যিনি নিজ শক্তিতে এই সমুদয় বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন, যিনি এক ইঙ্গিতে এই সমুদয় বিশ্ব পরিচালিত করিতেছেন; যিনি এই কোটী কোটী মানবের হৃদয়ে জ্ঞানের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি সকলই দান করিতেছেন, সেই পরমেশ্বর কয়জন? তিনি যেমন একমাত্র হইয়াও নিজের অতুলনীয় শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক বিরাট শক্তিকুণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনই আমার এই স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের মধ্যে একজনও যদি তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠি, তখন সেই একজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আগুন জ্বালাইয়া দিতে পারিবেন। তখন আমাদের কিসের ভয়, আর কিসের ভাবনা! তবে একটী কথা এই যে, আমরা নির্ভয় হইতে চাহিলে, সেই অন্তর্দেবতা ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে; তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ ডুবাইয়া দিতে হইবে; অগ্নিহোত্রী যেমন তাঁহার পূজার অগ্নিকে অবিচ্ছেদে জ্বালাইয়া রাখেন, সেইরূপ আমাদের অন্তরে ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনাকে একনিষ্ঠ-ভাবে অগ্নিময় মূর্ত্তিতে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে।

ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিলেই মানুষের প্রতি প্রেম, মানুষকে ভালবাসাও স্বভাবতই আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হইবে। কেন?—ভগবানকে ভালবাসিলে মানুষকেও ভাল বাসিব কেন? মানুষ যে তাঁহারই সন্তান। মানুষকে ভাল না বাসিয়া তাঁহাকে ভালবাসা!—সেটা মিথ্যা কথা। তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিলে, তাঁহাকে সত্যসত্য ভাল বাসিলে কেবল মানুষ কেন, তাঁহার সৃষ্ট সকল জীবেরই প্রতি তোমার স্নেহ-প্রীতি সম্প্রসারণ করিতে হইবে, কারণ এই প্রকার জীবে দয়া এবং মানবপ্রীতি, ইহাঁ যে তোমার সেই প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেবতারই প্রিয় কার্য্য। এই মহোচ্চ ভাব তোমার হৃদয় অধিকার করিলে, মানুষের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ করিয়া তুমি কি একটী মানুষকেও ঘৃণা করিতে পারিবে? কখনই নয়। তখন স্বভাবতঃই মানুষকে মানুষ বলিয়াই ভালবাসিতে পারিবে। ভগবানকে এই রকম প্রাণের সঙ্গে ভালবাসা এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্য বলিয়া মানুষকে ভাই বলিয়া বুকের ভিতর ডাকিয়া লওয়া—ইহাই হইল বর্ত্তমান ধর্ম্মবিষয়ক, কেবল ধর্ম্মবিষয়ক কেন, সর্ব্ববিষয়ক মহাসংকট হইতে মুক্তি দিবার একমাত্র তারক মন্ত্র, ইহাই আমাদের সঙ্কটমোচন মহামন্ত্র।

একদিকে পরমাত্মাকে আত্মার আত্মা বলিয়া জান; তাঁহাকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি কর; উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের সমুদয় ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ কর; অপরদিকে, সেই অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধাকে ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ বহিরাকারে প্রকাশ কর এবং তাঁহারই সন্তান মানুষকে ভালবাসাও তাঁহারই প্রিয়কার্য্য জানিয়াই মানুষকে ভালবাস এবং তাহার কল্যাণসাধনে যত্ন কর। ঈশ্বরকে প্রীতি করা—ইহাই হইল প্রকৃত সত্যধর্ম্মের শেষ কথা, ইহা ছাড়িয়া সত্যধর্ম্মের দ্বিতীয় কথা নাই। আবার জীবে দয়া ও মানবের হিতসাধনের দ্বারা ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনই হইল সমস্ত নীতিশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য, শেষ কথা।

আমাদের মুখের কথায় ও কাজে মিল করিতে গেলে ভগবানের স্থলে ঐহিক সুখসমৃদ্ধিকে মানসম্ভ্রমকে দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইলে চলিবে না। ঐহিক মানসম্ভ্রম সুখসম্পদকে প্রকৃত মঙ্গলের সঙ্গে এক করিয়া দেখিলে এবং তাহাতে আসক্ত হইয়া তাহারই পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইলে অনেক সময়ে ধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইবেই; এবং তখন সেই আসক্তির কারণেই তোমাকে সত্যধর্ম্মের পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেই হইবে। ঐহিক সুখসম্পদকেই আজকাল আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছি বলিয়াই যাঁহারা ঐহিক মানসম্ভ্রম ও সুখসম্পদে পরিবৃত, তাঁহাদেরই পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে এতই ব্যস্ত থাকি যে, যাহারা সত্যসত্য পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তি পাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের নিকটে আসে, কঠোর দুঃখবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া যাহারা আশ্রয় পাইতে চাহে, তাহাদের দিকে আমরা ফিরিয়া দেখিবার অবসরও পাই না। ঐহিক সুখসম্পদ মানসম্ভ্রমকে সর্ব্বস্ব করিয়া লইলে পুরাতন দাসখত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় নূতন আর একটী দাসখত লিখিয়া দিতে হইবে; পরাধীনতা হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভের আশা থাকিবে না। ইহাই আমাদের একটা মহাসঙ্কট।

ভগবানের করুণা যে অনুভব করে না, ভগবান হইতে যে দূরে থাকে, তাহার মত কেবল নিজের সুখকেই সমস্ত জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিও না। অতুল সম্পদের যদি অধিকারী হও, তবে সেই সম্পদ জগতের মঙ্গলের জন্য তোমার নিকট ভগবান গচ্ছিত রাখিয়াছেন জানিয়া তাহা সযত্নে রক্ষা করিবে; গর্ব্বে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাহা অন্যায়রূপে নষ্ট করিবার

অধিকার তোমার নাই। দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেই যদি বা তুমি পতিত হও, তবে তাহাও তোমার মঙ্গলেরই জন্য ভগবানের দান বলিয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে। সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও তৃষ্ণা দূর হয় না; বরঞ্চ সেই জল পান করিলে তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়, মরণ ঘনাইয়া আসে। কিন্তু এক ঘটি মিষ্ট জল পান করিলেই সমুদয় তৃষ্ণা দূর হইয়া প্রাণমন শীতল হয়। সেইরূপ ভগবানকে ছাড়িয়া শান্তির আশায় ঐহিক সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও যে প্রকৃত সুখ পাইবে শান্তি পাইবে তাহা কখনই মনে করিও না। বহুকালের দাসত্বের পর আজ মুক্তির আশাবাণী শোনা গিয়াছে; আর নূতন করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল নির্ম্মাল্য বলিয়া গলায় তুলিও না। ভগবৎপ্রদত্ত ঐ সঙ্কটমোচন মহামন্ত্র নির্ভীকহৃদয়ে মুখেও প্রচার করিবে, আবার তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া মহাশক্তি অর্জ্জন করিবে। ভগবানের মাভৈঃ রব শুনিতে থাক, আর তাঁহার হস্তে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া ঐহিক সুখের অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিলাসের প্রতি, আসক্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া নিজেদের কথায় ও কাজে মিল করিয়া কর্ত্তব্য কাজ করিয়া চলিয়া যাও; সেই কর্ম্মের শক্তি ও ফল দেখিয়া তুমি নিজেই অবাক হইবে। আমাদের প্রত্যেকের ভগবানকে খুঁজিয়া পাইবার উপর এবং সেই পাইবার চেষ্টা করার উপর আমাদের প্রত্যেকের, আমাদের পরিবারের, আমাদের দেশের এব সমস্ত জগতের সমূহ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, ইহা সত্য জানিয়া তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব, একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভম্ভবতি—এই সঙ্কটমোচন মহামন্ত্রকে কৌস্তুভমণির ন্যায় হৃদয়ে অহর্নিশি ধারণ করিয়া রাখ। ভগবান আমাদিগকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে মুক্তি প্রদান করুন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
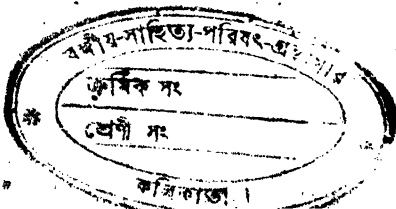
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৫ম বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩২৮ সাল। { ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

যাত্রী।

—:০:—

এবার আমায় করতে হবে
স্থদূর যাবার আয়োজন,
তরী যে ওই আস্‌ছে ঘাটে
বিদায় দেহ প্রিয়জন!
ডাক পড়েছে আজ বিদেশীর
পড়ছে ছায়া আঁধার নিশির,
কথার সময় রাখবে না যে
জরুর জবর প্রয়োজন।

(২)

ফুরায়ে ওই আসছে পুঁজি
তুলতে হবে ব্যবসায়,
মেলার শেষে বিজন দেশে
রইব বসে কি আশায় ?
ধুলোটের ওই পড়লো পালা
ভাঙ্‌তে হবে সখের চালা,
মনকে এবার করতে হবে
নিজের কাজে নিয়োজন।

(৩)

ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে ক্রমে
পরিচিতের পরিচয়,
আস্‌ছে সহজ জটিল হয়ে
বিধির বিধান তোরি জয় !
কি এক নিঠুর আমোদ করা
যত্নে ভাঙ্গা যত্নে গড়া,
নয়ন জলে বিদায় খণে
প্রণাম জানায় অভাজন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কুমীর

—•—

এই হাল বছরের (অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বেলা সাড়ে বারটার সময় এলেনা ইভানোভ্‌না বল্লেন যে আরকেডে (Arcade) যে ক'দিন ধরে কুমীরটা দেখাচ্ছে সেটা দেখে এলে একবার কেমন হয়? এলেনা হচ্ছেন আমার বিদ্বান সুসভ্য বন্ধু আইভান মাট্‌ভিচের পত্নী। বন্ধুবর আবার আমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও হ'ন, আর আমাদের ডিপার্টমেণ্টেই কাজ করেন। মাটভিচ্ বিদেশ ভ্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শরীরের উন্নতির জন্য না হো'ক, মনের (অর্থাৎ জ্ঞানের) প্রসার বাড়াবার জন্য ভ্রমণটা নাকি তাঁর বড় দরকার হয়েছিল। টিকিটও করা হয়ে গিয়েছিল—আফিসের কাজের কোনও তাড়া ছিল না। কাজেই তাঁর স্ত্রীর এই খেয়ালী প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন, আর কথাটা হচ্ছে কি, তাঁর নিজেরই একটা প্রবল ঔৎসুক্য হয়েছিল জানোয়ারটা কি দেখবার।

"বাহবা, বেড়ে মজা হবে 'খন। কুমীরটাকে দেখা যাবে; ইউরোপে বেরোবার আগে দেশী বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত।" এই বলেই তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে তখনই তিনি আরকেড যাবেন বলে বেরিয়ে পড়লেন। আমি হচ্ছি তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমিও সঙ্গে গেলাম। কক্‌খনো দেখিনি মাট্‌ভিচকে এমন দিল্ পসন্দ্ হতে যেমন সেদিন সকালে; বাস্তবিকই নিয়তি যে আমাদের জন্যে কি ঠিক ক'রে রেখেচেন তার কিছুই জানিনা। আর্কেডে ঢুকেই তিনি একেবারে বাড়ী ঘর দোরের প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে গেলেন; আর যে দোকানটাতে সেই ভীষণ জানোয়ারটাকে দেখান হচ্ছিল, সেখানে উপস্থিত হতেই, তিনি রক্ষককে আমার হয়ে দর্শনীর জন্যে কোয়ার্টার-রুবল দিলেন—এমনটি আর আগে কখনও হয় নি! সেই অল্পপরিসর জায়গার ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখলাম যে কুমীরটা ছাড়া, কোণেতে কতকগুলি কাকাতুয়া আর এক পিঞ্জরা বাঁদর রয়েছে। প্রবেশদ্বারের কাছে বাঁদিককার দেওয়াল ঘেঁসে টিনের একটা বড় চৌবাচ্চা রয়েছে; উপরে সরুসরু লোহার শিক দিয়ে আটকান,—ভিতরে জল ২.৩ ইঞ্চি হবে। এই অল্পজলে এক বৃহদাকার কুমীর প্রকাণ্ড

একটা স্থাণু কাষ্ঠখণ্ডের মত নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে, আর মনে হ'ল যেন আমাদের এই স্যাঁৎসেঁতা জায়গায় এসে ওর চেতনাও যেন লোপ পেয়েছে। প্রথম প্রথম কারুরই তেমন ভাল লাগ্‌ল না।

এলেনা ইভানোভনা যেন একটু দুঃখমিশ্রিত করুণ স্বরে বল্লেন—"ও—অঃ। এই—ই বুঝি কুমীর, আমি ভেবেছিলাম বুঝি বা.........অন্য কিছু হবে।"

খুব সম্ভবতঃ তিনি ভেবেছিলেন যে সেটা হীরের তৈরী কোন একটা জিনিষ। কুমীর-ওয়ালা একজন জার্ম্মাণ। সে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকালে যেন কুমীরের অধিকারী হওয়াতে তার ভারি পদ হয়েছে।

আইভান বল্লেন "নিশ্চয়ই তার গর্ব্ব অনুভব করবার অধিকার আছে। সে জানে যে সারা রুষিয়াতে কেবল একজন মাত্র লোকই কুমীর দেখাচ্চে।"

আইভানের এই বোকামী ধরণের উক্তিটা তার তখনকার খোসমেজাজের ফল, কেন না অন্য অন্য সময়ে তিনি যেন বিষিয়েই থাকৃতেন।"

কুমীরওয়ালার উদাসীন ভাব দেখে তাকে কথা কওয়াবার জন্য স্ত্রীসুলভ কৌশল অবলম্বন করে একটুকু মিষ্টি ক'রে হেসে, এলেনা বল্লেন—"তোমার কুমীরটা বুঝি জীয়ন্ত নয়?"

জর্ম্মাণটা ভাঙ্গা রুষভাষায় বল্লে—"আজ্ঞে না"—এই বলেই চৌবাচ্চার আধখানা ঢাকা খুলে একটা ছড়ি দিয়ে কুমীরটার মাথায় লাগালে এক খোঁচা।

সেই বিশ্বাস-ঘাতক রাক্ষসটা, সে যে বেঁচে আছে তাই জানাবার জন্য আস্তে আস্তে পাগুলি তারপর লেজটা নাড়তে লাগল, তারপর মুখটা তুলে অনেকক্ষণ ধ'রে ফোঁ ফোঁ করতে লাগ্‌ল।

জর্ম্মাণটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে—আদর করে—কুমীরটাকে বল্লে—"রেগো না, বাছা।"

এলেনা একটু রহস্য করে বল্লেন—"ওরে বাবা, কি ভীষণ কুমীরটা! সত্যি বলছি আমার ভয় কচ্চে। আমি ওর স্বপ্ন দেখব।"

জার্ম্মাণটা একটু রসিকতা করে বল্লে—"ওঃ, আপনি যদি ওর স্বপ্ন দেখেন তবে ও আপনাকে কামড়াবে না।" বলেই নিজের রসিকতাতে নিজেই হাসতে লাগল—আমরা কেউই তাতে যোগ দিলাম না।

এলেনা আমাকে ডেকে বল্লেন, "চলো সেমিয়ন আমরা বাঁদরগুলো দেখে আসি, তাদের আমি বড্ড ভালবাসি......আর কুমীরটা যে ভয়ানক।"

আমরা চলে যাচ্চি দেখে, পিছু ডেকে আইভান বল্লেন—"ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। তোমার কোন অনিষ্ট ও করবে না।" আর তাঁর সাহস দেখাবার জন্যে সেই চৌবাচ্চাটার ধারেই রয়ে গেলেন। তা ছাড়া দস্তানা খুলে ফেলে তাকে হাঁচাবার জন্যে দস্তানা দিয়ে তার নাকে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন। কুমীরওয়ালা ভদ্রতা দেখাবার জন্য মহিলাটির পিছু পিছু বাঁদরের খাঁচা পর্য্যন্ত তখন গিয়াছে।

এমনি করে বেশ চলছিল—আর অদৃষ্টের কথা কেইই বা জানত? বাঁদর দেখে এলেনার কি আনন্দ—তা'দিকে নিয়ে তিনি মেতে গেলেন! যেন জার্ম্মাণটাকে দেখিতেই পান নি এই ভাব দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে ফিরে আনন্দে চীৎকার করছিলেন—আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরিচিতগণের সঙ্গে বাঁদরদের সাদৃশ্য দেখাচ্ছিলেন। আর বাস্তবিক সেই সাদৃশ্য দেখে আমিও খুব আমোদ অনুভব করছিলাম। জার্ম্মাণটা হাসবে কি হাসবে না, ঠিক করতে না পেরে শেষে ভ্রূকুটী করতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এক ভীষণ এমন কি অমানুষিক চীৎকারে ঘরটা কেঁপে উঠল। কি হয়েচে ঠিক করতে না পেরে মুহূর্ত্তের জন্য আমি ভয়ে থ' হয়ে গেলাম, কিন্তু ফিরে দেখলাম যে এলেনাও ভয়ে চীৎকার কচ্ছেন। কি দেখলাম, কি দৃশ্য! হায় হায় ভগবান! দেখলাম হতভাগ্য মাটভিচ কুমীরের ভীষণ চোয়ালের মধ্যে তখন প'ড়ে—কুমীরটা তার কোমর কামড়ে ধরেচে—আর তিনি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ক্রমাগত পা ছুঁড়চেন। তার পর মুহূর্ত্তেই—একেবারে অন্তর্ধান—আর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সমস্তক্ষণটি আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—আর অবাক হয়ে আমি সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিলাম। অতএব আমি বর্ণনাটা পূরাপূরিই করব।

হতভাগ্য মাটভিচকে কুমীরটা তার ভীষণ চোয়ালেতে ধ'রে ঘুরোতে লাগল যাতে তা'র পা দুটোকে প্রথমে গিলতে পারে। যখন এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য মাটভিচ

প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে চৌবাচ্চার কিনারা ধরতে চাচ্ছিল তখন কুমীরটা তাকে টক্‌ ক'রে গিলে ফেল্লে। আবার তাকে উগরে ফেলে আবার গিলে ফেল্লে; ক্রমাগত এই রকম করতে লাগল। এই প্রকারে মাটভিচ আমাদের চোখের সামনেই ক্রমাগত 'অন্তর্ধান' হ'চ্ছিল। অবশেষে আমার সুসভ্য বন্ধুটিকে একেবারে গিলে ফেল্লে—তাঁ'র চিহ্ন পর্য্যন্ত রইল না। যখন কুমীরটার ভিতর তিনি প্রবেশ করছিলেন তখন বাইরে থেকেই তাঁর বপুটীর নিশানা দেখা যাচ্ছিল। যখন আমি ভীষণ চীৎকার করবার উদ্যোগ করছিলাম তখন সেই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারটা ভয়ঙ্কর জোরে ঢেকুর তুল্লে তাতে আমার বন্ধুর হতাশামাখা মুখখানি ক্ষণিকের জন্যে বেরিয়ে পড়ল, আর সেই মুহূর্ত্তেই বেচারার চশমাটা নাক থেকে পিছলে চৌবাচ্চায় পড়ে গেল। তার পরই কুমীরটা একেবারে তাকে গিলে ফেল্লে; বন্ধুর মাথা আর বেরুল না। একটা জীয়ন্ত মানুষের মাথা ক্রমাগত বেরুচ্চে আর ডুবে যাচ্চে আর এত তাড়াতাড়ি যে সে দৃশ্যটা খুব বীভৎস হ'লেও তাতে এমন একটা হাস্যরসের ব্যাপার ছিল যে আমি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলাম। কিন্তু তখনই বুঝতে পারলাম যে না-হেসে থাকতে পারলেও হাসিটা ভাল হয় নি—এ হাসবার সময়ও নয়—যখন বন্ধুর এই অবস্থা; তাই একেবারে এলেনার দিকে ফিরে সহানুভূতির সুরে বল্লাম, "বন্ধু'র সব শেষ হ'ল।"

এই সময়টা এলেনার যা অবস্থা হ'ল তা বর্ণনা করতে আমি পারছি না। প্রথমে তিনি চীৎকার করে উঠ্‌লেন, তার পর তাঁকে যেন কেউ সেখানে পেরেক মেরে রেখে গেছে, এইরূপভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর চোখ দুটা মাথা থেকে যেন বেরিয়ে আসচে এইরূপ ভাব হলেও বোধ হ'ল যেন তিনি উদাসীনের মত চেয়ে রয়েছেন; তারপর তিনি হৃদয় বিদারক স্বরে কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁর হাত ধরলাম। কুমীরওয়ালাও এতক্ষণ সেই দৃশ্যে একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল, সেও হঠাৎ তার হাত দুটোকে মুচড়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগল—"ওরে কি হ'ল···আমার কুমীরের কি হ'ল—ও আমার কার্‌ল্‌চেন (কুমীরের নাম!) ম, ম, ম" (অর্থাৎ তার স্ত্রী!)।

এই শব্দে ঘরের পিছুকার দরজা খুলে একটা বর্ষীয়সী এলোকেশী স্ত্রীলোক—ওরফে ম বেরিয়ে, চীৎকার করে সেই জার্ম্মাণটার কাছে এল।

তারপর পাগলাগারদের সব পাগলাগুলো বেরিয়ে পড়্‌লে যা অবস্থা হয় সেই রকম হ'ল। এলেনা পাগলের মত চীৎকার করে বলতে লাগল—"ওর খাল খিঁচে ফেল, খাল খিঁচে ফেল"—বোধহয় তা'র ইচ্ছেটা যে কুমীরটাকে চিরে ফেলে তাঁর স্বামীর উদ্ধারসাধন কেউ করে। জার্ম্মাণ ছুটো আমাদিকে কোন আমল না দিয়ে কুমীরের জন্য বাছুরের মত চেঁচাতে লাগল।

"কুমীরটা এখুনি ফেটে মরে যাবে। কি করলে! একটা জাঁদরেল অফিসারকে সে গিলেচে।"

তার স্ত্রীও "আমাদের কার্‌ল্‌চেনের কি হ'লো গো" বলে চেচাঁতে লাগল।

"হায় হায় আমাদের অন্ন গেল। আমাদের কুমীর গেল। আমরা অনাথ হ'লাম।" বলে কুমীরওয়ালা পোঁ ধরলে।

তার কোট ধরে এলেনা ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগল। "কুমীরটার খাল খিঁচে ফেল।"

তাঁর হাত থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে জার্ম্মাণটা বল্লে—"নিশ্চয়ই উনি কুমীরটাকে জ্বালাতন করছিলেন। কেন উনি ওকে জ্বালাতন করতে গেলেন? আমার কুমীর যদি ফেটে যায়, তো আপনাকে তার দাম দিতে হবে।"

জার্ম্মাণটার এই স্বার্থপরতা ও তার স্ত্রীর হৃদয়হীনতা দেখে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। উন্মাদের মত তখনও এলেনা চেঁচাচ্ছিলেন "ওর খাল খিচে ফেল।" আমি ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মনে হ'ল এলেনা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিল, তিনি যেন পাগল হয়ে পড়েছেন ও প্রতিহিংসা নেবার জন্য তিনি কুমীরটাকে মারতে চাইছিলেন—জানি না হয় তো তখন তিনি অন্য কিছু ভেবেও কথাটা বলছিলেন কি না। তাই আমি বল্লাম তাঁকে এখানে ওই খাল খেঁচার কথাটা বলবেন না। কেনমা আর্কেডের মত সুসভ্য বায়গায় যেখানে হয় তো—দু পা দূরেই লাভরোড পাব্‌লিক লেক্‌চার দিচ্ছেন সেখানে এমন বিসদৃশ কথাটা বলা ভাল নয়—হয় তো সভ্যরা এর জন্য আমাদিগকে ঠাট্টা করতে পারে। কি সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছি তাই-ই! যেখানে কুমীর দর্শনীর টাকা আদায় হয় ঠিক সেইখানে

চৌকাটের ওধারে পা দুটীকে বিশেষ যত্ন করে রেখে (চৌকাটের এধারে এলে পাছে টাকা দিতে হয়) শরীরের আধখানা চৌকাটের এধারে ঢুকিয়ে দিয়ে, গোঁফদাড়ীওয়ালা হাতে-টুপি এক ভদ্রলোক বল্লেন "মহোদয়া, এইরূপ বিপরীত ইচ্ছা আপনার উন্নতির পক্ষে অনুকূল নয়—আর আপনার মস্তিষ্কে ফস্ফরাসের অভাব প্রতিপন্ন কর্‌ছে। আপনাকে এর জন্যে "উন্নতি" নামক কাগজে টিট্‌কারি দিতে পারে......।

কিন্তু তাঁকে আর মন্তব্য শেষ করতে হ'ল না। কুমীরওয়ালা একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখতে পেলে কি সর্ব্বনাশ! দর্শনী না দিয়েই কুমীরের ঘরে লোকটা কথা কইছে। দৌড়ে গিয়ে সে দুহাতের দুটা ঘুষি দিয়েই তাঁর মন্তব্য শেষ করে দিলে। দুজনেই পরদার আড়াল হ'তে আমার মনে হ'ল যে মিছে গোলমাল—এলেনার কোনও দোষ নেই। তাঁর এমন কোন ইচ্ছা ছিল না যে মর্য্যাদানাশক শারীরিক শাস্তি কুমীরটাকে দেন—কেবল তিনি তাঁর ইচ্ছা জানাচ্ছিলেন যে তাঁর স্বামীকে কুমীরটার ভিতর থেকে মুক্ত করবার জন্য যেন তাকে চেরা হয়।

জার্ম্মাণটা দৌড়ে এসে বল্লে—"কি তুমি আমার কুমীরটাকে মেরে ফেল্‌তে চাও? তার আগে তোমার স্বামীর মরণ হোক না কেন? আমার বাবা কুমীর দেখিয়ে বেড়িয়েছে, আমার ঠাকুরদাদা কুমীর দেখিয়ে বেড়িয়েছে, আমার ছেলে কুমীর দেখাবে, আমি কুমীর দেখাব। আমাকে সারা ইউরোপ জানে—তোমাকে কেউ জানে না। তোমাকে টাকা দিতে হবে।"

"যা, যা,—কার্‌ল্‌চেন ফেটেছে কি তোমাকে টাকা দিতে হয়েচে, কিন্তু বলে দিচ্চি।" বলে মাগীটা চেঁচিয়ে উঠল।

আমি বেগতিক দেখে এলেনাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বল্লেম—"আর এখন কুমীরটাকে চিরেই বা কি হবে। বন্ধু এতক্ষণ স্বর্গের দিকে চল্‌ছেন।"

আমাদিগের একেবারে স্তম্ভিত করে মাট্‌ভিচের স্বর বলে উঠল—"ভাই, আমার যদি উপদেশ নাও তা হ'লে একেবারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আফিসে যাও, পুলিসের গুঁতো না খেলে জার্ম্মাণটার বুদ্ধি খুলবে না।"

এই কথাগুলি এরূপ দৃঢ়তা, আত্মসংস্থতা আর উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছিল, যে প্রথম এক মিনিটের জন্য আমরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, কান দুটোকে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তৎক্ষণাৎ চৌবাচ্চার দিকে দৌড়ে গিয়ে খুব ভক্তি অথচ অবিশ্বাসের সহিত হতভাগ্য বন্দীর কথা শুনতে লাগলাম। তার স্বরটা যেন চাপা চাপা, ক্ষীণ, চিঁ চিঁ করে বেরুচ্চে—যেন অনেক দূর থেকে আসছে। দেখেছিলাম একবার বড়দিনের সময় একজন রঙ্গুড়ে লোক, জনহীন প্রান্তরে দুজন চাষা দূর থেকে পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে যেন, এই রকম তাদের স্বর নকল করবার জন্য পাশের ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খুব চেঁচাচ্ছিল। বন্ধুবরের স্বরও কতকটা তারই মত শোনাচ্ছিল।

এলেনা স্খলিত স্বরে বল্লেন, "দয়িত, মাটাভিচ, তা'হলে তুমি বেঁচে আছ ?"

আইভান মাট ভিচ বল্লেন, "বেঁচে বলে বেঁচে ; খুব ভালই আছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে রাক্ষসটা আমাকে গিলে ফেল্লে বটে, কিন্তু এতটুকু আঁচড়ও লাগে নি। কেবল একটা বিষয়ে আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছে, এই ঘটনা সম্বন্ধে আমার মুরুব্বিদের কি ধারণা হবে। কোথা আমি নিলাম অনুমতি বাইরে বেরুবার জন্য না একেবারে কুমীরের ভিতর ঢুকে দিব্যি বসে আছি !—এতে মোটেই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।"

এলেনা বাধা দিয়ে বল্লেন—"এখন বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া না-দেওয়ার কথা ভাববার সময় নয়। এখন কি রকমে ঐ গহ্বর থেকে তোমাকে খুঁড়ে বের করি তারই উপায় করতে হবে।"

কুমীরওয়ালা চেঁচিয়ে বল্লে—"কি ! খুঁড়ে বের করা ! কখনই আমার কুমীরকে খুঁড়তে দেবনা। এখন বলে লোক বেশী বেশী দেখতে আসবে। আমি বেশী করে টাকা চাইব। কার্লচেন ত ফাটবে না।"

মাটভিচ খুব ধীরভাবে বল্লেন—"হাঁ, ওরা ঠিক কথাই বলেচে ; অর্থনীতির মূলসূত্রে হচ্ছে আগে, পিছে অন্য কথা।"

আমি বল্লাম—"যে গোলমাল দাঁড়াচ্চে তাতে দেখছি যে কর্ত্তাদের সাহায্য না নিলে আর এর মীমাংসা হয়ে উঠবে না। যাই সেখানে গিয়েই নালিশ করিগে।"

মাটভিচ বল্লেন—"আমারও তাই মত। আজকালকার industrial crisis-এর দিনে কোনও রকম স্থায়সঙ্গত খেসারত না দিয়ে কুমীরের পেটটা চেরা বেশ সহজ ব্যাপার হবে না; আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি সমস্যা দাঁড়াচ্ছে—প্রথমতঃ কুমীরটার জন্যে জার্ম্মাণটা কত নিতে রাজী হবে, আর দ্বিতীয়তঃ; সে টাকা আস্‌বে কোত্থেকে? জানই ত, আমার অর্থ সঙ্গতি নেই......।"

আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম—"কেন তোমার মাইনের থেকে?" এমন সময় কুমীরওয়ালা ভীষণ চেঁচামেচি করে বলে উঠলো, "বেচব না আমি কুমীর; আমি তিন হাজার নেব! আমি চার হাজার নেব! এখন বেশী বেশী লোক দেখতে আসবে। আমি পাঁচ হাজার নেব!"

সত্যি কথা বলতে লোকটা ভারী চাল দেখছি যে—একেবারে অসহ্য। অর্থগৃধ্নুতা তার চোখে খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

রেগেমেগে আমি বল্লেম—"চল্‌লাম তবে আমি।"

এলেনা নাকি সুরে বল্লেন—"আমিও চল্‌লাম। আমি আণ্ড্রি অসিপিচের কাছে যাব, চোখের জলে তাকে ভেজাব।"

মাটভিচ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"লক্ষ্মীটি, এমন কাজও কোর না।" ব্যাপারটা হচ্ছে যে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আণ্ড্রি অসিপিচকে তিনি বরাবরই ঈর্ষার চক্ষে দেখতেন। আর তিনি জান্‌তেন যে এলেনা কাঁদতে খুব মজবুত; আর সুসভ্য ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে কান্নার মত বিলাসিতা উপভোগ করতে এলেনা কখনই ছাড়বেন না।

আমাকেও বল্লেন—"বন্ধু তুমিও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে নালিশ করতে যেও না—কে জানে কি হ'তে কি দাঁড়ায়। তার চেয়ে তুমি টিমোফি সেমিও নিজের কাছে যাও—যেন এমনি দেখা কর্ত্তে এসেছো। লোকটা সেকেলে ধরণের আর খুব চালাক-চতুরও নয়, কিন্তু বিশ্বাসী; আর সকলের সেরা, সাধাসিধে ন্যায়পরায়ণ। আমার অভিবাদন জানিয়ে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে সেটা খুলে বলবে। হ্যাঁ, দেখ সেদিন তাস খেলে সাত রুবল তার কাছে হেরেছি, এই অবকাশে সেটাও দিয়ে দিও; তাতে বুড়ো ভিজবে। অন্ততঃ তার উপদেশ আমাদের কাজে লাগতে পারে। এখন এলেনাকে বাড়ী নিয়ে যাও।"

তারপর এলেনাকে সম্বোধন করে বল্লেন—"ওগো, একটু ঠাণ্ডা হও। আমার এই সব মেয়েলি চেঁচামেচি, গোলমাল ভাল লাগে না। এখন একটু ঘুমোব। ততক্ষণ চারিধার দেখবার অবকাশ হয় নি, এখানটা চমৎকার নরম আর গরম।"

এলেনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—"দেখো-দিকি ভিতরে আলো আছে কি না?"

হতভাগ্য বন্দী বল্‌লেন—"এখানে ঘোর অন্ধকার, তবে হাত দিয়ে, সবই দেখতে পাচ্ছি দেখার কাজ অনুভবেই হচ্ছে। এখন বিদায়; নিশ্চিন্ত হও গো, কোনও ভাবনা চিন্তা করো না; আমোদ-আহ্লাদ থেকে বিরত হবার কোনও দরকার নেই। আবার কাল দেখা হবে। আর তুমি সেমিয়ন সেমিওনিচ, তুমি কাল সন্ধ্যের সময় এসো। তোমার বড় ভোলা মন, রুমালে একটা গাঁট বেঁধে নাও, তা হ'লে আর ভুলবে না।"

সত্যি সত্যি সেখান থেকে যেতে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম—আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম আর বিরক্তি ধরছিল। সুন্দরী ম্রিয়মানা এলেনার হাতটা ধরে তাঁকে কুমীরের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম।

কুমীরওয়ালাটা আমাদের পিছু পিছু চেঁচিয়ে বল্‌লে—"সন্ধ্যের সময় আর সিকি রুবল বাড়বে।"

এলেনা আর্কেডের প্রত্যেক আয়নাটিতে নিজের চেহারাখানি দেখে আরও বেশী সৌন্দর্য্য বেড়েছে এই জ্ঞানে বেশ খুসী হয়ে বল্‌লেন—"উঃ, কি অর্থপিশাচ এরা!"

আমার সঙ্গে একটি সুন্দরী মহিলা রয়েছেন আর লোকে তাই দেখছে এতে আমি একটু বেশ গর্ব্ব অনুভব করলাম, বল্‌লাম—"এ সব হচ্ছে, অর্থনীতির মূলসূত্র।"

এলেনা বল্‌লেন—"অর্থ-নীতির মূলসূত্র! মাটভিচ এই ভয়ানক অর্থনীতির সম্বন্ধে মাথামুণ্ডু কি বল্‌লে বোঝাই গেল না।"

আমি বল্‌লাম—"আচ্ছা আমি সব বুঝিয়ে দেব।" সেইদিন সকালবেলা আমি Petersburg News ও Voice এই দুইখানি সংবাদপত্র পড়েছিলাম; আমাদের দেশে বিদেশী Capital (মূলধন) আসাতে কত যে উপকার হয়েছে অমনি তারই কথা বলতে লেগে গেলাম।

খানিকক্ষণ শুনে তিনি বল্লেন—"কি আশ্চর্য্য এসব কথা—কি ভয়ানক লোক তুমি কি গুল্‌খুরি এসব—থাক্। অ'চ্ছা, আমার মুখখানা কি লাল দেখাচ্ছে।"

আমি তাঁকে স্তুতিবাদ করবার এই অবকাশ পেয়ে বল্লাম—"লাল দেখাবে কেন, আপনার মুখখানি নিখুঁত, নিটোল সুন্দর।"

তিনি আত্মপ্রসাদের সহিত বল্লেন—"দুষ্টু!" এক মিনিট পরে, একধারে মাথাটি হেলিয়ে রসরঙ্গিণীর মত বল্লেন—"হতভাগা মাটভিচ! বাস্তবিকই তার জন্যে আমি বড় দুঃখিত।" তার পরে চীৎকার করে হঠাৎ বলে উঠলেন—"ওঃ সর্ব্বনাশ! ওখানে ও ডিনার খাবে কি করে......আর......আর..... যদি কিছুর দরকার হয় তো কি করবে?"

বাস্তবিক একথা তো আমার মনে হয় নি। মেয়ে মানুষরা দৈনিক জীবনের দরকার অ-দরকার বিষয়ে কি Practical! হতবুদ্ধির মতো বল্লাম—এ কথা তো ভাবি নি!"

"আহা বেচারা! কি করে এই কাণ্ডটা সে বাধালে। এই অন্ধকারে•••কোন আমোদেরই ব্যবস্থা নেই। ভারি বিরক্তি ধরেছে আমার যে তার কোন ফটোগ্রাফই আমার কাছে নেই।" আর এই অবস্থার বিষয় উপলব্ধি করে একটা মনমাতানো হাসি হেসে বল্লেন—...ধরো এখন আমি একরকম বিধবাই হ'লাম। হুঁ...তার জন্যে ভারি দুঃখ হচ্চে যদিও।"

আমি তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলাম, সান্ত্বনা দিলাম, তারপর সুগন্ধযুক্ত এক পেয়ালা কাফি খেয়ে দুটার সময় বেরুলাম টিমোফি সেমিয়োসিচের বাড়ী যাবার জন্যে। হিসেব করে দেখলাম যে উড়ু উড়ু না-করা বিবাহিত ব্যক্তিরা এই সময়ে বাড়ীতেই আছে—হয় বসে না-হয় শুয়ে। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

---

* Dostoevsky——The Crocodib.

ভাবরাজ্যে।

——:০:——

(পথিক।)
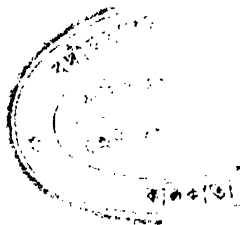
সংসার ছুটিছে পিছে পিছে, দিকে দিকে অভাব কেবল,
শত চিন্তা পীড়িছে মরম সকরুণ আঁখি ছল ছল
চেয়ে আছে মুখপানে তার,—মায়া আসি পথ আগুলায়,
প্রকৃতি শোভার দ্বার খুলি' ব্যথিতেরে ডাকে 'হেথা আয়';
ব্যথিত বারেক ফিরে চায়—আঁখিদুটী ভরে আসে জলে,
নেত্রপথ রুদ্ধ হ'ল তায়, আর যে গো দৃষ্টি নাহি চলে!
পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়ে তা'র, খসিল একটী দীর্ঘশ্বাস—
ক্ষুদ্র চিন্তা উড়িল সে শ্বাসে, ছিঁড়ে গেল যত মায়াফাঁস;
ফোঁটাকত নব অশ্রুকণা, মর্ম্মতল ধৌত করি' তা'র
ঝরে ঝরে কোন্ শুভক্ষণে বুকে এসে গেঁথে দিলে হার;
সসম্ভ্রমে পথ ছাড়ি দিয়া, নতশিরে সংসার দাঁড়ায়,
মায়াদেবী গুটাইল জাল, জড়াইতে পারিল না তায়;
কোথা, কোন্ স্বপনের দেশে, কি যেন বা দেখিল পথিক,
সেই লক্ষ্যে ছুটিল উধাও—আত্মহারা, নির্ম্মম, নির্ভীক!

(কল্পনা।)

ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধপানে, চলেছে সে ধীরে ধীরে ধীরে,
বুজে আসে নয়নের পাতা, নিদ্রাঢালা সমীরে সমীরে—

কোথা হ'তে কা'র জ্যোতি খসি' পথে তার ছড়াইছে আলো,
সে আলোকে আত্মা জেগে উঠে বলিতেছে "চলো চলো চলো !"
কোলাহল পড়েছে ঘুমায়ে ধীর স্থির পরাণের গায়,
ছোটখাটো সুখদুখ যত—তাহারাও অঘোরে ঘুমায় ;
মৌন, মুগ্ধ, নীরব, গভীর শূন্যপথ ভরি খেলে হাসি,
সে হাসিতে নাহি মাদকতা—আছে শুধু রাশি রাশি রাশি
মল্লিকা, শেফালি, বেলা ফুটে ; আঁখিযুগ বিস্ফারিয়া শুধু
প্রাণ ভ'রে বিমুগ্ধ পথিক পান করে সে ফুলের মধু ;—
এই মৌন গভীরতা-কোলে, ওকি, ওরে বাজে কার বাঁশী ?
সুষমার নিখুঁত ছবিটী—কে বালিকা দাঁড়াইলি আসি' ?
শত চাঁদ ফুটিছে কায়ায় ; ফ্যাল্ ফ্যাল্ পথিক তাকায় !
বালিকা ফুলের মালা র'চি' পরাইল তাহার গলায় ;

(ভাষা ।)

মিটিয়াছে সকল অভাব ; সীমা ভেদি' ছোটে দু'জনায়
চন্দ্রলোকে—মলয়-বাহনে, মেঘে মেঘে—ঘন নীলিমায় ;
নদীতটে ছায়ায় ছায়ায়, বর্ষাকাশে, নির্ঝরের পাশে,
শ্যামক্ষেত্রে, দূর্ব্বা-শিরে শিরে, ফুলে ফুলে, সুবাসে সুবাসে ;
বাঁশরীর সুরে, তানে, গানে, পাখীকণ্ঠে, লতাইয়া আসে
পথিকের হিয়াখানি তা'র প্রেয়সীর মৃদুমন্দ শ্বাসে।
আজ সে যে পেতেছে সংসার, অভিনব, কত সাধে ভরা,
আজ যে তাহার কাছে সবি শোভাময়ী নিত্য-মনোহরা ;
অনাবিল প্রেম কল্পনার ফুটাইছে শত শত ভাষা—
নিম্নে বিশ্ব কাঁদিয়া লুটায়, লাজে নত মায়াবিনী আশা।

মিলায়েছে ভূত-ভবিষ্যৎ তা'র স্বপ্ন-জীবনের কোলে
নেচে ওঠে আনন্দ-উচ্ছ্বাস, প্রেম-ভাষে হিল্লোলে হিল্লোলে ;
কোথা স্বপ্ন, কোথা জাগরণ ?   কে করিবে প্রভেদ-বিচার ?
ভাষা ভাঙি' মরতে গড়ায় অর্ঘ্য তার প্রীতি-বেদনার !

(শান্তি।)

ভক্তিরসে সিক্ত দু'নয়ন—কবি আজ বসেছে পূজায়,
কল্পনা সাজায় পঞ্চপাত্র, তাহে সে যে ফিরেও না চায় !
মুদ্রিত নয়ন যুগ, মরি, বাহ্যদৃশ্য পশে নাকো আর—
অন্তরেতে ফুটেছে নয়ন, সমুজ্জ্বল—দীপ্ত—সাধনার !
তীব্র তেজ কাঁপিছে হৃদয়ে, ঊর্দ্ধমুখী ধায় শিখা তা'র
আলো করি অন্তরবাহির—আলো করি অনন্তের পার !
কল্পনা পারে না যে গো আর, নিজ প্রেমে বাঁধিতে তাহারে,
ছাপাইয়া সে প্রেমের সীমা, ভক্তিধারা নামে শতধারে !
ভাষা আজ মৌন মূকসম—কবি স্থির পাষাণের প্রায়,
সে পাষাণ আঘাতে টলে না, সে পাষাণ নিজে গলে যায় !
কল্পনার প্রেম-শক্তি নিয়ে পথিক দেখিছে একি ছবি !
অদ্ভুত এ দাম্পত্য-মহিমা, কি গরিমা, ধন্য তুমি কবি—
চারিধারে ভরে' ওঠে ঐ প্রেম, ভক্তি, আনন্দ, আলোক,
এমনি শান্তির কোলে বসে' কবিচিত্ত গলে সুধা হোক্ !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

নারীর কথা।

নারীর কথা মিঠা যেমনই হউক কঠিন তার চেয়ে ঢের বেশী। এই কাঠিন্যের পরিমাণটা কি রকমের কতখানি;—তাই আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

দেমক্রাসী এ যুগের জয়ের বাণী। জন্মসংস্কার এর গ্রীক ক্লিসথিনিস করিয়াছেন—না পালি মতে কপিলাবস্তুতে তার অনুষ্ঠান হইয়াছিল—সে-যুগের পেশবা রাজারাই ইহাকে সত্যকার আকার দিয়াছিলেন কি এ যুগের মার্কিণ এই দেমক্রাসীকে খাঁটি খাঁটি গড়িয়া তুলিয়াছেন সে সব কথা আলোচনা করিবার স্থান এ নয়—বিদ্যাও আমার নাই। আমরা দেখিতেছি এর আজকার রূপটীকে, বিচার করিয়া বুঝিতে চাহিতেছি ইহার বর্ত্তমান ধর্ম্মটাকে। দেমক্রাসী আজ যে শুধু রাজনীতির গণ্ডীতেই একান্ত হইয়া থামিয়া গিয়াছে—তা নয়, সমাজের সীমান্ত পর্য্যন্ত ফোঁপাইয়া আসিয়া সাড়াটা ইহার সেখানেও একটা ফেনিল ঢেউ তুলিয়াছে। ব্যক্তিগত অধিকারে ন্যায্য দাবীটাকে চাপিয়া রাখিয়া শাসকের আজ আর শিরোমণি হইয়া থাকা চলিবে না—শাসিতেরা তাঁদের খাম-খেয়ালী মেজাজ আর বিধান মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে রাজী নয়। শাসিতের তরফ দিয়া সমাজে তাই এ চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে। এক, দুই, একশ, হাজার এমনি কত বৎসর চলিয়া গেল—রক্তচক্ষু আর কশাঘাতের নীচে নিরীহের মত পড়িয়া থাকিয়া নারী দেখিল তাহাদের জমার ঘরে ঢেরাহীন শূন্য। কাল তার রথের চাকার তলায় কত পুরাতন ভাঙিয়া নূতন গড়িয়া দিল কিন্তু যুগ-সমাজের সৃষ্টি করিলেন যাঁরা পণ্ডিত—যাঁরা সমাজপতি-জীবন-তন্ত্রের মর্ম্মের নিকটায়—সমাজের অন্তরের মধ্যে—অন্দর মহলে তাঁরা দৃষ্টি দিলেন না। বাহির আর ভিতরের মধ্যে একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়া নরের চক্ষুর সমুখে নারীর চক্ষুকে অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া তাঁরা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু জাতিকে জ্যোতিঃতে আনিয়া স্নেহের আবডালে, বক্ষের রক্তে তাহাকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন যাঁহারা—তাঁহারা এই অন্ধকারকে চিরকালই বরণ করিয়া চলিবেন কেন? এই আলোকের আকাঙ্ক্ষাই হইল নারীর "দেমক্রাসীর" দাবী।

এখন এ দাবী তাদের সত্যসত্যই প্রাপ্য এবং ইহা অবশ্যই দেয় কিনা দাতার পক্ষ হইতে উঠিতেছে এই প্রশ্ন। অধিকার লাভের যে একটা মর্য্যাদা আছে সেটা তারা পাইবার যোগ্য কি? আবার পাইলেও সমীচীন ব্যবহারে সংযত প্রয়োগে সে মর্য্যাদাকে রক্ষা করিতে পারিবে ত? রাজনীতির ক্ষেত্রেও যেমন এই প্রশ্নই দাঁড়াইয়াছে বড় হইয়া সমাজেও তেমনি নারীর সম্বন্ধে তর্কটা জমিয়া উঠিয়াছে এমনই একটা ভুয়া হেতুবাদের উপর। ফলে কিন্তু জাতীয় জীবনের গঠন, সমাজের উন্নতির জন্য যে কল্যাণ লাভের সাধনা আজ নিতান্ত করিয়া প্রয়োজন—তাহাকে ইচ্ছা করিয়া তুচ্ছ করা হইতেছে, ক্রমাগতই, দূর হইতে দূরান্তে ঠেলিয়া ধরা হইতেছে।

সে যাই হ'ক এ প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া অবশ্য করিয়া আবশ্যক। নারী যে চাহিতেছে এই অধিকার—এটা কিসের? দাবীটা তার কেন? প্রয়োজন কোন্‌খানে? তারা পাইতে চাহিতেছে কি ব্যষ্টি গণনায় দু'চারজন—না সমষ্টিরই এই আবেদন?

এ আবেদন সমষ্টির—সকলের। সহস্র অন্তর হইতে গুঞ্জরিয়া উঠিয়া এ নিবেদন অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইতেছে—একটা তাদের শ্রেয় পাইবার জন্য। তাই এটাও দেমক্রাসী। অধিকারটা হইল আত্ম-প্রতিষ্ঠার, আত্মার উন্নতির। মহৎ যাহা কেবল নারীরই নিজস্ব, শক্তি—যাহার উপর জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি,—সে চাহিতেছে আত্মাভিমানী সমাজকে দিয়া তাহাই স্বীকার করাইয়া লইতে—যে কুৎসিৎ ঘৃণ্য অবিশ্বাসের উপর চলিয়াছে নারীর অনাবিল জীবন-যাত্রা সেটাকে বনিয়াদ শুদ্ধ ভাঙিয়া ফেলিতে। এই অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। কিন্তু আবার সেই যোগ্যতার বিতণ্ডা, প্রয়োজনের তর্ক। অযোগ্য তাঁহারা হইলেন কিসে? এই যুগযুগান্তর ধরিয়া অন্তঃপুরের রাজ্য—অন্ন দিয়া, সেবা দিয়া, শৃঙ্খলার নিয়মে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া যাঁহারা নিপুণ হাতে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা হইবেন অযোগ্য? প্রাণের পরিপোষণ ষোল আনা আসিতেছে যাঁহাদের কাছ হইতে,—দেহের ও মনের বল সঞ্চার করিয়া যাঁহারা সমাজ-যন্ত্রটীকে আবহমান চলনশীল রাখিতেছেন—তাঁহাদের ক্ষমতা নাই—জ্ঞান লাভের? তাঁহারা দাবী করিতে পারেন না—তোমাদেরই কর্ম্মজগতের মধ্যে একটা স্থান, এ ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতার বিধান ও চিন্তার মূলে আর কি হেতুবাদ—কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে—এক নির্য্যাতনের কুটিল-ইচ্ছা ভিন্ন! কিন্তু

এমন করিয়া নির্য্যাতন তাঁহারা আর সহিতে পারিবেন না—অধিকার লাভের যে দাবী লইয়া তাঁরা দাঁড়াইয়াছেন—আজ সময় আসিয়াছে সমাজকে তা আঠারো আনা বুঝিয়া দিতে হইবে।

এখন স্পষ্ট করিয়াই বলি যে এই অধিকারটা হইল শিক্ষা লাভের জ্ঞানের দীপালী জ্বালিয়া মনের মর্ম্মের জ্যোতিঃ তাঁহারা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন। আমরা বলিব কেন অভাব তো তাঁহাদের কিছু নাই। "দিব্যি" রান্নাবান্না করিয়া, সন্তান ও স্বামীকে খাওয়াইয়া তাঁরা তো বেশ আছেন। আর জ্ঞানই বা কম কি! বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস পড়িয়া তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন শরৎবাবুর গল্পের বই তো তাঁদের কাছে ডাল ভাত। "কুরুশীর" লেস বুনিতে পারেন—কার্পেটের উপর শুধু হরফ তোলা নয় কালীমূর্ত্তি ময়ূরপুচ্ছ পর্য্যন্ত শিল্প করিতে শিখিয়াছেন--উন্নতি তো তাঁদের দস্তুরমতোই হইয়াছে—আর কি মেমসাহেব হইয়া ছাতি আর ঝুলানো থলিয়া হাতে লইয়া রাস্তায় বাহির না হইলে তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না? এ দাবীই তো তাঁদের একটা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক—তাঁরা চাহিতেছেনই স্বাধীনতা, যার ফল সমাজ ও দেশের পক্ষে নিতান্ত কুৎসিৎ যাহা এখানকার আব-হাওয়ার সঙ্গে মোটেই খাপ খাইবে না। সুতরাং আর তো তাদের কোনোরকম দাবী-দাওয়া থাকিতে পারে না—প্রয়োজন কিছু নাই। কিন্তু কথাটাই যে হইল—সেই হাম বড়া হুকুমের নৌকা চালানো অতিমাত্র কর্ত্তৃত্বের—উপসংহারটা করিলেন মামুলীমাপের সবজান্তা সমালোচনায়। আবার একদল এটার উপরেরও একটা অশ্লীল অশোভন কথাই হয় তো বলিয়া ফেলিলেন। উচ্চশিক্ষার আলোচনা তুলিয়া মায়ের জাতিকে নারীর নারীত্বের মর্য্যাদাটাকে একেবারে জাহান্নামে টানিয়া লইয়া গিয়া ছাড়িলেন।

কিন্তু এটা কেউই বুঝিতেছেন না—যে এই অধিকার পাওয়াটা তাদের পরম প্রেয় আর এই প্রেমের অনুসরণ করিয়াই সমাজে আসিবে বিশেষ শ্রেয়ঃ। সমাজ যে একটা নিয়মিত তন্ত্র তাহাতে তো সন্দেহ আসিবার কারো কোনোরকম কথাই নাই? তন্ত্র মাত্রেই এক-একটা বিরাট যন্ত্র। যন্ত্রের একটা দিক—গোটা কয়েক অংশ যদি সবল সুক্ষম হয়,—আর—আর একটা দিক যায় একেবারে দুর্ব্বল হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহা হইলে সে যন্ত্র আপনার পথে

কল্যাণের গঠন করিয়া চলিতে তো পারেই না বরং অপর সবল অংশগুলাই ফলে অকর্ম্মণ্য পঙ্গু হইয়া পড়ে। সমাজের এক অঙ্গে যে আজ ভাঙন ধরিয়াছে সে কথা নিশ্চয় করিয়া সত্য কারণ আর একটা অঙ্গ যে আজ অনাবশ্যক রকম নড়িয়া উঠিয়া একটা অস্বাভাবিক সাড়া দিতেছে। বাহিরের সে অঙ্গ চাহিতেছে— দাঁড়াইয়া উঠিয়া জগতের সঙ্গে ছুটিতে পথের উপরকার তার সকল বাধা সমস্যা দীর্ণ, চূর্ণ দলিত করিয়া দিতে—সত্যতর প্রয়োজন তার যাকিছু—তারই অভাবটা আগাগোড়া নিবারণ করিবার সঙ্কল্পে কিন্তু কৈ পারিতেছে ত না! শক্তি নাই। ইহার প্রকৃত কারণ নারীর প্রতি অবজ্ঞা—নারীর ন্যায্য দাবীটাকে তুচ্ছ করা—উপেক্ষা করা।

শিক্ষা—যাহা আজ নারী চাহিতেছেন—তার মানে এ-নয় যে বি-এ, এম-এ পাস করিয়া পুরুষালি হইয়া উঠা কিম্বা পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের সকল অধিকার জবর-দখল করিয়া বসিয়া নারীর কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাওয়া। যে একটা ছেদচিহ্ন নারী ও নরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রচনা করিবার জন্য প্রকৃতি রাণীর নিজের হাতের তুলিতে পরস্পরের মাঝখানে টানিয়া দেওয়া আছে সেটাকে বেমালুম মুছিয়া ফেলিবার জন্য এ বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে নাই। এ শিখা জ্বলিয়াছে—নর ও নারীর করিবার জন্য যে কর্ত্তব্য সমান—যেখানে পাশাপাশি দাঁড়াইবার দুজনের অধিকার সমান সেই বিষয়গুলা—স্থানটা ফুটাইয়া স্পষ্ট করিয়া ধরার জন্য।

ঘরের মধ্যে যে রাজ্য তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে পঞ্চখানি মাত্র গ্রামের মত তাই লইয়াই নারী সন্তুষ্ট থাকিতে রাজী আছেন। কিন্তু অবস্থা কাল যাহা ছিল আজ তাহা নাই—আবার আজিকার যাহা—পরে তাহাও থাকিবে না। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবহার-প্রচলন এগুলিকেও তো বদলাইতে হইবে। বিভিন্ন প্রকৃতির শাসনের জন্য আইনের প্রণয়ন প্রয়োজন হইয়া উঠে—আবার কালের ধর্ম্মে আবশ্যকের জন্য সেসব কানুন আদ্যন্ত উল্টাইয়া দিতে হয়। আজ ভারতেও আসিয়াছে এমনই আইন উল্টাইয়া দিবার দিন—নারীর জন্য সমাজকে লিখিতে হইবে নূতন সংহিতা—গড়িতে হইবে নূতন আইন এবং এই গড়াটাই হইল নারীকথার কাঠিন্য।

নূতন সমাজতন্ত্রের এই নবীন রূপ না দিলে চলিবে কেমন করিয়া! নারীর যে রাজ্য সেখানে আজ প্রয়োজন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে সুতরাং শাসনের ধারা, সংরক্ষণের নীতি ও জন্ম নিয়াছে নানা ভঙ্গীর,—সংখ্যায় অনেক। যে রাজ্যে নারী পাইবেন আপনার অপ্রতিহত প্রভাব, অবাধ স্বাধীনতা তাঁহারই মনের মত করিয় সেখানকার কলা-কান্তি ফুটাইয়া গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু যে আদর্শে এটা আকার পাইয়া উঠিবে সেটা তো হওয়া চাই সুন্দর সম্পূর্ণ। সেই মনের জন্য চাই পুষ্টি—চাই স্বাস্থ্য। এ স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য সরবরাহ করিবার একমাত্র বস্তু হইতেছে শিক্ষা।

দেশে উপস্থিত হইয়াছে অন্ন-সমস্যা; বস্ত্র-সঙ্কট অর্থ-বিহীনতা। পুরুষকে হাঁফাইয়া উঠিতে হইতেছে এই সকলের সংস্থান খুঁজিয়া, নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য এই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদের শেষের দাঁড়িটা টানিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া। এই সময়ে নারীর জন্য প্রকাণ্ড কর্ত্তব্যের সৃষ্টি হইয়া উঠিল যে—ঘাড়ের বোঝা তার নূতন করিয়া ভারী হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া—কেন তাই দেখা যাক।

সংসারের ভবিষ্যৎ যাঁরা, যাঁদের মুখে প্রথম ভাষা দিয়া জগতের সম্মুখে জননী আনিয়া দাঁড় করাইলেন—তাঁহাদের পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিবার,—প্রথম শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিয়া দিবার গুরুভার পড়িল আজ জননীরই উপর। আর সে শিক্ষাও আজ তাঁকে দিতে হইবে আজের দিনের সংসারে চলিবার যোগ্য করিয়া অভিনবের এ শতাব্দীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্য ছাঁকিয়া আনিয়া। তবে আজ নারীর কত বড় শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিতেই পারা যাইতেছে। মহাজেরিনে কত জনে দেশত্যাগী সাশ্রু নয়নে বিদায় লইল বা পার্লিয়ামেণ্টে মণ্টেগুর বক্তৃতা শুনিতে কোন কোন ভারতীয় ভূপতি উপস্থিত হইলেন এ সংবাদ জানা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য না হইলেও জর্ম্মাণ যুদ্ধের ইতিবৃত্ত—ইতিহাসের ক্রমপরিবর্ত্তন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার যেটা নিজস্ব সেই সেই দেশের পক্ষে উপযোগী—স্বাতন্ত্র্যের মধ্য হইতেও স্ব-তন্ত্র বলিয়া পরস্পরের যাহা লইবার বস্তু আছে সেগুলি জানা তো দরকারই। তার অর্থনীতি—জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিবে আজকার দিনের জীবনযাত্রা,—তাঁর জ্ঞান কৌশল দ্বিধা দৈন্যের সমীকরণে সামঞ্জস্য বিহিত গতি-বৈচিত্র্যের উপরেই ভবিষ্যতের জন্য প্রেরিতদের জীবনের প্রতিষ্ঠান হইবে,—তাঁরই প্রাণের গভীরতার পরিমাপে গহিন হইবে ভাবী ভারতের হৃদয় আর জ্ঞান।

আসলে এইটেই যে আজ নারীর চাই নারীও তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। নারীও ভাবিতে শিখিয়াছে যে সেও মানুষ। মানুষ হিসাবে তারও আছে জগতে একটা কর্ত্তব্য। নিদ্রা আর নিন্দা লইয়া তার আর আজ চলিবে না। সৃষ্টির গোড়ার কথাটা হইতেছে বাধাহীনের অসীমের অনন্তের মধ্যে পরমাত্মার উদার মুক্তি। নারীর বন্ধন আহত মন আজ ছুটিয়াছে সেই মুক্তির সন্ধানে—বাঁধন কাটিবার জন্য জ্ঞানের তীক্ষ্ণ কাটারিখানার যাচ্ঞা করিয়া কারণ আজ নূতন ভারতের জন্মদিন—নারী তাঁর মনের, গৌরবের, অভিজ্ঞতা, এষণার আলোক দিয়া এ দিনের অভিনন্দন করিবেন।

এখন ইহার পরের বিষম কথাটা আলোচনা করা যাক যাহার প্রগল্ভ প্রকাশে পুরুষ নীচভাবে নারীকে অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেটা হইতেছে যৌন-সম্বন্ধের কথা। পুরুষ নারীর অন্তরকে তার উপযোগী অভ্যর্থনা অভিনন্দন ত দিতেছেই না বরং শক্তি যাঁরা—শক্তিকেই তাঁদের দেখিতেছে অতি খাটো করিয়া মনকে তাঁদের অবিশ্বাস করিতেছে অতিশয় ছোটর মত। পিঞ্জরের বাহিরে নারীর দেখা পাইলেই সে আশঙ্কা করিয়া বসে—কুৎসিৎ হীন রকমের। শৃঙ্খলখানি তার পায়ের খসিয়া যাইতে দেখিলেই ভাবিল--হয়ত স্বেচ্ছাচার--স্ব-ঈরিণীর স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াস। কিন্তু চিরকালই কি নারীকে এজন্য এমনি করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়া মরিতে হইয়াছে? আর্য্য-সভ্যতা—যাহার গৌরব করিয়া ভারতে বিশ্ব-সভ্যতার চূড়ার উপর আপনার স্থান দাবী করে, তাহাতে কি নারীর অধ্যায়ে এ নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যায়; তোমরাই এক সময় কখন আনিয়া গুণ্ঠনখানি তাদের মাথার উপর তুলিয়া দিয়াছিলে। আজ তা নামাইয়া দিবারই প্রয়োজন হইয়াছে--কোনো ক্ষতি হইবে না তাহাতে। শিক্ষায় মন যখন উন্নত হয় আবিলতা মলিনতার তখন স্থান কোথায়? সাধারণ প্রাকৃত মানুষ আর শিক্ষিত সভ্য মানুষে প্রভেদ তাহা হইলে থাকিল কৈ? প্রাকৃত জ্ঞান—প্রবৃত্তির ইন্দ্রজাল রচনা—মনের গোপন পর্দ্দায় অনবরতই চলিতেছে। প্রাকৃত মানুষ তারই একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাটীতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান মনকে করে প্রবৃত্তির উপরে প্রভু—সে তাহাকে সটান সিধা পথে না চালাইয়া লইয়া যায় শোভন সঙ্গত রাস্তায়। রূপের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার এই যে ব্যবস্থা ঘোমটাখানা তুলিয়া দিয়া তোমার আভাসটাকে পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক রকম সমীহ করিয়া চলা তার বাস্তবিক কোনো মর্য্যাদা আছে কি? সে

যে মনুষ্যত্বের গ্লানি—একটা ছদ্ম বেশের ছলচাতুরী পাপের কথাটা ইচ্ছা করিয়া চলিতে ফিরিতে মনে করাইয়া দেওয়া—বারণ করিতে গিয়া মন্দটা ভাবিবার সুযোগ আনিয়া দেওয়া। কি দরকার আছে তার? শিক্ষা দাও আশঙ্কার কারণ সমূলে বিনষ্ট হইবে। এই যে মেমটী তোমার পাশ ঘেঁসিয়া "গ্যাট গ্যাট" করিয়া চলিয়া যায় তুমি সাহস করিয়া তার মুখের দিকে চোখ দুটো তুলিতে পার না—সেটা তার সাদা চামড়া আর গাউন ব্লাউজের গুণে নয়—বেশীর ভাগ তার শিক্ষা দীক্ষায় যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে তারই জন্য। সুতরাং নারীর সান্নিধ্য হইতে বাহিরকে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখিবার তত বড় আবশ্যক নাই—শিক্ষা দিয়া তাহার মনকে বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন যতখানি বেশী।

এইখানে একটা অতি বড় প্রশ্ন এই যে শিক্ষার বিধান তাহাদের করিতে হইবে কি প্রণালীতে? পৌরুষ শিক্ষা কি শোভন হইবে—নারীর জন্য! সর্ব্বাংশে সেটা শোভন, সুষ্ঠু না হইলেও—বর্ত্তমানে যখন অন্য কোনো সুনিয়মিত প্রণালী নাই তখন আপাততঃ এই পথেই নারীর শিক্ষাকে নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতেই ক্রমশঃ আসিবে সেই সত্য, সেই শ্রেয়স্কর খাঁটি পদ্ধতিটী।

অন্য কতকগুলি সামাজিক আচারবিচার, বিবাহ, গার্হস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারের বিরোধও দেখা যাইতেছে। শিক্ষাকে অবশ্য আর বিবাহের বয়সটাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে সম্ভবতঃ এ তর্কের অনেকাংশে মীমাংসা হইতে পারে—কন্যার পিতারও—লোন অফিসের সেক্রেটরীর চরণ ধরিয়া বিপদের নিবেদন জানাইবার প্রয়োজন কতকটা কমিয়া আসে।

মোটের উপর নারীর জন্য সুশিক্ষা চাই নিতান্ত করিয়া। তাঁহাদিগকেও ভাবিতে হইবে আমাদেরই সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সাথী, সখী, সচিব। ভগবান যেদিন চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—"গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"- নারীর জন্য সেদিন তিনি একটা আলাদা কিছু বিভাগ সেদিন করে নাই—গ্রীসের লাইকারগাস গো নারী ও নরের শিক্ষার একই বিধান দিয়াছিলেন—সোলোনের সংস্কারও নারীকে ভুলিয়া ফেলিয়া হইয়াছিল না।

চক্ষু বুজিয়া প্রাচীর বেষ্টনের কড়া বিধান দিয়া নারীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে আর চলিবে না—নারীকে দিতে হইবে তার অধিকার—তাদের পরম প্রেয়—প্রার্থয়িতব্য—তারই উপর তাহা হইলে দেশ ও সমাজের শুভ রূপে গৌরবে বর্ণে গন্ধে ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রতীক্ষায়।

সুহা-কানড়া-একতালা।

আমি রেখেছি রিক্ত
হৃদয়-আসন,
সখা তব আগমন-আশে হে।
আজি প্রেম-ফুলদলে
অর্ঘ্য র'চেছি
পূজিতে তোমারি চরণ হে॥

ওহে বঁধু আজি
বড় আশা করি'
ধুয়েছি মরম আঁখির জলে,—
ভকতি-কুসুমে
সাজায়েছি তায়,
ও মোহন ছবি আঁকিব ব'লে।

তুমি যদি প্রিয়
না আস আজিকে,
মম এ পিরীতি-কুঞ্জ মাঝে হে;
মম হৃদয়—কানন
পূরিবে বিষাদে,—
পিয়াসা জাগিবে সকাল্-সাঁঝে হে॥

শ্রীমতী মুতাহিরা বানু বেগম।

স্বরলিপি।

—•—

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
{ সসা II সা রা জ্ঞা | মা -পা পা I মা পা দা | ণা র্সর্সা -া |
আমি রে খে ছি য়ি হৃ ত হৃ দ য় আ সন্ ০

২´ ৩
| র্সর্সা র্সর্সা র্রা | র্রা র্সর্সা া I মপা -ণা পা | মজ্ঞা -মা } II
সখা তব আ গ মন্ ০ আ০ ০ শে হে০ ০

অন্তরা

মমা II পা দা দা | ণা ণদা ণপা I মপা দা ণা | র্সা র্সা র্সর্সা |
আজি প্রে ম ফু ল দ০ লে০ অর্ ঘ্য র' চে ছি সখা

২´
| র্সা ণা র্রা | র্সা ণদা পা I মা পা -ণপা | মজ্ঞা -মা II
পূ জি তে তো মা০০ রি চ র ০ণ হে০ ০০

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
II { সা সা ণ্‌া | রা রা রা I জ্ঞা জ্ঞা মা | রা ণ্‌সা সা |
ও হে বঁ ধু আ জি ব ড় আ শা ক০ রি

I রা মা মা | মা পা পা I দা দা ণদা | ণা পা -া |
ধু য়ে ছি ম র ম আঁ খি র জ লে ০

০ ১ ২´ ৩
| মা পা দা | ণদা ণা পা I মা পা দা | ণা র্সা -া |
ভ ক তি কু০ সু মে সা জা য়ে ছি তো র

০ ১ ২´ ৩
| ণা র্সা র্রা | -া র্সা র্সা I পা ণা পা | মা জ্ঞা -মা } |
ও মো হ ন্ ছ বি আঁ কি ব ব' লে ০

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩
| { মা মা পা | পা দদা -ণা I ণা র্সা র্সা | ণা র্সর্সা -া |
তু মি য দি প্রিয় ০ না আ স আ জিকে ০

১ ২´
| র্সর্সা র্রর্রা র্রর্রা | র্জ্ঞা -া র্মা I র্রা -া র্জ্ঞা | র্সা -া মমা } |
মম প্রি রীতি কু ঞ্ ্জ মা ০ ঝে হে ০ মম

০ ১ ২´ ৩
| পা পা পা | দা ণপা া I মা পা পা | দা ণর্সা -া |
হ র ষ কা নন্ ০ পূ রি বে বি ষাদে ০

০ ১ ২´ ৩
| র্সর্সা র্রা র্সণা | পা মা পপা I মা -মপা ণা | মজ্ঞা -মা II II
পিয়া সা জাগি বে স কাল্ সাঁ ০০ ঝে হে০ ০

চিররহস্য-সন্ধানে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই সপ্তাহেই প্রকৃতির ইতিহাসে এমন এক প্রচণ্ড দুর্যোগের পাতা খুলিয়া পড়িল, যাহা বুঝিবার পূর্ব্বে কখনও ইংলণ্ডের উপকূলকে অধিকতর বিক্রমে বিধ্বস্ত করে নাই। নির্ম্মম বাত্যায় ও বর্ষণে ফুলে-ফুলে-ভরা তরুরাজির উপর কি নির্দ্দয় ধ্বংসলীলা চলিয়াছে, দেশের চতুর্দ্দিক হইতে তাহার সংবাদ আসিতে লাগিল—প্রত্যেক ডাক-বিলির সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও জাহাজডুবির নূতন নূতন খবর পাওয়া গেল,—আটল্যাণ্টিক-যাত্রী বড় বড় ষ্টীমার হারাইল, এবং অসংখ্য জেলে-ডিঙি জীবনের জন্য যুধ্যমান নাবিকসহ দেখিতে দেখিতে সাগর-গর্ব্ভে তলাইয়া গেল। এ-হেন-দুর্যোগের তৃতীয় দিবসের প্রভাতে ডাক্তার ক্রেমলীন তাঁহার সুউচ্চ গির্জ্জাঘরটীর জানালা হইতে মেঘমেদুর আকাশ ও প্রমত্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে বলিতেছিলেন—"এ রকম একটা দিনে এই কথাটাই বিশেষ করে মনে হয় যে ভগবান বাস্তবিকই ক্রুদ্ধ হয়েছেন; নিজের ওপর, আর বুঝিবা নিজের সৃষ্টিরও ওপর।"

তিন দিন হইল তিনি এল র‍্যামির নিকট হইতে সেই পত্র পাইয়াছেন যাহাতে সাইপ্রস-দ্বীপের সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক বুধগ্রহ-সম্বন্ধীয় 'তৃতীয় রশ্মি'র বর্ত্তা বিবৃত আছে। সেদিন হইতে মুহূর্ত্তকাল নষ্ট না করিয়া এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের উপযোগী যা'-কিছু যোগাড়-যন্ত্র আবশ্যক তাহার তিনি ক্রুটী করেন নাই—আশা, যতই আয়াস-সাধ্য ও দুর্ব্বোধ হোক্, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের ফলে ঐ রশ্মি-সঙ্কেতের অর্থ হয়তো বা আবিষ্কৃত হইতেও পারে। সমস্তই প্রস্তুত—এমন সময় এই দারুণ দুর্যোগ বিপত্তি ঘটাইল। আকাশপট মেঘস্তরে এমন নিবিড় হইয়া আসিল, যে পত্র-প্রাপ্তির পর হইতে এ-যাবৎকাল একটী তারকা পর্য্যন্ত ক্রেমলীন আর দেখিতে

জ্ঞান নাই। তাঁহার ভৃত্য-কার্ল তো প্রকৃতির এই দৃশ্য-বিভীষিকায় একেবারেই ভীত হইয়া পড়িয়াছে,—তরঙ্গের ও বাতাসের গর্জ্জন দেখিয়া সে মুষড়াইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ গির্জ্জাঘরের চতুর্দ্দিকে দলে দলে উড্ডীয়মান সিন্ধু-শকুনের বিপন্ন চীৎকারে সে একেবারেই অস্থির।

"ডুবে মরার সময় মানুষ যেমন চেঁচায়, এও ঠিক সেইরকম"—বলিয়া সে বারংবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল; এই আন্দোলিত, উন্মত্ত, ভীতিসঙ্কুল ও গর্জ্জনমুখর সমুদ্রের তুলনায় তাহার দেশের গতিভঙ্গ-সুন্দর 'রাইন'-নদীটার গীতি-কল্লোলও বুঝিবা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সারাদিনের মধ্যে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও সে আবার তাহার প্রভুর কাছে খবর লইল—ঝড়ে গির্জ্জা দুলিয়াছে কিনা?

"নিশ্চয়ই"—নয়নের কোণে একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ক্রেমলীন বলিলেন—"নিশ্চয় দুল্‌ছে, এ-রকম ঝড়ে তা' না হয়ে কি থাকে; একখানা কুঁড়ে পর্য্যন্ত এই দারুণ ঝড়ে না দুলে পারে না।"

"তা' সত্যি, কুঁড়ে দোলে"—চিন্তিতভাবে কার্ল বলিল—"কিন্তু একখানা কুঁড়ে ঝড়ে একদম উড়ে গেলেও বড় বেশী আসে যায় না। শুনতে পাই, আমেরিকায় কুঁড়ে-সুদ্ধ সপরিবারে উড়ে যাওয়া আখ্‌ছারই ঘটে থাকে—সেটাকে মন্দ ভ্রমণ-প্রণালী বল্‌তে পারিনে। কিন্তু গির্জ্জা যদি বাতাসের ভেতর দিয়ে উড়তে থাকে, তা' হলে টুক্‌রো টুক্‌রো না হয়ে সপরিবারে বোধ হয় ওড়া চলে না!"

ক্রেমলীন হাসিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না; কার্লও এমন একটা অশোয়াস্তির সহিত কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিতে গেলে, যাহা তাহার স্বভাব-প্রফুল্ল মনের পক্ষে সাধারণ নয়। বস্তুতঃ, সমস্ত ব্যাপার বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহার মেজাজ বিগড়াইবার কারণও ছিল প্রচুর। রান্নাঘরের চিম্‌নি হইতে ঝুল ঝরিতেছিল,—একখানা প্রকাণ্ড ইষ্টক উনানের বেষ্টনীটার উপর ভীষণ শব্দে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল,—দুয়ার জানালার ফাটাল-পথে বাতাস যেন শানাই বাজাইতেছিল;—তারপর উনানের ছাই ফেলিবার জন্য উঠানে নামিতেই এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল যাহাকে দেখিবামাত্র

অবাক ও আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াপড়া ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর রহিল না। জন্তুটা এক প্রকার সামুদ্রিক হংস—চাতালের উপর জড়সড়ভাবে বসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত কদাকার চাহনিতে সে কার্লকে লক্ষ্য করিতেছিল।

"বেরো!"—হস্তসঞ্চালনে কার্ল তাহাকে তাড়াইতে চাহিল;—"বেরো; পাজি কোথাকার!"

কিন্তু পাজীর ভাবে অনুমতি পালনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না,—সে তাহার বর্ষাবারি-সিক্ত ডানাদুটীর প্রসাধনে মন দিল।

ক্রোধে অধীর হইয়া কার্ল রন্ধনশালার দিকে ছুটিল, এবং হাতের মাথায় হাতা খুন্তি যা' পাইল লইয়া আসিয়া ঐ বেয়াদপ জানোয়ারের অঙ্গ-লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অবশেষে, চমকিত হইয়া জানোয়ারটা তীক্ষ্ণ চীৎকার শব্দে পক্ষ প্রসারিত করিল, এবং উচ্চ হইতে ক্রমোচ্চ বায়ুস্তরে তাহার উড্ডয়ন-লক্ষ্যে কার্লেরও চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কার্ল উঠান হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল—পরিশেষে শ্রুতিকঠোর চীৎকারে বায়ুমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সে গির্জ্জার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুষ্টিবদ্ধ হস্তের উৎক্ষেপ প্রক্ষেপে কার্ল গর্জ্জিয়া উঠিল—"অসভ্য বেয়াড়া কোথাকার!—হায় ডাক্তার যদি অন্য লোকের মতন হতেন, তা তিনি নন, তা' হলে নিশ্চয়ই বাড়ীতে বন্দুক রাখতেন, আর আমিও ঐ অসভ্যটাকে গুলি করে মারতে পারতুম। এখন বোধ হয় সারাদিনরাতের মতই ব্যাটাচ্ছেলে ঐখেনে বসে চেঁচাবে,—আরামজনক সন্দেহ নেই!

আপন মনে গজ গজ করিতে করিতে সে ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে সমস্তই গোলমাল হইয়া গিয়াছে; উনান ধরিতে চায় না,—কেট্‌লির জল গরম হয় না,—অথচ তার প্রভু যে তারই মতন অশান্তিভোগ করিতেছেন না, এজন্য সে মনে মনে বিরক্ত হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে ক্রেমলীনের মন সেদিন বেশ প্রফুল্ল ও শান্তিময়ই মনে হইতেছিল—ঝড়ের গোলযোগে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীতে উত্তেজনার পরিবর্ত্তে বুঝিবা স্নিগ্ধতাই সঞ্চারিত করিতেছিল। একটি কারণ—তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইয়াছে এবং এল র‍্যামির সহিত সাক্ষাতের পর তৎপ্রদত্ত ঔষধে জীবনের মেয়াদ দীর্ঘীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে কতকটা অল্পবয়স্কও দেখাইতেছে।

বৈকালের দিকে ঝড় অল্পে অল্পে কমিয়া আসিয়া এক সময় একেবারেই স্থির ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। কার্ল এই সময় প্রভুর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেছিল,—সে হাতের কাজ থামাইয়া সহসা বাহিরের স্তব্ধতার দিকে কান পাতিল। সাগরতটে প্রতিহত বারিতরঙ্গের বিলম্বিত কল্লোল-গীতি ছাড়া এমন কি সিন্ধু-শকুনগুলোর গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত নীরব হইয়া গিয়াছে। চামচ হাতে করিয়াই সে আকাশের অবস্থা দেখিবার জন্য বাহিরে আসিল—কিন্তু গির্জ্জাঘরের চূড়ার দিকে নজর পড়িবামাত্র তাহার সকালবেলাকার সেই বন্ধুটীকে তখনও সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া কার্লের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল।

"মরুক গে যাক্—একটা পাখী বই তো নয়"—বিরক্তির সহিত আপন মনে তর্ক করিতে করিতে সে পুনরায় রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল—"শিকারী পাখী, পচা মাংসের ভক্ত—আর কিছুই নয়। এ নিয়ে আমি মন খারাপ করি কেন? যদি হার্ ডাক্তারকে গিয়ে বলি যে ছাদের ওপর বেটা আরামে বসে আছে, তা' হ'লে সম্ভবতঃ তিনি জানলা খুলে অসভ্যটাকে ঘরের মধ্যেই আদর করে ডেকে নেবেন—চাই কি রাত্তিরটার মত খেতে এবং শুতে দেবেন। যে সমস্ত দয়ার-শরীর-ওয়ালা মানুষ মনে করে যে সমস্ত সৃষ্ট জীবই সমান আদরযত্ন পাবার অধিকারী ইনিও তাদেরি একজন। হ'তে পারে—এ মত খুব উদার ও উৎকৃষ্ট—কিন্তু তা'তে বড় যায় আসে না; যদি একটা ইঁদুর বাচ্চাকে শয়নের সাথী পাই তা' হ'লে সেটা যেমন আমি পছন্দ করিনে, তেমনি একদল ভ্যাস্ত আর্স্‌লার সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি করে' খেতেও আমি রাজী নই। অহিংসা ধর্ম্মেরও একটা সীমা আছে।"

আহার্য্য-প্রস্তুত-কার্য্য কার্ল অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইল—কেননা তাহার প্রভু আজকাল বেশ ক্ষুধাবোধ করেন, এমন কি তাহার রন্ধনের গুণ-গ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এটী কার্লের পক্ষে মস্ত সান্ত্বনা, যেহেতু সে একজন ভাল রাঁধুনি।

"বিজ্ঞানের জন্যে উপোস দেওয়া হয় তো মন্দ নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকই যদি মারা পড়েন তা' হ'লে বিজ্ঞানের গতি কি হবে?"—দেখিতে দেখিতে কার্ল তাহার প্রভুর ক্ষুধাবৃদ্ধির কথা ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং গির্জ্জার উপর উপবিষ্ট সেই বিহগ-বন্ধুটীর কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল।

দীর্ঘ নির্জ্জনবাসের ফলে পাঠস্পৃহার অন্যান্য অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে আহার করিতে করিতে পড়াও ক্রেমলীনের একটী অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যে বইখানি আজ তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল সেখানি বাইরণের "ম্যানফ্রেড," এবং যে পংক্তিকতিপয়ের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাহা এই :—

"কি সুন্দর দৃশ্যমান জগত বিশাল !
কর্ম্ম তার, মর্ম্ম তার কি গরিমাময় !
আর মোরা,— দুনিয়ার প্রভু-গর্ব্বীদল,
আধ-ধূলি আধ-দেব,—সমান অক্ষম
উড়িতে বা তলাইতে,—ঘটাই সংঘাত
বিশ্বের পদার্থপুঞ্জে আমাদেরি মিশ্র উপাদানে।
শ্বসিয়া হীনতা-দম্ভ কলুষিত বায়ু
লয়ে ক্ষুদ্র অনটন, উচ্চ অভিলাষ,
যুঝি নিত্য,—যতদিন নাহি হয় জয়ী
মরত্বই অবশেষে ; না হয় প্রমাণ
মানব তাহাই মাত্র, যে-নামে দেয় না তারা আত্মপরিচয়,
যে-স্বরূপে পরস্পরে করে না বিশ্বাস।"

"এখন, এই পংক্তিকটী সর্ব্বাংশেই সেক্সপীয়রের যে-কোনো রচনা-সৌন্দর্য্যের সমকক্ষ—" ক্রেমলীন চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আর, মানবের সমস্ত দুঃখ-রহস্যই এইখানে। ত্রুটী জগত-ব্যাপারের মধ্যে নেই,—আছে আমাদেরই মধ্যে, যারা নাকি 'ঘটাই সংঘাত বিশ্বের পদার্থপুঞ্জে।' প্রশ্ন হচ্ছে, যদি যথার্থই আমরা 'সমান অক্ষম উড়িতে বা তলাইতে' হই, তবে সে কি আমাদের দোষ ?—ধৃষ্টতা প্রকাশ না করেও আমরা কি জিজ্ঞাসা করতে পারিনে, কেন আমাদের এরকম অসম্পূর্ণ করে গড়া হয়েছে ? এই 'কেন'-সম্বন্ধে আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বন্ধু এল র‍্যামির প্রতিপাদ্য বিষয়টী অতি মানবীয়,—আর আমার মনে হয়, তাঁর অনুসন্ধান সফল হবার আগেই আমি বুধ-গ্রহ ও অন্যান্য অনেক গ্রহ-উপগ্রহের রহস্য-উদ্ভেদে সক্ষম হব।"

চিন্তিত-চিত্তে তিনি 'ম্যানফ্রেডে'র পাতা উল্টাইতে লাগিলেন, এবং যেখানে উক্ত কাব্যের অভাগ্য নায়ক অভিযোগকারী দানবদলের প্রতি তাঁহার চরম অবজ্ঞা-বাক্য নিক্ষেপ করিতেছেন সেখানকার ঝক্‌ঝকে পংক্তিগুলিতে আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল:—

"চিত্ত,—যাহা অবিনাশী—করে পরিশোধ
আপনিই শুভাশুভ চিন্তা-ঋণ তার;
অশুভ ও সমাপ্তির উৎস সে আপনি;
কাল তার, ব্যাপ্তি তার, চেতনা তাহার,
নর-আবরণ-মুক্ত হয়ে আসে যবে,
বহির্বিশ্বে ভাসমান বস্তুপুঞ্জ হ'তে
করে না নিশ্চয় কোনো বর্ণ-পরিগ্রহ,
শুধু মিশে যায় হর্ষে কিম্বা বেদনায়
নিজ কর্ম্মফল-লব্ধ-জ্ঞান-উৎস-জাত।
তোরা লুব্ধ করিস্ নি আমারে দানব
নহে তা' সম্ভব কভু; নহি—নহি আমি
তোদের শিকার মূঢ়; কি অতীতে কিম্বা অনাগতে
ছিলাম, রহিব আমি আপনি স্বয়ং
আপনার বিনাশক !...... ..."

"তবু লোকে বলে যে বাইরণের রচনা দুর্নীতি-দুষ্ট !"—আপন মনে ক্রেমলীন বলিলেন—"এই ক'টিমাত্র পংক্তিতে ব্যক্ত উচ্চ শিক্ষা সত্ত্বেও! উঃ কি ভয়ঙ্কর এই উক্তি—'ছিলাম, রহিব আমি আপনি স্বয়ং আপনার বিনাশক'—সম্ভাবনার কত বড় রাস্তাই না এ-উক্তিতে খুলে পড়েছে!"

এই সময় কক্ষ মধ্যে তরবারি-ঝলকের মত একটা নীলাভ চকিত-দীপ্তিসম্পাতে সহসা চমকিত হইয়া তিনি থামিয়া গেলেন। চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া তিনি উভয় হস্তে নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিলেন—কেননা সে আলোকে তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল।

"কি ও ?—এঁ্যা"—তিনি চীৎকার করিতেই কার্ল কক্ষপ্রবিষ্ট হইয়া জানাইল—"বিদ্যুৎ !........খুবই বেয়াড়া নমুনা........ছুরিটুরি বা অন্য ইস্পাতের জিনিসগুলো সরিয়ে রাখি।"

কার্ল তথাকরণে নিযুক্ত হইল; অপরপক্ষে ক্রেমলীন ঐ আকস্মিক বিজলীলীলার ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষিপ্রতায় বিমূঢ়বৎ হইয়া তখনও কক্ষকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা গুরুগম্ভীর মেঘমন্দ্রধ্বনি আকাশের সুদূর প্রান্ত হইতে সমুত্থিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে যেন নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল এবং ক্রমে সাগর-গর্জ্জনের সঙ্গে মিলিত হইয়া স্তব্ধতার কোলে মিলাইয়া গেল।

"রাত্রে আবার দুর্যোগ হবে দেখ্‌ছি"—বলিয়া ক্রেমলীন পুনরায় বাইবেল খুলিলেন এবং কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"নাবিকদের জন্যে আমি দুঃখিত! দোরজানালাগুলো বেশ সাবধানে বন্ধ করো।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন"—কার্ল জানাইল—"ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে সমুদ্রে উড়িয়ে নিয়ে যেতে আমি বর্ত্তমান থাকতে কেউই পারবে না; তা'ছাড়া ও-রকম সমুদ্র-যাত্রায় আমার নিজেরও বিশেষ আগ্রহ নেই। আশা করি"—একটু উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"আজকের রাতটা আপনি নিশ্চয়ই গির্জ্জেঘরে কাটাবেন না?"

"নিশ্চয়ই কাটাবো,"—স্মিতমুখে ক্রেমলীন উত্তর করিলেন—"সেখানে আমার কাজ রয়েছে যথেষ্ট; একটা দুর্যোগের ভয়ে অলস হয়ে থাকা চলে না। কিন্তু তোমাকে যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে,—কেন? ভয়ের কোনো কারণ নেই।"

"তা' আমি বলছি নে"—অপ্রসন্নকণ্ঠে কার্ল বলিল—"কিন্তু—যদিও আমি কখনও ভেতরে ঢুকিনি, তবু আমার মনে হয় যে ও-ঘরটা খুবই নির্জ্জন, তা' ছাড়া বিদ্যুতের আলোর সঙ্গে ওখান থেকে ঐতটা নিকট-পরিচয় ঘটা সম্ভব যা' নাকি খুব আরামজনক হওয়ার কথা নয়।"

ক্রেমলীন কার্লের কথায় কৌতুক বোধ করিলেন এবং জানালার দিকে অগ্রসর হইয়া একদিকের পর্দ্দা খুলিয়া দিলেন।

সাগরের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"আমার বিশ্বাস, তোমার আশঙ্কা অমূলক। ঐ বিদ্যুৎ আর মেঘের আওয়াজ সম্ভবতঃ এমন কোনো একটা ঝড়বৃষ্টির বিদায়-সঙ্কেত, যা' অন্য কোনোখানেই ঘটেছে। ঐ দেখ, মেঘ কেটে যাচ্ছে!"

প্রকৃতপক্ষে, তা' যাইতেছিল। খুব অন্ধকার হইলেও, সন্ধ্যাটীর দিকে চাহিয়া বোধ হইতেছিল যে তাহার অন্তরে কোনো প্রকার আসন্ন উপদ্রব-সম্ভাবনা নাই। ঘন-নীল আকাশ-পরিসরে দু'একটী নক্ষত্র ক্ষীণ দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল—ক্রেমলীন তাঁহার জীবন-ব্রতের এই সমস্যা ও জ্যোতির্ম্ময় উপদেষ্টাগুলিকে দেখিবামাত্র আর বৃথা বাক্যে সময় অতিবাহিত না করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার নির্জ্জন পরীক্ষাগারে উঠিয়া আসিলেন। কার্ল কাণ পাতিয়া উপরের দ্বার-রোধ-শব্দ ও তালায় চাবী পড়ার পরিচয় গ্রহণ করিল,—সেই বিরামহীন অপরূপ আওয়াজও সেই সঙ্গে তাহার কাণে প্রবেশ করিল। এ-শব্দে তাহার কর্ণ কতকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিলেও, আজ পর্য্যন্ত উহা তাহার নিকট প্রহেলিকাবৎই রহিয়া গিয়াছে। বিষণ্ণভাবে মাথাটী নাড়িয়া বিমর্ষমুখে সে আহারের টেবিল পরিস্কার করিল, ঘরের আসবাবপত্র যথাবিন্যস্ত করিল, রান্নাঘরে গিয়া সমস্ত মাজিয়া-ঘসিয়া ঝাড়িয়া ও পরিস্কার করিয়া যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ জর্ম্মাণ-ভঙ্গীতে জননীর উদ্দেশে একখানি পত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইল। আপনার 'পাণ্ডিত্য'-সম্বন্ধে কার্লের মনে বুঝিবা একটু গর্ব্বই ছিল,—তা' ছাড়া সে জানিত যে দেশে সে যে সব চিঠিপত্র লিখিয়া থাকে তাহা পড়িবার ও শুনিবার জন্য গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাহাদের কুটীরে সমবেত হয়—এইজন্যই বিশেষভাবে সে ভঙ্গীতে ও বাক্য নির্ব্বাচনে তাহার লিপিচাতুর্য্যকে সকলের উপভোগ্য করিবার দিকে খুবই সতর্ক থাকিত।

কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকায় কার্ল লক্ষ্যই করে নাই যে ইতিমধ্যে বাতাসের বেগ অল্পে অল্পে বাড়িতেছিল, এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য মন্দীভূত থাকিয়া দ্বিগুণ বিক্রমে ও প্রচণ্ডতায় তাহা পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিয়াছে। রন্ধনশালার দ্বারের ছিদ্রপথে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে সে ঘরের মধ্যে শীতল-শিহরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল,—ক্রুদ্ধ বিক্রমে জানালায় জানালায় ধাক্কা দিয়া ফিরিতে লাগিল,—অবশেষে; ভাণ্ডারের দ্বার খোলা দেখিয়া এমন ভয়ানক শব্দে তাহা

বন্ধ করিয়া দিল, যেন তর্কে পরাজিত কোন লোক হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। হাতের কলম হাতে লইয়া কার্ল উৎকর্ণভাবে বসিল—ঠিক এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার গৃহের চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—মনে হইতেছিল যেন শব্দটা উপর হইতে নীচে আছাড় খাইয়া বাতাসের সহিত মাটীতে সঞ্চরণ করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যাইতেছে।

"নিশ্চয় সেই শালার পাখীটা!"—অর্দ্ধস্বগতঃভাবে কার্ল বলিল—"কি মিষ্টি আওয়াজ!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রন্ধনশালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা নীলাভ বিদ্যুদ্দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া উঠিল,—পরক্ষণেই একটা সংক্ষিপ্ত অথচ উচ্চ বজ্রনির্ঘোষ শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে আসন্ন ঝটিকা তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া দেখা দিল; গর্জ্জন-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর পুঞ্জীভূত, মসীকৃষ্ণ মেঘস্তর যেন একেবারেই মরিয়া হইয়া পৃথিবীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রেমলীন অপরদিকে তাঁহার পরীক্ষাগারে যথাকালে পৌঁছিয়া, মেঘাবৃত হইবার পূর্ব্বেই আকাশের পরিচ্ছন্ন অংশের অন্বেষণ-চেষ্টা করিতেছিলেন। বড় জানালাটী খুলিয়া দিয়া ও বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তিনি সাগ্রহে নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাথার উপর একদল তারকা চিক্-চিক্ করিতেছিল, এবং ঠিক বিপরীত দিকে ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তরের একটি ছাউনী তাঁহার দৃষ্টি হইতে তাঁহার বর্ত্তমান পরীক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র সেই উজ্জ্বল জগৎ বুধগ্রহটীকে আড়াল করিতেছিল। তিনি দেখিতেছিলেন যে দক্ষিণ দিক হইতে জলদজাল ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিতেছে এবং আর এক দফা ঝড়বৃষ্টির জন্যও প্রস্তুত হইতে ছিলেন—কিন্তু তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সুযোগ ঘটে তবে তাহা কাজে লাগাইতে ছাড়িবেন না!

তথাপি কেমন করিয়া আকাশ বাতাসের এই প্রতিকূল অবস্থার ভিতর হইতে তৃতীয় রশ্মির চকিত-সম্পাত অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে? চুম্বক-চক্রের গায়ে

পড়িবামাত্র, তিনি গতি লক্ষ্য করিতে পাইবার পূর্ব্বেই তাহা কি অদৃশ্য হইয়া হইয়া যাইবে না ! কিন্তু এই বিষয়ে যতই জল্পনাকল্পনা ও হিসাবনিকাশে তিনি তাঁহার মস্তিষ্ককে ব্যাপৃত রাখিতে চাহিতেছিলেন, ততই অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন যেন এই সময় তাঁহার অতীত জীবনের মধ্যেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। সেই পরমাশ্চর্য্য বিগত দিনগুলি যখন তিনি যথার্থই যুবক ছিলেন,—সেই যৌবনের অধিকারী যাহা নাকি এল র‍্যামির সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-জাত নহে, কিন্তু যে কর্ম্মীর শিল্পনৈপুণ্য জগতকে কণ্টকহীন পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে সেই দেব-শিল্পীরই হাতে-গড়া সুসম্পূর্ণ ও অকৃত্রিম যৌবন। পাঠ্যাবস্থার সেই কৃশকায় ছাত্রটী, মাথাভরা কুঞ্চিত কেশ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি-আয়ত নয়ন ছুটী, বিজ্ঞান-সমর্পিত-প্রাণ, নব নব পরীক্ষায় উৎসুক—সেই সব দিনের কথা আজ বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল, দৃষ্টি-বিজ্ঞানের সেই আলোকরশ্মি-সংঘাত-বিষয়ক ব্যাপারটী যাহাতে বলা আছে যে একই বিন্দু হইতে ছুটী আলোকরশ্মি বাহির হইয়া যদি একই দিকে যাত্রা করে তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে তাহাদের সংঘাতে অন্ধকার উৎপন্ন হয়,—মনে পড়িল, একদিন এই বিস্ময়কর অথচ অবিসম্বাদী তথ্যটী লইয়া তাঁহার মন কতই না আন্দোলিত হইয়াছিল,—আরও মনে পড়িল, কেমন করিয়া এই সমস্ত আলোচনার মাঝখানে কোনো একটী শক্তির ধাক্কায় তাঁহার সমস্ত কাজ প্রতিহত হইয়া থামিয়া যায় ;—যে শক্তিকে কোনো জ্যোতির্ব্বিদের জ্ঞান নাগাল পায় না ; যে শক্তি প্রেমের। হ্যাঁ—তিনি ভালবাসিয়াছিলেন ও ভালবাসা পাইয়াছিলেন,—এই দীনহীন, নিরীহ ও কল্পনাজীবী, রাশিয়ায় একদা শীতের দিনে,—প্রান্তর যখন বরফাচ্ছন্ন এবং অরণ্যের অন্ধকার শার্দ্দূল-রব-মুখর,—প্রেমস্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন আর সে স্বপ্ন হইতে জাগিয়া-ছিলেন—ভগ্নহৃদয়ে। রাশিয়ার সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো এক সুন্দরীকে তিনি ভালবাসেন ; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রে দলবদ্ধ কতকগুলো রাজদ্রোহীর সহিত তাহার যোগ ছিল। দোষী প্রমাণ হওয়ায় তাহার দ্বীপান্তর-বাস নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু ঐ দণ্ডাজ্ঞা শুনিবামাত্র সে কারাগারেই বিষপানে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনায় ক্রেমলীন ক্ষোভে ও দুঃখে উন্মত্তবৎ হইয়া রাশিয়া পরিত্যাগ করেন। লোকে বলে যে শোকে ও হতাশার আতিশয্যে তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল—অসম্ভব নয়,—কিন্তু তা' সত্ত্বেও, লাবণ্য-সুন্দর যৌবনে আত্ম-নাশিনী ঐ প্রণয়িনীর জন্য স্নেহ-কোমলতা জীবমাত্রেরই দুঃখে

তাঁহাকে সচেতন করিয়া তোলে, এবং তাঁহার প্রকৃতি হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ ও তিক্ততা নিঃশেষে নষ্ট করে। তাহার পর এই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—দিনের পর দিন তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টী জটীলতর হইয়া আসিয়াছে—অবশেষে বার্দ্ধক্য আসিয়া আরব্ধ অনুষ্ঠানের সাফল্য-সম্বন্ধেও তাঁহাকে হতাশ করিয়াছে। এই সময় এল র‍্যামির সহিত বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ—আবার জীবনের মেয়াদ-বৃদ্ধি—আবার ব্রত-উদ্‌যাপনের সম্ভাবনা-সম্বন্ধে নবীভূত আশার সঞ্চার। এল র‍্যামি কি বলে নাই—"বলপ্রয়োগ ছাড়া তোমার মৃত্যু অসম্ভব?"

আকাশপটের তারকাচিত্রের মত তাঁহার অতীত জীবনের চিত্রগুলি এমনি করিয়া আজ নির্জ্জন নিশীথে কক্ষ-বাতায়ন-পার্শ্বে মেখাস্তরালের বুধগ্রহ-সন্ধানে উপবিষ্ট ক্রেমলীনের চিদাকাশে একে একে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

"আচ্ছা, কেন এ সব হারাণো দিন এখন মনে পড়ছে?"—সহসা এক সময় আপন মনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"অতীতের কথা নিয়ে সময় নষ্ট করা তো আমার স্বভাব নয়; ভবিষ্যতই যে আমার কার্য্যক্ষেত্র!"

তাঁর এই স্বগত-প্রশ্নের অবসরে সহসা ঐ কালো মেঘখানির একজায়গায় ছিন্ন হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা দ্বিধাভিন্ন হইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভাঁজের পর ভাঁজ খুলিতে খুলিতে মেঘগুলি আকাশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধ-রক্তিম ও ঝঞ্ঝা-জয়োল্লাস-দীপ্ত বুধগ্রহ হইতে একটা চকিত রশ্মি-তরঙ্গ ছুটিয়া আসিল… এবং চক্ষের নিমেষে ক্রেমলীনও তাঁহার চক্র-পৃষ্ঠ হইতে কৃষ্ণাবরণখানি টানিয়া লইয়া, রুদ্ধ-নিশ্বাসে, এমন কি বুঝি বা সমগ্র প্রাণশক্তিই চক্ষে কেন্দ্রীভূত করিয়া, সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রকাণ্ড চক্রগাত্রে একটা ম্লান দীপ্তি ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল.. ২.ক্, মিলাইয়া গিয়াছে!…দ্বিতীয় তরঙ্গ…ঊর্ম্মি-বিক্ষোভের মত এটা কাঁপিতে লাগিল—এইবার…এইবার… তৃতীয়!—ক্রেমলীন উদ্বেগ-বিকম্পিত-বক্ষে চক্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন · সেটী দেখা দিল!—একটা রক্তবিন্দুর মত চক্র-গাত্রে পতিত হইয়া পারদের মত ক্ষিপ্রগতিতে মসৃণ চক্রপৃষ্ঠে পরিদৃশ্যমান অসংখ্য রশ্মিরেখার ভিতর দিয়া সেটী আবর্ত্তিত হইল… এবং পর মুহূর্ত্তেই

একটা আরক্তিম আভায় দীপ্ত হইয়া মিলাইয়া গেল ! ক্রেমলীনের ওষ্ঠ হইতে একটা অদম্য হতাশার চীৎকার বাহির হইয়া আসিল—

"অসম্ভব !···হা ভগবান !···অসম্ভব !"

হায় ! বাস্তবিকই এত ক্ষিপ্র একটা গতির অনুসরণ অসম্ভব—কোন্ জায়গাটীতে যে ঐ রক্তবিন্দুবৎ দীপ্তিটুকু প্রথমে পতিত হইল এবং কোন্‌খানে গিয়াই বা উহা অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। তথাপি ক্রেমলীন নিদারুণ উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—তাঁহার ওষ্ঠযুগল উদ্ভিন্ন, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত, বিস্ফারিত নয়ন দুটীর অপলক-দৃষ্টি আপন নৈপুণ্য-সৃষ্ট সেই ভীষণ-দর্শন আকাশ-মুকুরখানির প্রতি নিবদ্ধ, যে মুকুর এতকাল প্রতিফলিত করিয়াছে কত বেশী এবং প্রতারিত করিয়াছে কত অল্প !···গির্জ্জাগাত্রে আহত-প্রতিহত ঝঞ্ঝাগর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া চক্রপৃষ্ঠে রেখায় রেখায় হিল্লোলিত রশ্মিগুলির দিকেই তিনি মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাইল এবং পরক্ষণেই বজ্রগর্জ্জনে আকাশ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল—অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রেমলীন স্থান-ত্যাগ করিয়া ঝড়বাতাসের বিরুদ্ধে জানালাটী বন্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু জানালার নিকটে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে বুধগ্রহটী তখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ আকাশ-প্রান্তের ঘন মেঘপুঞ্জ বিদ্যুতে উজ্জ্বল ও গর্জ্জনে কম্পিত হইতে লাগিল,—তথাপি আগ্রহ-কম্পিত চরণে তিনি পুনরায় চুম্বক-চক্রটীর দিকে ছুটিয়া আসিলেন—আশা, যদি সেই সমস্ত চঞ্চল রজতরশ্মিরেখাপুঞ্জের মাঝখানে পূর্ব্বদৃষ্ট রক্তদীপ্তরেখাটী আবার দেখা দেয় !

"ধীরে,······ধীরে !" অর্দ্ধস্বগতকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আর এক মুহূর্ত্ত, তার পরই হয় ত দেখা যাবে......জানা যাবে.. ...যা' এত কাল খুঁজছি তা' পাওয়া যাবে ·····"

শেষ কথাকয়টী তাঁহর ওষ্ঠ হইতে বাহির হইতে না-হইতেই একটা আরক্ত অগ্নিশিখা লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া মেঘমণ্ডল হইতে লাফাইয়া উঠিল এবং প্রকাণ্ড একখানি তরবারির মত বেগ-প্রচণ্ডতায় গির্জ্জাচূড়ায় পতিত হইল······মুহূর্ত্তমাত্র······ছাদের খিলান ও দেওয়াল ফাটিয়া চৌচীর হইল এবং চূড়া গুঁড়াইয়া গেল,—পরমুহূর্ত্তেই জলস্থল ও ক্রোশের পর ক্রোশ প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীষণ শব্দে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল······শৃঙ্খল, তার ও গুরুভার ধাতু-

দ্রব্যের মধ্যে একটা সংঘাত-ঝঞ্ঝনা শ্রুত হইল......প্রকাণ্ড চুম্বক-চক্রখানা বিশৃঙ্খল হইয়া টলিয়া গেল · একবার......আবার .... কাঁপিল......থামিয়া গেল .... পরে কীলক-বিচ্যুত হইয়া যেন একটা ভীষণ-দর্শন রাক্ষসের মত ছুটিয়া আসিয়া ভূপতিত হইল! সেই সঙ্গে ভয়ানক শব্দে দেওয়াল ও ছাদ ধূলা ও পাথর ও খোয়া ছড়াইয়া ধ্বসিয়া গেল...তার পর ?... কেন, তার পর কিছুই না! শুধু গাঢ় অন্ধকার, মেঘমন্দ্রধ্বনি, আর প্রমত্ত ঝটিকার অশ্রান্ত গর্জ্জন!

বাহিরে, ভীতি-উৎকন্ঠিত কার্ল বারংবার গির্জ্জাঘরের দৃঢ়অর্গলবদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিতে লাগিল। বাড়ীতে বাজ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সে রান্নাঘরে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল,—কিন্তু কয়েকমুহূর্ত্ত পরেই অল্পে অল্পে চেতনা ফিরিয়া পাইয়া প্রথমটা সে হতবুদ্ধি ও বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া যায়; পরে সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব-সম্বন্ধে সচেতন হইবামাত্র ঝড়বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জনকে তুচ্ছ করিয়া গির্জ্জা-দ্বারে ছুটিয়া আসে। একবার উঁকি মারিয়াই ব্যাপার বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না,—সমস্তই চৌচীর হইয়া গিয়াছে; সেই দুর্য্যোগময়ী নিশীথের অন্ধকারে যতটুকু দেখা গেল তাহাতে বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে এই নিদারুণ ধ্বংশ কালে স্বচ্ছন্দ-বনজাত লতাগুল্মেরই লীলানিবাস হইয়া উঠিবে। রুদ্ধনিশ্বাসে সে উন্মত্তবৎ উপরে ছুটিয়া আসিল এবং অসহিষ্ণু চীৎকারে দুর্ভেদ্য গির্জ্জাদ্বারে বারংবার আঘাত ও পদাঘাত করিতে করিতে অবশেষে শ্রান্ত হইয়া দুয়ারে কান পাতিয়া দাঁড়াইল; কোথায় কি! একটু শব্দ পর্য্যন্ত নাই! হতাশভাবে হাত নাড়িয়া ও চাবীর ছিদ্রে মুখ দিয়া সে ডাকিল—

"হার ডাক্তার!...হার ডাক্তার!"

নিরুত্তর,—শুধুই ঝোড়ো বাতাসের শন্ শন্ শব্দ।

"নিরুপায়!" উত্তেজনায় ও ভয়ে উভয় চক্ষু বাষ্পাকুল করিয়া সে মনে মনে বলিল—"সাহায্য দরকার হবে; পাড়ার লোকদের জাগিয়ে তুলি, দোর ভেঙ্গে ফেলবার যোগাড় দেখি।"

ঝড়বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া, বর্ষা-বারি-স্নাত অঙ্গে সে নিকটবর্ত্তী কয়েকঘর মৎস্যজীবির কুটীরাভি-মুখে ছুটিল; এই কুটীরগুলির অধিবাসীদের সে চিনিত, এবং তাহাদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব

ছিল। প্রাণপণ চীৎকারে তাহাদিগকে জাগাইয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে ঘটনাটী বিবৃত করিল—এবং চার জন হৃষ্টপুষ্ট লোক অবিলম্বেই কোদাল কুঠার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ কার্লের সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল!

গির্জ্জাদ্বারের নিকট উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উত্তেজনাও কার্লের চেয়ে কিছু-মাত্র অল্প ছিল না; কিন্তু দ্বারটী ভাঙ্গিতে তাহাদের মনে একটু যেন দ্বিধা উপস্থিত হইল।

"আবার ডাক দাও দেখি" একজন বলিল—হয় তো তিনি ভিতরে বেশ আরামেই আছেন; প্রথম ডাকাডাকি শুন্‌তে পান নি।"

সঙ্গীদের সন্তোষের জন্য কার্ল আদেশ পালন করিল,—কিন্তু ফল পূর্ব্ববৎ; বায়ুগর্জ্জন ছাড়া দ্বিতীয় উত্তরদাতা নাই।

"মরে গেছে, নিশ্চয়"—বিবর্ণমুখে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"আচ্ছা, তা' হ'লে দোরটা ভাঙাই যাক্"—

কার্য্য আরম্ভ হইল; কয়েক মিনিটের পরিশ্রমেই,—যদিও এই প্রত্যেক মিনিটটী কার্লের নিকট যুগযুগান্তর বলিয়াই মনে হইতেছিল,—দ্বার ভাঙিয়া পড়িল,........তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল........এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঝোড়ো বাতাসের একটা প্রবল ঝাপ্‌টা তাহাদের হাত-বাতি নিভাইয়া দিয়া সমস্তই অন্ধকার করিয়া দিল। মাথার উপর দ্বিধা-ভিন্ন ছাদের ফাঁকে মসীকৃষ্ণ আকাশ ও পদতলের চতুর্দ্দিকে স্খলিত প্রস্তর স্তূপ, প্রক্ষিপ্ত চূণবালি ও আসবাবপত্রের ধ্বংশাবশেষ! অনতিবিলম্বেই আলোকটী পুনঃপ্রজ্জলিত করিয়া কম্পিত-হৃদয়ে ও নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহারা চতুর্দ্দিকের সেই ধ্বংশলীলা দেখিতে লাগিল। প্রথমে প্রস্তরখণ্ড ও ইষ্টকাদি-চূর্ণের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না,—কিন্তু কার্লের উদ্বিগ্ন ও চকিত দৃষ্টি পরক্ষণেই ঐ স্তূপের ভিতর কালো রঙের কি-যেন-একটা দেখিতে পাইল। সে হাত দিয়াই রাবিশ সরাইতে প্রবৃত্ত দেখিয়া সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরিশ্রমের পর তাহারা একটা বিপুলকায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের সন্ধান পাইল।

"এটা কি গো?"—একজন বলিল—"এ তো........হার ডাক্তার নয়!"

কার্ল কিছুই বলিল না—ভয়ে সে যেন বিবর্ণ হইয়া যাইতেছিল,......সেই কালো পদার্থটা সে স্পর্শ করিল—সেটা একখানা মোটা কাপড়, অনেকটা শবাধার আচ্ছাদনীরই মত—কে

জানে কি আছে তার তলায়! আকুল উৎকণ্ঠায় সে সেটাকে টানিতে লাগিল, কতকগুলো ভাঙা ধাতুদ্রব্য ও তারে তাহার হাত ছিঁড়িয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল; অবশেষে সেটা খুলিয়া আসিতেই চাকার মতন একখানা প্রকাণ্ড গোলাকার প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িল এবং বাতির আলো গায়ে লাগিবামাত্র সেটা বিচিত্র বর্ণ অনুরঞ্জনে ঝকমক করিয়া উঠিল। সেটাকে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টায়, কার্ল তাহার ধারে হাত দিবামাত্র উত্তপ্ত ও আর্দ্র একটা-কিছুতে তাহার আঙুল ঠেকিয়া গেল; ভয়ে হাত টানিয়া লইতেই দেখা গেল যে তাহার অঙ্গুলিগুলি রক্তসিক্ত হইয়া গিয়াছে।

"হা ভগবান! হা অদৃষ্ট!"—সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"তিনি এইখানে, এইটের তলায়!...তুলে ফেলো এইটে—শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!"

উপস্থিত সকলেরই কণ্ঠ হইতে একটা ভীত ও বিস্মিত শব্দ একই কালে বাহির হইয়া আসিল—কার্লের ললাট ঘর্ম্মাক্ত, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—তথাপি, মাঝারি-রকম একটা কাঠের গুঁড়ি তুলিতে যতখানি আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তেম্‌নি আয়াসেই সে যন্ত্রপাতি সমেত ঐ প্রকাণ্ড পাথরখানা একটা লৌহকীলক-সাহায্যে টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল যে কিসের শক্তিতে তাহা সে নিজে বা তাহার সঙ্গীরা বুঝিতেই পারিল না। পরমুহূর্ত্তেই তাহার নজরে পড়িল শোণিতসিক্ত একতাল মাংসপিণ্ড ও কতকগুলি পক্ককেশ!...বুকভাঙা আর্ত্তনাদে একবারমাত্র আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নিকটে দণ্ডায়মান মৎসজীবীরা সহানুভূতি-কাতর হইয়া সন্তর্পণে তাহাকে স্কন্ধে তুলিল এবং বাড়ীর বাহিরে লইয়া আসিয়া কিছুক্ষণ পরামর্শের পর আপনাদের কুটীরে আনিয়া তাহাদের রক্ষিতাগুলির শুশ্রূষাধীনে রাখিল। সে রাত্রে কাহারও আর ঘুম হইল না,—ঝড়ের গতির দিকে এবং মধ্যে মধ্যে বজ্রদীর্ণ গির্জ্জাবাড়ীর ধ্বংশাবশেষের দিকে ভীতিকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাকী রাতটুকু ধূমপান করিতে করিতেই তাহারা কাটাইয়া দিল।

"নিশ্চয়ই ভুতুড়ে কাণ্ড"—তামাক টানিতে টানিতে একজন বলিল—"তা' নইলে ছোট্ট একটা লোহার ডাণ্ডায় এমন প্রকাণ্ড পাথরখানা হাল্কা শোলার মতন উঠে পড়ল—এ্যাঁ!"

"সেটার ওজন খুব কম করেও পাঁচশো মণ হবে"—অপর একজন চিন্তিতভাবে জানাইল।

"আচ্ছা, সেটা কি বলতে পারিস"—তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"আমি ভেবেছিলুম সেটা মস্ত একখানা শান্-পাথর, কিন্তু তা' হ'লে আলো লেগে অমন ঝক্ ঝক্ করলো কেন?"

"চুলোয় যাক্,—ও যেখানকার জিনিস, সেখানেই থাকুক"—প্রথম বক্তা বলিল—"হাজার টাকা দিলেও ও-জিনিষ আর আমি ছুঁতেও যাচ্ছি নে।"

"আমিও না—আমিও না।"

সকলেই সমস্বরে এ-বিষয়ে তাহাদের মতের ঐক্য জ্ঞাপন করিল।

"সে লোকটার কি মতলব ছিল, কে জানে"—চতুর্থ ব্যক্তি গম্ভীরভাবে জানাইল—"ভুতুড়ে কাণ্ডই হোক্ বা বিশ্বকর্ম্মা-পুজোই হোক্, এখন সবই শেষ হয়ে গেছে। একেবারে থেতো হয়ে গেছে—আহা বেচারী বুড়োমানুষ! বড় দুঃখের মরণ—ভগবান তার সদ্গতি করুন!"

"বাতাসের বেগ কি রকম!" একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল।

"উঃ, ভয়ানক,"—বক্তার জেলে-ডিঙির বৈকালিক সঙ্গী উত্তর করিল—"হ্যাঁ ভাল কথা, একটা জোলো-হাঁসের চীৎকার তুই শুন্তে পেয়েছিলি?"

"হাঁ, হ্যাঁ, শুনেছিলুম বটে!"····· বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ও সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় কুটীরে শয়ান কার্লের খোঁজ লইয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল। এখনও তাহার চেতনা ফেরে নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

কলিকাতা।

অতৃপ্ত।

—:০:—
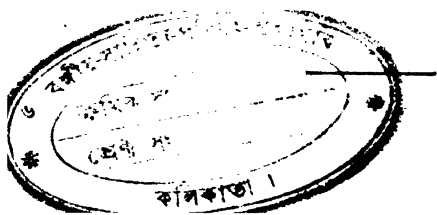
জুড়ায়ো না আর পিয়াসা আমার
কতই জুড়াবে জীবন ভো'র।
পূরায়ো না আর বাসনা আমার
বাসনার মোর নাহিক ওর।

তব অকুণ্ঠ করুণার ধারা,
পিয়ে আকণ্ঠ হ'নু মাতোয়ারা,
তবু জুড়াল না চিত্ত সাহারা,
গেল না তৃষার নেশার ঘোর।
যতই তাহায় করিয়াছি দূর
ততই হয়েছে পুনর্ণবা,
যত ছুটি কাছে যায় দূর দূর
যেন মরু মরীচিকার প্রভা।

যাবে না যাবে না শ্রাবণ ধারায়
প্লাবনের মাঝে সে নাহি হারায়
অশনি হানিয়া দহ' দহ' তায়
ব্যথা বরষার বাসব মোর।

শ্রীকালিদাস রায়।

———

বাঁধন-হারা।

সমস্ত জগতটাকে বাদ দিয়েও যেটুকুকে বাদ দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, যেটাকে ভর করে আমরা বাঁচ্‌ছি, যেটা আমাদের অন্তর থেকেও অন্তরতম, যার কথা আমাদের হৃদয়ের গোপন কোণে মূর্চ্ছিত লাঞ্ছিতের মত পড়ে ছিল, তারি বুকের বেদনা-ভরা-তারে বার বার আঘাত করে' আজ যে মর্ম্মস্পর্শী ব্যথা-ভরা সুরের সৃষ্টি করে তুল্‌লো—সে বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মান্তিক। এ সকরুণ ধ্বনি তার বুক ফুঁড়ে বেড়িয়ে পাহাড় থেকে পাহাড়ে—বন থেকে গভীর বনে—শুষ্ক মরুভূমির বুকে বুকে সে ব্যথা-ভরা-গান ছড়িয়ে দিল। এ গান গাইল পাখীতে,—মূর্চ্ছনা তার জাগিয়ে দিল গাছে গাছে, লতায় পাতায়,—শিহরণ তার উঠ্‌লো জেগে প্রতি প্রাণে প্রাণে।

যারা সুখ চাইত না, দুঃখকেই বরণ করে নিয়ে আপনাকে তার অতলতলে ডুবিয়ে রেখেছিল, তারাও আজ অনুভব কর্‌লো সে দুঃখের গুরুত্ব, সে দুঃখের গভীরতা। সুখ তারা চাইত না—চাইত একটা নিরবচ্ছিন্ন নিরাবিল শান্তি। কিন্তু এটুকুও তাদের প্রাণে সইল না। শান্তির স্নিগ্ধ সুষমাকে ছাপিয়ে একটা অশান্তির তুফান উঠে সব তোলপাড় করে দিল;—গভীর রাতের কোন্ সে দূরের অস্ফুট বাঁশরীর তান থামিয়ে দিয়ে কানের কাছে আজ্‌কে তারা দামামা টিপিয়ে দিল।

আর সে রাত্‌ নেই—তাই কোলাহলের মাঝে নীরবতা আজ নিজকে হারিয়ে ফেলেছে। যে মূক ছিল, কারও সঙ্গে কথা কইত না—আজ্‌কে সে নিজেকে মুখর করে তুলে, বিশ্ব-ভুবনকে তার নিজের সুরে ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছে। প্রভাতের মত ভেতরে ভেতরে আজ রঙিন্ আলোয়, নবীন হাওয়ায়, নূতন গানে ভরে উঠ্‌ছে,—আর ফুটে উঠ্‌চে তার সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্দাম চঞ্চলতা—একটা পূর্ণ আবেগ। এ আবেগ-চঞ্চল-হৃদয়ের অরুণ-উন্মেষ প্রভাতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জেগে উঠ্‌ছে।

মনে পড়্‌লো আজ আবার বহুদিন আগেকার পুরোণো স্মৃতি, মাঝের সুদীর্ঘ আঁধারের আগের-দিক্‌টার সেই প্রশান্ত, সীমাহীন, উন্মুক্ত, নীল আকাশ—সেই আলো সেই হাওয়া,—

সেই মুক্তি—সেই স্বাধীনতা। বহুদিন পর অন্ধ আবার তার নষ্ট চোখ ফিরিয়ে পেয়ে পূর্ণ আলোর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো—সে চায় দীপ্তি—সে চায় জগৎকে তার চোখের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে।

পরের সুখ যাদের সয় না, তারা চায় দুঃখ দিয়েই পরকে ঢেকে রাখতে। গভীর সুখের ভেতরেও যে একটা তৃপ্তি, চোখের জলের ভেতরেও যে একটা হাসি লুকিয়ে থেকে, কান্নার অবসানে একটু সুখের আস্বাদন এনে দেয় এটা যারা জেনেশুনে দুঃখকে আপন করে নিয়েছিল, তারা আবার নতুন সুখের আশ্বাসে মৃত্যুকেও বুক পেতে দিতে ডর্‌লো না। দুঃখ-মধুর আস্বাদ তারা আজ পেয়েছে! দুঃখ উপচে উথলে পড়ছে;—আত্মপ্রসাদ আনন্দ! দুঃখ এ নয়;—

"তোমার হাতের সোনার কাঠির স্পর্শ কি এ!
এক পরশে জড়িয়ে দিলে সর্ব্বসহা ভক্তি দিয়ে
জীবনধারায় মিশিয়ে দিলে সাগরমুখী এই প্রবাহ।
জুড়িয়ে গেল জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল বুকের দাহ।"

স্বর্গের বাণীর মত তারা শুন্‌লো যে প্রবীণকে আজ নবীন করে তুল্‌তে হলে মৃত্যুর ভেতর দিয়েই তাকে পেতে হবে, তাই দেবতার আশীর্ব্বাদের মত মরণকে তারা বরণ করে নিল। চোখ দিয়ে তাদের আনন্দাশ্রু ঝরে পড়্‌লো।

স্রোতের প্রয়াস—তার মুখের বাঁধনটাকে ভাসিয়ে নেওয়া, তার স্বাধীন স্রোতকে অবাধে চালিয়ে দেওয়া; প্রাণ দিয়েও এইটেই আজ জীবনের মহাসাধনা, মহাব্রত হয়ে দাঁড়াল।

বাজ্‌লো একটা নতুন সুর কানের আশেপাশে। সে সুর ভুলিয়ে দিল সকল সঙ্কোচ, লাজ, ভয়, ভাবনা। এ গান উঠলো বেজে আমার গোপনতম অন্তরে। তোমার আদেশ, তোমার পরশ পেলেই আজকে আমি সকল বাঁধন চুকিয়ে দেই।

যত জড়িয়ে ছিল বাধা—
আজ সকল হ'ল ক্ষয়,
আমার সকল হাসাকাঁদা—
আমার লোকদেখান ভয়।

মুক্ত আমি—বাঁধনহারা—বিশ্বভুবনে গতি আমার—বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে আমার আজ যে প্রাণের পরিচয়!

শ্রীকামাখ্যাচরণ মজুমদার।

অসন্তুষ্ট।

অন্তরের গুহাশায়ী, কে তুই রে বল্?
অনুখন শুনি তোর ক্রন্দন উতল!
ধূলিলিপ্ত আছিস পড়িয়ে একধারে,
ব্যাকুল বিব্রত তবু করিস চীৎকারে।
আনিয়া দিলাম তোরে রাজভোগ্য যাহা,—
বসোরার বাগিচার গোলাপ, সে আহা!
ইন্দ্রের নন্দন লুট আনিয়া মন্দার,
ধরিনু অধরে তোর মকরন্দ ধার!
তোর তরে লাজ লজ্জা সব বিসর্জ্জন,
অপমান অপবাদ অঙ্গের ভূষণ!
দুরন্ত শিশুর মত মাথা নেড়ে তবু
কহিলি সে—নহে নহে—এনয় গো কভু!
রে অভাগা! বিশ্ব যবে ছাড়িয়াছে তোরে,
কেন আর মিছামিছি জ্বালাস রে মোরে?

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

সন্ন্যাসিনীর চিঠি।

(শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সংগৃহীত)

—:o:—

নিভৃত-আশ্রম।
৮।৪।২৮

স্নেহাস্পদাসু,

কল্যাণীয়াসু বলে নেই-বা সম্বোধন কর্‌লুম্, তাতে কি-ই-বা আসে যায়? তোমাদের মত সংসারী মানুষরা কল্যাণ বল্‌তে যা বোঝে, আমার জীবনটা আজ যখন তার সংস্পর্শ-বর্জ্জিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ও-কথাটা বাদ দিয়ে শুধু আমার স্নেহ,—যেটা সত্যিকার আমার হৃদয়ের, অকপট নিজস্ব-সম্পত্তি, সেটাই জানাচ্ছি। তোমরা, শঙ্করের নজীর উদ্ধার করে, হয় ত তর্ক তুল্‌বে, সন্ন্যাসিনীর পক্ষে স্নেহের অধিকারও নাই, যেহেতু স্নেহটাও পাপ—তা হলে আমার উত্তর,—যে সন্ন্যাস, ভগবানের জীবদের প্রতি স্নেহশূন্য-নির্ম্মমতা আনে, সে সন্ন্যাসের মধ্যে এখনও আমার হৃদয়, মন, বুদ্ধি, অভিব্যক্ত হয়ে উঠে নি, মাপ কোরো।

কাল তোমার চিঠিখানা পেয়ে বড় আনন্দ হোল, বিস্ময়ও বড়-কম হোল না! আমার মত একটা দীন দুর্ভাগা জীবকে তুমি এখনও চিঠি লিখে স্মরণ করবার সাহস রাখো, দেখে, সত্যিই একটু যেন 'কেমন-কেমন' লাগ্‌ল! ভয় হচ্ছে, এর জন্যে তোমার অদৃষ্টে কোন দুর্গতির কথা লেখা নাই ত? কি জানি, লোকসমাজের মধ্যে তোমরা বাস কর্‌ছ, লৌকিকতার আইন-কানুন তোমাদের 'আষ্টে-পিষ্টে' কড়াকড় বাঁধন লাগিয়ে ঘাড় চেপে বসে আছে, নিয়ম লঙ্ঘন করে, ঘাড় তোলবার চেষ্টাটা যে তোমাদের পক্ষে কতখানি নিরাপদ,—সেটা নিজের জীবনে বেশ শক্ত রকমেই 'ঠেকে শিখেছি' কি না! তাই তোমাদের মধ্যে কাউকে, যখনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে মাথা-ঝাড়া দেবার চেষ্টা কর্‌তে দেখি, তখনি আশঙ্কা জেগে উঠে,—"এই রে! ভাঙ্‌লে বুঝি এর ঘাড়!—"

মনে হচ্ছে বলি,—'ওগো মা লক্ষ্মি, একটু সাবধান হয়ে চলো'—কিন্তু সেটা বলা মিথ্যে! এ পৃথিবীতে তোমরা কতখানি সহায়-সম্পদের অধিকার ভোগ-দখল করে বাস কর্‌ছ, সেটা

জান্‌তে আমার বাকী নাই। বলি,—হাঁ করে আমার চিঠিখানা পড়্‌তে পড়্‌তে তন্ময় হয়ে যাও নি ত? বেড়ালে রান্নাঘরে ঢুকে মাছ খাচ্ছে কি না, সে দিকে চোখ রেখেছ? বলি ছাগলটা কি বাঁধা আছে, না খোলাই চরে বেড়াচ্ছে? দ্যাখো, দ্যাখো, খোঁজ নাও, যেন, ধান খাবার জন্যে প্রতিবেশীর বাড়ীতে না ঢুকে পড়ে, আর তাদের চাকরটা যেন খোঁয়াড়ে দিয়ে এসে প্রতিহিংসা না তোলে! তাহলে, যাও যাও, কোমরে আঁচল জড়িয়ে এই বেলা ছুটে গিয়ে, সেই 'ছোট-লোকটাকে' তার তেজের সম্বন্ধে বেশ করে তত্ত্বকথা উপদেশ করে,—চারিদিকের লোককে সম্‌ঝে দিয়ে এসো, তুমি কেউ-কেটা নও,—একটা গৃহের গৃহিণী! আরে হাঁ, হাঁ!—সব দিক তো দেখ্‌ছ, ওদিকে ছাদের বড়িগুলো? সেগুলো কি রোদে শুকুচ্ছে, না বাঁদর বাবাজীদের পেটে গেল? ব্যস্ নাও! এবার লাগাও নিজের গৃহস্থ সকলের ওপর তর্জ্জন! পেটাও বাড়ীর ছানা ছেলে গুলোকে ধরে!—আর ওই বারো বছরের আইবুড়ো-অরক্ষণীয়া মেয়েটা ঠিক হাতের গোড়ায় আছে তো? ভাঙো, চ্যালা-কাঠের বাড়ি ওর মাথা! তোমাদের সংসারে অত বড় মহৎ-আপদ আর কেউ নাই! ওটাকে যদি এই সময় নিকেশ করতে পারো, তবে মা বসুন্ধরা গ্লানিমুক্ত হয়ে বাঁচেন! অমন গলগ্রহ যে আর পৃথিবীতে কেউ নাই! সৃষ্টিকর্ত্তার বড় অন্যায়, যে এই বয়েসটায় কোথায় তোমাদের সুবিধার মুখ চেয়ে ও-পাপগুলোর জীবনী-শক্তি সমূলে ধ্বংস করে দেবেন,—না,—ঠিক এই বয়েসটাতেই সতেজে সেটাকে বাড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত!—ভীষণ শত্রুতা আর কাকে বলে? তোমাদের কোন দোষ-ঘাট নাই! তোমরা ত বেশ সোজা রাস্তায় চল্‌ছ, বারো বছরে 'মা'—চব্বিশ বছরে মাতামহী, ছত্রিশ বছরে প্র-মাতামহী,—তার ওপরও যদি একান্তই জবরদস্ত 'ভাইটালিটি'র জোরে টেঁকে থাকে, তবে আটচল্লিশে, বৃদ্ধা প্র-মাতামহী হবেই! এই তো সোজা নামতার হারে গাঁথা সহজ স্বচ্ছল জীবনযাত্রা! ওপরওলার হুকুমমত, ঠিক তালে তালে লেফ্‌ট্ রাইট্ সঙ্গতি রেখে তোমরা বেশ সুন্দর কুইক মার্চ্চ করে চলেছ, তবু অসঙ্গতি আসে কোথা থেকে, আর অস্বস্তি জাগেই বা কেন, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নে! কারণটা কি?

জানি, এই সব অনাবশ্যক চিন্তার, অবসর, তোমাদের অশ্রান্ত-কর্ম্ম-ব্যাকুল জীবনের অঙ্কে নাই! থাক্‌লে, সেটা, অনেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষে বিশেষ উৎপাত-জনক হয়ে উঠ্‌ত,

আর তোমাদের সেই কর্ম্মশ্রান্তির অবসরের সহজ-আরাম, —পাড়া-বেড়ানো, আর পরকুৎসার রটনার উৎসাহপথে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত! রাগ কোর না, তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন বসবাস করে এসেছি, তোমাদের প্রকৃতিটাকে নিঃশব্দে পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ যথেষ্টমাত্রায় পেয়েছি। তাই আজ এই নিভৃত আশ্রমের প্রান্তে, মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে, যখন তোমাদের কথা ভাবি, তখন মনে বিশেষ আহ্লাদ, আর আশা ভরসার ঢেউ যে উথলে ওঠে না,—সেটা সত্যের খাতিরে হলপ করেই বলছি! এতে আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আর অভিসম্পাৎ কর, দুটোই সমান আদরে গ্রহণ করতে রাজী আছি।

একজন মনীষী বলেছিলেন, "আমি ভাবতে পারি তাই বেঁচে আছি,"। তোমাদের দিক থেকে যখন ঐ কথাটার সার্থকতা ওজন করে দেখতে যাই,—তখন হতাশ হয়ে খুঁজে পাই, ঠিক ওর উল্টো উত্তর! যে হেতু, তোমরা যে বেঁচে আছ, সে কেবল তোমাদের কিচ্ছুটি ভাবতে হয় না,—সেই আরামের সন্তোষে!—চিন্তাশক্তির চর্চ্চা জিনিসটাকে তোমরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখো,—মানসিক শক্তি জিনিসটাকে, তোমরা একটা জঘন্য পাপ বলেই গণ্য করো,—এবং শুচিতা বাঁচাইবার ওজুহাতে দূর থেকে লাফ মেরে সেটাকে নির্ভাবনায় ডিঙিয়ে পার হও! মনে মনে ঠিক সিদ্ধান্ত করে নাও,—'বাঁচা গেল!'

বাঁচতে পারতে সত্যিই,—যদি এ দুনিয়াখানা ভগবানের রাজ্য না হয়ে, শয়তানের এক-চেটিয়া রাজত্ব হোত! তাই ওই 'নির্ভাবনায় চলার' দাম উশুল করতে যখন দুর্ঘটনা-চক্রে দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাবনা মহারাজ সামনে এসে বাঘা-গর্জ্জন হেঁকে বাবা-থাবা পেতে বসেন তখন তাঁর দাবী মেটাতে তোমাদের সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়তে বাকী থাকে না! তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বোধহয় একটুখানি বুঝে নিতে বাধ্য হন, যে ঐ নির্ভাবনায়—নিরাপদ—আরাম-যাত্রার পথে, 'অচেতন হয়ে' চলায় আর 'সচেতন হয়ে' চলায় তফাৎটা কতখানি!

বিরক্ত হোয়ো না। এসব অপ্রিয়-সত্য নিয়ে মনে মনে (কারণ মুখোমুখি আলোচনার সুযোগ আমার ছিল না) আলোচনা করতে আমারও এক দিন বড় বিরক্তি লাগত, তাই

ক্লেশ এড়াবার জন্যে, এসব দুর্ভোগকে সন্তর্পণে এড়িয়ে, ওই নিরাপদ আরাম-যাত্রার পথে, বেশ চমৎকার, নির্বিকারভাবে 'অচেতন হয়ে' যাত্রা সুরু করেছিলুম, এবং পাঁচ জনের আশীর্বাদে বেশ 'গোলে হরিবোল' দিয়েই দিনগুলি স্বচ্ছন্দভাবে কাটাচ্ছিলুম। ভেবেছিলুম, ওঁম্নি যারা ফাঁকির জোরে, যখন আর পাঁচ জনে 'তরে' যাচ্ছে, তখন আমিই বা তর্‌ব না কেন? নিশ্চয় তরে যাব।

নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখবার কারণ, যদিও কস্মিন্ কালে খুঁজে পাই নি,—কিন্তু গরজের ঠ্যালায় সেদিন দস্তুরমত পিঠ ঠুকে উৎসাহ দিয়ে লাগিয়ে দিলুম তাকে নিজের মনটাকে ঠকাবার জন্যে! বেশ বাধা-বিপত্তিহীন নিরাপদ প্রতারণা! বুদ্ধির লম্ফ, ঝম্ফ, দম্ভ, দাপট, অত্যাচার, উৎপীড়নের চোটে মন বেচারা যখন ত্রাহিমধুসূদন জপতে জপতে—মুমূর্ষুবৎ,—তখন পড়ল, বুদ্ধির পিঠে নির্ঘাৎ সত্যের চাবুক! বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল! সে এমন ভয়াবহ বিশ্বব্যাপী গুঞ্জন, যে—বল্‌তে ক্ষোভে বুক ফেটে যাচ্ছে,—ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর শ্রদ্ধা রাখা উচিত কি না, সে সন্দেহটা আস্‌তেও ত্রুটি হ'ল না! বুঝ্‌তে পারছ? কি দুর্যোগময় মুহূর্ত সে, মানুষের জীবনের পক্ষে!

—কিন্তু জুয়াচুরি ঠাট্টা-বাজী আর যার সঙ্গে চলে চলুক, জাগ্রত সত্যের সঙ্গে চলে না। প্রতারণার দেনা শোধ করে, সর্বস্বান্ত হয়ে রিক্ত হস্তে যখন ফিরলুম—তখন হিসাব খতিয়ে দেখলুম পার্থিব-ক্ষতির দিক থেকে আমি একবারে রিক্ত নিঃসম্বল হলুম বটে,—কিন্তু সেই ক্ষতির সঙ্গে আমি এমন একটা কিছু লাভ করলুম, যা—বাস্তবিকই অপার্থিব! আজ লোকালয়ের বাইরে, এই শান্ত নির্জ্জনতার মাঝে, নিভৃত আশ্রমে বসে, প্রাণভরা তৃপ্তির সঙ্গে জয়জয়াকার ঘোষণা কর্‌ছি,—হে আমার উৎপীড়কচয়, তোমাদের অত্যাচারের প্রসাদে আজ আমি যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তোমাদের জয় হোক্!

হাঁ,—কেমন আছি জান্‌তে চেয়েছ? উত্তর,—বেশ ভালই! পৃথিবীর যা কিছু ভাল, তাকে আমি চিরদিন ভালবেসেই এসেছি, জীবনের পক্ষে যা-কিছু মহৎ, এবং যা-কিছু ভদ্র-সুন্দর, তাকে আমি চিরদিন পূজা করেই চলেছি। এই পূজাটাই আমার পক্ষে শান্তিময়,

এবং এতেই আমি থাকি ভাল। সুতরাং বাধাহীনতার মধ্যে, যতক্ষণ আমার পূজাটা নির্ব্বিবাদে চলবে, ততক্ষণ আমি নিঃসন্দেহে ভালই থাকব। এর ব্যতিক্রম-টাই আমার জীবনের পক্ষে অনাচার, তাতেই আমায় অসুস্থ করে তোলে।

বিদায়, ভাল থাকবার চেষ্টা করো; ভালবেসো তাকেই,—যা জীবনের পক্ষে বৃহৎ, এবং যা বিশুদ্ধ-আনন্দের সৌন্দর্য্যময়। ভালবেসো, চরিত্র-নিষ্টাকে, ভালবেসো আত্মোন্নতি সাধনের তীব্রতম ইচ্ছাশক্তিকে,—আর ভালবেসো প্রত্যেক মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-উদ্বোধন চেষ্টার সৎসাহসকে! আর যতটুকু সাধ্য, মানুষের সৎচিন্তা এবং সৎকার্যের সাহায্যে, নিজেকে লাগিয়ে দিয়ে,—নিজের জন্যে আত্মিক-বল সংগ্রহ কোরো। বাচালতা, ভণ্ডামি, আর কপটতাকে প্রতি মুহূর্ত্তে, ঠুকে ঝেড়ে ফেলে চলো।

নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ, যা তোমার পছন্দ হয়, বেছে নাও। দুটোই সমান শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট করে তোমাদের উদ্দেশে পাঠাচ্ছি। ইতি—

তোমাদের সেই—
পরিচিতা।

মাতৃত্ব।

(১)

সে যে গো আজিকে জননী,
অমল কুন্দ নন্দনবনে ফুটেছে বুঝিবা আপনি।
বদ্ধ কোরক নব আনন্দে,
দিল উপহার মধু ও গন্ধে,
সৌরভে তার গৌরবমাখা স্বর্গ এবং ধরণী।
সে যে গো আজিকে জননী।

(২)

সে যে গো আজিকে জননী,
ভাষাহীন তার পুতুলের প্রাণে এসেছে নবীন জীবনী ;
　　মিথ্যার খেলা আজিকে সত্য,
　　কল্পনা তার পূর্ণ তথ্য,
সফল ঊষার আলোকে ডুবেছে শৈশব-সুখ-যামিনী।
　　　　সে যে গো আজিকে জননী।

(৩)

সে যে গো পূর্ণ কলসী,
বিশ্বনাথের চরণ পূজার চন্দনমাখা তুলসী।
　　রূপ-গুণ আজি হইল ধন্য,
　　সফল তাহার সকল পূণ্য
পূর্ণতা আজ নবীন আভায় বিফলতা দিল ঝলসি'।
　　　　সে যে গো পূর্ণ কলসী।

(৪)

বালিকা নহে সে রমণী,
ধরার কুঞ্জে চম্পক ফুল সৌম্য কনক-বরণী।
　　প্রথম যে দিন 'মা' বলিয়া সুত
　　শিরায় শিরায় বহাল অমৃত,
নূতন করিয়া বুঝিল সেদিন আপনারে অনুরাগিণী
　　　　সে যে গো আজিকে জননী।

———　　শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

মানুষ কে?

—:০:—

গত পূজার সময়, কোন কাজকর্ম্ম ছিল না বলিয়া, বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। নানা স্থান ঘুরিয়া শেষে একদিন—বোধহয় সেটা কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিনই হইবে,—বর্দ্ধমান হইতে প্রাতঃকাল ছয়টার সময় বর্দ্ধমান-অণ্ডাল শাটল্ ট্রেণে চড়িয়া সিউড়ী চলিলাম। অনেকে ভ্রমণকাহিনী লিখিতে গেলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এ কথাটা প্রকারান্তরে বলিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীতেই আমি যাই। তবে যে ট্রেণে হিন্দুস্থানী-দের ভিড় থাকে, তাহাতে যাইতে হইলে আমাকে অগত্যা মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর টিকিট কিনিতে হয় কারণ ঐ জাতটাকে আমি ট্রেণে যাইবার সময় বড়ই ডরাই। কথাটা যে বলিলাম ইহা রীতিমত অভিজ্ঞতা-প্রসূত। একবার চুঁচুড়া হইতে বর্দ্ধমান যাইব; সে সময়ে বর্দ্ধমানের স্কুলে কাজ করিতাম; প্রাতঃকালে স্কুল বসিবে। রাত্রির শেষে ট্রেণে যাইব, তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াছি। চড়িতে গিয়া দেখি, দরোজা বন্ধ করিয়া একজন হিন্দুস্থানী বসিয়া আছে। গাড়ীর মধ্যে সব হিন্দুস্থানী, আমাকে কিছুতেই চড়িতে দিবে না। গাড়ী অল্পক্ষণ দাঁড়ায়, এমন সময় নাই যে টিকিট বদলাইয়া মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীতে চড়ি। অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া জানালার মধ্য দিয়া কোন রকমে গাড়ীতে চড়িলাম। সেই দিন হইতে কাণ মলিয়াছি যে, হিন্দুস্থানীর ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আর কখনও তৃতীয় শ্রেণীতে যাইব না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমি তৃতীয় শ্রেণীরই যাত্রী।

যখন বর্দ্ধমান হইতে ট্রেণ ছাড়িল, তখন মোটেই ভিড় নাই। আমার সঙ্গে একটি বাঁশের হাতবাক্স ও একটি ছোট পুঁটুলি ছিল। গুস্করায় লোকের কিছু ভিড় দেখিয়া আমি আমার জিনিষগুলি নামাইয়া অপরের জন্য স্থান করিয়া দিলাম। আমার সাম্নে তিনজন লোক বসিল। দেখিলাম প্রত্যেকেই এক একটি পুঁটুলি বেঞ্চের উপরেই রাখিল। বোলপুরে বেজায় ভিড়, স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। অনুসন্ধানে জানিলাম, তাহারা গঙ্গাস্নানের যাত্রী। আহ্‌মদপুরে নামিয়া আহ্‌মদপুর-কাটোয়া রেলে চড়িয়া কাটোয়া যাইবে। আমি তাহাদের

জন্য স্থান করিতে গিয়া সামনের লোক তিনটিকে পুঁটুলি নামাইয়া বেঞ্চের নীচে রাখিতে অনুরোধ করিলাম। দুইজন নামাইল কিন্তু একজন কিছুতেই রাজি হইল না। একজন ভদ্রবেশধারী যুবক আহমদপুর হইতেই পাশের কুঠরীতেই চড়িবেন এবং নিজের সঙ্গীদের চড়াইবেন বলিয়া দুয়ার আটকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে বহু অনুরোধ করিলেও তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা এক বৃদ্ধা তাহার চালের বস্তাটি জানালা গলাইয়া রাখিতে গেল। আমি পেছন ফিরিয়া ধরিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। আমি যে কুঠরীতে ছিলাম সে কুঠরীতে যখন বসিবার স্থান ভরিয়া গেল, তখন যাহারা স্থান পাইতেছিল না, তাহাদের ডাকিয়া দাঁড়াইতে বলিলাম। আমার সামনের যে লোকটি পুঁটুলি বেঞ্চের উপর হইতে নামায় নাই, তাহাকে আবার অনুরোধ করিলাম "তুমি তোমার পুঁটুলিটি নামাইলেই দুইজন বসিতে পারিবে।" সে রাগিয়া উঠিয়া বলিল "কেন আমার গরজ ?" যাহারা স্থান পাইতেছিল না তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান দিয়া গাড়ীতে ভিড় করিয়াছি বলিয়া আমাকে অধিকন্তু অনুযোগ করিল। তখন ভাবিতেছিলাম, "আমাদের দেশে এই শ্রেণীর লোকই তো বেশী। ইহারা নিজের অধিকারই বুঝে। সমাজে থাকিতে হইলে যে, অনেক সময় বিনা মূল্যে বিনা প্রার্থনায় নিজের অধিকার একটু একটু সঙ্কুচিত করিতে হয় ইহা শুধু অশিক্ষিত বলিয়া নহে, আমাদের দেশের তথা-কথিত শিক্ষিত লোকেও বুঝে না। তাই আমাদের দেশে এত অশান্তি। অনেক সংবাদপত্র আবার এই প্রবৃত্তির অনলে আহুতি দিয়া বলেন, 'আমাদের দেশের লোককে তাহাদের অধিকার বুঝিয়া লইতে শিখাইতেছি।' উকীলেরাও ঠিক এমনই করিয়া অধিকার বুঝিয়া লওয়াইতে গিয়াই মামলামোকদ্দমার সংখ্যা বাড়ান।" যাহা হউক লোকটির ব্যাপার ভাবিয়া আমি মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম যে, আমি ইহার মত ক্ষুদ্রচেতা নই অর্থাৎ কিনা আমি একটু মানুষের মত।

জীবনে একটা ব্যাপার খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান শুধু রাবণ ও দুর্য্যোধনের মত বড় বড় লোকের দর্পচূর্ণ করেন না, আমাদের মত ক্ষুদ্র নগণ্য লোকের মনের গুপ্তকক্ষে দর্পের কণামাত্র থাকিলে তিনি চূর্ণ করিয়া দেন।

ট্রেণ আহমদপুর আসিলে ভিড় খুব কমিয়া গেল কিন্তু সাঁইতে ষ্টেশনে আবার যেমনকার ভিড় তেমনই হইয়া উঠিল। আমি দরোজার কাছে বসিয়াছিলাম আর গলা বাড়াইয়া দেখিতেছিলাম সকলের চড়া হইল কি না। সিউড়ীতে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। যাহারা তখনও স্থান পায় নাই তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল কোন গাড়ীতে স্থান আছে। আমাদের কুঠরীর দরোজা বন্ধ ছিল। যে চড়িতেছিল সেই চড়িয়া বন্ধ করিতেছিল। আমি কাহাকেও এ পর্য্যন্ত ডাকি নাই। এমন সময় দেখিলাম একজন ভদ্রবেশধারী যুবক ও তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধ মুসলমান (অর্থাৎ আমার চাইতেও বৃদ্ধ) আমাদের কুঠরীর দরজার সামনে দাঁড়াইল। আমার ইচ্ছা হইল, ভদ্রবেশধারী যুবককে ডাকি। কিন্তু পাছে ঐ বৃদ্ধ মুসলমানটি চড়ে, তাই যুবককেও ডাকিলাম না। মুসলমানটির প্রতি যে ধর্ম্মের জন্য মনে মনে একটু অবজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা নহে। গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই। তাই মনে হইল সে যদি চড়িতে আসে আমি আপত্তি করিব না, তবে আমার ঠিক কাছটায় না বসিলেই হইল। মনে এই ভাব উদয় হইবামাত্র আমার লজ্জা হইল। "ছি ছি ওকি মানুষ নহে? মানুষের উপর এ অবজ্ঞা আমার কেন?"

ভদ্রবেশধারী যুবক কোথাও স্থান না পাইয়া ফিরিয়া আসিলে আমি এবার তাহাকে ডাকিয়া আমাদের কুঠরীর মধ্যে স্থান দিলাম। এবং মুসলমানটী আসিলে তাহাকেও ডাকিয়া আমার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। সে আমার ডাক শুনিয়া বলিল,—"আমার সঙ্গের লোকটীকে খুঁজিয়া পাইতেছি না, সমস্ত প্লাটফর্ম্মে নাই।" আমি বলিলাম,—"সে বোধ হয় কোন গাড়ীতে চড়িয়াছে।" মুসলমানটী শেষে আমাদের গাড়ীতেই আসিয়া চড়িল।

ট্রেণ সাঁইতে ছাড়িয়া সিউড়ি অভিমুখে চলিয়াছে। হঠাৎ একজায়গায় লাল নিশান দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বোধ হয় ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, নানা জনে নানা গল্প আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময়ে সেই মুসলমানটী বলিয়া উঠিল,—আমি একবার লাল নিশান দেখাইয়া এঞ্জিন থামাইয়াছিলাম বলিয়া পুলিস আর রেলের কর্ত্তারা মিলিয়া আমায় জেলে পুরিবার চেষ্টা করিয়াছিল।" আমরা সকলেই গল্পটা শুনিতে চাহিলাম।

"মুরারই আর চাতরা ষ্টেশনের মধ্যে পাগলা (কি বাঁশলোই ঠিক মনে নাই) নদীর উপর যে সাঁকো আছে, তাহার উপর দিয়া একদিন আমি নদী পার হইয়া আসিয়াছি, আর ৪টী স্ত্রীলোক পার হইয়া যাইতেছে। এমন সময়ে দেখিলাম একখানি খালি এঞ্জিন দ্রুতবেগে সাঁকোর দিকে যাইতেছে। স্ত্রীলোক কয়টী তাহা দেখিতে পায় নাই কারণ তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে এঞ্জিনখানি যাইতেছিল। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া সাঁকোর উপর দিয়া পার হইবে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সাঁকোর উপরে রেললাইনের পাশে এমন স্থান নাই যে, একখানি এঞ্জিন গেলে মানুষ আপনাকে বাঁচাইয়া পাশে দাঁড়াইতে পারে। আমার কাছে একটুকরা লাল কাপড় ছিল। আমি ভাবিলাম, এই লাল কাপড় দেখাইয়া এঞ্জিনখানিকে দাঁড় করাইতে পারি, তাহা হইলে স্ত্রীলোক কয়টীও বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু আমাকে হয় তো সে জন্য জেলে যাইতে হইবে। তা হয় হউক, ৪টী স্ত্রীলোকের প্রাণ বাঁচাইয়া যদি জেলে যাইতে হয় তাহাও ভাল। এই ভাবিয়া আমি লাল কাপড়টুকরা ধরিয়া রেললাইনের উপরে গিয়া দাঁড়াইলাম। এক একবার মনে হইতে লাগিল যদি এঞ্জিন না থামে, তাহা হইলে আমারও প্রাণ যাইবে, স্ত্রীলোক কয়টাকেও বাঁচাইতে পারিব না। কিন্তু যদি থামে, তাহা হইলে তো উহারা বাঁচিয়া যাইবে।

"দেখিতে দেখিতে এঞ্জিনের বেগ থামিয়া আসিল। আমি মাঝে মাঝে পেছন ফিরিয়া দেখিতেছি স্ত্রীলোক কয়টী পার হইল কি না। এমন সময়ে আমার ১০। ২ হাত তফাতে এঞ্জিন থামাইয়া লাল মুখ ড্রাইভার সাহেব রাগে মুখ আরও লাল করিয়া আমাকে বলিয়া উঠিল;—'তোম কেঁও রোকা ?' আমি বলিলাম, 'কেন, সাহেব দেখিতেছ না ? আমি তোমার এঞ্জিন না থামাইলে তুমি হয় তো এতক্ষণ ঐ স্ত্রীলোক কয়টীকে গরুবাছুরের মত মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে।' বলিতে বলিতে আমি মুখ ফিরাইয়া স্ত্রীলোক কয়টীকে দেখাইলাম। তাহারা তখন সাঁকোর প্রায় অপর প্রান্তে পৌঁছিয়াছে। সাহেব বলিলেন,— 'নেকি তোম্ ট্রেণ মার্‌নেকে ওয়াস্তে ঠিক্ কিয়া থা—খালি এঞ্জিন দেখ্‌কে তোমারা সাথী সব নেহি আয়া। আচ্ছা দেখেঙ্গে, তোমারা নাম ক্যা ?' আমি তখন সাহেবকে আমার নাম-ধাম বলিলাম। সাহেব লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আমিও বাড়ী গেলাম। স্ত্রীলোক

কয়টীকে বাঁচাইতে পারিয়াছি ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এখন জেলে যাইতে আমার ভয় নাই।"

"তিন দিন পরে নলহাটি থানার দারোগা আমার বাড়ীতে আসিয়া হাজির। ড্রাইভার সাহেব রিপোর্ট করিয়াছে, আমি নাকি ডাকাতি করিবার মতলবে এঞ্জিন থামাইয়াছিলাম। তবে আমি যদি দারোগাকে ১০০৲ শত টাকা ঘুষ দিই, তাহা হইলে আমি জামিনে খালাস পাইব নতুবা আমাকে হাজতে যাইতে হইবে। আমি বলিলাম,—'দারোগা বাবু, আমার টাকাকড়ি নাই। ঘুষ দিতে পারিব না। মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে কাজ করিয়াছি তাহাতে জেলে যাইতেও আমার আপত্তি নাই।' দারোগা বাবু বিশ্বাস করিলেন না যে, আমি নিঃস্ব, সুতরাং তিনি কোন অনুসন্ধান না করিয়াই আমাকে রামপুর হাটে চালান দিলেন।

"রামপুর হাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। তাঁহার এজলাসে আমি হাজির হইলাম। তিনি আমার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া একজন ডেপুটীর উপর তদন্ত করিবার ভার দিলেন। আমার কেহ জামিন হইবে না কারণ আমি নিঃস্ব, এই কথা শুনিয়া সাহেব আমাকে বিনা জামিনে ছাড়িয়া দিলেন। পরদিন ডেপুটীবাবু আমাদের গ্রামে গিয়া উপস্থিত। অনুসন্ধান আর কি করিবেন? আমি সাঁকোর নিকট ঘটনাস্থান দেখাইয়া পরপারে যে গ্রামটিতে স্ত্রীলোক কয়টি থাকিত, সেই গ্রামে গেলাম। তাহারা জাতিতে হিন্দু, আমি ঠিক তাহাদের বাড়ী জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সন্ধান পাইলাম। তাহারা আমার কথাই সমর্থন করিল। যেন মোকদ্দমার দিন হাজির হই। এই বলিয়া ডেপুটি বাবু চলিয়া গেলেন।

"ঠিক দিনে আমি হাজির হইলাম। ড্রাইভার সাহেব নাছোড়-বান্দার মত ধরিয়া বসিয়াছে আমি ডাকাতি করিবার জন্যই এঞ্জিন থামাইয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দিতেই যাইতেছিলেন কিন্তু রেলকর্ত্তৃপক্ষের জেদ্ যে, এ মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হওয়াই উচিত। ম্যাজিষ্ট্রেট কিছুক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, আচ্ছা আমি জজ সাহেবের মত জানিতেছি।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, সিউড়ীর জেলা-জজ সাহেবকে কি লিখিয়া

পাঠাইলেন। মোকদ্দমার আবার দিন পড়িল। লোকে এমন ফ্যাসাদে পড়িলে কতই ভাবে। আমার কিন্তু ভাবনাচিন্তা নাই। আমার টাকাকড়িও নাই যে উকীল মোক্তার দিব। আমার খরচের মধ্যে চাতরা হইতে রামপুর হাটের রেল ভাড়া।

"আবার নির্দ্দিষ্ট দিনে রামপুর হাটের এজলাসে হাজির হইলাম। আমি হাজির হইবামাত্র সাহেব আমার খালাস দিয়া বলিলেন, জজ সাহেব লিখিয়াছেন, "এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের দণ্ড হওয়া দূরে থাক, পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমি পুরস্কার দিবার জন্য উপরে লিখিলাম।" আমি সাহেবকে সেলাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

"যে কাজের জন্য পুলিশ ও রেলকর্ত্তৃপক্ষ আমায় জেলে দিতে গিয়াছিলেন, জেলা জজের কৃপায় সেই কাজের জন্য মাসখানেক পরে আমি এক শো টাকা পুরস্কার পাইলাম।"

গল্প শেষ হইলে আমি মুসলমানটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, লাল কাপড়ে এঞ্জিন থামিবে?" মুসলমানি ভদ্রলোকটি যখন বলিলেন যে, মানুষের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া যদি জেলে যাইতে হয়, তাহাতে আমি ভয় করি না,—তখন হইতে আমি তাঁহাকে মনে মনে আমাদের চাইতে তাঁহাকে অনেক উচ্চাসন দিয়া ছিলাম। কাজেই গল্পের শেষে তাঁহাকে আর "তুমি" বলিতে পারি নাই। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি পরিচয় দিলেন যে, আমি রেলে চাকরি করিতাম। অবশ্য চাকর অর্থে এখানে উচ্চ-শ্রেণীর চাকর নহে। আমি লোকটির নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া পকেটবুকে লিখিয়া রাখিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম "হায় হায়, ঐ বৃদ্ধের কাছে আমি কি মানুষ?"

সিউড়ীতে আমরা উভয়েই নামিলাম। বর্দ্ধমান হইতে আমার পরিচিত একজন উকীলবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়িয়া সিউড়ী আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক গাড়ীতে যাইব বলিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে সেই মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আপনার সঙ্গীকে পাইলেন?" উকীলবাবুটি অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিলেন। চাহনির অর্থ এই যে, ওরূপ একজন নিম্নশ্রেণীর মুসলমানকে আমি আপনি বলিয়া ডাকি ইহার কারণ কি? আমি ভাব বুঝিয়া বলিলাম, "উঁকে আপনি

বলিলাম কেন, জানেন? উনি একটি খাঁটি মানুষ—আর আমাদের গায়ে জামা জোড়া আর নামের সঙ্গে ডিগ্রী, অভাবে বিদ্যাবিনোদ কি এম, আর, এ, এস, থাকিলেও আমরা আস্ত মানুষ।”

শ্রীরাখালরাজ রায়।

স্বাস্থ্যের কথা।

—:০:—

বায়ু।

কি সুস্থ অবস্থায়, কি অসুস্থ অবস্থায়, শরীরের উপর আর্দ্র বায়ুর প্রভাব খুব বেশী। বায়ু যদি সম্পূর্ণরূপে ভিজা থাকে, তবে তাপের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, বায়ু আর বেশী জল শোষণ করিতে পারে না।

ভিজা বায়ুর কুফল।

ভিজা বায়ুর দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের কি কি অনিষ্ট হইতে পারে? বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্য ঘটিলেই তাহাকে আর্দ্র বায়ু বলা যায়। আমাদের দেহের বেশীর ভাগই জল। তবে আর্দ্র বায়ু কেমন করিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে? সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস, ভিজা বায়ু অনিষ্টকর। সর্ব্বসাধারণের এই ধারণা ভুল নয়। আর্দ্রতা সত্য সত্যই অনিষ্টকর বটে। কিন্তু জলের আর্দ্রতা অনিষ্টকর এই জন্য যে, তখন আর বায়ুর জল শোষণ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে শুকাইয়া ফেলিবার ক্ষমতা থাকে না।

আমাদের দেহের একটা প্রধান উপাদান—সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদান—জল। কিন্তু এই জল গতিশীল;—বদ্ধ নহে। আমরা জল পান করি। আমরা যে খাদ্য ভক্ষণ করি তাহাতেও যথেষ্ট মাত্রায় জল আছে। কিন্তু এই জল বদ্ধ জল নহে—ইহা গতিশীল। অর্থাৎ প্রস্রাবের আকারে, ঘর্ম্মের আকারে এই জল আমাদের শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে,

যদি মূত্রনালীর ক্রিয়া রহিত হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। যদি চর্ম্মের ভিতর দিয়া ঘর্ম্মের আকারে জল বাহির হইবার পথ না পায় তাহা হইলে আমাদের মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইবে। জীবন রক্ষা করিতে হইলে, জলের গতিশীলতা অব্যাহত রাখিতে হইলে, জল বাহির হইবার দ্বারগুলি খোলা রাখিতে হইবে। চর্ম্ম ও মূত্রনালীর পথে জল বাহির হইয়া গিয়া আমাদের শরীর পরিষ্কার রাখে। ঘর্ম্মের আকারে জল দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া শরীরকে শীতল রাখে। এই উপায়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জল আমাদের দেহের রাসায়নিক ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখে। আমদের শরীরের মধ্যে নিয়ত যে গঠন ও ক্ষয়কার্য্য চলিতেছে—যাহা জীবনীশক্তির প্রধান লক্ষণ—জলের গতি অব্যাহত না থাকিলে ঐ ক্রিয়াও চলিবে না—আমাদের জীবনশক্তিও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। এই ক্রিয়া না চলিলে শরীর তেজোহীন হইয়া পড়িবে, মানুষের শরীরে যতটা জল আছে তাহার শতকরা দশ অংশ নষ্ট হইয়া গেলে, এবং সেটা তৎক্ষণাৎ পূরণ করা না হইলে, আমদের মৃত্যু হইবে। চর্ম্ম হইতে জলীয় অংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয় আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে একটী অপরিহার্য্য ক্রিয়া।

যখন বায়ু স্বভাবতঃ আর্দ্র থাকে, তাহার যখন আর জল শোষণ করিবার শক্তি না থাকে, তখন বায়ু আর আমাদের চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে জল আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। তখন দেহের জল বদ্ধ হইয়া যায়—দেহ হইতে বাহির হইতে পারে না। কাজেই দৈহিক রাসায়নিক ক্রিয়াও স্থগিত হইয়া যায়। বায়ু আর্দ্র হইলেও যদি গরম থাকে, তাহা হইলে ঘর্ম্মাকারে বাষ্প দেহ হইতে বাহির হইতে না পারায়, আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে না; এবং ফলে দেহের মধ্যে দহন ক্রিয়ারও ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। দহন ক্রিয়ার ফলেই যখন দেহের তেজঃ বজায় থাকে, তখন দহন ক্রিয়ার অভাবে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অথবা সর্দ্দিগর্ম্মিও হইতে পারে। আর যদি আর্দ্র বায়ু শীতল থাকে, তবে তাপের ব্যাপকতা-ধর্ম্মবশতঃ শরীর হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে তাপ বাহির হইয়া যায়; এবং দহন ক্রিয়ার অল্পতা বশতঃ নষ্ট তাপের সম্যক পূরণও হইতে পারে না।

জলভরা তন্তু।

আরও একটী কথা আছে। এই বিষয়টী আমরা কাহাকেও বড় একটা লক্ষ্য করিতেও দেখি না। বিষয়টী এই—দেহমধ্যস্থ তন্তুগুলি হইতে যে জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া

উচিত ছিল, তাহাও উড়িয়া না গিয়া তন্তুতেই থাকিয়া যায়। এমন কি, চর্ম্মের নিম্নস্থ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির নিম্নস্থ তন্তুগুলিতে জল ক্রমাগত জমিতে থাকে। তখন শরীর ভার ভার বোধ হয়। ফলে তন্তুগুলি ফুলিয়া উঠায় স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। ইহারই দরুণ যন্ত্রণাদায়ক কড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে; বাতব্যাধিজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়। বায়ুবাহী শিরা সকল ফুলিয়া উঠিয়া ব্রঙ্কাইটিসও হইতে পারে। আর সাধারণভাবে স্নায়বিক পীড়া ত হইয়াই থাকে।

এইভাবেই আর্দ্র বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিয়া থাকে। যদি আর্দ্র বায়ু সচল হয়, এবং সম্পূর্ণরূপে ভিজা না হয়, তাহা হইলে বায়ুর গতির দরুণ তাহার জল শোষক ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না—কিছু বজায় থাকে। তখন আর্দ্র বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ততটা অনিষ্টকর হয় না। বর্ষাকালে আমাদের গা দিয়া যে বেশী ঘাম বাহির হয় না, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

এ কথা সত্য যে, দেহ হইতে জল নিষ্কাশন সম্বন্ধে গাত্রচর্ম্ম ও মূত্রনালী পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকে।

অসুস্থ শরীরে আর্দ্রতার ক্রিয়া।

চর্ম্মের পথে ঘর্ম্ম কম বাহির হইলেই, সেই অসুবিধা দুর করিবার জন্য প্রস্রাবের বেগ বেশী হয়; অর্থাৎ, যে জল চর্ম্মের লোমকূপের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তাহার কিয়দংশ মূত্রনালীর পথে বাহির হইয়া যায়।

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা? তন্তুগুলিতে যখন জলীয় অংশ কম থাকে, দেহের স্বাভাবিক তরল পদার্থগুলি যখন ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, শরীরের আবর্জ্জনা বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যখন জলের গতি অব্যাহত থাকে, চর্ম্মসংশ্লিষ্ট গ্রন্থিগুলি হইতে জল ঘর্ম্মাকারে বাহির হইয়া গিয়া যখন শরীর শীতল রাখে, এবং আমরা যখন বিশুদ্ধ অনার্দ্র বায়ু সেবন করিতে পারি—সেই অবস্থাই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। তখনই আমাদের দেহ সতেজ থাকে। যক্ষ্মা রোগী এবং অন্যান্য দুর্ব্বল লোকে এই জন্য শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে ভাল থাকে। *

আর্দ্রতা ও তাপের দ্রবতা।

গ্রীষ্মকালে আর্দ্র বায়ু যাহাতে শরীরের তাপ সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শরীর হইতে তাপ বাহির হইয়া যাইতে না পারিলে, তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া নূতন তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না। শরীরের স্বাভাবিক তাপের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। শরীর ক্রিয়ার ফলে প্রতিনিয়ত নূতন তাপ উৎপন্ন হইতেছে, এবং উক্ত মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য অতিরিক্ত তাপ দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া বায়ুসাগরে লীন হইতেছে। গ্রীষ্মকালে বায়ু আর্দ্র থাকিলে দেহ হইতে তাপ বাহির হইতে পারে না; অথচ নূতন তাপও উৎপন্ন হইতেছে। অতএব শরীরের মধ্যে স্বাভাবিক তাপের মাত্রাধিক্য ঘটিতেছে। আর, স্বাভাবিক মাত্রা ঠিক থাকিলে বুঝিতে হইবে, নূতন তাপ উৎপন্ন হইতেছে না। অথচ নূতন তাপ উৎপন্ন না হইলে শরীরের তেজও বজায় থাকে না। দেহ হইতে তাপ প্রধানতঃ দুই উপায়ে বাহির হইয়া যায়—কতক তাপ বিকীর্ণ হইয়া যায় ও কতক তাপ ঘর্ম্মের সহিত বাহির হইয়া যায়। আর্দ্র বায়ুতে দেহের তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে না। এবং ঘর্ম্মের সহিতও কম তাপ বাহির হয়। ইহার ফল শরীরের তেজোহ্রাস।

বায়ু যত উত্তপ্ত থাকিবে, ততই তাপ বিকীরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্মের সহিতও তাপ বহির্গত হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই স্বভাবতঃই ঘর্ম্মবাহী গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া গ্রীষ্মকালে প্রবল থাকে, এবং এই উপায়েই ঘর্ম্ম তাপ-বিকীরণ-কার্য্যে সহায়তা করে। কিন্তু বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকিলে ঘর্ম্ম যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইতে পারে না। বায়ুর তাপ বেশী হইলে দেহ হইতে তাপ বিকীরণও হইতে পারে না। এই হেতু জীবনী-শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য দেহের মধ্যে যে তাপ উৎপন্ন হয়; তাহা বাহির হইতে পারে না। ইহার ফল সর্দ্দিগর্ম্মি ও মৃত্যু।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে একই সময়ে বায়ুর আর্দ্রতা ও উষ্ণতা ঘটিলেই সর্দ্দিগর্ম্মি রোগ উৎপন্ন হয়। ৮৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, আর্দ্র বায়ুতে তদপেক্ষা অধিক তাপ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। ডাক্তার হালডেন সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বায়ুতে তাপের পরিমাণ ১৩১ ডিগ্রী ফারেনহীট বাড়াইলেও দেহের

স্বাভাবিক তাপ বর্দ্ধিত হয় নাই। কিন্তু বায়ুর আর্দ্র অবস্থায় ৮৯ ডিগ্রী ফারেনহীট তাপেই শরীরের তাপও বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আর্দ্র বায়ু বেশী গরম হইলে কেবল যে দেহের উপর ক্রিয়া করিয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা নহে—উহার দ্বারা মানসিক বিকারও ঘটিয়া থাকে। ফলে মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে,—তন্দ্রা, আলস্য ও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে।

তাপ বিকীরণের ব্যাঘাতে বিপদ।

খুব গরম দিনে শুষ্ক বায়ু ঘর্ম্মের সহিত দেহ হইতে প্রচুর তাপ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। সম্ভবতঃ, এরূপ অবস্থায় একজন স্থূলকায় ব্যক্তির দেহ হইতে ১৫০০ ক্যালরী পরিমাণ তাপ বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই তাপের পরিমাণ বড় সামান্য নয়—ইহার দ্বারা ১৫০০ লিটার জল ১ সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ঐ স্থূলকায় ব্যক্তির দেহ হইতে এই তাপ বাহির হইয়া গেলে তাহার কোন ক্ষতি হয় না—বরং উপকারই হয়। এমন কতক লোক আছে, যাহাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম শরীরে তাপ আটকাইয়া রাখা। ঠাণ্ডা দিনে যখন তাহারা সাহস করিয়া ঘরের বাহির হয়, তখন তাহারা শরীরের উপর একগাদা বস্ত্রের ভার চাপাইয়া থাকে। যখন তাহারা ঘরের ভিতরে থাকে, তখনও তাহারা নিজ দেহখানিকে যথাসাধ্য গরম রাখিতে চেষ্টা করে। বাহিরের ব্যবস্থার ফলে তাহাদের দেহের অভ্যন্তরে উত্তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না—এমন কি, তাহার শরীরের তাপ উৎপাদক যন্ত্রগুলি নূতন তাপ উৎপাদন করিতে সাহসই করে না। এই তাপ উৎপাদন ক্রিয়া হ্রাসের ফলে শরীরের মধ্যে রাসায়নিক ও যান্ত্রিক এবং পৈশিক ক্রিয়াগুলিও কমিয়া যায়। কাজেই তেজও কমিতে থাকে। আমাদের দেহ হইতে যখন যথেষ্ট তাপ বাহির হইয়া যায় তখনই আমরা বেশ সতেজ ও কর্ম্মক্ষম থাকি। কিন্তু বায়ু ভিজা থাকিলে দৈহিক তাপ যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হয় না। আমরা সচরাচর শীতকালের ঠাণ্ডা ভিজা বায়ুকেই বেশী ভয় করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত আর্দ্র বায়ুকেই অধিক পরিমাণে ভয় করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহাতেই আমাদের জীবনীশক্তিরূপ অগ্নিকে ভিজাইয়া নিবাইয়া দিয়া থাকে।

শীতল আর্দ্র বায়ুও বিপজ্জনক।

প্রকৃত শীতল আর্দ্র বায়ুও আমাদের দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। সকল প্রকার আর্দ্র বায়ুর যেমন স্বভাব—ইহাও তদ্রূপ শরীর হইতে জল বাহির হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায়। এইরূপে জীবনীশক্তির মূল যে তেজ তাহাও কমিয়া যায়। বাহিরের বায়ুর তাপের সহিত দৈহিক তাপের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ যদিও আর্দ্র শীতল বায়ু দেহ হইতে কিছু তাপ আকর্ষণ করিয়া লয়, কিন্তু দেহের যে স্বাভাবিক তাপ বিকীরণ ক্রিয়া আছে, সেই ক্রিয়া রীতিমত চলিতে পারে না। বায়ু খুব শীতল হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু সাধারণতঃ শীতল আর্দ্র বায়ুর প্রভাবে দেহ হইতে যথোচিত পরিমাণে তাপ বাহির হয় না। ইহার দরুণও জীবনী-শক্তির মূল স্বরূপ তেজোহ্রাস হয়। পক্ষান্তরে যদি আর্দ্র বায়ু অতিমাত্র শীতল ও প্রবহমান হয়, তাহা হইলে, তাপ বিকীরণ না হওয়াতে শরীরে যে পরিমাণ তাপ সঞ্চিত হয়, তদপেক্ষা বেশী তাপ এই বায়ু বাহির করিয়া লয়। ইহার ফলে, দেহের স্বাভাবিক তাপের মাত্রাও কমিয়া যায়।

বায়ুর আর্দ্রতার আরও একটা অসুবিধা আছে। জলের সমোচ্চতার ন্যায় তাপেরও একটা ধর্ম্ম এই যে, কোন স্থানে দুইটী পরস্পর নিকটবর্ত্তী বস্তুর তাপ অসমান হইলে, যে বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত তাহা শীতল বস্তুতে তাপ সংক্রামিত করিয়া উভয়ের তাপের সমতা সম্পাদন করে। তাপের এই ধর্ম্ম বশতঃ আর্দ্র বায়ু আমাদের তেজ বৃদ্ধি করিতে পারে না। আর্দ্রতা যে কেবল আমাদের দেহ হইতেই তাপ বাহির হইতে দেয় না তাহা নহে; ইহা বায়ু হইতেও তাপ বাহির হইতে দেয় না। সেই জন্য বায়ুর তাপের শীঘ্র অথচ বেশী পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। ইহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর; কারণ, বায়ুর তাপের পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ এই যে, যে সকল নগরের মাটীর নীচে জল সঞ্চিত হয়, সেখানকার হাওয়া সর্ব্বদা ভিজা থাকে বলিয়া নগরগুলি সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর। মাটীর নীচের জল বাহির হইবার ব্যবস্থা করাতে এরূপ অনেক নগরের স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে।

কেবল শৈত্য অহিতকর নয়।

আর্দ্রতার লক্ষণসমূহের মধ্যে শৈত্য সর্ব্বাপেক্ষা কম অনিষ্টকর। আর্দ্রতা হইতে সর্দ্দি করে না, শীতও করে না। কেবল আর্দ্রতার দরুণ কখনও কাহারও সর্দ্দি কিম্বা নিউমোনিয়া

অথবা অপর কোন রোগ উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু, পূর্ব্বেই আমরা যেরূপ দেখাইয়াছি,—আর্দ্রতা নানা প্রকারে আমাদের দৈহিক তেজ কমাইয়া ফেলিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র-সংলগ্ন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহকে জলে ভর্ত্তি করিয়া, শরীরকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলে যে, রোগ-সকল সহজেই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। সর্দ্দি এবং নিউমোনিয়া রোগের পূর্ব্বে আর্দ্রতার ক্রিয়া ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপেও যেমন, ৩০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপেও তদ্রূপ। সামুদ্রিক ও পার্ব্বত্য কুয়াসায় ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যতক্ষণ না ঐ দুই রোগের বীজাণু আমাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়, ততক্ষণ কেবল আর্দ্রতা আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আর্দ্র বায়ুতে আমাদের ফুসফুসের কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের ফুসফুসের মধ্যে বায়ু স্বভাবতঃই ভিজা থাকে। শুষ্ক বায়ুতে যত রোগের বীজাণু থাকিতে পারে, আর্দ্র বায়ুতে সম্ভবতঃ তদপেক্ষা কম বীজাণু থাকে। ফুসফুসের সম্পর্কে আর্দ্র বায়ুর এইটুকু মাত্র অসুবিধা দেখা যায় যে, উহা ফুসফুসের জলীয় অংশ শোষণ করিয়া লইতে পারে না। আর, আর্দ্র বায়ুর দরুণ ফুসফুসের মধ্যে বীজাণু বৃদ্ধি লাভের পক্ষে কিছু সাহায্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে শীতকালের আর্দ্র বায়ুর শৈত্য গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত আর্দ্র বায়ুর উত্তাপ অপেক্ষা অনেক অংশে ভাল; অর্থাৎ, কম অনিষ্টকর। প্রয়োজন হইলে আমরা ব্যায়াম করিয়া কিম্বা ভালরূপে কাপড়চোপড় মুড়িয়া দিয়া দেহকে গরম করিয়া লইতে পারি। কিন্তু যখন আমাদের দেহ গরম অথচ আর্দ্র বায়ুর দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তখন আমরা ইচ্ছা করিলেই সেই গরম কাটাইয়া শরীরকে ঠাণ্ডা করিতে পারি না। অথচ ভিজা হাওয়ার মধ্যে থাকিয়া আমাদের দেহনিঃসৃত বা দেহের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প বাহির করিয়া দিতে পারি না।

গৃহ মধ্যস্থ আর্দ্র বায়ু।

আর্দ্র বায়ুর যথার্থ অনিষ্টকারিতা যে কি, সে সম্বন্ধে জনসাধারণ এতই অনভিজ্ঞ যে, তাহারা অবলীলাক্রমে ঐ সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হয় না। বর্ষার দিনে আর্দ্র বায়ুতে তাহারা ঘরের বাহিরে যাইতে ভয় পায়; কারণ, তাহাদের ধারণা এই যে,

আর্দ্র বায়ু ফুসফুসের পক্ষে অহিতকর ; এবং ঠাণ্ডা জলো হওয়া গায়ে লাগাইলে তাহাদের সর্দ্দি হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গরম আর্দ্র বায়ু আমাদের শরীরের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর ; অথচ ঘরের ভিতর এই অনিষ্টকর গরম আর্দ্র বায়ুতে থাকিতে তাহারা একটু ভয় পায় না। কোন একটী ঘরের বা কোন রেলগাড়ীর কামরার সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে—তাহাদের ঘর্ম্ম ও ভিজা প্রশ্বাস বায়ুর সংস্রবে উক্ত ঘর বা রেলগাড়ীর কামরার বদ্ধ বায়ু গরম হইয়া ভিজিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিলেও তাহারা একটুও ভয় পাইবে না। সময়ে সময়ে এইভাবে ঘরের বায়ু এমন ভিজিয়া উঠে যে, সেই ভিজা বায়ু জানালার কপাটে বা কাচের সার্সির গায়ে লাগিয়া তাহাদেরও আর্দ্র করিয়া তুলে ; ক্রমে সেই জল গড়াইয়া পড়িতেও দেখা যায়। যদি তাহারা কোন কিছুকে ভয় করে ত সে প্রবহমান বায়ু আর কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড ! বায়ুর আর্দ্রতাকে যে ভয় করিতে হইবে, এ ধারণা কখনও তাহাদের মনে উদয় হয় না। তাহারা নির্ভয়ে বসিয়া থাকিয়া ঐ বিষাক্ত ভিজা বায়ু সেবন করে, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের তন্তুগুলিও বিষাক্ত ও সজল হইয়া উঠে ; এবং ক্রমে তাহাদের জীবনী-শক্তির মূল তেজ এমন করিয়া আসে যে, তাহাদের প্রাণহানির আশঙ্কা জন্মে। তার পর যখন কোন অন্ধকার কোণ হইতে কতকগুলি বীজাণু বাহির হইয়া তাহাদের আক্রমণ করে, এবং তাহাদের সর্দ্দি হইয়া মাথা ভারী হয়, কি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় অথবা নিউমোনিয়া হয়, তখন তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে, এত গরমের মধ্যে থাকিয়াও কেমন করিয়া ঠাণ্ডা লাগিল ! লাগিয়া এই সকল অসুখ হইল !

ঋতু যতই আর্দ্র হউক, ইহার সম্মুখীন হইতে কোন ভয় নাই ; অর্থাৎ, বর্ষাকালে বা অন্য সময়ে বৃষ্টি পড়িয়া বায়ু আর্দ্র হইয়া উঠিলেও, ঘরের বাহিরে বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। এই রকম হওয়াতে ব্যায়াম করা হিতকর। তবে এই জলো হাওয়া অত্যন্ত গরম হইলে অনিষ্টকর হয়। আর প্রবহমান বায়ু সর্ব্বাবস্থাতেই ভাল। আচ্ছা, যখন বায়ু প্রবাহিত হয় না, স্থির থাকে, তখন আমরা কি করিয়া প্রবহমান বায়ুর সুযোগ গ্রহণ করিব ? কেন, আমরা নিজেরা ত চলাফেরা করিতে পারি। স্থির বায়ুতে ভ্রমণ করিয়া বা দৌড়াদৌড়ি খেলা

করিয়া আমরা প্রবহমান বায়ুর সুবিধা লাভ করিতে পারি—আমাদের শরীরকে শুকাইয়া লইতে পারি।

বৃষ্টি পতনের ফলে বায়ু আর্দ্র হয় না।

এখানে এই কথাটি বুঝিয়া লইতে হইবে যে, বৃষ্টি পড়িলেই বায়ু আর্দ্র হয় না। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুব অল্প অথচ সেখানকার হাওয়া খুব জলো—ভিজা। আর যেখানে খুব বেশী বৃষ্টি পড়ে সেখানেও শুষ্ক বায়ু দুর্লভ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোহিত সাগরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানকার হাওয়া সর্ব্বদাই ভিজা; অথচ এ অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম পড়ে—ইহার দুই পাশেই মরুভূমি। আবার কতকগুলি সুউচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর বারিপাত সত্বেও তথাকার বায়ু মোটের উপর শুষ্ক। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট তাপ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট নিম্ন ভূমির বায়ুর অপেক্ষা সেই তাপ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট কোন উচ্চ পর্ব্বত শিখরের বায়ুর শুষ্ককারিতা শক্তি অধিক। প্রধানতঃ এই কারণেই যে উচ্চ স্থানের বায়ু কতকটা স্বাস্থ্যকর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও শুষ্ককারিতা শক্তি বিশিষ্ট বায়ু আর্দ্র বায়ু অপেক্ষা উত্তম, তথাপি, কোন স্থানে বা সময় বিশেষে বায়ুর শুষ্ককারিতা শক্তি এত বেশী হইতে পারে যে, তাহা নাসিকা ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক করিয়া ফেলিতে পারে। এই কারণে, মিশর, ডাভোস এবং অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে গলনালীতে ক্ষত রোগ বড় বেশী।

বায়ু কিরূপে দূষিত হইতে পারে।

বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা বায়ু কিরূপে দূষিত হয়, এমন অন্য অনেক গ্যাস বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে পারে, যাহা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর।

ফুসফুস হইতে প্রশ্বাসের সহিত প্রাণঘাতী বিষ বাহির হয়। কিন্তু ঐ বিষের প্রকৃতির সহিত আমাদের সবিশেষ পরিচয় নাই। সে যাহা হউক, যেখানে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু বাস করে, সেখানে বায়ু চলাচলের উত্তম ব্যবস্থা থাকা যে অতীব আবশ্যক, সে পক্ষে কোন সন্দেহই নাই।

ধূম ও ভূষা।

ধূমের দ্বারা বায়ু অত্যন্ত অবিশুদ্ধ হয়। ভূষা তত অনিষ্টকর নহে; উহার সহিত যে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড থাকে তাহাও নিরাপদ। কিন্তু বায়ুর সহিত প্রচুর পরিমাণে ধূম মিশিয়া থাকিলে অনেকটা সূর্য্যকিরণ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। শীতকালে লণ্ডনে স্বভাবতঃ যে পরিমাণ সূর্য্যকিরণ পাওয়া যাইত, ধূমের দরুণ তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় না। জীবন

নগরও স্বাভাবিক সূর্য্যকিরণের শতকরা ৩০ হইতে ৪০ অংশে বঞ্চিত থাকে। ধূমের সহিত অল্প পরিমাণে গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত থাকে। যে সকল সহরে অনেক কল কারখানা আছে, সেখানে প্রচুর কয়লা পোড়ানো হয় বলিয়া ধূমের সঙ্গে যে সালফিউরিক এসিড বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়, তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

কুয়াসা।

ধূমের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অবস্থা—যখন তাহা নাগরিক কুয়াসার আকার ধারণ করে। লণ্ডন, লীডস, ম্যানচেষ্টার প্রভৃতি নগরে এই অবস্থা খুব সাধারণ। তখন সূর্য্য একেবারে কুয়াসায় ঢাকা পড়ে। ঐ সময়ে উক্ত নগরবাসিগণকে কার্ব্বণ ডাইক্সাইড, ভুষা ও সালফিউরিক এসিড নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। যেখানকার বায়ুর উপাদান এইরূপ অবিশুদ্ধ, যে স্থান সূর্য্যকিরণে বঞ্চিত, সেখানকার স্বাস্থ্য যে ভাল থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই আশা করা যায় না। বস্তুতঃ কুয়াসার সময় ঐ স্থানগুলিতে মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

'স্বাস্থ্য-সমাচার'

দিব্য ভাব।

—ঃ॰ঃ—

আমাদের আছে তিনটি জিনিষ—শরীর, প্রাণ আর মন। শরীরটা চায় পশুর ভোগ—কেবল আহার, নিদ্রা, মৈথুন—শরীরের ইহাই স্বধর্ম্ম, প্রাণ শরীরেরই বশীভূত, মনও এইখানে হামাগুড়ি দিয়ে মরিতেছে—আসল কথা এই শরীর, প্রাণ ও মনকে আমাদের একেবারে নূতন পথে ফিরাইতে হবে। সাধারণ মানুষ যাহা করে, তার উল্টা পথ ধরিয়াই যোগীর জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয়—যোগীর অসাধারণ জীবন—অসাধারণ উপায়েই নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইবে।

সাধনার প্রথম কথাই হইতেছে এই—এই শরীর, প্রাণ, মন হইতেছে বাহিরের রূপ—ইহাদেরই ভিতরে উপরে আছেন সত্য মানুষ—এই স্বরূপ মানুষ আর রূপমানুষ দুই মানুষেরই আহার যোগাইয়া আমরা জন্মজন্মান্তর কাটাইয়া আসিতেছি—ফলে দুইটাই পুষ্ট হইয়া উঠিবে বিচিত্র নয়—কিন্তু আজ আমাদের বুঝিতে হইবে—এই অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা চাই। বাহিরটাকে অসীম আদরে সবল করিয়া বাঁচাইয়া তোলা—সেও যেমন ঠিক নয়—তেমনি আবার উহাকে নিষ্ঠুরভাবে টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে—এ কথাও আমরা বলিতে চাই না—বাহিরের এই জাগ্রত মানুষটি—তাহার ন্যায্য অধিকার

যেটুকু, অর্থাৎ উহাকে সজীব কর্ম্মপটু রাখিয়া দিবার জন্য যতটু প্রয়োজন, ততটুকুই উহার প্রাপ্য। এক কথায় বাহিরের দাবী যত বড়ই হউক, সে কথায় কাণ দিলে প্রতারিত হইবারই সমূহ সম্ভাবনা— ভিতরটাকে জাগাইয়া, ভিতরের শক্তি এবং আনন্দ দিয়াই বাহিরটাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যাওয়া যেমন সহজ, জীবনে ফলাইয়া তোলা তেমনি শক্ত ও সাধনা-সাপেক্ষ।

সঙ্কল্প চাই—সত্য মানুষটিই হইয়া উঠিবার জন্য। মনের মানুষ একেবারে চিরদিনের জন্য মরিয়া যাউক— মন না মরিলে বিজ্ঞান ফুটে না—আমরা মানুষের মধ্যে এই বিজ্ঞানময় মানুষটিকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে চাই। পুরাতনের আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে সম্পূর্ণ রূপান্তর হয় না। রূপান্তর আসলে এই নব জন্ম। মানুষকে একেবারে একটা নূতন জন্মই পাইতে হইবে। শরীর-মানুষ, হৃদয়-মানুষ, মনোমানুষ— তারও উপরে নিগূঢ় যে নিত্য মানুষ—সেইই নূতন মানুষ। দেবভাবই এই মানুষের নিত্য জীবন ধর্ম্ম। দেবজন্ম অর্থে দেবতার এই নিত্যধর্ম্মেই গড়িয়া উঠিতে হইবে। দেবতার জাগরণ হয় বিজ্ঞানে, কারণে। দেবতা কারণের সত্তা। দিব্যভাব কারণেরই ভাব।

মনের উপর কারণ। আমরা মন লইয়াই ছোট বড় সংসার পাতিয়া ঘরকন্না করি। মনের বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়াই জিনিষকে জগৎকে দেখি, বুঝি, বিচার করি, চিন্তা করি—ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মনই জীবনের অনুভূতিগুলি আহরণ করে, সজ্জিত করে, রূপরস বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া ভোগ দখল করে—মনই ত আপনার সঙ্কীর্ণ ভিতরে সুখদুঃখ পাপপুণ্য ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বসৃষ্টি করিয়া সেই আত্মকৃত দ্বন্দ্বজালে আপনাকেই জড়াইয়া মরে। মনের মুক্তি চাই, তার অর্থ অগ্রে মনে হইতে আমাদের মুক্তি চাই। মনকে একবার ছুঁড়িয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া চাই। মনের উপরে দাঁড়াইয়া যেদিন জয়ডঙ্কা বাজাইয়া দিতে পারিব—সেই দিনই মনকে মুক্তির মণিকোটায় তুলিয়া লইয়া তাহারও স্বভাব-ধর্ম্মের আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার অধিকার জন্মিবে। মন নূতন দিব্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই নব জন্মের সূচনা হইল বুঝিতে হইবে। মনই ইন্দ্রিয়পতি—প্রাণের, শরীরেরও উপর কর্ত্তৃস্থানীয়—এই মন রাজা, উপরের আনুগত্য স্বীকার করিলে, ধীরে ধীরে অন্যান্য যন্ত্রগুলিও তুরীয় দিব্যশক্তির অনুকূল হইয়া উঠিবে।

যত গোল মন লইয়াই ত। এই মনকে শাসন করিবার শ্রেষ্ঠ পথই হইতেছে—উপরে উঠিয়া যাওয়া। মনের উপরে থাকা যায়—অভ্যাস হইয়া গিয়াছে মনের সঙ্গে মিশিয়া থাকা, অভ্যাস ওলটপালট করিয়া দেওয়াও যায় না কি? পুরাতন অভ্যাসটুকু উল্টাইয়া নূতন অভ্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। মনের সুখদুঃখ চিন্তা কল্পনাগুলির সঙ্গে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিব না—থাকিব সেগুলির দ্বন্দ্বের উপরে—প্রবল বেদনার আঘাত বুক ছিঁড়িয়া দিলেও,

সে তীক্ষ্ণ শেল সবলে উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে--দ্রষ্টা পুরুষ হইবে নির্ব্বেদ, অচঞ্চল, উদাসীন ভোক্তা মাত্র—প্রকৃতির সৃষ্ট তরঙ্গগুলি নিরুদ্বেগ হৃদয়ে সহ্য করিবে, ঘটনা, বিষয়, ভাব, সব কিছুরই অন্তর্নিহিত যে মূল রস তাহার বিচিত্র আস্বাদ গ্রহণ করিবে। এই দ্রষ্টা, ভোক্তা পুরুষেই অবস্থান অভ্যাসসিদ্ধ করিয়া তোলাই প্রথম কথা। মনের উপরের এক স্বচ্ছ ঊর্দ্ধ ভূমিতে দাঁড়াইয়াই এই অভ্যাস দৃঢ় ও স্থির করিতে হয়।

এ অবস্থায় একটা বিশেষ ভাব গ্রহণ করা বড় সাহায্যকর। ভাব বড় মধুর, শুষ্ক সাধনাকে সরস করিয়া তোলে। ভাবে থাকিতে হইবে। মনকেও এই ভাবমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। একটা ভাব আশ্রয় না করিলে কিসের উপর ভর করিয়া জীবনের দ্বন্দ্বময় ঢেউগুলি কাটাইয়া ধীরে ধীরে জীবনটিকে অমর দেবময় করিয়া তুলিতে পারিবে? প্রকৃতির নীচের তীব্র টান—রিরংসার অধোমুখী প্রবল আকর্ষণ—তাহার হাত এড়াইয়া উপরে টানিয়া তুলিতে হইলে, উপর দিক হইতে একটা প্রবলতর বিপরীত আকর্ষণই চাই—সেই উজান তোড়ে গা ভাসান দিলে তবেই না সবখানি একদিন অমৃতপূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই ঊর্দ্ধস্রোতে অবগাহনই ভাব সাধনা। নিষ্ঠাশীল সাধককে আমরা এই ভাব সাধনাই আশ্রয় করিতে বলি। ভাবই দিব্য জীবনের বেদিকা-স্বরূপ।

ভাব কি? ভাষায় যাহা ব্যক্ত হয় না, মন যাহার আভাস পাইয়া অভিভূত, প্রাণ মুহূর্ত্তে আবেশাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই দারুণ চিরবিদ্রোহী রক্তমাংস পর্য্যন্ত এক অপার্থিব রসাবেশে জারিত, শোধিত হইয়া উঠে—কেমন করিয়া সে জিনিষকে বিবরণযোগে প্রকাশ করিব—অথচ এই ভাবই ত আধ্যাত্ম জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। সাধককে বাঁচিতে হইলে ভাবেই বাঁচিতে শিখিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক জীবন রক্ষার জন্য যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ন পান যোগাইতে হয়, তেমনি অধ্যাত্ম জীবটিরও নিত্য পুষ্টির জন্য নিত্য আহার্য্যেরই আত্যন্তিক প্রয়োজন—ভাবই সেই অধ্যাত্ম আহার্য্য—অন্তরপ্রসূত সেই সুধারস পান করিয়াই ভিতরের নিগূঢ় প্রাণীটিকে নিত্য সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আকুল কণ্ঠে যে গান গাহিতেন—"যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়"—তাহা তলাইয়া বুঝিবার জিনিষ। ভাব শ্রদ্ধারই মূলসঞ্জাত—যেমন ভাব তেমনি লাভ, আধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যে ধনী সাজিতে হইলে, ভাবের ভাবুক হওয়া চাই—ভাবস্বরূপ দানই বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান সাধকের হৃদয়ে ভরিয়া দেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি"—মানুষ যেমন ভগবানকে ভজনা করে, ভগবানকেও তেমনি মানুষকে ভজনা করিতে হয়—এই ভগবানে মানুষে যে সম্বন্ধ-সূত্র উহাই সূক্ষ্ম ভাব-যোগ। ভাব-যোগ অবলম্বন করিয়াই ভাগবত পরশ পাওয়া যায়। ভগবান যখন মানব হৃদয়ে অলক্ষ্য কৌশলে পদাঙ্ক দান করেন, তখনই

হৃদয় জাগিয়া উঠে—হৃৎপদ্মের প্রকাশেই ভাগবত প্রকাশ বুঝিতে হয় ভগবান সাধকের হৃদয় জুড়িয়া অধিকার করিয়া বসেন—ভাবের মধুর আবেশে।

শাক্তের দর্শন স্পর্শন করিতে হয়—এই ভাবাশ্রয়েই। ভাবুক যোগী মায়ের আবাহন করেন, হৃদয়ে মায়ের পূজার সিংহাসন রচনা করেন, মাকে সোণার পীঠে স্থাপন করিয়া মহোল্লাসে আত্মনিবেদন করেন। আত্মসমর্পণ উদার যোগ, কোন বিধি তন্ত্রে উহা গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না, কিন্তু একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত দিব্য ক্রম আপনিই ফুটিয়া উঠে—সাধকের হৃদয়ের গোপন স্তরে একটা গূঢ় উৎস খুলিয়া যায়, শক্তিমূর্ত্তি রূপে রসে উছলিয়া সাধকের নিকটে প্রকাশ হন, সেই শক্তিরাণীর সঙ্গে বিচিত্র অথচ বিশিষ্ট একটা দিব্য সম্বন্ধই সাধক আবিষ্কার করিয়া লয়। ভাবযোগের এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা গোপন কথা—উত্তমরহস্য—জীবের সঙ্গ ভগবানের একটা দিব্য সম্বন্ধ আছে, সেই নিগূঢ়, সনাতন, অথচ নিত্য নূতন রসসম্বন্ধটুকু খুঁজিয়া পাওয়া, সেইটিই প্রত্যক্ষ করা, শুধু প্রত্যক্ষ দর্শনে জানা পাওয়া নয়, অনুভূতির মধ্যে উহাকেই গাঢ় ঘনীভূত করিয়া ধরা, হৃদয়ের যে লীলাবৃত্তি—তাহার চরম ভোগ ও চরিতার্থতা সেই সম্বন্ধটুকুর ভিতর দিয়াই আস্বাদন করাই ত রস সাধনার মূল লক্ষ্য ও প্রগাঢ় পরিণতি।

এইখানেই ভক্তিযোগের আত্যান্তিক সার্থকতা। জ্ঞানেই সাধনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়—নহিলে শুধু অন্ধ ভক্তি বিশ্বাসের একটা গভীর সার্থকতা থাকিলেও সেই সার্থকতাই চরম সামগ্রী নয়—ভক্তিকে জ্ঞানের মধ্য দিয়াই চমকাইয়া না লইলে, ভক্তির পূর্ণ পরিপক্কতা হয় না। আবার উল্টা ভুল করিলেও চলিবে না। জ্ঞান মূল হইলে কি হয়, মূলই ত সবখানি নয়—শুষ্ক জ্ঞানযোগ উদার উজ্জল বটে—কিন্তু ভক্তি রসপরশ না পাইলে সে জ্ঞান সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠে না। প্রেমই ত জ্ঞানকে অনুভবের মধ্যে ঘনীভূত, গাঢ় রসালিঙ্গনে, নিবিড় ভোগে ভরাট করিয়া জমাইয়া তোলে—বিজ্ঞান-পদ্ম যেমন ভগবানের নিত্যপীঠ—হৃৎ-পদ্ম তেমন তাঁহার লীলামঞ্চ—বিহারক্ষেত্র—এই লীলাকুঞ্জেই ভাগবত প্রকাশ আনন্দে, রসরঙ্গে, অনন্তবিচিত্র ও মাধুর্য্য-লহরীতে ভরপুর হইয়া উঠে।

ভাবের বিচিত্র স্তর। মানুষের প্রেম ত একদিনেই পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। প্রেমের পরিশুদ্ধি বড় বিচিত্র ক্রমেই সংসিদ্ধ হয়। সাধারণ প্রেম সে ত প্রেম নয়—প্রাণেরই ভোগবৃত্তির ক্রমপ্রসারণ—প্রাণ চায় কামতৃপ্তি, এই প্রাণিক প্রেম কামেরই একটু উচ্চতর সংস্করণ মাত্র—এ প্রেম চায় ভোগ, আত্মেন্দ্রিয়েরই তর্পণ—"আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্ত কাম বলি তার।" এখানে বিনিময়ে আত্মদান নাই—দেওয়া নাই, আছে কেবল নেওয়া—আমার তৃপ্তির জন্যই তুমি আছ, তোমায় ভালবাসি, সে তুমি আমার বলিয়া, আমার ভোগের পাত্র, আমার ইন্দ্রিয় তর্পণের আধার বা উপকরণ এই জন্যই। এখানে প্রেমের গান—আমার জীবন তোমার তরে নয়—তোমার জীবনই—আমার তরে। উৎসর্গ এ প্রেমের ধর্ম্ম নয়—উৎসর্গ

একাঙ্গী একতরফা, পাত্রের, (object এর,) বিষয়ীর (subject এর) দিক হইতে নয়। বলিতে পার, ইহা আসুরিক প্রেম—অধম প্রেম—আসলে প্রেম নয়—কামেরই হৃদয়-সংস্করণ।

সাধারণী প্রেমের উপর সমঞ্জসী প্রেম—বিনিময়, সামঞ্জস্যই এই প্রেমের কেন্দ্র ধর্ম্ম। আমি তোমায় ভালবাসি, সে তুমিও আমায় ভাল বাসিবে বলিয়া—আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে তোমায় প্রেমের সম্পূর্ণই প্রত্যাশা রাখি, আমার হৃদয়দান বিনিময়ে তোমার হৃদয়দান পাইব বলিয়াই—এখানে দোকানদারী আছে, হৃদয়ের হাটে ভালবাসার বেচাকেনা আছে; বণিক্-বৃত্তি এ প্রকার প্রেমের সহজাত বৃত্তি—বিনিময়ধর্ম্মী এ প্রেম মধ্যম প্রেম। তোমার সুখ আমি চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমারও সুখ হউক—তোমার তরে আমার জীবন, কিন্তু তাই বলিয়া, এমন কি সেই জন্যই আবার আমার তরে তোমার জীবনই নয় কি? আমি দিব—আর তুমি না দিলে চলিবে কেন? এ সব প্রশ্ন এই সামঞ্জসী প্রেমই শোভা পায়। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের একটা দান প্রতিদান, তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেওয়া নেওয়ায় সামঞ্জস্যই ইহার লক্ষণ—শুদ্ধ হইলে এ প্রেমও অত্যুৎকৃষ্ট ও বিমল সৌরভপূর্ণ হইয়া উঠিতে না পারে এমন নয়—সাধনার ক্রমাভিব্যক্তি অনুসারে মানবহৃদয়ের এই শুদ্ধতারও উৎকর্ষ ঘটে—মানুষের মন উন্নতিধর্ম্মী, তাহার হৃদয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হইয়াই চলিতেছে—শতাব্দী পর শতাব্দীর বিবর্ত্তনে এই মানুষ-প্রেমেরও ক্রম পরিণতিই হইতেছে—ইহা ত সত্য কথা। কিন্তু এই স্তরে যতক্ষণ, ততক্ষণ এ প্রেম শ্রেষ্ঠ প্রেম নয়, দিব্য প্রেম ইহাকে ত বলা যায় না।

দিব্য প্রেম—হৃদয়েই প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু তাহার উৎস উপরে—এক নিগূঢ়তর লোকে। আনন্দ জগতেই এই দিব্য প্রেমের জন্ম। হৃদয়ে আসিয়া এই প্রেম বিলসিত হয়, খেলা হয় এখানে, কিন্তু পরিণতি সেইখানে, সেই জনলোকে—আনন্দময়ের নিজস্ব ক্ষেত্রে। দিব্য প্রেমেই আত্মসমর্পণের, উৎসর্গের চরম ও পরম সার্থকতা—কারণ উৎসর্গই এই প্রেমের আদি, মধ্য ও শেষ সবখানি কথাই। আপনাকে ঢালিয়া ঢালিয়া, লুটাইয়া লুটাইয়াই এই প্রেম সার্থক হয়, সমর্থ হয়, মুগ্ধ বিভোর হইয়া জন্মজন্মান্তর কাটাইয়া দেয়—বিনিময়ে কিছুই চায় না—বিনিময়ের কথাই এখানে মনে আসে না—দিয়াই যে চরম সুখ এখানে খুঁজিয়া পাইতেছি—প্রত্যর্পণের, প্রতিগ্রহণের ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও তাহার উপর কোন চিহ্নপাত করিবার অবসরই পায় না। তোমায় ভালবাসি—এই ত আমার আত্যন্তিক সুখ—এ সুখের কি আর শেষ আছে, তল আছে; যে আর কিছু চাইব, পাইবার আশা রাখিব?—পাইবার চিন্তাও সেখানে স্পর্শ করে না—তোমায় ভালবাসিয়াই যে আমি ভরিয়া আছি, আর ত কিছুর স্থান সেখানে একেবারেই নাই। বিনিময়ের কথা যদি জোর করিয়া টানিয়া আন, ত আমার সহজ অবলীলা উত্তরেই তোমায় নষ্ট হইয়া যাইতে হইবে—বিনিময় ত আমি চাহি না—

কেনা বেচা দোকানদারী করিতে ত আমি আসি নাই—ভালবাসি—সে তুমি ভালবাসিবে বলিয়াই—ছি: ছি: এমন কথা ত মুখে আমার উচ্চারণ করিতেও নাই—ভালবাসি ভালবাসি, কেন তা জানি না—ভালবাসিয়াই যে অনন্ত সুখই পাই—তুমি যদি ভাল না বাস, শুধু তাই নয় তুমি যদি আমার প্রতি ঘৃণায় তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাও—আমার সেচ্ছাকৃত হৃদয়দান যদি দারুণ অবজ্ঞাভরে দুই হাতে ঠেলিয়া ফিরাইয়াই দাও, সেও ত আমার সুখ—দুই পায়ে আমার হৃদয়খানি দলিয়া গেলেও জানিব তোমারই চরণালিঙ্গনে আমি ধন্য হইয়াই উঠিলাম। এ যে অপূর্ব্ব সুখ—তোমার স্বেচ্ছাদত্ত অসীম যন্ত্রণাও যে আমার প্রিয়তমের কৌতুক-রঙ্গ বলিয়াই অনুভব করিতে পারি—সেই ত আমার জন্মসিদ্ধ স্বভাবধর্ম্ম। এ প্রেমে আনন্দ ছাড়া কথা নাই, ভাব নাই, প্রিয়তমের হাতে দেওয়া গরলও যে সুধার ভরাপাত্র বলিয়া আকণ্ঠ পান করিতে পারি—প্রিয়তমের প্রীতিতেই যে আমার প্রীতি—তার চেয়ে প্রীতি যে আর আমার কিছুতেই নাই। ইহাই দিব্য প্রেমের কথা। "আমারই বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া"—সমর্থ প্রেমিকের মুখে এমন অভিমানের কথাও শুনিবে না—এ স্বর্গেও উর্দ্ধের প্রেম—এ আনন্দময়ের নিজস্ব প্রকাশ—দিব্যভাব সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানেরই আপন ধর্ম্ম।

মন, বিজ্ঞান, আনন্দ—মনে, হৃদয়ে দিব্যপ্রেমের রূপ ও খেলা, বিজ্ঞানেই উহার সত্য ও স্বরূপটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায়, আর আনন্দেই উহার চরম উৎস ও পরিণতি—এ ত্রিধাম ভরিয়া দিব্যভাব মানুষকে মাধুর্য্যে মহিমায় অতুল পূর্ণত্বে ভরাট ও ঋদ্ধিমান করিয়া তোলে। সাধনার পরম লক্ষ্য—এই দিব্যভাব। আত্মসমর্পণযোগী এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াই চলিবেন। দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই চাই। অসাধারণ জীবন যাহাদের, সেই আত্মহারা দিব্যোন্মাদ চির প্রেমিককুলকেই এই দিব্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কালী স্বয়ংই করিবেন—প্রেমিক সাধক, সৃষ্টিছাড়া এই পাগলামী লইয়াই যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাক—মা নিজেই তোমায় নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন—চিহ্নিত বরপুত্র তোমারই মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব ও নিরবচ্ছিন্ন দিব্যলীলা প্রকট করিয়া তুলিবেন।

'প্রবর্ত্তক'

(নব পর্য্যায়)
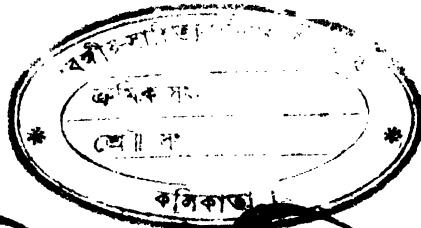
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৫ম বর্ষ। | আশ্বিন, ১৩২৮ সাল। | ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

কামরূপে কোচরাজকীর্ত্তি।

" 'করতোয়াং' সমারভ্য" একদিন যে কামরূপের রাজ্যসীমা ছিল, তাহা চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াংই বলিয়া গিয়াছেন। কেননা, তিনি 'কলতু' নদী পার হইয়াই 'কামরূপ' রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধে সেই বৃহত্তর কামরূপের কথা বলিব না; আজ বৃটিশ অধিকারে যে ভূভাগ 'কামরূপ' জেলা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোচরাজগণের যে দুইটি মহতী কীর্ত্তির নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে—সেই ৺কামাখ্যা মন্দিরের এবং হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের কথাই আলোচনা করিব।

কামাখ্যা মন্দিরের সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এবং সর্ব্বশেষ আসাম-প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী একটি নাতিবিস্তৃত প্রবন্ধে এই মন্দিরসম্পর্কে বহুকথা লিখিয়াছেন—এবং ইহার শিলালিপির একটি চিত্রও প্রকাশিত করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা পঞ্চবিংশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা (১৩২৫ সাল) ৭৭পৃষ্ঠাবধি দেখিবেন।

৺কামাখ্যা-মন্দির-সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমিও কিছু লিখিয়াছিলাম * তাহা ৺রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর প্রণীত "আসাম বুরঞ্জী" (আসামের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহারই একটা ভাবানুবাদ।

রায় গুণাভিরাম বাহাদুরের মতে মহারাজ বিশ্বসিংহনারায়ণ কর্ত্তৃক ৺কামাখ্যার মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়; তাহা ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন কালাপাহাড় দিগ্বিজয়ে আইসে, তখন তৎকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। পরে মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। এই কার্য্যে প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

স্যার এডোয়ার্ড গেইট্ প্রণীত ইংরেজীতে লিখিত "হিস্‌টরি অব্ আসাম্"এ (আসামের ইতিহাসে) বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ৺কামাখ্যার মন্দির নির্ম্মাণের কথা আছে এবং নরনারায়ণ যে ঐ মন্দির মোসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়াতে পুনর্নির্ম্মাণ করেন, একথাও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কালাপাহাড়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "Kalapahar was the General of Sulaiman Kararani, who ruled in Bengal from 1563 to 1572 A. D." (P. 53, Gait's history of Assam.)

তাহা হইলে রায় গুণাভিরাম বাহাদুর বর্ণিত সময়ের ১০ বৎসর পরে—সুলেমান কররাণির রাজত্বের প্রথম বৎসরেই—কালাপাহাড় আসিয়া কামাখ্যা মন্দির ভগ্ন করিলেও, ইহার পুনর্নির্ম্মাণে ১০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল, এই কথাটা অলীক হইয়া পড়ে—কেননা মন্দিরের

* আরতি, বৈশাখ ১৩২৪—"পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ"। এই প্রবন্ধ মৎসঙ্কলিত প্রবন্ধাষ্টকের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া সচিত্র পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্ম্মাণ তারিখ ১৪৮৭ শক বা ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ। কালাপাহাড়ের কাণ্ড যদি প্রকৃতই ঘটিয়া থাকে তবে ইহার বর্ষদ্বয় মধ্যেই মন্দিরের পুনঃসংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

কিন্তু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় নরনারায়ণের পূর্ব্বে বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ৺কামাখ্যা মন্দির নির্ম্মাণ—তথা সেই মন্দিরের কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ধ্বংস-সাধন—এই উভয় কথাই বিশ্বাস করেন না। কেননা কালাপাহাড় যাঁহার সেনাপতি ছিল, সেই সুলেমান কররাণি কর্ত্তৃক কোচরাজা আক্রমণের তারিখ ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ—"রিয়াজস উস্ সালাতিন" গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে। অথচ বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ। বোধ হয় গোস্বামী মহাশয়ের মতই সমীচীন।

তবে গোস্বামী মহাশয় যে দরং রাজবংশাবলী হইতে নরনারায়ণ রায় ও চিলারায় কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মাণের কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহার একস্থলে আছে, দেবী স্বপ্নে রাজ-মিস্ত্রিকে বলিতেছেন "দেবী বোলে পূর্ব্বে মঠ যবনে ভাঙ্গিলা"। এবং রাজভ্রাতৃদ্বয় তৎপূর্ব্বে কামাখ্যা ক্ষেত্রে আসিয়া "ভগ্ন মঠ চিহ্ন দেখিলন্ত বিদ্যমান"। অতএব যদিও দরং রাজবংশাবলী গ্রন্থে বিশ্বসিংহের মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোনও কথা নাই—এবং কালা-পাহাড়েরও স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না—তথাপি পূর্ব্বে শিলা-নির্ম্মিত মঠ ছিল এবং তাহা যবনে ভাঙ্গিয়াছিল—এই দুইটি কথা প্রকৃতই পাওয়া যাইতেছে।

পরন্তু, মন্দিরে যে শিলালিপি আছে, তাহাতে ইহা যে "পুনর্নির্ম্মিত" হইয়াছে একথাও নাই। এবং গোস্বামী মহাশয় মন্দিরের উপাদান সম্বন্ধে বংশাবলী হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখ যায়, দেবী শিলাদ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে একেবারেই নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাই ঘিয়ে ভাজা ইষ্টক দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু শিলালিপিতে (দুইবার) উল্লেখিত হইয়াছে যে মন্দিরটি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরে ইষ্টক যে ব্যবহৃত হয় নাই এমন নহে; কিন্তু প্রধানতঃ শিলা দ্বারাই ইহার গাঁথুনি ইত্যাদি হইয়াছে। যদি দেবীর আদেশ-কাহিনী যথার্থ হইত, তবে শিলালিপিতে ইষ্টকের কথাটাই প্রধান ও ঈপ্সিত উপাদান বলিয়া উল্লেখিত হইত। তাই মনে হয় দরং রাজবংশাবলীর বৃত্তান্তও সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে। অপিচ, রায় গুণাভিরাম বাহাদুরও স্বকপোলকল্পিত কিছু লিখেন নাই—

তিনি কালাপাহাড়ের আক্রমণবৃত্তান্ত "গুরু ভটিমা" হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—একথা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন।*

গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণে এবং গুণাভিরামের বর্ণনায় একটা সাদৃশ্য দেখা যায়; গুণাভিরামের মতে রাজভ্রাতৃদ্বয়—বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ—নীলাচলে গিয়া মানত করেন, রাজ্যে শৃঙ্খলাবিধান হইলে, মন্দির করিয়া দিবেন—বরং নির্ম্মাণ সময়ে প্রত্যেক ইষ্টকের মধ্যে এক এক রতি সোণা দিয়া দিবেন। গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণেও ঐ কথা আছে—তবে বিশ্বসিংহও তদ্ভ্রাতার স্থলে, নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা চিলারায়ের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

যাহা হউক নরনারায়ণ পুনর্নির্ম্মাণই করুন আর নূতনকল্পেই করুন, তাহাতে বিশেষ আসে যায় না। ৺কামাখ্যার বর্ত্তমান মন্দির যে তাঁহার ও তদীয় প্রিয় ভ্রাতা চিলারায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শিলালিপিটির সম্বন্ধে একটি বড় কৌতুকের কথা আছে। একটি বৃহৎ প্রস্তর-ফলকে বড় বড় অক্ষরে এই দুইটি শ্লোক লিখা আছে:—

লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থো ধনুর্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ॥

* "কালাপাহারর এই দেশত পোরাসুঠার, পোরাকুঠার, কালাসুঠার বা কালযবন নাম প্রচলিত আছে। এওঁ ধর্ম্ম বিদ্বেষী বুলি এতিয়া লৈকে মানুহে কয়। কালাপাহারর আক্রমণবিবরণ গুরু ভটিমাত আছে।" (বুরঞ্জী ৪র্থ সংস্করণ ৬০ পৃষ্ঠা পাদটীকা।) ইহা হইতে এটাও বুঝায় (যেহেতু কালাপাহাড়ের বহু নাম এদেশে প্রচলিত) যে ১৫৫৩ অব্দে যে মোসলমান মন্দির ভাঙ্গে, সে সুলেমান কররাণির সেনাপতি কালাপাহাড় নহে—পরন্তু তৎসদৃশ সংজ্ঞাভাজন অপর ব্যক্তি।

প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দ
ভক্ত্যা করোত্তদমুং বরনীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপলেন
শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্ক সংখ্যে ॥

এই দুইটি শ্লোক দ্বারাই সমস্ত কথা বলা হইয়া গেল—কোনও কিছু অপেক্ষিত থাকিল না। তথাপি এই লিপির নীচে একটি ক্ষুদ্রতর প্রস্তর-ফলকে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে আর একটি শ্লোক লিখা হইয়াছে।

তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থলী
মাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে সুন্দরম্।
প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎ শাকে শিলারাজিভি-
দে বীভক্তিমতাং বরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ ॥*

স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক দুইটার তাৎপর্য্য একই এবং ইহাদের মধ্যে একটী দ্বারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়।

তবে এইরূপ হইল কেন?

আমার বোধ হয় তৃতীয় শ্লোকটাই পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; শিলালিপির কবি প্রথম ও তৃতীয় শ্লোক একই ছন্দে লিখিয়া মন্দির নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধায়ক শুক্লধ্বজ বাহাদুরকে প্রদান

* এই শ্লোকগুলির লিপির ছবি, তদনুযায়ী অবিকল পাঠ এবং অনুবাদ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (২৫ ভাগ ২য় সংখ্যায়) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে দেওয়া হইল না। ঐ প্রবন্ধের শেষে পরিষৎ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইতঃপূর্ব্বে মূল লিপিটি কোথাও দেওয়া হয় নাই।" এইটুকু ঠিক্ নহে; উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের ৺কামাখ্যা অধিবেশনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় কালীচরণ সেন বাহাদুরের অভিভাষণে বঙ্গানুবাদ সহ মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছিল। তবে মূললিপির দ্বারা যদি তিনি শিলালিপির "ছাপ" মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কথাটা যথার্থই বটে।

করেন। অবিকথন লক্ষ্মণসদৃশ রাজভ্রাতা জ্যেষ্ঠের সঙ্গে সমভাবে বিশেষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। তিনি বাজে কথা (অর্থাৎ বিশেষণগুলি) ছাটিয়া দিয়া ক্ষুদ্রতর ছন্দে বর্ত্তমান দ্বিতীয় শ্লোকটী স্বয়ং লিখিয়া * (অথবা লেখাইয়া) প্রস্তরফলকটির লিপিসম্পাদন করাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বোধহয় নরনারায়ণ পশ্চাৎ একথা জানিতে পারিয়া প্রিয়ভ্রাতার প্রশস্তি জুড়িয়া দিতে অনুজ্ঞা করেন। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা চিলারায় রাজাদেশ লঙ্ঘন না করিয়া ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখণ্ডে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে এইটী লেখাইয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ এই শ্লোকটী বড়ই খাপছাড়া হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠ, যেস্থানে জগন্মাতার মহামুদ্রা বিরাজমান, তথায় মন্দির করিয়া দিয়া মহারাজ নরনারায়ণ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এবং তাঁহার ও তদ্ভ্রাতা চিলারায়ের সৌভাগ্যের বিষয় যে মন্দির মধ্যে তাঁহাদের মূর্ত্তি মায়ের দিকে মুখ করিয়া ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুরঃসর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাণ্ডারা প্রত্যেক যাত্রীকে তাহা প্রদর্শন করাইয়া থাকেন—যাত্রীরাও তাঁহাদের মূর্ত্তির প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভক্তির আগ্রহাধিক্যে পুণ্যকীর্ত্তি নরনারায়ণ দেবীর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কথিত আছে যে পীঠের পূজক কেন্দু কলাই ঠাকুরের ভক্তিবশতঃ তাঁহার আরতি সময়ে মাতা দিগম্বরী বেশে নৃত্য করিতেন। মহারাজ ইহা শুনিয়া দেখিবার জন্যে পূজককে অনুরোধ করাতে তিনি সম্মত হইয়া রাজাকে লুক্কায়িত অবস্থায় রাখেন। কাহারও এটা খেয়াল হইল না—এ লুকোচুরি কার সঙ্গে ? ধরা পড়িয়া পূজক নিহত হইলেন—নরনারায়ণের প্রতি অভিশাপ হইল—তাঁহার বংশের কেহ এই মহাপীঠ দেখিতে পারিবেন না। সেই হইতে রাজবংশীয় কেহই কামাখ্যা দর্শনে আসেন না।

---

* বিজনী অভয়াপুরী হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় আমাকে এই লিপিটির নকল দিয়াছিলেন। তবে দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় পাদের প্রথমে পাঠ "যো যো" ছিল। আমি "যো সৌ" করিয়াছি। সর্ব্বশেষ পংক্তিতে "গুণি বরাঃ কারাঃ" ছিল, আমি একবচনান্ত করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই লিপির 'ছাপ' পাওয়া গেল না।

কিন্তু "ন মাতা শপতে পুত্রম্"—এমন ভক্ত মহারাজ জগন্মাতার শাপগ্রস্ত হইলেন, এটা কেমন কথা ?

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ভুল বুঝা হইয়াছে। অন্যায় কর্ম্ম করিলে মাতা প্রিয়তম পুত্রকেও বলেন "যা, তোর মুখ দেখ্‌ব না ;" কিন্তু পুত্রের কি উচিত ঐ কথায় মায়ের ক্রোড় পরিত্যাগ করা ? পুণ্যশ্লোক মহারাজ নরনারায়ণ প্রকৃতই মহামায়ার প্রিয়ভক্ত ছিলেন। পরন্তু তিনি এই শাপগ্রস্ত হইয়াই ৺কামাখ্যার দিক হইতে যে মুখ ফিরাইলেন—আর সেই দিকেই গেলেন না, মায়ের অভিমান, স্বস্ত্যয়ন পুরশ্চরণাদি দ্বারা, দূরীভূত করিবার কোনও চেষ্টা করিলেন না। ইহার ফল এই হইল আত্মদ্রোহ—রঘুরায়ের বিদ্রোহ—বশতঃ এই অঞ্চল তাঁহার করচ্যুত হইল। রঘুরায়ের বংশীয়েরাও অধিক দিন এই স্থানের অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। যাউক সে সব কথা।

* গুণাভিরামের বুরঞ্জীতে আছে, নরনারায়ণ ও চিলারায় উভয় ভ্রাতাই বিদ্যাশিক্ষার্থ বারাণসী ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তাই চিলারায়ের পাণ্ডিত্য থাকিবারই কথা। বিশেষতঃ শুক্লধ্বজ রচিত "সারবতী" এই সার্থকনামা গীতগোবিন্দের একখানি টীকা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাভারতের কামরূপীয় অনুবাদক রাম সরস্বতী কৃত গীতগোবিন্দের ভাষানুবাদে না কি এই টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

তারপর দ্বিতীয় কীর্ত্তি ;—চিলারায়ের পুত্র রঘুরায় কর্ত্তৃক হাজোর ৺হয়গ্রীব মাধবের মন্দির নির্ম্মাণ। এ বিষয়ে কোনওরূপ কিংবদন্তী ইত্যাদি শুনা যায় না। রঘুদেব জ্যেষ্ঠতাতের ও স্বীয় জনকের কামাখ্যা-মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ক কীর্ত্তির অনুকরণেই বোধ হয় হাজোর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অবশ্যই পূর্ব্বে এস্থলেও মন্দির ছিল। তাহা কালাপাহাড় কর্ত্তৃক (বা তাদৃশ কোনও কারণে) বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তবে কামাখ্যা মন্দিরের শিলালিপিতে যেমন পুনর্নির্ম্মাণের কথা নাই—এস্থলেও শিলালিপিতে তাহা নাই। লিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীমদ্‌ বিশ্বসিংহঃ ক্ষিতিপতিরভবত্তৎসুতঃ খ্যাতকীর্ত্তিঃ
শ্রীমৎ শ্রীমল্লদেবো নৃপতিরতিমতির্নির্জ্জিতারাতিজাতিঃ।

গাম্ভীর্য্যোদার্য্যশৌর্য্যপ্রথিত পৃথুযশোধর্ম্মকর্ম্মাবদাতঃ
শ্রীমৎ শুক্লধ্বজাখ্যো বাজনি তদনুজো যদ্বশেঽশেষদেশঃ ॥
সাক্ষাদ্রাঘবপুঙ্গবো দিশি দিশি প্রখ্যাতকীর্ত্তিব্রজো
হন্তা পুণ্যজনস্য যো বিধিবশাৎ যঃ কামরূপেশ্বরঃ।
যো সৌ বাখিললোকশোকদহনজ্বালাবলী বারিদঃ
শ্রীমৎ শ্রীরঘুদেবভূপতিরভূৎ শুক্লধ্বজস্যৌরসঃ ॥
তস্যাশেষজনপ্রসাদজনকঃ শ্রীকৃষ্ণপাদার্চ্চকো
ভূপঃ প্রাপ্তবয়া গদাধরকৃতী প্রাসাদরত্নং ব্যধাৎ।
মণ্যাখ্যানগিরৌ হয়াস্থুররিপোরত্যাশ্রমানাস্পদং
শাকে বাণবিয়ত্তিথৌ গুণিবরঃ কারুঃ স্বয়ং শ্রীধরঃ ॥

ইহার ইংরাজী অনুবাদ গেইট সাহেবের প্রাগুক্ত "হিস্‌টরি অব্ আসাম্" গ্রন্থে আছে। কিন্তু বঙ্গানুবাদ কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীশ্রীবিশ্বসিংহ রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র প্রখ্যাতযশাঃ মহামতি শ্রীশ্রীমল্লদেব (ছিলেন) যিনি শত্রু কুলনির্জ্জিত করিয়াছিলেন। শ্রীশুক্লধ্বজ নামে তাঁহার অনুজ জাত হইয়াছিলেন যিনি, গাম্ভীর্য্য, উদারতা ও বীরত্বে বিখ্যাত, বিপুল যশঃসম্পন্ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা নির্ম্মল ছিলেন, * এবং নানা দেশ যাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। সেই শুক্লধ্বজের ঔরস পুত্র শ্রীশ্রীরঘুদেব ভূপতি ছিলেন। যিনি সাক্ষাৎ রাঘবশ্রেষ্ঠ (রামচন্দ্র) সদৃশ, যাঁহার কীর্ত্তি সমূহ দিক্-দিগন্তে প্রসিদ্ধ, যিনি পাপিজনের নাশকারী, নিয়তি বশতঃ যিনি কামরূপাধিপতি হইয়াছিলেন; যিনি সমুদয় লোকের শোকরূপ অগ্নির শিখাবলীর পক্ষে (বারি বর্ষণকারী) জলদ সদৃশ; সর্ব্বজনানুগ্রহকারক শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবক, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও যিনি অমাত্য

---

* এই বিশেষণগুলি মল্লদেবেও প্রয়োগ করা যায়। গেইট্ সাহেব তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু সুষ্ঠুতর অন্বয় শুক্লধ্বজেই হয়। এবং ইহাই অভিপ্রেত ছিল, এই আমার ধারণা। জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি রঘুরায়ের যে ভাব ছিল, তাহাও এই ধারণার সমর্থক।

গদাধরের সাহায্যে কর্ম্মকুশল * সেই নৃপতি হয়াসুর নাশকারীর মণি নামক পর্ব্বতে রত্নোপল সমাদর ভাজন এই প্রাসাদ-রত্ন ১৫০৫ শাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার শিল্পী স্বয়ং শ্রীধর (নামক) গুণিশ্রেষ্ঠ (ব্যক্তি)। †

'বিধিবশাৎ' এই শব্দটিতে রঘুদেবের স্বীয় জীবনের ইতিহাস সূচিত হইতেছে। মহারাজ নরনারায়ণ একপ্রকার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রলাভ করেন। তৎপূর্ব্বে রঘুদেবই রাজ্যাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। রাজার পুত্রসন্তান হওয়াতে, রঘুদেব রাজ্যলাভে হতাশ হইয়া বিদ্রোহী হন। কিন্তু নরনারায়ণ প্রাণতুল্য অনুজের পুত্রকে বঞ্চিত করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় পোষণ করেন নাই। যখন রঘুদেব নরনারায়ণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়াও পলায়নপর ছিলেন, তখন উদারাশয় জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাই বোধহয় "বিধিবশাৎ" কামরূপেশ্বরত্ব প্রাপ্তির কথা শিলালিপিতে উল্লেখিত হইয়াছে।

কালক্রমে কামরূপের অধিকার যখন আহোম রাজগণ গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহারা কোচরাজগণের আদর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত মন্দিরের গঠনরীতিও প্রায় কোচরাজগণের অনুরূপই ছিল। তবে একটি বিষয়ে আহোম রাজগণ স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মন্দিরগুলিতে যে সকল লিপি আহোম ভূপতিগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে তাহা প্রায়শঃ গদ্যে লিখিত। ‡

* গেইট সাহেবের ইংরেজী তর্জ্জমায় 'গদাধর কৃতী' পদের কোনও অনুবাদ নাই। কিন্তু এই গদাধর রঘুরায়ের পরম হিতৈষী মন্ত্রী ছিলেন। ঐ তর্জ্জমায় "রত্নাশ্মমানাস্পদং" পদেরও অনুবাদ দেখা যায় না।

† শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে মাধব মন্দিরের একটি লিপির ছাপ আছে। তাহা তিনি স্বয়ং মন্দিরের উপরিভাগ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অতীব অস্পষ্ট। কিন্তু যতটুকু পাঠ করা যায়, তাহাতে বোধহয় উহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লিপি। উপরি উদ্ধৃত পাঠের সঙ্গে কোনও ঐক্য নাই।

‡ তবে ৺কামাখ্যার যে নাটমন্দির আহোম-রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তাহাতে যে দুইখানি লিপি দৃষ্ট হয়, তাহা পদ্যে রচিত। বোধহয় কোচরাজ লিপির অনুকরণেই এরূপ ঘটিয়াছে। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে আরো দু এক স্থলে আহোম-রাজ-লিপিতে ছন্দোবদ্ধ রচনা পরিলক্ষিত হয়। তাই 'প্রায়শঃ' বলিয়াছি।

কবিতার অতিশয়োক্তি পরিহারকল্পে যে গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে। আহোম লিপিতেও লম্বা লম্বা সমাসবদ্ধ পদ দ্বারা রাজগণের বিশেষণ রচিত হইয়াছে। * আমার বোধহয় আহোমগণের প্রকৃতি কবিতার বিশেষ অনুকূল ছিল না। তাই তাঁহাদের বুরঞ্জী ইত্যাদি গদ্যে লিখিত—এদিকে কোচ-রাজ "বংশাবলী" পদ্যে লিখিত। "বংশাবলী" কেন, যে "ব্যাকরণ" সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বত্র গদ্যে লিখিত হইয়াছে, তাহাও কোচ-রাজ-সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ (উদাহরণ সহিত) পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন। এই "প্রয়োগ রত্নমালা" ও বিদ্যোৎসাহী রাজা নরনারায়ণের নাম ৺কামাখ্যা মন্দিরের ন্যায় বহুকাল স্মরণীয় করিয়া থাকিবে।

পরিশিষ্ট।

মূল প্রবন্ধে যে দুইটি কীর্ত্তির কথা লিখিত হইল, তাহা আজিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কীর্ত্তি যে কিছু ছিল না—একথা বলিতে পারি না। † রঘুদেবের নির্ম্মিত আর একটি মন্দিরের সংবাদ—একখানি প্রস্তরফলক হইতে পাওয়া যাইতেছে। ৺কামাখ্যা শৈলের পাদদেশে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র তীরে শ্রীশ্রী৺পাণ্ডুনাথের মন্দির আছে। ই, বি, রেলওয়ের 'পাণ্ডু' ষ্টেশন হইতে ইহা কয়েক গজ মাত্র দূরবর্ত্তী। বর্ত্তমান মন্দিরটি

* যদৃচ্ছাক্রমে একটি আহোম লিপির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "স্বস্তি শ্রীহরগৌরী পদারবিন্দমকরন্দসন্দোহনিলীনমনোমধুকরপ্রবরস্য অবনিবনীয়কপরমকরুণাবরুণাশয়স্য শুভ্র যশোরাশিমণ্ডিতাশেষমেদিনীমণ্ডলস্য বাসববংশাবতংসস্য শ্রীশ্রীযুক্ত শিবসিংহ ভূপালস্য" ইত্যাদি।

† গৌহাটী সহরে ব্রহ্মপুত্র তীরে ৺জনার্দ্দনের মন্দিরটি দেখিতে অবিকল ৺কামাখ্যা মন্দিরের ন্যায়। ইহাও কোচরাজ কীর্ত্তিই হইবার সম্ভব। কিন্তু কোনও শিলালিপি নাই। সম্মুখের গৃহটি আহোমরাজ প্রমত্তসিংহের সময়ে (১৬৬৬ শাকে—নির্ম্মিত তাহা একটি শিলালিপিতে বর্ণিত আছে।

টিনের ছাউনি দিয়া অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এস্থলে প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা বিনির্ম্মিত একটি মন্দির ছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ঐ মন্দিরে গ্রথিত এবং অধুনা বিক্ষিপ্তাবস্থায় নিপতিত একটি প্রস্তরফলকে নিম্নোদ্ধৃত লিপিটি রহিয়াছে।

শ্রীমন্মল্লনৃপানুজস্য কৃতিনঃ শুক্লধ্বজস্যাত্মজে
বীরে শ্রীরঘুদেবভূপতিকুলোত্তংসে কলানাং নিধৌ।
দুর্গাদত্তবরেণ শাসতি গুণগ্রামাভিরামে মহীং
তস্যামাত্য গদাধরস্য বহুশঃ স্নেহানুকূল্যাদপি ॥
শ্রীপাণ্ডুনাথস্য হরেঃ শিলাভিঃ প্রাসাদমানির্ম্মিতবান্-মনোজ্ঞং।
পয়োনিধি বিষ্ণুপদৈকতানঃ শাকেশ্বর ব্যোমশরেন্দুসংখ্যে ॥*

শ্রীমন্মল্লদেব ভূপতির অনুজ কর্ম্মকুশল শুক্লধ্বজের পুত্র, ভূপতিকুলের ভূষণ (স্বরূপ), কলানিধি, গুণগ্রামমনোহর বীর শ্রীরঘুদেব (যখন) (কর্ম্মচারী) প্রধান দুর্গাদত্তের সাহায্যে পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, (তখন) তদীয় অমাত্য গদাধরের বহুশঃ সস্নেহ সাহায্যে, বিষ্ণুপদে একাগ্রচিত্ত (শিল্পী) পয়োনিধি শিলাদ্বারা শ্রীশ্রী৺পাণ্ডুনাথ (সংজ্ঞক) নারায়ণের একটি মনোজ্ঞ প্রাসাদ ১৫০৭ শকে সম্যক্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* এই শিলালিপির ছাপ এতৎসঙ্গে প্রদত্ত হইল এবং ইহার পাঠটি যথামত শুদ্ধ করিয়া লিপিবদ্ধ হইল। বলাবাহুল্য, মূল লিপিটিতে বহু অশুদ্ধি রহিয়াছে এবং পাঠও স্থানে স্থানে বড়ই অস্পষ্ট। যদি লিপির অশুদ্ধি এবং অস্পষ্টতা বশতঃ ভ্রান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যানুবাদ দেখিতে কেহ কৌতূহলী হন, তবে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় লিখিত "কামরূপের শিলালিপি" প্রবন্ধে ঐ লিপির পাঠ ও ব্যাখ্যা দেখিবেন। [সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা পঞ্চবিংশ ভাগ (১৩২৫) ৪র্থ সংখ্যা ১৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] বাহুল্যভয়ে এস্থলে এগুলি আলোচিত হইল না।

একটী আঙ্গুর লতার প্রতি

কে বসালে উষর মাঠে নধর আঙ্গুর লতা
দিন দুপুরেই জুড়ে দিলে আরব নিশির কথা।
শ্মশান মাঝে বসিয়ে দিলে ন'বৎ সুমধুর
মেঘনাদ বধ কাব্যে দিলে কীর্ত্তনেরি সুর।
গোয়াল ঘরে পুর্‌লে এনে এই চমরী গাই
বল্‌গা হরিণ উটের গাড়ী টান্‌বে কেন ভাই।
আনন্দ যার শীতল গৃহে থাক্‌তে জীবন ব্যেপে
মীন-রাণী কি উড়তে পারে উড়োজাহাজ চেপে !
আতপ চাউল অর্ক-কুসুম দূর্ব্বা ফেলে হায়
সূর্য্যার্ঘ্য রচলে তুমি রজনীগন্ধায়।
জাফ্রাণ ফুল ফুটিয়ে দিলে তুমি শোণের গাছে
আন্‌লে বারি গঙ্গোত্রীর জ্বালামুখীর কাছে।
আনন্দ ও বিস্ময়েতে দেখছি শুধু চেয়ে
রাজপুত্‌নায় যেমন সাজে ল্যাপলাণ্ডের মেয়ে !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চিররহস্য-সন্ধানে ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

——:০:——

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার দিন দুয়েক পরে, এল র‍্যামি এমন একটা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন যাহা তাঁহার বিশেষ প্রিয় নয়—প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র পাঠ। ঝড় ও বন্যার খবরগুলির উপর তিনি চোখ বুলাইয়া গেলেন,—দেখিলেন যে ইলফ্রাসকোম্বের দিকে ঝড়ে অনেক ক্ষতি ঘটিয়াছে—কিন্তু রাজনীতি বা বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন কোনো প্রয়োজনীয় সংবাদ দেখিলেন না যাহাতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। এক কোণে খানতিনেক কেতাবের সমালোচনা কতকগুলো ঔষধের বিজ্ঞাপন,—অপেক্ষাকৃত বেশী পয়সা ও প্রতিপত্তিশালী জনকতক লোকের সহর-ত্যাগ বা সহরে প্রত্যাবর্ত্তন-সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রভৃতি ব্যাপার হইতে এল র‍্যামি জানিতে পারিলেন যে জনৈক ভদ্রলোক একখানা মামুলি-ধরণের পদ্যপুস্তিকা রচনা করিয়া এবং ছাপাখানার দৌলতে নাম জাহির করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"যেহেতু এই ভূমণ্ডলের অধিকাংশই এমনই সমস্ত উপাদানে গঠিত যা' দেখা যায় না, এবং যেহেতু অদৃশ্য জগতের আলোচনাকে দৃশ্য জগতের আলোচনারই অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে, সে-কারণ তিনি (ঐ পদ্যপুস্তিকাকার) স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে এরূপ আলোচনায় অনেক বড় বড় সম্ভাবনার পথ খুলিয়া পড়িতে পারে"।

"তিনি 'স্বীকার করিতে প্রস্তুত'—বটে!"—কাগজখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া এল র‍্যামি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—"আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক অজ্ঞ এই সমস্ত জ্ঞান-গর্ব্বীর দল! এই পুঁচ্‌কে পদ্যকার—ইনিও 'স্বীকার করিতে প্রস্তুত' যে অদৃশ্য জগতের আলোচনায় অনেক বৃহৎ সম্ভাবনার অবকাশ আছে! চমৎকার এই শিষ্টাচার! পৌরাণিক যুগের তুলনায় আধুনিক জীবন-যাপন-প্রণালীর কি ভয়ানক বদল হয়ে গিয়েছে! তখন অদৃশ্য-জগতের আলোচনাই দৃশ্য-জগত-পরিচয়ের প্রাথমিক সোপান বিবেচিত হ'ত,—দৃশ্য-জগত ছিল অদৃশ্য-জগতেরই প্রতিবিম্ব—অদৃশ্য ছিল 'কারণ' আর দৃশ্য তার 'কার্য্য'। কিন্তু এখন

আমরা উল্টো পথেই ভেসে চলেছি—ধরে নিচ্ছি যে দৃশ্যই 'সত্য' আর অদৃশ্য 'কল্পনা'-মাত্র !

পার্শ্বের টেবিলে রচনা-নিরত ফেরাজ এ-কথায় ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

"তোমার উক্তিতে অসঙ্গতি প্রকাশ পাচ্ছে,—কেননা তুমি নিজেই প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছু বিশ্বাস কর না"।

"কিন্তু, এটা ভুলে যেও না, যে আমি অদৃশ্যজগতকে প্রমাণ করতে পারি, তার স্তরগুলি অনুসরণ করতে পারি, আর যে প্রণালীতে তা' নিজেকে পরিদৃশ্যমান করে তাও কতক কতক জানি—কতক কতক অবশ্য। প্রামাণ্যের সীমারেখা আমি অতিক্রম করিনে। অপরপক্ষে তুমি, কল্পনার পাখায় চড়ে সে সীমা ছাড়িয়ে যাও—পরীর দেশ, নক্ষত্র-জগত, এমন কি স্বয়ং ভগবানকে পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাও। আমি অতটা পারিনে,—আমি শুধু 'স্বীকার করিতে প্রস্তুত' নই, কিন্তু স্বীকার করি ; তবে তথ্য-হিসাবে গ্রাহ্য করবার আগে আমি তা যাচাই করে দেখি, এই যা।"

"তবু, অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করো তো" ?

"স্বভাবতঃই। ছায়াপথে হাজার হাজার সূর্য্যের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি, যদিও তাদের দৃশ্যমান বলা যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থায় অদৃশ্য অস্তিত্বে বিশ্বাস না করাই আমার পক্ষে মূঢ়তা হবে—কিন্তু তাই বলে অদৃশ্য শক্তির 'মায়া' আমাকে প্রতারিত করতে পারে না। থিয়সফির কারবার এই রকম একটা ইতর প্রতারণা নিয়ে—এ-পদার্থের ব্যবসায়ীরা কি আপন কল্পনাকে কি অপরের ধারণাকে প্রতারিত করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ; যে সব প্রাচ্য ঐন্দ্রজালিক 'ইশা' ও ইহুদী-পুরোহিত 'আরণ'কে শিখিয়েছিলেন, কি উপায়ে পশুবৎ অজ্ঞ শিষ্য সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়ে বশ করতে হয়—এঁরা হচ্ছেন তাঁদেরই অতি অধম অনুকারী। বায়ুমণ্ডল-প্রতিভাসিক, ধাতুদ্রব্য বা আলোক-তরঙ্গের ওপর প্রভাব-বিস্তার করবার নৈপুণ্য, যা' নাকি এপোলোনিয়াস বা আলেকজ্যাণ্ডারের ছিল, এই সব অধুনিক 'মিডিয়ম' দের কারুর মধ্যেই নেই। এই দু'জন বৈজ্ঞানিক যাদুকরই যিশুখৃষ্টের সমসাময়িক আর ঐ এপোলোনিয়াসও খৃষ্টের মতন এক কুমারীকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। ঐন্দ্রজাল

ছিল এ-সময়ের একটা ফ্যাসান,—এ-যুগেও দেখ্‌ছি, ইতিহাসের একঘেয়ে পুনরাবর্ত্তনের মতন ও-জিনিস আবার আদর পাচ্ছে। আমরা আজ যা' জানি, তা' অনেক আগেই জানা হয়ে গিয়েছে; তবু অতিভক্তি বা অন্ধসংস্কার সব কালেই সমান,—'মহাত্মা' বা ঐজাতীয় জীবে অন্ধভক্তি করতে প্রস্তুত হবার মতন নির্ব্বোধ কোনোকালেই অভাব হবে না,—তা' ছাড়া, 'মন্ত্রের' আবৃত্তি, যদি সুউচ্চারিত হয়, এই উনবিংশশতাব্দীর লোকের মনেও ঠিক তেমনিই প্রভাব বিস্তার করবে যেমন নাকি খৃষ্ট জন্মাবার আগেও করতো।"

"মান্ত্রের আবৃত্তি কাকে বলে?" ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

"জোচ্চরি,"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"যা' প্রাচ্যদেশবাসী প্রত্যেক প্রাচীনারা ও দিব্য-দৃষ্টির ভান-কারী ঐন্দ্রজালিকেরা জানে। গোবেচারী ধরণের কোনো লোককে নিয়ে তা'র ওপর একটু জল ছিটিয়ে দাও, আর সেই সঙ্গে তা'র দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তোমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর—তারপর কতকগুলো রাসায়নিক মিশ্রণ আর গন্ধদ্রব্য আগুনে নিক্ষেপ কর—ঐ আগুনের ধোঁয়া আর গন্ধ নাকে গিয়ে লোকটার ঝুমুনি আসবে। এই অবস্থায় তুমি যা' দেখাতে বা শোনাতে চাও, ঠিক তাই সে দেখ্‌বে বা শুন্‌বে। কিন্তু ইচ্ছা-শক্তিই হচ্ছে এক্ষেত্রে আসল জিনিস,—আর, আমি যদি কারুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাই, তা' হ'লে জল বা আগুনের সাহায্য একেবারেই পরিহার করে একমাত্র ঐ ইচ্ছাশক্তি-বলেই তা' করতে পারি।

"আমি জানি যে তা' পারো"—মৃদু হাস্য করিয়া ফেরাজ অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে জানাইল।

"আজকাল সমালোচনা জিনিসটা আশ্চর্য্য-রকম চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে!"—কাগজখানা আবার টানিয়া লইয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"গভীর রসবোধের একটা নমুনা এইখানেই দেখ্‌ছি—'বুঝিবার জন্য এই বইখানি পঠিত হওয়া আবশ্যক'—তার মানে? না পড়ে কে আর কোন্‌কালে কোনো বই বুঝতে পেরেছে?"

হাসিয়া ফেরাজ বলিল—"সেদিন আইরিণের কোনো বইএর এম্‌নি একটা সমালোচনা দেখে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে সমালোচককে ধরে আছাড় মারি। সেটা সমালোচনা নামের যোগ্য নয়,—মানুষ যে কতখানি ইতর হ'তে পারে, তারই একটা নমুনা।"

"কিন্তু এই সমস্ত জিনিসেই পয়সা আসে!" ব্যঙ্গভরে এল র‍্যামি বলিলেন—"এইগুলোরই নাম উনবিংশ শতাব্দীর বীরত্ব,—তার ওপর.........এতেই নাকি পৌরুষ প্রকাশ পায়!"

"তা' হ'লে,—প্রাচীন ইতিহাসে যদি সত্য থাকে,—মানুষ যা' ছিল, এখন আর সে-রকম নেই"—ফেরাজ বলিল।

"না—সে-রকমটী আর নেই ভাই,—সমস্তই বদল হ'য়ে গিয়েছে। নারীজাতি একদিন সত্যসত্যই পুরুষের ক্রীতদাসীবৎ ছিল। এখন তা'রা প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছে, অন্ততঃ ইচ্ছা করলে হতে পারে। পুরুষকে অল্পে অল্পে এ অবস্থায় অভ্যস্ত হ'তে হবে—এখন পরিবর্ত্তনের মুখে তা'রা এটা পছন্দ করছে না। তা' ছাড়া, যতদিন পৃথিবী থাক্‌বে ততদিন অত্যাচারী পুরুষ ও নিপীড়িতা নারী-দুষ্প্রাপ্য হবে না। মানুষ যা' ছিল, এখন তারা তা' নয়,—যা' হতে পারে তাও তারা নয়।

"তারা দেবতা হ'তে পারে"—ফেরাজ বলিল—"কিন্তু আমার মনে হয়, দানব হওয়াই তাদের অধিকতর কাম্য।"

"অবিকল!"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"কারণ তা' হওয়া সহজ, এবং আরাম-জনক।"

ফেরাজ পুনরায় রচনা-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইল। সে তাহার শ্রদ্ধাস্পদ আইরিণের কথা ভাবিতেছিল,—আর ভাবিতেছিল উপরের কক্ষে পর্য্যঙ্কশয়ান সেই পরমাশ্চর্য্য কুসুম-সৌন্দর্য্যটীকে, যার কমনীয়তার কথা মুখে আনিতেও তাহার সাহস হয় না। আজকাল সে তাহার ভ্রাতার মধ্যে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে,—তাঁহার বাক্য ও ভঙ্গীর স্বাভাবিক উগ্রতা কেমন যেন একটু সূক্ষ্মধরণের কোমলতায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে,—মুখভাবে কেমন একটা কান্তি ও প্রসন্নতা দেখা দিয়াছে,—নয়নের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কোমল দীপ্তি বিকীরণ করিতেছে; কিন্তু এই নম্রতা, ও সর্ব্বপ্রকার অধীরতার অভাব-সত্ত্বেও তিনি সমস্ত দিনরাত গোপন অধ্যয়নে এতই অভিনিবিষ্ট থাকেন যে তাঁহার ভাবী স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে ফেরাজ মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত না হইয়া পারে না।

প্রার্থনায় কি তুমি বাস্তবিকই বিশ্বাস কর, ফেরাজ?" - সহসা যেন কোনো একটা চিন্তা হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া তিনি কনিষ্ঠকে এই আকস্মিক প্রশ্ন করিলেন—"অর্থাৎ, আমি

বলতে চাই, তুমি কি মনে কর যে আমাদের প্রার্থনা-কালে কোনো অদৃশ্য আত্মা সে কথা শোনে ?"

ফেরাজ কলম ফেলিয়া ক্ষণকাল ভ্রাতার মুখপানে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল ; পরে ধীরে ধীরে বলিল—

"তোমার নিজের 'থিওরি' অনুসারেই বাতাস হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড ফনোগ্রাফ,—তা' হলেই দাঁড়াচ্ছে এই, যে সমস্তই শ্রুত ও সুরক্ষিত হয়। তবে প্রার্থনা-সম্বন্ধে সেটা নির্ভর করে, আমার মনে হয়, ঐ প্রার্থনা কিভাবে করা হয় তারই ওপর। সব সময় আমি এতে বিশ্বাস করিনে—তা' ছাড়া আমার আশঙ্কা হয় যে সাধারণতঃ প্রার্থনা-সম্বন্ধে যে ধারণাটা গ্রাহ্য হয়ে থাকে, আমার ধারণা তার সঙ্গে খাপ খাবে না।

"তা' না থাক্—তবু বল"—বাধা দিয়া আগ্রহভরে এল র‍্যামি বলিলেন—"আমি জানতে চাই, কখন্ কি ভাবে তুমি প্রার্থনা কর।"

"বেশ,—তা' হ'লে সত্য কথা এই যে প্রার্থনা আমি খুবই কম করি"—ফেরাজ জানাইল—"সীমাবদ্ধ মানব-ভাষায় আমার সামর্থ্যে যতদূর পারি, কি দিনে কি রাতে, আমি আমার প্রাণের প্রশংসাই অঞ্জলী দিই—কিন্তু কখনও কিছু প্রার্থনা করিনে—এত পেয়েও, আরও চাওয়ায় বুঝিবা নীচতাই প্রকাশ পাবে। ভগবান যে পরম জ্ঞানী এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—অতএব একটা জিনিস ছাড়া আমার চাইবারও কিছু নেই।"

"সে জিনিসটা ?"

"শাস্তি !"—ফেরাজ সজোরে উত্তর করিল—"আমি তারই প্রার্থী, তারই ভিক্ষুক ; আমি চাই যেন অন্যায় করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এমন শাস্তি পাই যাতে নাকি ভুল বুঝে নিজেকে শুধরে নিতে আমার দেরী না হয়। পরলোকের চেয়ে ইহলোকে শাস্তিভোগই আমার কাম্য।"

এল র‍্যামির মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর হইল ও ওষ্ঠদুটী একটু কাঁপিল।

"আশ্চর্য্য বালক !" তিনি বলিলেন—"সমস্ত ধর্ম্ম-মন্দির এই বলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে যেন পাপের জন্যে তা'রা ক্ষমা পায়,—আর তুমি কিনা এমনভাবে শাস্তি চাও, যেন সেটা আশীর্ব্বাদ।"

"বাস্তবিকই এটা আশীর্ব্বাদ,"—ফেরাজ বলিল—"আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না,—নিয়মের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করাটা ধর্ম্মমন্দিরের পক্ষেও অসঙ্গত; যে হেতু এ একটী নিয়ম। যখন আমরা স্বাস্থ্য-নীতির বিরুদ্ধাচার করি, দৈহিক যন্ত্রণা ও রোগের আকারে প্রকৃতি আমাদের শাস্তি দেন,—তেমনি ভগবানও আমাদের মনের বিরুদ্ধাচারকে মানসিক দুর্দ্দশার দ্বারা দণ্ডিত করেন। এইটেই হওয়া উচিৎ। আমার বিশ্বাস, যা' কিছু পাবার আমরা যোগ্য, তা'র সমস্তই ইহজগতে আমরা পাই—তা'র একটুও বেশী বা কম নয়।"

"কোনো যত্নপালিত লক্ষ্যের সাফল্য,—কিম্বা বিশেষ কোনো ভোগ্য লাভ করবার প্রার্থনা—তাও কি কখনও তুমি কর না?"—ধীরে ধীরে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"না"—ফেরাজ বলিল—"কারণ আমি জানি, যদি আমার পক্ষে তা' শুভ হয় তবে নিশ্চয়ই তা' পাবো; যদি অশুভ হয়, তবে আমাকে তা' দেওয়া হবে না,—আমার সমস্ত প্রার্থনাও এ নিয়ম বদ্‌লাতে পারবে না।"

কয়েক মুহূর্ত্ত এল র‍্যামি নীরবে বসিয়া রহিলেন,—পরে, উঠিয়া ঘরময় দু'তিন পাক ভ্রমণ করিলেন—ক্রমে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে আধ-ব্যঙ্গ ও আধ-মাধুর্য্য-ভরা একটু হাসি দেখা দিল।

"তা' হলে, ওগো শান্ত-সমাহিত যুবা-দার্শনিক,—প্রার্থনা আমি করবো না"—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ঔজ্জ্বল্যে দু'খানি নয়ন দীপ্ত করিয়া তিনি বলিলেন—"আমি একটা বিশেষ লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছি—বিশেষ কোনো আনন্দ আমি আয়ত্ত করিতে চাই!—সেটা আমার পক্ষে শুভ বা অশুভ যাই হোক্, কারুর সাহায্য না নিয়েই আমি চেষ্টা করবো।"

"যদি শুভ হয়, চেষ্টা সফল হবে"—কতক বিস্ময়ে ও কতক আশঙ্কায় এল র‍্যামির দিকে চাহিয়া ফেরাজ বলিল—"যদি অশুভ হয়, তা' হ'লে হবে না। এই হচ্ছে ভগবানের বিধান।"

"ভগবান—ভগবান—উঠ্‌তে বস্‌তে ভগবান"—বিরক্তিভরে এল র‍্যামি বলিলেন—"আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে কোনো ভগবানই পারেন না!" এই সময় সদর দরজায় ভীরু কর-তাড়ন-শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ফেরাজ কক্ষ-বিনিষ্ক্রান্ত হইল, এবং অনতিপরেই এক শোক-কাতর অশ্রু-প্লাবিত-গণ্ড ব্যক্তিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল।

বিস্ময় বিস্ফারিত-নয়নে এল র‍্যামি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একি! কার্ল!... তুমি এখানে? ব্যাপার কি?"

কার্ল কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অশ্রুবাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, কথা বাহির হইল না; শুধু কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল মাত্র।

"অসুস্থ তুমি"; কোমল কণ্ঠে এই কথা বলিয়া ফেরাজ সযত্নে তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইল এবং এক গ্লাস মদ্য আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল—"নাও, পান কর, সুস্থ হবে।"

কম্পিত হস্তে গ্লাসটী সরাইয়া রাখিয়া কার্ল কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ একটু হাসিতে চেষ্টা করিল,—এবং ইতিমধ্যে কতকটা সামলাইয়া সে কাতর দৃষ্টিতে চিন্তানিবিষ্ট ও সহসা-গম্ভীর এল র‍্যামির সুন্দর অবয়বখানির দিকে চাহিল।

"আপনি......আপনি......শোনেন নি বোধ হয়"—সে টানিয়া টানিয়া আরম্ভ করিতেই, এল র‍্যামি প্রশান্ত গম্ভীরভাবে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"শান্ত হও বন্ধু!—না, আমি শুনিনি,—তবে অনুমানে বুঝ্‌ছি,......ক্রেমলীন..... তোমার প্রভু..... মারা গিয়েছেন।"

তিনি অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। কার্লের চক্ষু দিয়া নবীভূত শোকাশ্রু ঝরিতে লাগিল এবং সে ফেরাজ কর্তৃক প্রদত্ত মদ্যের আস্বাদন চেষ্টা করিল। ফেরাজ চিত্রার্পিত-বৎ দণ্ডায়মান।

"নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা কর"—কার্লের দিকে চাহিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"নিরীহ ডাক্তার ক্রেমলীন জীবনে অনেক দুঃখ ও অত্যল্প আনন্দ পেয়েছেন—এখন তিনি এমন জায়গায় গিয়েছেন যেখানে দুঃখ নেই, যেখানে সমস্তই আনন্দময়।"

"আহা!"—একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কার্ল বলিল—"একথা বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছে হয়, একথায় আমি বিশ্বাস করতে চাই! কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এটা ভগবানের বিচার,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই!—আহা, বেচারী মা আমার এই কথা বল্‌তেন,—ভগবানের বিচার!"

মনের কোণ হইতে একটু যেন বিরক্তি এল-রামির চিন্তা-গম্ভীর আননের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। একটু আগে যে-কথা তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন—"আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে কোনো ভগবানই পারেন না"—আমার তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। আবার কিনা এই লোকটা কাঁদ্‌ছে, কাঁপছে, আর সেই 'ভগবানের বিচারের' কথা এমনভাবে পাড়্‌ছে যেন এটা বাস্তবিকই কোনো ঐশী-সংঘটন যার অন্যথা নেই।

"কি ভেবে তুমি একথা বল্‌ছো?"—মনের অধীরতা যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"অবশ্য আমি জানি যে কোনোরকম আকস্মিক দুর্ঘটনাতেই তাঁর জীবন শেষ হয়েছে, নইলে কখনই"—কথাটার উপর বিশেষভাবে উৎপ্রেক্ষা দিয়া তিনি বলিলেন—"কখনই তাঁর মৃত্যু সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে স্বভাবের অতিরিক্ত বিস্ময়কর কিছু ছিল কি?"

"অতিরিক্ত বিস্ময়কর! হা ভগবান!"—অনেকখানি হতাশ ও ভীতিভঙ্গিমার অপব্যয় করিয়া সে তাহার প্রভুর মৃত্যু-সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে আপন অজ্ঞাতসারে এল রামির উষ্ণরক্তের ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল,—নিজের দুঃসাহসিক-নৈপুণ্য-সৃষ্ট সেই ভীষণ চক্রতলে বৃদ্ধের শীর্ণ শরীরখানির ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণ দৃশ্য, তিনি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে মনে মনে বলিলেন—"লিলিথ! সুখবাদিনী লিলিথ! এ সত্ত্বেও তুমি বল্‌তে চাও, জগতে মৃত্যু নেই!" ফেরাজ কিন্তু কার্লের ঐ বিবৃতি উত্তেজনা-লেশ-পরিশূন্য প্রশান্ত আননে শুনিতেছিল—সমস্ত শুনিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল—"যাক্, কষ্ট হয়নি তাঁর; বিদ্যুতাগ্নি নিশ্চয়ই তাঁর দেহ-মনের ওপর খুবই ক্ষিপ্র কাজ করে থাক্‌বে। আমার বিবেচনায়, এ-রকম পরিসমাপ্তি সুন্দর"

কার্ল এই মধুর-দর্শন যুবকটীর দিকে সভীতি-বিস্ময়ে চাহিল—কি!—বিষম গুরুভার একখানা নিপতিত চাকার তলায় কাগজের মতন চেপ্টা হইয়া যাওয়া,—সুদৃশ্য সমাধি-লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য খানিকটা হাড়-মাংসের অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণে পরিণত হওয়া—এটা কি না "সুন্দর পরিসমাপ্তি!" কার্ল শিহরিয়া উঠিল,—যুবক ফেরাজের আশ্চর্য্য দার্শনিকতা তাহার অভ্যস্ত ছিল না—সে কখনও তারকা-রাজ্যের উদ্দেশে আকাশ-ভ্রমণে দেহের বাহিরে যাত্রা করে নাই।

"ভগবানের বিচার"—সে বিমর্ষভাবে বলিল—"তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রভু আমার এত বেশী পড়তেন আর এত বেশী জানতে চাইতেন যে আমার বোধ হয়, ভগবান তাতে রাগ করেছিলেন—"

"নিরীহ বেচারী,"—একটু যেন বিরক্ত হইয়া এল র‍্যামি বাধা দিলেন—"যা' তুমি বোঝো না, সে সম্বন্ধে কথাও ব'লো না। তুমি খুব বিশ্বাসী, শ্রম সহিষ্ণু ও প্রভুভক্ত ছিলে সত্যি, কিন্তু তোমার প্রভুর 'বেশী জানতে চাওয়া' কি 'ভগবানের রাগ করা, এ-সব কথা হচ্ছে নির্ব্বোধের। আমরা এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি, নিজেদের সম্বন্ধে বা এই পৃথিবী-সম্বন্ধে, যতদূর পারি জানতে—শিক্ষা বা জ্ঞানের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে; এই কোটী কোটী প্রাণীর মধ্যে একজনের ওপর খুসী-মাফিক রাগ করবার জন্যে কোনো পরমেশ্বরের ধারণা হচ্ছে একেবারেই অসঙ্গত—"

"কিন্তু কোনো প্রাণী যদি নিয়মের বিদ্রোহী হয়, নিয়ম তাকে ধ্বংস করে"—মৃদু-কণ্ঠে ফেরাজ প্রতিবাদ করিল—"একটা মাছি যদি আগুনে পড়ে, আগুন তাকে পোড়ায়—নিয়ম কার্য্যকরী হয়—আর এই নিয়ম হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা।"

এল র‍্যামি বিরক্তিভরে ওষ্ঠ-দংশন করিলেন।

"সে যা' হয় হোক্,—কিন্তু গ্রাহ্য করবার বা বাধা দেবার আগে, নিয়মটা যে ঠিক কি, তা' প্রথমতঃ জানা দরকার।"

ফেরাজ কোনো জবাব করিল না। বস্তু ও প্রাণ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি সহজিয়া নিয়ম, যা' নাকি সেই 'সাইপ্রস-দ্বীপের সন্ন্যাসী'-গুরুর শিষ্যসম্প্রদায় মানিয়া লইয়াছে, তাহারই কথা সে ভাবিতেছিল।

কার্ল এই সময় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়বৎ ফেরাজের দিক হইতে এল র‍্যামির দিকে এবং এল র‍্যামির মুখ হইতে ফেরাজের মুখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বলা-কওয়া একেবারেই তাহার বুদ্ধির অগম্য; এই সব সূক্ষ্ম দার্শনিকতা সে বুঝিতে পারেও না বুঝিতে চায়ও না।

"আমি আপনাকে জিজ্ঞেস্ করতে এসেছিলুম,"—একটু থামিয়া ও ঢোক গিলিয়া সে বলিল—"এখন সমস্ত শোনার পর সেই বিদ্‌ঘুটে জিনিসটা, যা' আমার প্রভুকে খেয়েছে,

আপনি নিয়ে আসবেন কিনা ? আমি নিজে সেটাকে ছুঁতে ভয় পাই, আমার প্রতিবেশীরাও তাই,—এখনও সেটা সেই ভাঙা ঘরে মস্ত একটা আলোর মতন পড়ে চক্‌চক্ করছে। যদি দরকারে লাগে, সেটা নিয়ে আস্‌বেন—আর, ভাল কথা, এইটে আমি প্রভুর ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

একখানা ঠিকানা-লেখা গালা-মোহর-করা খাম সে এল র‍্যামির হাতে দিল। খুলিতেই যে চিঠিখানি হাতে পড়িল, তাহা এই :—

"এল র‍্যামি জ্যারানোস্ সমীপেষু—

প্রিয়বর, যদি আমার মৃত্যু ঘটে, আমার যা'-কিছু সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করিও আর এই উপকারটী করিও—চুম্বকচক্রখানা ধ্বংস করিয়া আমার সম্পাস্ত-প্রতিজ্ঞাটিকেও সহমরণে পাঠাইও।"

স্বাক্ষরের নিম্নে দুই বৎসর পূর্ব্বের তারিখ,—পাঠান্তে এল র‍্যামি কার্লকে চিঠিখানি দিলেন,—সেও পড়িল। ক্ষণকাল নীরবে কাটিল,—পরে এল র‍্যামি কক্ষ-প্রাচীরগাত্রের একটী ছোট আলমারী খুলিয়া মদ্যবৎ রক্তবর্ণ পদার্থে পূর্ণ একটী শিশি বাহির করিয়া আনিলেন।

"শোন কার্ল,"—তিনি বলিলেন—"সে প্রকাণ্ড পাথরখানাতে ভয় পাবার মতন 'বিদ্‌ঘুটে' কিছুই নেই। সম্ভাব্য সকল জগতের সেরা জগত আমাদের এই পৃথিবীতে যাবতীয় নশ্বর জিনিসের মতন সেটাও নশ্বর। আপাততঃ ইলফ্র্যাকোম্বে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, তা' ছাড়া প্রয়োজনও বিশেষ দেখ্‌ছি নে। বন্ধুর কাগজপত্র বা সামান্য আসবাব যা' কিছু আছে তা' তুমিই নিয়ে আস্‌তে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে ; তা' ছাড়া ঐ পাথরটাও, তুমি নিজেই নষ্ট করতে পারো। শুধু এই শিশির তরল পদার্থটুকু তার গায়ে ঢেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে হবে না—মিনিট দশেকের মধ্যেই তা' গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবে।"

কার্লের চোখে মুখে একটা বিস্ময় দেখা দিল ; সে ভয়ে ভয়ে সম্মতি জানাইল। শিশির ভিতরকার ও-রকম গুণবিশিষ্ট একটা পদার্থকে ভয় করাই তাহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক—

সেই জন্য সে যেন নিতান্তই অনিচ্ছায় ও দ্বিধাভরে এল র‍্যামির হাত হইতে সেটী গ্রহণ করিল। একটু চাপা হাসি হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—

"ভয় নেই কার্ল! এতে বিপদ কিছুই নেই,—তোমার গায়ে লাগ্‌লে এ-জিনিস তোমাকেও ধুলো করে ফেল্‌বে না. নির্ভয়ে পকেটে এটা রেখে দিতে পারো যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করলে একটা পাহাড়ও এতে ধসে' ধুলো হয়ে যেতে পারে সত্যি,—কিন্তু রক্তমাংসের ওপর এটা কাজ করতে পারে না।"

"পাহাড়ও ধসে' যায়!"—শঙ্কাবিবর্ণমুখে কার্ল বলিল· "আপনি বলতে চান যে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়কেও এ-ওষুধ মাটীর ঢিবি করে' দিতে পারে?"

"একটা সহরকে, কি দুর্গকে, কি সাগরের বাঁধকে—এককথায় পাথরের তৈরি যে কোনো জিনিসকে"—সহজ কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"কিন্তু মানুষের এতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।"

"ফেটে গিয়ে কোনোরকম আওয়াজ-টাওয়াজ হবে না তো?"—তথাপি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে শিশিটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

"আদৌ না—একেবারেই নিঃশব্দে অথচ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এর কাজ চল্‌বে; ভয় নেই।"

মনের মধ্যে স্পষ্টই একটা অশেষ স্বস্তি লইয়া কার্ল ধীরে ধীরে শিশিটা পকেটে রাখিল,—এবং বিশেষভাবে অনুভব করিল যে তাহার নিকট এমন একটা জিনিস রহিল যাহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে পর্ব্বতকেও মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত করিতে পারে। ভবিষ্যতে কোথায় থাকিবে বা কি করিবে তাহা এল র‍্যামি জানিতে চাওয়ায় কার্ল বলিল—"কোনো-খানে আর একটা চাকরীর সন্ধান করবো, কিন্তু জার্ম্মাণীতে আর ফিরবো না। অবশ্য এই 'পিতৃ-ভূমি'র কথা মনে করতে আমি ভালবাসি; তা' ছাড়া, সমস্ত কলজির জোর দিয়ে 'রাইন'-নদীর স্তুতি-গাথাও গাইতে পারি—কিন্তু তাই বলে সেখানে বাস করতে আমার মন, সরে না। এমন একটা জায়গা আমাকে দেখতে হবে যেখানে কোনো 'গিন্নি'র কাজে লাগা যায়; কেননা, কর্ত্তাদের চাকরী প্রায়ই একঘেয়ে হয়। যে ভদ্রলোক 'ঘোড়দৌড়' খেলে, সে ঐ নেশাতেই মেতে আছে—যে মাতাল সে কেবল মদই খাচ্ছে—এইরকম; কিন্তু

স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে এমনটী হবার জো নেই! কোনোদিন তিনি ফুল নিয়ে আছেন, কোনোদিন ছবি, কোনো দিন বা গানবাজনা কখনও বা পোষাক-পরিচ্ছদ—আবার হয়তো বা হঠাৎ পড়ার বাতিকে লাইব্রেরী থেকে রাশি রাশি বই এনেই জড়ো করাচ্ছেন। বুঝ্‌তেই পারছেন এ-সব কাজ পুরুষ-চাকরের পক্ষে যেমন আরামের, তেমনি আমোদের।"

ফেরাজ, গৃহকর্মের এই অভিনব চিত্রে হাসিতে লাগিল, এবং কার্ল অধিকতর প্রফুল্ল হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"ধরুন, যদি আমি কোনো খেয়াল-ভরা দুরন্ত গৃহিণীর কাজে ঢুকি, তা' হলে অষ্টপ্রহর একটা-না-একটা কিছুতে আমাকে লেগে থাক্‌তে হবে। কোনো সন্ধ্যায় বা ছবির দোকানের সাম্‌নে তাঁর শাল বা র‍্যাপার হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছি,—কোনোদিন বা লাইব্রেরী থেকে ঘরে, আর ঘর থেকে লাইব্রেরীতে ছুটোছুটী করছি,—বিশেষ ফুর্ত্তির কথা এই, যে কখন তাঁর কি খেয়াল হবে কোনোমতেই তা' আন্দাজ করা যাচ্ছে না। এ একটা ভারী মজার ধুক্‌পুকুনি,—কেমন নয়!"

সহসা তাহার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল, এবং পকেটের সেই শিশিটার কথা মনে পড়িবামাত্র তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। এই সব বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কি যন্ত্রণাদায়ক!

এল র‍্যামি অবহিতচিত্তে কার্লের কথা শুনিতেছিলেন।

"বেশ কথা, কার্ল," —অবশেষে তিনি বলিলেন,—"যে রকম চাকরী তোমার পছন্দনই, কথা দিচ্ছি, আমি তাই তোমাকে একটা জোগাড় করে' দেবো। সাহিত্য-জগতে সুপরিচিতা একজন খ্যাতনামা মহিলা এই লণ্ডনে থাকেন—তিনি বেশ ভাল ভাল মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন; তাঁর মেজাজ তোমার প্রার্থনার মতনই খেয়ালী-ধরণের, অথচ অন্তঃকরণটী করুণায় ভরা। আমি তোমার সম্বন্ধে তাঁর কাছে লিখ্‌বো,—আমার বিশ্বাস, তিনি আমার কথা রাখবেন"।

এ-সম্ভাবনায় কার্লের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"ধন্যবাদ, মশাই!"—উল্লসিত-কণ্ঠে সে বলিল—"সুন্দরী মহিলার জন্যে খুব যত্নে তৈরি চা' বয়ে নিয়ে যেতে সে কি আনন্দ হবে তা' আর আপনাকে কি বল্‌বো। ইন্‌ফ্র্যাকোম্বের

সেই ভয়ানক জায়গায় বাস করার পর এরকম একটা চাকরী আমার রুগ্ন মনের পক্ষে 'টনিকের' কাজ করবে। আপনি একটু ভাল করে' তাঁকে আমার সম্বন্ধে বলবেন।"

"নিশ্চয়ই বল্‌বো!"—হাসিতে হাসিতে এল র‍্যামি বলিলেন—"বল্‌বো যে ফিল্ড-মার্শালের' তত্ত্বাবধানে জার্ম্মাণ সৈন্যদলের মতন তোমার ব্যবস্থায় তাঁর গৃহস্থালীও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে।"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কার্ল বিদায় গ্রহণ করিল এবং বৈকালের ট্রেণে ইলফ্র্যাকোম্বে ফিরিল। একটী মৎসজীবী বন্ধুর সহিত সে এক বাড়ীতে বাস করিতেছিল—কিন্তু ফিরিতে অত্যন্ত দেরী হওয়ায় সে-রাত্রে আর ভগ্ন-অট্টালিকার দিকে ঘেঁসিল না। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই শিশিটী পকেটে পুরিয়া সে ছুটিল।

চক্রখানি উপুড় হইয়া পড়িয়া, প্রাতঃসূর্য্য-কিরণের প্রতিফলনে বিচিত্র বর্ণ-রশ্মি বিকীরণ করিতেছিল,—কার্ল প্রবেশ করিতেই তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। এরকম আশ্চর্য্য একটা জিনিস প্রভুর কি কাজে লাগ্‌তো? দিনরাত সেই যে গুরুগম্ভীর আওয়াজটা শোনা যেতো, এই চক্‌চকে জিনিসটাই কি তার কারণ?——এর কি কোনো শব্দ আছে?——এ কল্পনা মনে জাগিবামাত্র সে হঠাৎ সাহস করিয়া ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত তারগুলোর একটা টানিয়া লইয়া চাকাখানার কিনারায় আঘাত করিল।—চুপ!—চুপ!———তাহার হস্ত হইতে তারটা খসিয়া পড়িল, এবং ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। একটা গভীর, গম্ভীর, গোল আওয়াজ বাতাসের ভিতর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পর্য্যবেক্ষণ-ব্যাপারে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া কার্ল পকেট হইতে শিশিটী বাহির করিল এবং সমস্ত তরল পদার্থ-টুকু ঐ চক্রগাত্রে ঢালিয়া দিল। রক্তের মত চাকার সর্ব্বাঙ্গে উহা ছড়াইয়া পড়িল,—চক্ষের নিমেষে ঔজ্জ্বল্য তিরোহিত হইল, অণুকণাগুলি শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, গায়ের চতুর্দ্দিকে ফোস্কা উঠিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে কার্লের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখেই ধূলি-স্তূপে পরিণত হইয়া গেল।

কক্ষচ্যুত গ্রহ যেমন করিয়া ধ্বংস হয়, তেমনি করিয়াই বিজ্ঞান-জগতের মহাবিস্ময় সেই চুম্বক-চক্র, তাহার 'অভ্রান্ত গতি' ও 'তাললয়পূর্ণ শব্দসঙ্গীত'এর ইতিহাস লুকাইয়া ধ্বংস-লাভ

করিল—সে সম্পাদ্য-মীমাংসা-কল্পে বহু বর্ষের অক্লান্ত চিন্তায় ও পরিশ্রমে সেটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া রহিল.........আর বুঝিবা আজও অমীমাংসিতই পড়িয়া আছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রেমলীনের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পর দু'তিন সপ্তাহ ধরিয়া এল র‍্যামির মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। এ ক'দিন ক্রমাগতই তিনি পড়িতেছেন, কিন্তু সে অধ্যয়নে তেমন বিশেষ তন্ময়তা নাই—লিলিথের কক্ষে তাহার পালঙ্কপার্শ্বে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটাইয়া দিতেছেন—নীরবে চিন্তাবিভোর হইয়া; দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, তিনি তাহাকে জাগরিত করেন নাই বা কোনো প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন নাই।

"মনে করলে কতই না উন্নতি করতে পারতুম"—তিনি ভাবিতেছিলেন—"কতই না অর্থসঞ্চয়, কতই না যশোলাভ আজ ঘটতে পারতো! এই আমার শক্তি, যা' অতি দুর্বিনীত সাগর-তরঙ্গকেও শান্ত করে' দিতে পারে—প্রস্তর-খোদিত লিপি, শত-শতাব্দীও যার বিলোপ-সাধনে অক্ষম, কেবলমাত্র কয়েকফোঁটা আরোকের সাহায্যে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত করে' দিতে পারে,—অজ্ঞ ইতর-সাধারণকে অসংখ্য উপায়ে বিস্ময়-বিমূঢ় করে' দাস্যে নিযুক্ত করতে পারে; এই শক্তি—যাতে রাজা মহারাজার চেয়েও বড় হ'তে পারা যেত, এ-শক্তি নিয়েও এমন সাধারণভাবে জীবন-যাপনে আমি সন্তুষ্ট কেন? কেন?—এইজন্যে যে, প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক ভেল্কির সাহায্যে অজ্ঞ-সাধারণকে প্রতারিত করতে আমার মন সরে না,—দ্বিতীয়তঃ, অসম্ভবকে আমি যাচাই করতে চাই; দেখতে চাই, বাস্তবিকই অসম্ভব কোথাও কিছু আছে কিনা। সূক্ষ্মতর কিছু, যা' জগতে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না—যার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নি,—তাই হ'চ্ছে আমার উচ্চাশার লক্ষ্য। আত্মা!.........কি রকম এ জিনিস? কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানে এ গঠিত? এর আকার কেমন, অনুভূতি কি রকম, ক্ষমতা কতখানি? এইটাই—শুধু এইটাই হচ্ছে চরম রহস্য,—একবার এইটাকে বুঝ্‌তে পারলেই ভগবৎ-বুদ্ধিও আমাদের কাছে সরল হয়ে যাবে। 'আত্মা' যে কি, সে সম্বন্ধে যতদিন আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ততদিন নরনারীকে আত্মরক্ষার উপদেশ দিয়ে প্রচারকেরা সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই করছে না। যা' প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য, তা' এই, যে আমাদের বন্ধুবান্ধবেরা মারা পড়ে এবং

একেবারেই অদৃশ্য হ'য়ে যায়। যেভাবে তাদের জানতুম আর সেভাবে তা' পারিনে.........আর.........ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়, অথচ এ প্রত্যক্ষ সত্য, যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে তাদের ভুলে যাওয়া; প্রকৃতপক্ষে, বছর তিনচারের মধ্যেই' ফটো বা চিত্র-মূর্ত্তির সাহায্য ছাড়া তাদের মুখাকৃতি স্মরণে আনাও আর আমাদের সুসাধ্য থাকে না।".........লিলিথের পালঙ্ক পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া এল র‍্যামি আজ এই সমস্ত কথা ভাবিতেছিলেন এবং জ্যারোবা তাহার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে বসিয়া অভ্যস্ত সীবন-কার্য্য চালাইতে চালাইতে চিন্তানিবিষ্ট এল র‍্যামির মুখের দিকে মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

"অন্তর্দ্দাহ আরম্ভ হয়েছে"—এক সময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল—"রক্তের মধ্যে কম্পন, অস্থিরতা, বিস্ময়, বাসনা। হৃদয়ের বেদনা থেকেই হৃদয়ের শান্তি আসে—আর বাসনা থেকেই চরিতার্থতা দেখা দেয়। এ-জগতের প্রাচীন দেবতারা পুরাকালের মতন বহ্নি থেকে—অশ্রু থেকে—তিক্ত-মাধুর্য্য থেকে প্রেমকে পুনঃসঞ্জীবিত দেখে কি প্রফুল্ল হবেন না? প্রেমের জগতে ভালবাসাবসির মধ্যে বিচরণ করার সুখ পুরাকালের যুবক-যুবতীরাই জানতো!—সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মোহ-মদিরা, তটিনীর কলগান, অরণ্যের গীতিমর্ম্মর, নক্ষত্রের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, ফুলবনের সুবাস—এ-সমস্তই যুবকযুবতীর হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দ মিলিয়ে প্রকাশ পেত;—কিন্তু এখন,—এখন জগত বুড়িয়ে গিয়েছে—এখন সে ঠাণ্ডা, শুষ্ক, নিরানন্দ।"

এমনি করিয়া অর্দ্ধ-স্পষ্ট ও অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন নিম্নস্বরে সে বকিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু এল র‍্যামির চিত্ত সে সকল উক্তিতে আকৃষ্ট হইল না বা সেদিকে তাঁহার নজরও পড়িল না; তন্দ্রাচ্ছন্ন লিলিথের প্রতিই এখন তিনি নিবদ্ধ-দৃষ্টি।

এই সময় যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইত যে দিনের পর দিন কি জন্য এ-ঘরে আসিয়া তিনি ঐ শয়ানা সুন্দরীটার পানে নীরবে চাহিয়া তাহার সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জবাব দিতে পারিতেন না। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যেমন, তাঁহার মধ্যেও সেইরূপ এমন একটা কিছু এখানে ছিল যাহা তাঁহার স্বভাবেরই অংশ—যাহা তিনি বুঝিতেন না বা বিশ্লেষণ করিতেও তেমন মনোযোগী ছিলেন না। যিনি ভগবানের বা ঐশী

লীলার রহস্ত-উদ্ভেদের জন্ত সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, জেরা করিলে সম্ভবতঃ তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে আপন রহস্ত-উদ্ভেদই তাঁহার নিকট অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নিজের চিন্তা ও যুক্তির সঙ্গতির জন্ত তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেন বটে, তথাপি অন্তরের অন্তরে তিনি জানিতেন যে অনেক বিষয়েই তিনি সঙ্গতি-রক্ষা করিতে পারেন না। অদম্য ইচ্ছাবলে জয়লাভ সত্য হইতেও, নিজের কাছে তিনি স্বীকার করিতেন যে তাঁহার আদেশের অনুগতা শয়ানা লিলিথের প্রশান্ত ধীর ও নীরব ভঙ্গীটীর মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা তাঁহাকে বিচলিত করে, তাঁহার চিন্তাধারাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। আগে এরূপ হইত না অবশ্য,— কিন্তু এখন হয়। তাঁহার বিবেচনায়, যেদিন হইতে সাইপ্রস-দ্বীপের সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন সেইদিন হইতেই এ-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে—আর, একথা মনে করিলেও তাঁহার মধ্যে অধীরতা ও বিরক্তি দেখা দেয়; অসঙ্গত ও অন্যায় সংশয় তাঁহাকে পীড়া দিতে থাকে। কারণ,—গুরুদেব (যেহেতু এই সংজ্ঞাতেই তিনি সংঘের সর্ব্বত্র পরিচিত) কি বলেন নাই যে লিলিথের আত্মাকে তিনি 'দেখিতে' পাইয়াছেন?—অপরপক্ষে, এল র‍্যামির নিজের স্বপ্ন দৃষ্টি আজ পর্য্যন্ত এতখানি সুখদ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। তারপর ফেরাজ,—ফেরাজের প্রার্থনা ও অনুনয়ও এই তন্দ্রাচ্ছন্না সুন্দরীর ওষ্ঠপুট হইতে একটু হাস্ত আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে—ইহাতে প্রমাণ হয় যে সেও অবশ্য ইহার মধ্যে একটা অস্পষ্ট তৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চারিত করিয়াছে! এই সমস্ত চিন্তা যখন তখন তাঁহার মনে কাঁটার মতন বিদ্ধ হইতে থাকে এবং তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করে—কেননা, এ-ব্যাপারের সহিত এমনি একটা অতৃপ্তিজনক ধারণা জড়িত যে লিলিথ একান্তভাবে তাঁহারই নিজস্ব নয়—অন্যেরও তাহার চিন্তায় অল্পবিস্তর অংশ আছে। সম্পূর্ণরূপে নিজেরই জন্ত কিছুই কি তিনি পাইবেন না?—মৃত্যুর হস্ত হইতে ছিনাইয়া আনা এই জীবনটা পর্য্যন্ত নয়?—ক্রুদ্ধ-বিরক্তিভরে বারংবার আপনাকে এই প্রশ্ন করিতে করিতে একটা জিদ্ তাঁহার ভিতর হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। না,—এ চলিবে না; এমনভাবে তিনি ইহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিবেন যে কি-দেবতা কি-দানব কেহই তাহাকে কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

"এ জীবন আমার!" তিনি বলিলেন—"যতদিন আমার খুসী ততদিন এ বেঁচে থাক্‌বে। এর দেহ ঘুমুবে.........যদি এখনও আমি ইচ্ছা করি......কিম্বা.. ...এ জেগে উঠবে। কিন্তু

দেহ জাগুক বা ঘুমুক্—এর আত্মা সর্বক্ষণই আমার আদেশ পালন কর্বে। বৃহত্তর গ্রহের অনুচর-গ্রহেরই মতন এর বিদেশী আত্মা চিরদিনই আমার—আমার !”

লিলিপের পালঙ্কপার্শ্বে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট থাকিয়াই তিনি উক্ত কথাগুলি আবৃত্তি করিলেন,—পরে সহসা উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন,—তৎপরে ভেলভেটের পর্দাখানি অপসারিত করিয়া ও সংলগ্ন-কক্ষটীর দ্বার খুলিয়া দিয়া যেন বা নূতন বায়ুসেবনের আশাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময় তাঁহার কর্ণে সঙ্গীত-লহরী ভাসিয়া আসিল.... ...ফেরাজ গাহিতেছিল—

“ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে
আমার নামটী লিখিও
তোমার মনের মন্দিরে—
পরাণে আমার যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখিও
তোমার চরণ-মঞ্জীরে !”

কম্পিতহস্তে তাড়াতাড়ি দ্বারটী পুনরায় বন্ধ করিয়া দিয়া, যেন বা ঐ গানের স্বরটাকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করিবার জন্য তিনি ভেলভেটের পর্দ্দাটাও টানিয়া দিলেন !

“ভগবান,—ভগবান, !”—মনে মনে তিনি বলিলেন—“এ কি ! কেন এরকম হচ্ছে ?... আমি কি পাগল যে এ রকম দুঃস্বপ্নও আমার মধ্যে দেখা দেয় ?”

বিহ্বল-দৃষ্টিতে তিনি ঘরের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—জ্যারোবা সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, এখন এল র‍্যামির সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। মাংসশিথিল দু’খানি হস্ত বুনন-কার্য্যে তৎপর, অথচ তীক্ষ্ণ ও দীপ্ত দুটী চক্ষু এল র‍্যামির মুখের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি,—এই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন সে কোনো সুনিপুণা বাদুকরী মানুষের ভাগ্যজালই বুনিয়া চলিয়াছে।

“তুমি বড়ই পরে জন্মেছো এল র‍্যামি”—ঈষদ্ কম্পিত নিম্নস্বরে সে বলিল—“পৃথিবীর যৌবন শেষ হয়ে গিয়েছে, হৃদয়ের বসন্তঋতু আজ বিশ্ববাসীর কাছে অপরিচিত। বড্ড পরে

জন্মেছো তুমি— বড্ড পরে! এখন সমস্তই খৃষ্টের প্রাপ্য.—দেহ, শোণিত, শিরা, আত্মা,—তার ক্রুশবিদ্ধ শুভ্র সুন্দর প্রত্যেকটী মাংসপেশীর জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' মানুষকে ভীষণ যন্ত্রণা ও শাস্তি স্বীকার করে' প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এমন কি, প্রেমও এখন দেহের ভেতরকার কণ্টক, আর এর জ্বালাও মূল্য দিয়ে শোধ করতে হবে—এ সময়টা হচ্ছে পরিসমাপ্তি-পূর্ব্বের দুঃখময় মুহূর্ত্ত। তোমার শিরায় যে রক্ত আজ প্রবাহিত তা' শক্তিমান লোক-শাসক ও রাজদেহ থেকেই উৎসারিত—এখনকার রক্তহীন ফ্যাকাশে হৃদয়গুলোর সঙ্গে তার রং বা দীপ্তির কিছুমাত্র মিল নেই। তোমার বলিষ্ঠ গর্ব্বী অন্তঃকরণে এরক্ত টগবগ করে ফুটছে—সাগরের ঢেউ যেমন চাঁদকে দেখে ফুলে ফেঁপে উঠতে চায়, এও তেমনি তোমার চেয়েও প্রবল এক স্বাভাবিক উত্তেজনায় কামনায় ফুটে উঠতে চাইছে! কিন্তু এখন—এখন সমস্তই খৃষ্টের প্রাপ্য।"

নিশীথস্বপ্নে মানুষ যেমন অসংলগ্ন ব্যাপার দেখে বা শোনে, এল র‍্যামিও যেন তেমনি করিয়াই জ্যারোবার কথাগুলি শুনিলেন। দিনকতক আগে এই ধরণের অসঙ্গত নির্ব্বোধ প্রলাপ হয় তো বা তাঁহাকে ক্রুদ্ধই করিত—কিন্তু আজ তাঁহার ক্রোধ হইল না। কেন ক্রোধ হইবে?—এই যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটা অভূতপূর্ব্ব সূচি-তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া দিয়াছে, সেকথা মনে করিলে কি রাগ করা যায়?

তিনিসির পুষ্পাধারে গোলাপগুচ্ছ একধারে বাতাসে গন্ধ বিকীরণ করিতেছিল,—ধীরে ধীরে সেদিকে সরিয়া গিয়া অন্যমনস্কভাবে তিনি কয়েকটী পুষ্প বৃন্তচ্যুত করিলেন; তাহাদের পাপড়িগুলি কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সহসা যেন কোনো বিষয়ে মনস্থির করিয়া তিনি জ্যারোবার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,—এবং নীরব ইঙ্গিতে তাহাকে কক্ষত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

"আজ রাত্রে আর নয়!"—সে বলিল—"তোমার ইচ্ছা যে আজ রাত্রে আর আমি এখানে না ফিরি?"

এল র‍্যামি ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন।

উঠিয়া ক্ষণকাল জ্যারোবা স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন,—পরে নিঃশব্দ অথচ ক্ষিপ্র চরণ পাতে লিলিথের পালঙ্ক-অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ও তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন তনুখানির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া

অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"অন্তরের ধ্রুবনক্ষত্র আমার! যার শৈশবের বাহ্যসৌন্দর্য্যকে আমি ভালবেসে এসেছি, ভেতরকার আত্মার সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিনি.—তোমাকে জেগে উঠ্তে আদেশ করবার মতন শক্তি যেন প্রাচীন দেবতাদের মধ্যে আজও অভাব না হয়!"

কথাগুলি এল র্যামির কর্ণে প্রবেশ করিল এবং একটু গর্ব্বিত, তিক্ত ও মলিন হাস্য তাঁহার বঙ্কিম ওষ্ঠযুগলে ফুটিয়া উঠিল।

"প্রাচীন দেবতাই হোক্ বা নবীনই হোক্—যায় আসে না"—মনে মনে তিনি বলিলেন—"মানুষের ইচ্ছাশক্তি, যাতে করে' বিশ্বের মূল-উপাদানকেই জয় করা, এমন কি মানুষের দাস্যে নিয়োগ করা যায়,—তার তুলনায় দেবতাদের শক্তি কতটুকু? 'আমার ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা'—প্রত্যেক শক্তিশালী লোকের এই হচ্ছে 'মত'। কিন্তু আমি—আমি কি শক্তি-শালী—না দুর্ব্বলদের মধ্যে দুর্ব্বলতম?.........আর......সত্যই কি সমস্ত খৃষ্টের প্রাপ্য?"

জ্যারোবার কক্ষত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভেলভেটের পর্দ্দাখানির পতন-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করায় এল র্যামি চমকিয়া উঠিলেন। এখন তিনি একা,—লিলিথের নিকট একাকী দণ্ডায়মান।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

সাফল্য।

ব্যর্থ আমার সঙ্গীত বলি
করিতেছ ভাই ঘৃণা
হবে নাক কলা-লক্ষ্মী আমার
সে ঘৃণায় দ্যুতিহীনা

inherits from his fathers." কিন্তু তাঁহার মনোগত রাজতন্ত্র চালাইবার প্রধান অন্তরায় হইল The Political Agent, এ বিষয়ে আমি B. M, Malabariএর Native States গ্রন্থখানার শরণ লইতেছি :—

"A masterful 'Political' loves to brush aside the ruler as of little account, practically relieving him of all responsibility. Lord Mayo described him 'a dangerous official.' He himself rules through a Prime Minister or a Council who intrigue against their own Chief. It is to their advantage to prevent all good understanding between the Rajah and his Political."

তখন ছিল রক্ষণশীল নীতি। ইংরেজ (Official) কর্ম্মচারীগণ অবাধ ক্ষমতাশীল। পক্ষান্তরে বীরচন্দ্র ছিলেন Oriental Prince (পূর্ব্বদেশীয় রাজা) একাধিপপতি। তাঁহার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ রাজা প্রজার মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার মত দেখিত। এই প্রজাগণ-সম্মুখে ইনি একজন সামান্য 'ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট'রূপে ব্যবহৃত হন—কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। অথচ ইংরেজগভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ চাহিতেন ব্রিটীশ অনুকরণে তাঁহার রাজ্য চলে। B. M. Malabari বলিতেছেন :—

"Unfortunately, the better educated and more capable a chief is, the more he feels the anomaly his position. The more he wishes to make a stand for his rights the more determined is the opposition he has to face. It is here that the system fails, as it makes no allowances for persons who are anxious to administer their justly, and to do the best they can for their people and for the Supreme Government."

"But the intervention of the Political Agents does not produce a happy impression on the Princes. It is difficult to convince them that the

acts of the "Political" are not sometimes due to prejudice, the spirit of contradiction and a pretty desire to parade his own importance."

এই কারণেই বীরচন্দ্রের সহিত গভর্ণমেণ্টের বনিবনাও হয় নাই এবং হইতে পারে না। শ্রুতিতে যাহা শুনিয়াছিলাম ইহাই উপলক্ষ করিয়া আমার জন্মের পূর্ব্বের ঘটনা ও রটনা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির ইচ্ছায় সত্য কথা বলিতেছি।

বীরচন্দ্র এক্ষণে স্বর্গে এবং তাহার বিরুদ্ধ পক্ষও প্রায় সকলেই গতাসু। গভর্ণমেণ্টের দপ্তর এবং আদালতের নজির খোঁজ করিবার দরকার নাই। অতএব সাহিত্যিক দরবারে সত্যকথা বলাই নিরাপদ মনে করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং গুরুগত প্রাণ মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। রাজ্য গুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া তিনি নিষ্কণ্টকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যৌবনেই (৩৪ বৎসর বয়সে) মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল কিন্তু পাছে "নাবালক" বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এই রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে এই আশঙ্কায় প্রজাবৃন্দ এবং দেশের কূটনীতিজ্ঞ মূর্খ লোক মিলিয়া একরাত্রের মধ্যে সহোদর ভ্রাতা বীরচন্দ্রকে রাজ্যাধিকার দিয়া বসিল। কারণ ইনি তৎকালে রাজপুত্র রূপে চলিতেন, রাজাকে সহায়তা করিতেন এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু আদালতে উপস্থিত হইলেন অধিকার প্রাপ্তির জন্য বৈমাত্র ভ্রাতা নীলকৃষ্ণ; যিনি চরিত্রে এবং বিদ্যায় বীরচন্দ্র হইতে অনেক লঘু ছিলেন। কেবলমাত্র ব্রিটিশ এলাকার বিস্তীর্ণ জমিদারীর জন্য তিনি এক মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন। মোকদ্দমার যেমন দস্তুর, প্রায় আট বৎসর পরে (প্রিভি কাউন্সিল) Privy Council হইতে হুকুম হইয়াছিল 'বীরচন্দ্রই প্রকৃত রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র ও কুলপ্রথা বীরচন্দ্রের পক্ষে।' এই দীর্ঘকাল তিনি Defacto-Ruler ছিলেন এবং কলা বিদ্যার অঞ্চল ধরিয়া সুখে সচ্ছন্দে ছিলেন। মোকদ্দমা ঘটিত জল্পনা-কল্পনা, সত্য এবং মিথ্যাকথা খানদান এবং পানদানের ধার ধারেন নাই। প্রজার কুলেই সে কুলের কাণ্ডারী ছিল এবং নৌকা কর্ণধারের মতেই চলিয়াছিল। কাজেই বানচাল্ হয় নাই। তাঁহার অভিষেকের পর সর্ব্বপ্রথম পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। বীরচন্দ্র বুঝিলেন আমার উপর একটা Master প্রভু নিযুক্ত হইল। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে Lusai expedition উপস্থিত হয় পরে Eastern boundary লইয়া তর্ক বাধে। School,

Dispensary, Municipality, Jail প্রভৃতি প্রবর্ত্তনার জন্য অনুরোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর Budgetএর কথাও অন্তঃসলিলা ভাবে চলিতে লাগিল। কত কথা, কত বার্ত্তা, কত আপদ, কত জঞ্জাল কেলেঙ্কারীর কম হয় নাই। আমি "জেহেল প্রথা" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এবং তাহাতে যদি কেহ কেহ কিছু কিছু বুঝিয়া থাকেন তবে আমি কৃতার্থ হইয়াছি বলিয়া মনে করিব। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা যাহা কু ছিল আজ সভ্য জগত পর্য্যন্ত তাহাকে সু বলিয়া মান্য করিতেছে। হায়, অদ্য বীরচন্দ্র ইহজগতে নাই। তাঁহার সহিত তাঁহার অবস্থা ও ব্যবস্থা জানিয়া "স্বাস্থ্যে পীত্বা" সুখী হইতেন।

ভাল গোলাপেরই অতিরিক্ত কাঁটা থাকে। কিন্তু সুধীজন মনে করে :—

"গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে,
মধুপ হেতায় যাস্‌নে।"

কিন্তু মধুপ তাহাতেই যাইয়া থাকে কাঁটার ঘা খাইয়াও মধুপান ছাড়ে না। Oriental Prince গুলির অবস্থাও তাই। কর্ণতুল্য দানে, কৃষ্ণতুল্য জ্ঞানে এমন রামের মত রাজা যদি কেহ হইতে পারে এই ভারতীয় প্রাচীন নৃপতিগণই সে পদবাচ্য হইতে পারেন। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি "বীরচন্দ্র বজ্রের মত কঠিন এবং কুসুমের মত কোমল" ছিলেন। তাঁহার এই চরিত্রকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। কাজেই তিনি উভয়কুল অর্থাৎ Government ও On Deputation কর্ম্মচারীবর্গের এবং ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারীবর্গের মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেন না। আদালত হইতে রক্ষা পাইলেন কিন্তু Government of Bengal হইতে মুক্তি পাইলেন না। কাজেই তাঁহাকে নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া পদে পদে বাগবিতণ্ডা এবং মাঝে মাঝে ঝগড়া তদুপরি দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিতেন।

স্থায়ীভাবে একজন Political Agent তাঁহার দরবারে নিযুক্ত হইলেন বটে, বলিতে গেলে এই কর্ম্মচারীর নাম হইতে Ambassador কিন্তু ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের গ্রহ বৈগুন্যে এই Political Agentগণ হইল Defacto Ruler তিনি প্রায় সমস্ত রাজ্যগুলিতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই ত্রিপুরাতেও সেই রীতি ও নীতি যথাযথ প্রতিপালনের

অদম্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। হাঁসের পক্ষে যাহা ভিম্ব বলিয়া গণ্য হয় রাজহংসের পক্ষেও তাহাই গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বীরচন্দ্র জানিতেন পাতিহংস হইতে রাজহংস অনেক পৃথক পাখী।

প্রথমেই 'খটাখটি' বাধিল Indian Princes and Chief শব্দ লইয়া। তিনি বলিতেন "তিনি কখনও Chief নহেন এবং সর্দ্দার ত কখনই নয়।" তাঁহার পুত্রগণ Prince (প্রিন্স) নামে অভিহিত হইতে পারে কিন্তু ছেলের বাপ কখনও এ নামে অভিহিত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথম "Coronation" শব্দটা লইয়া আপত্তির কারণ হইয়াছিল। আপত্তিকারী প্রমাণ করিতে চায় Crown হইতে Cornation নামের উৎপত্তি। কাজেই British Crownএর নিম্নতম ব্যক্তি এ শব্দ ব্যবহার করিতে পারে না। বীরচন্দ্র রসিক ছিলেন এবং জানিতেন "রসিকতা ও রসের কথা।" তিনি বলিয়াছিলেন "আমি Crown রূপী তাজ মাথায় দেই না কিন্তু মুকুট ধারণ করি কিন্তু প্রজা পক্ষে প্রজার দুঃখ বইকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য যেন তাহাদের চক্ষের জল দ্বারা আমার ব্রহ্মরন্ধ্র বন্ধ হইয়া না যায়। "Throne" শব্দটা হিন্দু বাচক শব্দ নহে। আমি ছবি দেখিয়াছি এবং গল্প শুনিয়াছি পুরাকালে যখন Europe প্রায় অসভ্য ছিল তখন যে পাথরে Anglo-Section বসিয়া শাসন করিতেন তাহা অদ্য পর্য্যন্ত "Throne" নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। সিংহাসন" দেখিলেই মনে হইবে সিংহ মূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যে আসন প্রস্তুত হয় তাহাই সিংহাসন। ইহা দেবতার আসন, দেবাসন ব্যতীত অন্য কোন আসনে হিন্দু রাজা বসেন না। "Court" শব্দ শুনিয়া মনে হয় Cromwellএর আমলের কথা। Court তখন প্রায় সমূলে বিনষ্টাতি হইবার মত হইয়াছিল। (দরবার) "Durbar" হিন্দু শব্দ বাচক নহে, কিন্তু "রাজ সভা" উপযুক্ত শব্দ। কারণ এই সভায় প্রবেশাধিকার সকলের নাই। "রাজপণ্ডিত" "সভাপণ্ডিত" এবং "দ্বারপণ্ডিত" প্রভৃতি শব্দ এবং "রাজমন্ত্রী" "অমাত্য" "রাজদূত" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বুঝা যায় হিন্দু রাজাকে দরবারে বসিবার জন্য অনুরোধ আমন্ত্রণ করা বৃথাড়ম্বর। এইভাবে তিনি প্রথম সিংহাসনস্থ হইলেন তোপের আওয়াজেও British Political officer ঘোষণা করিলেন তখন হইতেই বুঝা উচিত ছিল বীরচন্দ্রের মতি ও গতি কি হইবে? Lord Willie Brown আসিয়া British প্রতিভূরূপে কার্য্য সমাধা করিয়া গেলেন।

এখানে অপ্রাসঙ্গিকরূপে আমি একটা কথা বলিতেছি। বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম Lord Willie Brown কুচবেহারের স্বনামধন্য নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের অভিষেকের সময় Programe ঠিক করিতে গিয়া ত্রিপুরার অভিষেকের কাণ্ডকারখানা লইয়া একটা রব উঠিয়াছিল। তৎকালীন "Raise and Rise" নামক পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলাম দুঃখের বিষয় তাহা আমার হাতে নাই সেজন্য উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। বীরচন্দ্রের অভিষেকের সময় আমার বয়স ছিল ৭ বৎসর। আমার পিতৃদেব ছিলেন তাঁহার বিশ্বস্ত লোক। পদ ছিল "আলা হাজারি" মাসিক খোরাকি পাইতেন ৭৲ টাকা এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ পাইতেন রাজভাণ্ডার হইতে। এই ছিল তখনকার অবস্থা ব্যবস্থা। আমার আজও বেশ মনে আছে অভিষেক কার্য্য সমাধা করিয়া এবং রাজ-অন্তঃপুরের স্ত্রীআচার সম্পন্ন করিয়া যখন বীরচন্দ্র আসিয়া নিজকক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং মাথার মুকুটখানা নামাইয়া আমার পিতৃহস্তে দিয়াছিলেন একটা মর্ম্মবাণীর সহিত "ভারত নেও তোমার Crown এবং Sword. আমাকে বোধ হয় চিরকালই যৌবরাজ্যে জীবন কাটাইতে হইবে। পিতৃদেবের কর্ত্তব্য ছিল রাজবেশ ও রাজমুকুট রক্ষা করা। তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন আর পার্শ্বস্থ এই শিশুপুত্রটী (লিখক) বুঝিয়াছিল যেন একটা মেঘের সঞ্চার হইবার উপক্রম হইয়াছে। তখনও Resident Political Agent নিযুক্ত হয় নাই এবং Record নামক একটা রজ্জু (chord) আসিয়া পৌছে নাই যাহাদ্বারা Britania নীতি এবং ত্রিপুরার নীতি লম্বা রজ্জুতে ঝুলিয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে অভিনব খেলা খেলিতে হইবে এবং তাহার প্রসঙ্গ বলিতে হইবে আমাকে পাঠকবর্গের প্রীত্যর্থে কি অপ্রীত্যর্থে বলিতে পারি না। সে বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

স্বদেশ সঙ্গীত।

——:•:——

[রামপ্রসাদী।]

আর কি ভুলি বিদেশ মায়ায় ?
মিলে স্বদেশী ভাই বোন সনে
রত রব স্বদেশ সেবায়।
(আর) ছোঁব না বিদেশী পণ্য
(পাপ্) অন্ন বস্ত্র বুটো টাকায়,
(পেলেই) তুষ্ট রব সে চারটী ফল
স্বদেশ-জাত যা পাওয়া যায়।
দেখবো না বিদেশীর মুখ আর
বিদেশী মেলেচ্ছ যে হয়,
(এবার) বাঁধবো প্রেম-রাখী-বন্ধনে
সর্ব্বদেশী ভগ্নী ভ্রাতায়।
মানবো না আর বিদেশী-রাজ-
অহং আর তার অনুচর চয়,
(আমার) স্বদেশী রাজ রাজেশ্বর
থাক্‌তে ভক্তি দিব আর কায় ?
(এক) মাতৃভূমিই স্বদেশ আমার
অন্যদেশ আর আছে কোথায় ?
সে যে "সুবিশাল মিদং বিশ্বং"
দেশ বিদেশ কই নাহি ত তায়।

বন্দে মাতরং বলি

বন্দি আয় ভাই সেই একই মায়,

(আর) ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

করিসনে ভাই মোহ মায়ায়।

(সেই) একই মার সবাই ছেলে

পর বলে আর ভাবিস্‌রে কায় ;

(সবে) একই মায়ে মা বলিয়ে

ব্রহ্মানন্দে মিলে যাই আয়।

দীনসেবক—শ্রীব্রহ্মানন্দদাস

তারো।

(পূজার আজগুবী গল্প)

ভয়ানক গরম। একদিনেই দার্জ্জিলিংএর ডাক গাড়ীতে ২০২ খানা "বার্থ" "রিজার্ভড্" গেছে। পাহাড় দেশের সহর-তলী লোকেলস্করে একেবারে ভর্ত্তি। মেঘ-সাগরের ঢেউএ ঢেউএ ভেজা হাওয়া সৌখীন সুন্দর সুন্দরীর নিঃশ্বাসেপ্রশ্বাসে অমন হিমেও আজ গরম হ'য়ে উঠেছে। পশ্চিমে তো পথের ধূলোয় খই ফোটে। শুক্‌নো খস্‌খসের মিইএ মরা গন্ধে এবারকার হিন্দুস্থানের বিকালবেলা মে টেই মিঠা হ'য়ে উঠ্‌ছিল না। সন্ধ্যার পর ক'ল্‌কাতার ছাদের ওপর একটা যে শীতল বাতাস দিত এবার তা বন্ধ।

বীডন্ হোষ্টেলের মেয়েরা তাই এবারকার গরমের ছুটীতে বোর্ডিং-এই র'য়ে গেল। গল্পে আর ঘুমেই ছুটীটা বেড়ে জমিয়ে ভোগ ক'র্‌বে ব'লে ঠিক ক'র্‌লে—স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন বা দেশ

দেখার কৌতুক কৌতূহল নিয়ে দূর-দূরান্তরে ভ্রমণে বেরোনো গ্রীষ্মে তাঁদের উচিত ব'লে মনে হ'ল না।

কিন্তু শুধু খাওয়া, গল্প আর তন্দ্রা স্বপ্নে নিদ্রা কি আর বৈচিত্র্য-হীন একঘেয়ে জীবন একটানা ব'য়ে চলা যায়? তাদের এই রুটীন বাঁধা কাজের মধ্যে একটা যেন মস্ত ফাঁক প্রকাণ্ড অবসর ছেড়ে দে'য়া র'য়েছে ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো। অনেক মাথা ঘামিয়েও সে রিক্ততা পূর্ণতর ক'রে ভ'রে দেবার মত একটা কিছু উপলক্ষ খুঁজে বা'র ক'র্‌তে পা'র্‌লে না। একটা মোটে কাজ ছিল—লেখা-পড়া—ছুটীর ভেতর সে কাজ করা তো ছাত্র-ছাত্রীদের আইনে অপরাধ ব'লেই লেখে।

এর মধ্যে হঠাৎ খবরের কাগজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিবেদন বেরোলো। খুলনার কাঙাল তারা কঙ্কাল সার—দুর্ভিক্ষের অপদেবতা মৃত্যুর মেরজাই গায় দিয়ে, হাড়ের নূপুর পায় বাজিয়ে সর্ব্বভুকের মত লেলিহান জিহ্বা বাড়িয়ে তাদের দেশে এসে দাঁড়িয়েছে লোক গুলো ক্ষিদের কষ্টে তেষ্টায় ছটফটিয়ে ম'রে যাচ্ছে—যারা বেঁচে আছে তাদের পেটে-পিঠে এক হ'য়ে গেছে স্ত্রীপুত্রের অঙ্গে আবরণ নেই—শুধু আছে ক্ষুধা--পেট যোড়া, প্রাণযোড়া ক্ষুধা--হতভাগাদের দাও দাও চাওয়া, ক্ষীণ কণ্ঠের অস্পষ্ট কাতর সে নিবেদন ক্রন্দনের চেয়েও মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে আকাশ ছাপিয়ে উপরে উঠ্‌ছে। পরমারাধ্য আচার্য্য, এক মুষ্টির সংস্থান যাদের আজও আছে—তাদের কাছে এই চিত্র এঁকে দিয়ে—ভিক্ষুনী "অনাথ-পিণ্ডদসুতা" সেই শ্রাবস্তীর অন্নাভাবের দিনে যে মহাব্রত নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ফিরে বেড়িয়েছিলেন—তাই নিয়ে আজ ঘরে ঘরে ভিক্ষার মিনতি-কাকুতি নিবেদন-আবেদন পাঠাচ্ছেন—দুস্থ দুর্ব্বল, নিঃস্ব, নিরুপায় নিরন্ন তাঁর দেশবাসীর ক্ষুধায় এক মুঠো খাবার দেবার জন্য।

দেশের লোকের বুকে বুকে ব্যথা জাগিয়ে এ সংবাদ বাঙলার এ সীমা থেকে শেষ সীমায় গিয়ে পৌছোলো—যার যা ছিল কাঁথা, কাপড়, লুগা, কুর্ত্তা, মোহর-রূপা—পাঠিয়ে দিলে—নিরন্নের মুখে দিনান্তে দুটী গ্রাস তুলে দেবার জন্য—উলঙ্গের অঙ্গে অন্ততঃ লজ্জা নিবারণের মত একটুকরো বাস জড়িয়ে দিতে। বীডন হোষ্টেলের মেয়েদের মর্ম্মে গিয়েও এ বেদনা টাটিয়ে উঠ্‌লো।

৬

উপায় ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তাদের মাথায় খেয়াল এল যে—"ড্রামা" ক'রে টাকা তুলে সবটা আর আচার্য্যের বরাবর পাঠিয়ে দেবে। অমিয়া ছুটে গিয়ে সুপারিনটেনডেণ্ট লীলা দি'কে খবর দিয়ে এল।

লীলা দি বল্লেন, "বেশ তো ভাল কথা, কিন্তু তোমরা 'ড্রামা ডিড'" কর বেশ জমকানো হবে;—ইতিহাস থেকে ঘটনা বেছে নিয়ে দৃশ্যগুলো ঠিক করে ফেল।"

মেয়েরা তো আহ্লাদে হৈ—হৈ করে উঠলো। ঠিক হলো "রাজা অশোক" অভিনীত হবে। ঘটনাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে তারা দৃশ্য-চিত্র সব ঠিক করে ফেল্লে। লীলা দি বল্লেন যে 'আর কিচ্ছু মেয়েদের ভাবতে হবে না—তিনি "কোচিং" দিয়ে গান তৈরি করে শিখিয়ে যাতে খুব চমৎকার হয় তারই ব্যবস্থা কর্‌বেন।

সেই দিন থেকে জোর 'মহলা' চ'ল্ল রোজ দিনরাত। অশোক হবেন ম্যাট্রিক ক্লাশের মণি-দি, তিনি যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি এক্সপ্রেসন ও তাঁর খুব Graceful, Majestic, মন্ত্রী সাজবে মিণ্টু—গম্ভীর "ভার-ভার্ত্তিক" চেহারা বেশ মানাবে। আরো এমনি এমনি সব সাজবে গুজবে ইত্যাদি—ইত্যাদি।—লীলা দিই গান গাইবেন—উঃ কি মিষ্টি তাঁর গলা সত্যি।

পোষাক-পরিচ্ছদ সাজ-গোজের ঠিকানা মিনি দির দাদার কাছে লিখে নিয়ে আসা হলো; তিনি বৌদ্ধ আমলের উপর "রিচার্স" করে "হিষ্ট্রীর" পি, আর, এস। Play ঠিকঠাক তৈরি হলেই Handbill বেরোবে—লীলাদি অনেক রকম মিহি মোলায়েম কথা দিয়ে পদ্যের মত মিষ্টি করে হ্যাণ্ডবিলের খস্‌ড়া খাড়া কর্‌লেন—মেয়েরা বল্লে—চমৎকার হয়েছে লেখা।

বিজ্ঞাপন বার করার আগেই মেয়েদের দলে বিলক্ষণ সাড়া পড়ে গেল। বউরা অনেকেই আগে থেকেই ঠিক করে ফেললেন—খোকাকে কার কাছে রেখে যাবেন, ছোট ছোট মেয়েরা আবদারই ধরে বস্‌লো—তারাও যাবে 'ড্রামা' দেখতে,—বাড়ীর গিন্নীদের কেউ কেউ ঠাকুরকে বলে রাখলেন যে সেদিন শিগগীর শিগগীর—রান্না হওয়া চাই।

কেবল ছেলেদের মুখের ওপর একটা যেন কালির দাগ পড়েছে—বড় হতাশ ভাব—তাদের বুঝি আর "ড্রামা" দেখা হবে না।

হোষ্টেলের ভেতর-মহলে তারো মহলার গুলজার—তারি বাহিরে মাঠের মহল্লায় ফুটবলের হল্লা জমিয়ে তারা কোনো মতে ক্ষতিপূরণ করে নিচ্ছে—Shield Tournament এর First round খেলা হয়ে গিয়েছে।

Second round এ খেলা পড়েছে—ঢাকা আর মৈমনসিং এ। সেই দিনই দুই "টীম" আসবে। ছানা, নোনা, নরেশ, ভক্তিবিনোদ ওরা সবগেছে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে।

ট্রেণ "ইন্" হ'তেই খেলোয়ারের দল—"দে নন্দী, দেরে সতী দেরে" গোছের তাণ্ডব ভঙ্গী দাপটে প্লাটফর্ম্মে নেবে প'লো ষ্টেষণমাষ্টার বাবু বারন্দাওয়ালা টুপীটার নীচের দুটো ছোট ছোট চোখ তুলে একবার ওদিক পানে উঁকি মেরেই গুটী সুটী স'রে প'লেন, ওসব পালোয়ান পল্টনের সুমুখো-সুমুখি তাঁর সাদা সুটটী পরা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবার দুঃসাহস সত্যি ক'রেই হ'লো না—কার টিকিট কেবা চায়—ছেলেরা সব খেলোয়াড়দের নিয়ে যেখান দিয়ে ফাঁক পেলো বেরিয়ে রাস্তায় এসে প'লো।

নরেশ কেবল বরাবর গেট দিয়ে বেরোতে যেতেই—দেখে চিক্চিকে চোকোলেট রঙের গ্লাডষ্টোন ব্যাগটা হাতে নিয়ে—তড়িৎ যে। "Hallow Mr Bonarjee—First class First" ব'লে নরেশ চেঁচিয়ে উঠ্তেই—তড়িৎ ব'ল্লে:—"Wellmet Mr. Guha, but your first class first is only a one third B.L."

"Matters little" ব'লে নরেশ হো হো ক'রে হেসে জিগ্গেষ ক'র্লে "তোমার Law College কি এতদিনে বন্ধ হ'লো নাকি হে?"

"আর ব'ল কেন"—Non-co-oporation এর ধাক্কায় ঢের দূর স'রে প'ড়েছিলুম ভাই—লক্ষ্নৌ থেকে আস্ছি—বরাবর ছাতুখোরের লাইনে—ঝাঁকুনীর চোটে ছাতুর দলাই ব'নে গে'ছি এক দম—তা'পর সহরের নতুন খবর কি বল—"ব'লে তড়িৎ গেট পেরিয়ে ওয়েটিং সেডের ভিতর এসে প'লো তা' পর দুজনে মিলে রাস্তায় নেবে গল্প ক'র্তে ক'র্তে চ'ল্লো—নরেশ ব'ল্লে:—

"নতুন খবর তো তেমন কিছু নেই ইদানীং ঘটনা তেমন জমকানো গোছ গজাচ্ছে না যেন "ডাল"—"ডাল"—একদম "ডাল সিজন" ভাই—আর যা গরম—তবে একটা এ'কটু গুলজার গোছ খবর আছে—Beadon Hostal এর মেয়েরা খুলনা রিলিফের জন্য "তাব্লো ক'চ্ছে।"

"সত্যি! এতো একটা খবরের মত খবর দেখছি! Laudable enterprise তা public performance তো?"

নরেশ যেন অবাক হ'য়ে গিয়েছে এই রকম ভাব দেখিয়ে ব'ল্লে "public performance কি রে—nonsense? মেয়েরা "তাব্লে" ক'চ্ছে যে!—দেখবেনও মেয়েরাই।"

"'ভয়ানক' অ্যান্টিকোয়েটেড্ আইডিয়া" আমি ওরকম পছন্দই করিনে আজও কি মেয়েদের ঐ চিকখানা তুলে ফেলার সাহস হ'লো না? মানুষ হিসেবে নর ও নারী পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে।" ব'লে তড়িৎ বাঁ হাতটা ব'দলে ব্যাগটা ডান হাতে নিলে—সঙ্গে সঙ্গে কোঁচাটা তুলে ব্যাগের চারি পাশটা দিয়ে একবার বুলিয়ে গেল।

নরেশ ব'ল্লো "ব্যাগের যত্ন যে "Her Majestyর ওপরেও এক কাঠী হে।"

"দেখ্‌ছিস্‌নে কি ধুলো ভ'রেছিল! কিন্তু—এটা ক'খ্‌খনো হ'বে না—নরেশ,—"তাব্লো" সবাই দেখ্‌বে—পুরুষ, মেয়ে এক সঙ্গে—এই রকম ক'রেই সংস্কার করা দরকার—কচি কচি গোটা কতক মেয়ের মিলে—"তাব্লো" ক'র্‌বে তার আবার এত ঢাকাঢাকি।"

"তা তোমারি বা অত টানাটানি কেন বাপু,—মেয়েদের "তাব্লো" ব'লেই না—এত?" ব'লে নরেশ অনেকখানি মানে ভরা মুচকি হাসি নিয়ে তড়িতের মুখের দিকে তাকালে—তড়িৎ তড়িতেরই মত চকিতে উত্তর দিলে—তার ভেতর কিছুমাত্র মোহ প্রলোভন নেইরে নরেশ, ওসব একঘেয়ে বাজে কথা আর ভা'ল লাগে না। দেখ্‌বো তো সেখানে খানকত কালো বেমানানো—মুখ, কারো হয়তো নাক বোঁচা,—দুটী চোখের গরব ক'র্ত্তে পারে এমন মেয়ে ওদের বোর্ডিংএ একটীও নেই—এইতেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বার বা দেওয়ানার দাপাদাপি

নিয়ে বেরিয়ে যাবার কিছু সঙ্গত কারণ ঘট্‌বে না—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।"

"তুমি ব'ল্লেই তা তাঁরা বিশ্বাস ক'র্‌বেন কেন?"

এই কথা ব'লতে ব'ল্‌তেই তড়িৎদের দেউড়ী-দরজায় পৌঁছে গেল। "আচ্ছা সে হবে" ব'লে তড়িৎ নরেশের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে প'ড়্‌লো।

সেই দিনই বিকেলে "তাস্রোর" "হ্যাণ্ডবিল" বেরলো—তার পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় আরম্ভ;—ড্রামাটিক ক্লাবের ষ্টেজেই "তাস্রো" হবে। অভিনেত্রীরা মেয়েদের কাছে মরম-জানিয়ে দরদীর দয়া নিয়ে তাঁদের আস্‌তে ডেকেছেন। তড়িৎ হ্যাণ্ডবিলখানা প'ড়েই সতীশের কানে কানে যেন টুক্ ক'রে কি ব'লে এল। সতীশ হ'লেন ড্রামাটিক ক্লাবের সেক্রেটারী।

রাত্তিরে খবর এল—ড্রামাটিক ক্লাব—মেয়েদের ষ্টেজ, ড্রেস কিচ্ছু দেবেন না। লীলা দি তো খবর শুনে একেবারে বুদ্ধিহারার মতন ব'সে প'লেন। সব ঠিক্‌ঠাক্ কেবল দৃশ্যপট আর সাজ-পোষাকের অভাবে সব আয়োজন নষ্ট হতে বসেছে। এমন একটা Noble cause এ তাঁদের এ enterprise একে এরকম খামখেয়ালী একগুঁয়েমীতে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টাটা কি সেক্রেটারীর উচিত হচ্ছে। লীলা দি এই রকম সব ভেবে শেষে দেখলেন যে—সত্যিকার তিনি নিরুপায়। সেক্রেটারীর মত না হলে 'তাস্রো' 'ষ্টেজ' করা অসম্ভব। কাজেই এক-খানা চিঠি লিখে সেক্রেটারী সতীশকে বিনীতভাবে ডেকে পাঠালেন। সতীশ দয়া করে এক বার দেখা কর্‌লে—তিনি কৃতার্থ হবেন—এই কথা লীলা দির চিঠিতে লেখা থাক্‌লো। উত্তরে সতীশ আর তড়িৎ দুজনে "সশরীরে" এসে হাজির হ'ল—বোর্ডিং এর হল ঘরে। লীলা দি নেবে এসে দুজনকেই নমস্কার ক'রে—যুক্তি দিয়ে খুব নম্রভাবে নিজের নিবেদন জানালেন। তড়িৎ বল্লে—"তাই ত এ সতীশের ভয়ানক অন্যায়। ষ্টেজ যে এরা চাইছেন—সেইটেই তো ওর ঢের মনে করা উচিত ছিল।"

সতীশ লীলা দির সাম্‌নে কেমন যেন মুসড়ে গিয়ে নেহাতই নেতিয়ে পড়লো। তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও যেন বেচারী পারে না—গা.টা ভারী হ'য়ে ঘেমে কপাল-কপোল

ছুইই ভিজে উঠলো। রুমালখানা বার করে মুখ-টুখ মুছে নিঃশ্বাসটা টেনে টুনে কেশে-কুশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে—অনেক কষ্টে বললো—"আমি তো ষ্টেজ দোব না ব'লি নি—"

তড়িৎ অমনি কথার পিঠে কথা বলে উঠলো;—"না তুমি দেবে না—না বল্লে উনি বুঝি অমনি খামখাই এই রাত্তিরে তোমাকে ডাকিয়ে আনিয়েছেন?—তুমি বলেছ ঠিকই যে দেবে না—কিন্তু কারণ কি তাই বল—এত বড় আগ্রহ এঁদের তুমি নষ্ট করবে?"

সতীশ অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো;—"না-না আপনারা নেবেন ষ্টেজ—তবে—কি বল না হে তড়িৎ—আমি বাপু, ওসব তোমার শেখান কথা-টথা বল্‌তে পারবো না।"

"শেখানো কিরে—আমি কি শিখিয়েছি তোকে?—তুই-ই তো বল্লি—ক্লাবের মেম্বররা সব আপত্তি করছে—বলছে—যে তাদের না দেখালে—মেয়েরা ষ্টেজে তাব্লো করতে পাবেন না না। "আর দেখুন—" লীলা দির মুখের ওপর শেষ প্রতিভ দৃষ্টি তুলেই তাড়িৎ বলতে লাগলো —"একটা কথা কি জানেন মেয়েদের এই যে কেবলি পুরুষদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা এটা কি ভাল? নারীর অন্তর মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠা স্ব প্রকাশ কে জাগিয়ে তোলবার দরকার হ'য়েছে—তা নইলে নারী চিরকাল নারীই র'য়ে যাবেন একটা গুণ্ঠনের আবডালে সবটা তাঁদের শক্তি সাধনা সঙ্কুচিত হ'য়ে, বিফল হ'য়ে, মিছে হয়ে যাবে—জগতের উন্নতির ধাপে ধাপে পা ফেলে চ'লতে তো তাঁরা পারবেন না—কিন্তু এই চলাটাই তাঁদের আজ চাই।"

এই ব'লে তাড়িৎ জয়ীর মত গৌরবদীপ্ত মুখভঙ্গী ক'রে টেবিলটার ওপর ডান হাতের পাঁচটা আঙুলেরই একটা আঘাত শব্দিত ক'রে তুলে আবার ব'ললে:—হ্যাঁ—তাই চাই—আপনারা ইচ্ছে ক'রে সেটাকে নষ্ট করতে পারেন না—এই "তাব্লো" থেকে তার আরম্ভ হোক।—পুরুষদের জন্যেও আসনের ব্যবস্থা আপনাদের রাখতে হবে—এটা আমাদের দাবী।"

ললী দি আস্তে আস্তে বিনীত হ'য়েই উত্তর দিলেন:—"সেটা আর এটা ঠিক এক কথা হ'লো না তড়িৎ বাবু, আর আমরা সে রকম "অ্যাড্‌ভার্টাইজ"ও করিনি।"

এবার তড়িৎ তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে ব'ললে:—"সে জন্য আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না—আপনারা শুধু বলুন যে পুরুষদের জন্যও Seats রাখা হবে তারপর সে খবর

circulate ক'রতে যা যা করা দরকার সে সব আমরাই ক'রে নিচ্ছি। দেখুন আমরা কি ক'র্ত্তে পারি! আর এ রকমে আপনাদের যে ডবলের চাইতেও বেশী "বিক্রি" হবে— দেখুন তো সে কত বড় কথা—অতগুলি টাকা পেলে নিরন্নের এ দুর্দ্দিনে কতটা উপকার হবে।"

লীলা দি খানিকটা চুপ ক'রে থেকে একটা কি ভেবে নিয়ে ব'ল্লেন:—"আচ্ছা, তবে সাধারণের জন্য নয়—ড্রামাটিক ক্লাবের ক'জন মেম্বরের জন্য আমরা রাজী আছি,—আমরা ব্ল্যাঙ্ক টিকিট ইস্যু করবো; নির্দ্দিষ্ট মেম্বরের জন্য আসনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে আপনাদের যা ইচ্ছে হয় দয়া করে দিয়ে দরিদ্রের খাবার উপায় ক'রবেন।"

"অবিশ্যি অবিশ্যি নিশ্চয় ক'র্‌বো সে আর আপনাকে ব'ল্‌তে হবে কেন,"

"আচ্ছা আসুন তাহ'লে—রাত্তির ঢের হ'ল নমস্কার"—

নমস্কার ব'লে শুভরাত্রি এবং শুভইচ্ছা জানিয়ে তড়িৎ বেরিয়ে প'ড়লো সতীশ বেচারী নিরীহ সাদাসিদে মানুষ সে কোনো মতে "নম-স্-কার" বলে তড়িতের পেছনে পেছনে বাইরে এসে—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বাহিরের অবাধ হাওয়া উদার স্পর্শ বুলিয়ে গিয়ে এই তার এতক্ষণের বন্দীত্বের বেদনা যেন স্নিগ্ধ করে দিল।

পরদিন বিকেল থেকেই থিয়েটারের বাড়ীর সাম্‌নে—গাড়ী মোটর এসে জ'মতে লাগ্‌লো তড়িৎ তো খুব বাহার দেয়া পাঞ্জাবী উড়িয়ে দামী বার্ণিস লপেটা প'রে—বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এসে এর ওর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প ক'র্‌তে লাগ্‌লো। মেয়ে ইস্কুলের বুড়ো কেরানী বাবু টিকিট বিক্রি ক'চ্ছেন। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো জ'লে উঠে চারিপাশে জ্যো'স্নার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে যেন। মেয়েদের কাপড়ের খস্‌খসি, চুড়ির ঠুনঠুনি, জরীর চটীর লঘু, মৃদু, ছন্দে ঘরের ভিতরটা মুখর হ'য়ে উঠেছে সেই সঙ্গে বিনিয়ে বাঁধা বা গুছি-ঝোলানো কুন্তল গুচ্ছের সুরভি ও সাড়ী ব্লাউজে ছড়ানো সেণ্টের মিঠে মধুর-গন্ধ ফুর ফুর ক'রে উড়ে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গরম, ঘরের হাওয়াটাকে স্নিগ্ধ না ক'ল্লেও—শুদ্ধ কর্‌ছে বটে।

কনসার্ট বাজ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লো—দর্শকেরা সব ছুটোপুটী এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন প্রথম ঘণ্টা হঠাৎ বেজে উঠ্‌লো—ঢং ঢং—একটা ঠেলা ঠেলি প'ড়ে গেল। হুট্ হাট্ দুপ্‌দাপ্ ক'রে ভেতরে ঢুক্‌তে যেতেই চট্ ক'রে—তড়িৎ চমকানোর ফাঁক টুকুর ভেতরে

যেন সব আলোগুনো নিবে একেবারে অন্ধকার—দর্শকেরা কতক হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল কেউবা অন্ধকারেই হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো এর মধ্যে আবার নিমেষে দীপালি, জ্বালা জাগিয়ে জ্ব'লে উঠলো—তড়িৎ আর সতীশ সামনে এ'গিয়ে গেল কিন্তু—অ্যাঁ-কি-এ? চিকের ভেতর একপাশে একান্ত করা পুরুষদের আসন।—পালাও পালাও সব লজ্জায় আর মুখ রাখবার জায়গা নেই—ছি কি অপমান! সব তো অপদস্থ হ'য়ে মাথা হেট ক'রে বেরিয়ে এল ও'দিকে মেয়েরা দিব্যি মাথা উচু ক'রে "তারো" আরম্ভ ক'রে দিলেন—প্রথম দৃশ্য—পাটলীপুত্রের দরবারকক্ষে মণি সিংহাসনের উপর মহারাজ অশোক।—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শুভ-মুহূর্ত্ত।

কলিকাতা।
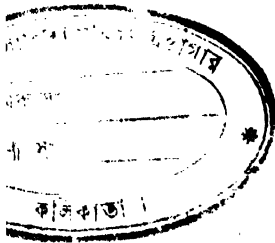
যখন কুঞ্জে শিশির-সিক্ত—
কুসুম-কপোলে কিরণ ভায়,
শিহরে সমীর সুরভি গন্ধে,
পিক-কলরবে ধরণী ছায়;—
ধরার কণ্ঠে পরায় অরুণ
সাত-লহরের সোনালী হার,—
জাহ্নবী-কল- কল্লোল মাঝে
ঝঙ্কারে গীত-বন্দনার;—

বেজে উঠে যবে করমের শাঁখ
কোটী প্রাণে আশা সঞ্চারি,
অমনি স্বর্গ আসে গো মর্ত্ত্যে
প্রেম-আনন্দ উৎসারি।

শ্রীকিরণচন্দ্র বসু।

অসহযোগ বা নন কোঅপারেশন।

আমরা পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি ছিলাম তাহার পর এই পঞ্চাশ ষাট বৎসরে আমাদের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং কেন হইয়াছে ইহা পর্য্যালোচনা করিলে নন্‌-কো-অপারেশননীতি দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন হইবে না।

বহুশত বৎসর জড়ের মত থাকিবার পর পঞ্চাশ ষাট বৎসরে চারি পাঁচ কোটি পরাধীন লোকের মধ্যে ব্যাপক একটা পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব এবং তাহা হয়ও নাই। কিন্তু যে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও এখনকার যুবকগণ বিশ্বাস করিতে পারেন না। দুই তিন বৎসর হইল একটা সভায় একজন বক্তা রামমোহন রায়ের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছিলেন যে তখনকার স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল আর শ্রোতাদের মধ্য হইতে বিশ বাইশ বৎসর বয়স্ক যুবকেরা মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন 'মিথ্যা কথা' অর্থাৎ রামমোহন রায় স্ত্রীলোকের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মিথ্যা! কিন্তু যাহাদের বয়স ৬০ অতিক্রম করিয়াছে-তাঁহারা জানেন যে তাঁহার কথার প্রতি বর্ণই সত্য। তাঁহারাও দেখিয়াছেন যে তাঁহাদের বাল্যকালে স্ত্রীলোকেরা কেবল দুঃখভোগ করিবার জন্যই জীবন ধারণ করিতেন। যতই কেন শীত হউক না তাঁহাদের গায়ে দিবার জামা ছিল না, লেখাপড়া শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও তাঁহারা অপ্রচুর আহার পাইতেন, রোগের সময় তাঁহাদের সুচিকিৎসা হইত না, সূতিকাগৃহে তাঁহারা সামান্য একখানা বিছানাও পাইতেন না। এখন অন্তত শিক্ষিত পরিবারে এই শোচনীয় অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

অন্য দিকেও সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সমাজের মধ্যে সহানুভূতি বস্তুটা প্রায়ই ছিল না। সকলেরই চেষ্টা ছিল ছলে বলে কৌশলে অন্যের বিত্ত আত্মসাৎ করিয়া সম্পত্তিশালী হওয়া। প্রভু ইচ্ছা করিতেন যত অল্প দিয়া চাকরকে খাটাইবেন—চাকরের

চেষ্টা ছিল প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া ধনবান হওয়া। কাহারও বাড়ীতে আগুন লাগিলে বা ডাকাত পড়িলে প্রতিবেশীরা যে সাহায্য করিতে যাইতেন না একথা সেদিনও "হিন্দুস্থান" পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন। মুসলমানেরা এবং পশ্চিমের হিন্দুরা শক্ররও মৃত্যু হইলে সকলে মিলিয়া সাত আট বৎসরের বালকদিগকে পর্য্যন্ত লইয়া শ্মশানে বা সমাধিস্থলে গিয়া থাকেন, কিন্তু উচ্চজাতির বাঙ্গালী হিন্দুরা কি করিতেন? শ্মশানে যাইতে তাঁহারা নানা প্রকারে আপত্তি করিতেন। তাঁহাদের একটা প্রধান আপত্তি এই ছিল যে তাঁহাদের স্ত্রী গর্ভবতী সুতরাং তাঁহারা শ্মশানে যাইতে পারিবেন না। এখনও এই প্রথা প্রায় পূর্ব্বের মতই আছে। এখনও কি কোন বাঙ্গালী নিজের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে লইয়া অতি নিকট কোন আত্মীয়ের সৎকারস্থানে গিয়া থাকেন? বরিশাল প্রভৃতি দুই একটা দেশানুরাগের কেন্দ্রস্থলে শুনিয়াছি যুবক ছাত্রেরা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পীড়িতের শুশ্রূষা এবং মৃতের সৎকার করিয়া থাকেন। এখনকার যুবকেরা বিশ্বাস করিবেন না যে আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে একটি সুন্দরী বধূ বা কন্যা থাকিলে সেই গৃহস্থের বিপদের সীমা থাকিত না। কাহার সুশ্রী একটি সন্তান হইলে সর্ব্বদা তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে হইত, পাছে ঈর্ষ্যাপরায়ণ প্রতিবেশীরা তাহাকে মারিয়া ফেলে। আমি অবগত আছি সাত আট বৎসরের একটি বালক একবার একখানা চেলির কাপড় পরিয়া আহ্লাদ করিয়া প্রতিবেশী সমবয়স্কদের দেখাইতে গিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল তাহার মৃতদেহ রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোন গ্রামে ওলাউঠা হইলে সেই গ্রামের লোক ওলাউঠাগ্রস্ত লোকের মল ও বমন লইয়া রাত্রিতে অন্য গ্রামের কূপে তাহা ফেলিয়া দিত যাহাতে সে গ্রামেও সেই রোগ হয়। এইরূপ আচরণের কথা আমি আমার বন্ধু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। পূর্ব্বে অনেক ব্রাহ্মণ (!) মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি বিদ্যা শিখিত এবং সমাজে তাহারা সম্মান প্রাপ্ত হইত। সেই সকল বিদ্যা সত্য কি মিথ্যা তাহার বিচার করার প্রয়োজন নাই। কি অভিপ্রায় প্রণোদিত হইয়া তাহারা উহা শিখিত তাহাই পাঠক বুঝিয়া দেখিবেন। কোন কোন স্থানের ভদ্রলোকেরা ডাকাতি করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন জমীদারের পূর্ব্বপুরুষ কিরূপ উপায়ে জমীদারী লাভ করিয়াছিলেন তাহাও সকলের অজ্ঞাত নহে।

জনসাধারণের মানাপমান বোধ ছিল না। কোন ধনবান লোকের বাড়ীতে নাচ গানের সময়ে জনসাধারণের ভিড় কমাইবার জন্য "ছড়িদার" নিযুক্ত থাকিত। তাহারা চাবুক মারিয়া লোক সরাইত। এই চাবুক খাওয়া কেহই অপমানজনক মনে করিত না। পূর্ব্বে রেল-ষ্টেশনে ও রেল কম্পানি কর্ত্তৃক টিকিট ক্রয়ের স্থানে "ছড়িদার" নিয়োজিত হইত। পুরীর মন্দিরে এখনও ছড়িদার আছে।

শুদ্ধাশুদ্ধের জ্ঞান বাঙ্গালী হিন্দুর মোটেই ছিল না—এখনও যে বেশী কিছু হইয়াছে তাহা নহে। চোখের সামনে যে পুষ্করিণীতে মলমূত্র ধৌত হইতেছে তাহার জল যে অশুদ্ধ তাহা কাহারও মনে আসে না। জনসাধারণে সেই জল বিনা দ্বিধায় পান করে এবং ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত মহাশয়েরা সেই জল দিয়া উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের তর্পণ করেন। কিন্তু জলটা যদি কাচপাত্রে ঢালা হইল অমনি তাহা অশুদ্ধ হইল। যে অন্ন ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রধান দান, যাহা দ্বারা আমাদের জীবন ধারণ হয়, যাহা না হইলে আমাদের মৃত্যু অপরিহার্য্য সেই অন্নটা বাঙ্গালী হিন্দুর চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অশুদ্ধ। থালে ভাত বাড়িয়া যে স্থানে রাখা হইল সে স্থানটা ভয়ানক অশুদ্ধ হইল। সে স্থানে গোবর জল না দিলে আর শুদ্ধ হয় না।

অশ্লীল খেঁউড় এবং খেমটা নাচ বঙ্গদেশে পূজার একটা অঙ্গ ছিল। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজন লইয়া সকলে ইহা দেখিতেন ও শুনিতেন। কাহারও মনে দ্বিধা হইত না—কেহ প্রতিবাদ করিত না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় আক্ষেপ করিয়াই এক স্থলে বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশের লোকের বুদ্ধি কলুষিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যক্ষেত্রেই এই কলুষিত বুদ্ধি—এই বিপরীত বুদ্ধি ছিল। এইরূপ বুদ্ধিই বাস্তবিক দাসভাব যাহাকে ইংরেজীতে Slave mentality বলে। আমাদের এই দাসভাব অতি অল্পে অল্পে অপনীত হইতেছে ইংরেজী শিক্ষার ফলে। অতি অল্পে অল্পে যাইতেছে এই জন্য যে দাসভাবটা এমনই উৎকট পীড়া যে ইহা একবার হইলে আর যেন যাইতে চাহে না। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে দাসের উদ্ধার নাই। অন্তত এক জন্মে তাহার উদ্ধার হয় না। বহু সুকৃতি করিলে দাস মৃত্যুর পর অদাস হইয়া জন্মে এবং সেই অদাস জন্মেও যদি তাহার পুনর্ব্বার সুকৃতি হয় তবেই তাহার মুক্তি হয়। বাইবেলে দেখা যায় যে ঈজিপ্টের ইস্রায়েল দাসগণ ঈজিপ্ট হইতে পলায়ন করিবার পর চল্লিশ

বৎসর পর্য্যন্ত বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে সকলেই মরিয়া গেল, তাহাদের একজনও কানন ভূমিতে গিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিল না। তবে তাহাদের বংশধরেরা সেখানে গিয়া স্বাধীন হইল। আমাদের মধ্যেও যাঁহারা দুই এক বৎসরে স্বরাজ লাভের আশা করেন তাঁহারা ইস্রায়েল দাসদিগের কথা মনে রাখিবেন। আর একটা কথাও তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। কারণ বিনা কোন কার্য্য হয় না; এই যে বহু শতাব্দী পর আমাদের একটা নব জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, এই যে আমাদের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনে নিজের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি অসন্তোষ জন্মিয়াছে এবং সেই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রবল ইচ্ছা ও কিঞ্চিৎ চেষ্টা হইয়াছে ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ যে ইংরেজী শিক্ষা তাহা নিতান্ত কুতর্কপ্রিয় লোক ভিন্ন সকলেই স্বীকার করিবে। ইংরেজী সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতির অধ্যয়ন এদেশে প্রচলিত হইবার আরম্ভ হইতেই দেশ মধ্যে সেই শিক্ষার এই বলিয়া ঘোর নিন্দা প্রচার হইয়াছিল যে ইংরেজী পড়িলে বালকেরা খৃষ্টান বা নাস্তিক হয় দেশের পুরাতন আচার ব্যবহার মানে না, ইত্যাদি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখনকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীর বর্ণনা এইরূপে করিয়াছেন:—

বিদ্যালয়ে কত শিশু, মজেছে ভজেছে যিশু
মনেতে বিকার নাই একদিকে চলেছে।
ঝস্‌মস্ জুতা পায়, ঠাকুরের ঘরে যায়
বিছানায় ভাত খায় দেব দেবী ভুলেছে॥
ফিরেছে সবার মতি, নাহি পূজে ভগবতী
আহারের সময়েতে ভগবতী চলেছে।
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট, দাঁতে কাটে বিস্‌কুট
গো টু হেল ড্যাম হুট মাবাপেরে বলেছে॥
ছুঁড়ীগুলো ছেলেবেলা, নাহি করে ছেলেখেলা
পাকা পাকা কথা কয় মন সব খুলেছে।
বেঁকে বেঁকে পথ হাঁটে, তেড়া করে সিঁথী কাটে
বই হাতে উঠে প্রাতে বিদ্যালয়ে ছুটেছে।

কে আঁটে মুখের সাটে, পুরুষের কান কাটে
সুখ ভোগ আশা হাটে ইচ্ছা ধ্বজা তুলেছে।
পতির কি সাধ্য হয়, মত ছাড়া কথা কয়
অধীনতা দড়ী ধরে কত নিচে ঝুলেছে॥

ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন, পুরাতন আচার ব্যবহারের পরিহার, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির অঙ্কুরোদ্গম অর্থাৎ সংক্ষেপে আমাদের জড়তা বা দাসভাবের লাঘব ইংরেজী শিক্ষার প্রথম হইতেই আরব্ধ হইয়াছে। যদি কখনও আমাদের দাসভাব সম্যক্ তিরোহিত হয় তাহা ইংরেজী শিক্ষা দ্বারাই সম্ভব হইবে। যাঁহারা বলেন যে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মনে দাসভাব উৎপন্ন করে বা বর্দ্ধিত করে তাঁহারা হয় ভ্রান্ত না হয় ইচ্ছা করিয়া লোককে ভ্রান্ত পথে চালাইতে চাহিতেছেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এখন যতজন নেতৃত্ব করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন যিনি ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত নহেন? সংসারে অমিশ্র ভাল বা অমিশ্র মন্দ কিছুই নাই। ইংরেজী শিক্ষায়ও হয়ত কোন দোষ থাকিতে পারে। সেই দোষ বর্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি আমরা সমূলে ইংরেজী শিক্ষাকেই বর্জ্জন করি তাহা হইলে আমরা জাতীয় আত্ম-হত্যার অপরাধে অপরাধী হইব। আর যাঁহারা এক মুহূর্ত্তে স্বরাজ পাইবেন বলিয়া আশা করেন তাঁহাদিগকেও অনুরোধ করি যে তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন আমরা স্বরাজের উপযুক্ত হইয়াছি কি না। মহাত্মা গন্ধী (গাঁধী বা গান্ধী নহে) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন যে যত দিন আমাদের মধ্যে জাতি বিদ্বেষ থাকিবে যতদিন আমরা মেথর, চাঁড়াল, পঞ্চম প্রভৃতির সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে না পারিব তত দিন আমাদের স্বরাজ পাইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার বিশ্বাস যে সেরূপ হইতে আরও অন্তত দুই শত বৎসরের ক্রম বিস্তৃতিশীল ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। ইহার মধ্যে যদি শিক্ষিত লোকেরা জাতিভেদের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত করেন তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে আরও বিলম্ব হইবে।

আরও একটা কথা। স্বরাজ প্রাপ্তির অর্থ স্বাধীন হওয়া, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন যে বর্ত্তমান সময়ে আমরা নানা বিষয়ে যে স্বাধীন তেমন স্বাধীন আমরা

কখনই ছিলাম না। হিন্দু রাজত্ব কালে একজন শূদ্র তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া রামের মত একজন রাজা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। একটা টিক্‌টিকীও আমাদের কাজের ব্যাঘাত করিতে পারিত এবং এখনও অনেকের কাজ বন্ধ করিয়া থাকে। আমরা যেদিন যাহা ইচ্ছা খাইতে পারিতাম না, যে দিন যে দিকে ইচ্ছা যাইতে পারিতাম না। কিন্তু এখন ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের অনেকের মন কুসংস্কার রূপ নিগড়ের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। সে দিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্পর্শ হইতে আমরা দূরে থাকিলে আমাদের কোনরূপেই মঙ্গল হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সমগ্র বিদ্যা আমরা ইংরেজীর মধ্য দিয়াই পাইয়া আসিতেছি এবং ইংরেজী ব্যতীত অন্য উপায়ে সে বিদ্যা আমাদের অধিগত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা ত্যাগ করিলে আমাদের কখনই মঙ্গল হইবে না।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

দুষ্ট ছোট ভাই।

(রঙ্গ-চিত্র)

(১)

সকাল বেলা চা খাইয়া উপর হইতে নামিয়া আসিয়া শোভা পড়ার ঘরে ঢুকিয়া,—সব কাজ ফেলিয়া আগেই লেখার সরঞ্জাম লইয়া, খুব রাগত ভাবে চিঠি লিখিতে সুরু দিল :—

"স্নেহের ছোট ভাই,—

চোদ্দ বছর বয়েসে পা দিয়েই, তুমি আমার চেয়ে মাথায় দেড় ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠেছ-ই না-হয়, তাই বলে, তোমার দাদা বলে ডাক্‌তে আমি যে কেন বাধ্য হবো, তার কোনই আইন-সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি নে। অথচ, আমাকে ঐ 'দাদাটা' বলাবার জন্যে তুমি নেহাৎ উজবুকের মতই অন্যায় আবদার জুড়ে দিয়েছ,—এমন কি আজ চা খাবার সময় তুমি জোর

করে আমার চা কেড়ে নিয়ে খেয়েচ, তার পর,—আমি চায়ের 'কাপ' মুখে তুলেছি দেখেও তুমি অম্লান বদনে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে, আমার কাঁধের ওপর তোমার পা দুখান চড়িয়ে দিয়েছ! বড় বোনকে এরকম অদ্ভুত সম্মানে অভিনন্দিত করবার বিধান, কোন্‌ শাস্তরে লিখেছে শুনি?

বেশী বাড়াবাড়ি কর তো 'ওপরে নালিশ' ঠুকবো, তা বলে রাখছি কিন্তু! পাঁচ বছর আগে সেই এক দিন আমার চুল ধরে টানার জন্যে, বড়দার কাছে সেই বকুনি.........মনে আছে কি? না থাকে তো, সেটা মনে ভাল করে ঝালিয়ে নাও, নচেৎ তোমার স্পর্দ্ধা কিছু ছাঁটবার ব্যবস্থায় আমি শীঘ্রই হাত দেব। ইতি—

তোমার চেয়ে অনেক বছরের বড়,——দিদি"

চিঠিখানা ভাঁজ করিতে করিতে শোভা দুয়ারের দিকে চাহিয়া ডাকিল—"সুচাঁদ —"

বালক ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া বলিল "কি দিদিমণি?—"

"এই চিঠিখানা নিয়ে, তেতালায় গিয়ে ছোট্ট দাদাবাবুকে দিয়ে এস তো।"

চিঠিখানা হাতে পড়িতেই,—সুচাঁদ তিড়িং করিয়া এক লাফ মারিয়া, দুয়ার হইতে সটান্‌ একেবারে বারেণ্ডার মাঝখানে গিয়া পড়িল! শোভা ব্যস্ত হইয়া ডাকিয়া বলিল "এই!—সহজ মানুষের মত ভদ্রভাবে হেঁটে যাও, ওম্নি করে বাঁদরের মত লাফ মেরে চল্‌তে গিয়ে এখুনি সিঁড়িতে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে, যে পা দুখানা রক্তারক্তি করে বস্‌বে, আর আমি যে কোথায় জল কোথায় পটী করে, সকাল বেলা তোমার পায়ের সেবা কর্‌তে গিয়ে পড়াশুনো মাটি কর্‌বো সে হবে না! আস্তে হাঁটো।"

সলজ্জে অপ্রস্তুতভাবে সুচাঁদ ঘাড় হেঁট করিয়া আস্তেই চলিল। হায়! আস্তে হাঁটার মত কষ্টকর বিধান যে সৃষ্টিকর্ত্তা তার কোষ্ঠিতেই লেখেন নাই। লাফাইয়া ছোটাই যে তার আজন্মের অভ্যাস, এবং পড়িয়া, ছিঁড়িয়া, মাথা ঠুকিয়া অজ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে তার খাতে পরম অভ্যস্ত—উপাদেয় স্বভাব হইয়া গিয়াছে,—এটা যে স্নেহময়ী ছোট্ট দিদিমণি কিছুতেই বুঝিতে চান না, এই সুচাঁদের বড় দুঃখ—বড় লজ্জা!

চক্ষুলজ্জার খাতিরে উচ্ছৃঙ্খল পা দুখানি কষ্টে সংযত করিয়া সুচাঁদ গণিয়া গণিয়া পা

ফেলিয়া চলিল। শোভা চাহিয়া চাহিয়া,—সহসা কি মনে পড়ায় পুনশ্চ ডাকিয়া,— খুব সতর্ক মৃদু কণ্ঠে বলিল "আর ছাখো, ছোট্ট দাদাবাবু নিজের 'পড়ার বই' পড়ছে,—মা, সেই চক্চকে লাল রংয়ের মলাট দেওয়া গল্পের বই পড়ছে, সেটা দেখে এসে চুপি চুপি আমায় বলো। বড় 'হলে' নানু বাবুরা তিন জনে পড়ছে মা গল্প করছে, সেটাও দেখে এসো।"

বাড়ীর সমস্ত স্কুলের ছেলেদের কাজের উপর চোখ রাখিতে হইত শোভাকে। শোভা নিজেও এক সময় স্কুলের ছাত্রী ছিল। বছর তিনেক হইল বিবাহের পর স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের অবকাশে এখন সকালে এক ঘণ্টা ও বিকালে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করে। স্বামী ফুলশয্যার পরদিনই জাপানে শিল্পবিদ্যা শিখিতে গিয়াছেন। ফিরিতে এখনও অনেক দেরী। শোভা পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে ছিল, আপাততঃ মাস কতক হইল এখানে আসিয়াছে।

শিক্ষা-মাধুর্য্যে-সুন্দর জীবনযাত্রার আদর্শ এবং স্নেহ-সচ্ছলতায় পরিপূর্ণ পরিপার্শ্বিক আবেষ্টন, এই তরুণীর দেহ মনকে তার বয়সের চেয়েও ঢের বেশী,—অল্পবয়স্কতায় কিশোর—কোমল সৌকুমার্য্যে ভরিয়া রাখিয়াছিল। চার পাঁচ বছরের ছোট হইলেও, অদৃষ্ট-মাহাত্ম্যে ঐ ছোট ভাইটির সঙ্গে সম্পর্কটা 'পিঠোপিঠি' ভাই-বোনে দাড়াইয়াছিল। দুজনের মধ্যে ভালবাসার টানও যেমন অষ্টপ্রহর দৃঢ় হইয়া আছে,—দিনের মাথায় অন্ততঃ আটবার করিয়া তেমনই ছেলে মানুষী—ঝগড়ার ঝড় ও দুজনের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে!

গায়ের জোরে শোভা ছিল দুর্ব্বল, কাজেই গুরুজনদের কাছে,—'ওপরে নালিশ' ঠুকিবার দুঃখটা সে বেচারাই একা ভোগ করিত, কিন্তু ছোট ভাই সামর্থ্যচক্রে ছিল,—গায়ের জোর এবং অদ্ভুদ বুদ্ধির খেলা আবিষ্কারে পরম পটু, কাজেই নিজের তরফ্ হইতে অভিযোগের কারণ যা কিছু থাকিত,—সেগুলা সে নিজের হাত এবং মাথার জোরে নিজেই সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিত! কাজেই সে ছেলেটির ওসব কোন বালাই ছিল না!

(২)

চিঠি পাঠাইয়া দিয়া শোভা, শেল্ফের উপর হইতে খুঁজিয়া-পাতিয়া The Children's Treasury বইখানা তুলিয়া লইল। তারপর দুয়ারের কাছে ক্যাম্বিশের ইজি চেয়ারটি পাতিয়া

তার উপর বেশ আরাম করিয়া শুইয়া, বইয়ের পাতা উল্টাইয়া Sir, E. Dyer এর Contentment শীর্ষক কবিতাটি বাহির করিয়া, স্বাভাবিক স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে মৃদু সুরে পড়িতে লাগিল :—

"My mind to me a kingdom is ;
Such perfect joy therein I find, "

পিছন হইতে সুচাঁদ আসিয়া,—"হ্যাঁ—অ্যাচ্চোঃ !" শব্দে এক নিষ্ঠুর হাঁচি হানিয়া, তরুণী পাঠিকার ধ্যান ভাঙাইয়া ডাকিল "দিদিমণি"—

মাথা ফিরাইয়া চাহিয়া শোভা সবিস্ময়ে দেখিল সুচাঁদের নাকে চোখে জল ঝরিতেছে এবং নাকের উপর সে কাপড় ধরিয়া পুনশ্চ হাঁচির প্রতীক্ষায় ঠোঁট মুখ কুঁচকাইয়া নিতান্ত বিপন্ন ভাবেই অপেক্ষা করিতেছে !—শোভা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কি রে ?"

তিনবার উপর্য্যুপরি হাঁচিয়া ছ বার থামিয়া সুচাঁদ আধা হাসিভরা মুখে করুণ স্বরে বলিল "ছোট দাদাবাবু আমার নাকে নস্যি গুঁজে দিলেন !"

এইমাত্র একদফা দুষ্টামীর জন্য শাসন-সঙ্কেত করা হইল, আবার দুষ্টামী ! তাও আবার সেই শাসন-বার্ত্তাবাহকেরই সঙ্গে !

ভগ্নদূতের দুর্দ্দশায় শোভার মনে কতখানি করুণ-রসের সঞ্চার হইল বলা শক্ত, কারণ সুশীল ভাইটির সুবুদ্ধির পুরস্কার, কি কতদূর হইতে পারে সেই ভাবনাতেই বেচারার মন এমন বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল যে তার মাঝে সদ্যঃ পঠিত Contentment কবিতাটির এক অক্ষরও খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইল ! খানিকটা চুপ করিয়া ভাবিয়া সুচাঁদের পুনশ্চ হাঁচির শব্দে সচেতন হইয়া বলিল "আচ্ছা তুমি ঠাণ্ডা জলে বেশ করে নাক মুখ ধুয়ে ফেল, তার নস্যির কৌটো আজ আমি জন্মের মত ভবপারে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর্‌ছি ! এক ফোঁটা ছেলে, গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়,—তার আবার নস্যি নিয়ে দসিবৃত্তির ধুম্ দ্যাখোদেখি ! যাও সুচাঁদ—"

সুচাঁদ হাঁচিতে হাঁচিতে কলতলার দিকে চলিয়া গেল। শোভা বইখানা বন্ধ করিয়া, ক্ষণেক ভাবিল তারপর আবার বই খুলিয়া, অন্য একটা পদ্য বাহির করিয়া—পড়িতে সুরু দিল :—

"Sweet Peace, where dost thou dwell ?
I humbly crave.
Let me once know."

মুহূর্ত্তে বারেণ্ডায় সজোর-বিনাস্ত দুরন্ত দুষ্ট পদধ্বনির সঙ্গে, মিহি - মোলায়েম সুরে প্রশ্ন হইল,—"খির্ণি খাবে ভাই ছোট্‌দি ? এই নাও, খাও !"

কণ্ঠস্বরটা এতই বেশী পরিচিত, যে মুখ তুলিয়া মানুষটিকে ভাল করিয়া দেখিবার প্রয়োজন মোটেই হইল না ! শোভা মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া, যেমন পড়িতেছিল, আবার তেমনই পড়িয়া চলিল। 'খির্ণি' ফল সম্বন্ধে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য জানাইল না।

প্রশ্নকর্ত্তা বিনা অনুমতিতেই ঘরে ঢুকিলেন। শোভার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া, বাঁ হাতে নিজের মুখে খির্ণি তুলিতে তুলিতে, ডান হাতে মুঠা ভরা ফল শোভার সামনে ধরিয়া, বেশ আদরের সুরে বলিল "খাও ভাই,—এগুলো পড়্‌তে পড়্‌তে বেশ খাওয়া চল্‌বে ; মুখে, হাতে, ঠোঁটে কিচ্ছু রস লাগ্‌বে না ! এই খুদে খুদে ফলগুলি বেশ সভ্য !—"

খির্ণি ফলের সভ্যতার বা অসভ্যতার বিরুদ্ধে মানহানির দাবীতে নালিশ করিবার মত কোন দুর্ঘটনাই শোভার ঘটে নাই, সুতরাং চুপ করিয়াই প্রশংসাবাদটুকু শুনিল,—এবং গম্ভীরভাবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, খির্ণি সে খাইবে না।—বাস্তবিকই সকালে চা খাওয়ার পর, সে এ সময় আর কিছু খায় না।—

সামর্থ্য দ্বিগুণ-উৎসাহের সঙ্গে শোভার মুখের কাছে হাতটা আগাইয়া আনিয়া, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল,—"খাও না ভাই, খাও না,—বাবাঃ, একটা কথাও কি শুন্‌তে নাই ?—বেশী না হোক, অন্ততঃ, গোটা চারেক খাও,—"

শোভা ত্যক্ত হইয়া বলিল "একটাও নয় !"

সামর্থ্য সবিনয়ে বলিল "আচ্ছা ভাই—তা হলে এই জানালায় প্লেটে তোমার জন্যে খির্ণি রেখে দিলুম,—এর পরে খেও, বুঝ্‌লে ? এখন তবে গাছ থেকে চাট্টি কল্‌সা পেড়ে আনি—সেগুলো খাবে তো ?"

শোভা কোন উত্তর দিল না।

সামর্থ্য উত্তর প্রতীক্ষায় ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া,—কৈফিয়ৎ ছন্দে বিনীত-নিবেদন সুরু করিল, "দ্যাখো ভাই, তুমি ফল্সা না খেলে আমারও খাওয়া হবে না, একলা আমার খেতে ভাল লাগে না। বলো ভাই, খাবে?"

অতীব রুষ্ট স্বরে শোভা বলিল "না।"

অত্যন্ত গভীর অভিমানভরা অনুযোগের স্বরে সামর্থ্য "বাবাঃ, তবু 'না'! খাও-না ভাই ছুটো;—খেলে কি তুমি মরে যাবে?"

উচ্ছ্বসিত হাসি সামলাইবার জন্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া,—শোভা খুব গম্ভীরভাবে বলিল "হুঁ।"

উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই—বইখানা মুখের সামনে এমন ভাবে আড়াল করিয়া ধরিল যে, মুখটা সম্পূর্ণই ঢাকা পড়িয়া গেল।

সামর্থ্য নিজের বাকী ফল ক'টা মুখে ফেলিয়া জানালার কুঁজা হইতে জল লইয়া হাত মুখ ধুইয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষণেক চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর অতীব মোলায়েম সুরে, ক্ষোভ-করুণ কণ্ঠে বলিল "দ্যাখ ভাই, তুমি যখন গম্ভীর হও,—বড় ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়েই পড়ো! ওকি ভাই, ওসব ভাল নয়! একবার হাসো-না ভাই।"

বইয়ের আড়াল হইতে হঠাৎ বিষম-খাইয়া, শোভা কাশিয়া উঠিল! তারপর খুব সংযত মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল "আগে আমার কাঁধে ঠ্যাং চাপানো, আর সুচাঁদের নাকে নস্যি গুঁজে দেওয়ার খবর বড়দার কাছে রিপোর্ট করি, তারপর হাসি-কান্নার কথা ভেবে দেখ্‌ব।"

সামর্থ্য যেন কথাটা শুনিতেই পাইল না, ঠিক এমনি ভাবেই নিজের পূর্ব্ব কথাটা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল,—"দ্যাখো ভাই, তোমাকে ওই ওম্নিভাবে গম্ভীর হতে দেখ্‌লে আমার ভয়ঙ্কর রাগ ধরে! এতো রাগ ধরে,—এমন অস্বস্তি লাগে যে, ইচ্ছে করে—তোমায় চেয়ার সুদ্ধ উল্টে ফেলে দিই!"—

শোভা বিচলিত হইয়া উঠিল! যে হেতু ঐ শ্রেণীর নানারূপ উদ্ভট-সদিচ্ছা যখন তখনই এই দুষ্টু ছোট ভাইটির মাথায় উদয় হইতেছে,—এবং সে ইচ্ছাগুলাকে সকল মাত্রেই কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষেও ভাইটির বেশী কিছু দ্বিধা—সঙ্কোচ দেখা যায় না! সুতরাং আসন্ন বিপদাশঙ্কায় শোভা-বেচারা মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া ঘাড় তুলিয়া বসিল।

তৎক্ষণাৎ সামর্থ্য বিপুল আড়ম্বরে চটাপট্ শব্দে তাল ঠুকিয়া, ঠিক যেন কোন এক সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মল্ল যুদ্ধের জন্য সুপ্রস্তুত হইয়াছে,—বীর গর্ব্বে ঘাড় উঁচাইয়া, সটান সোজা হইয়া, শোভার চেয়ারের সামনে দাঁড়াইল ! শোভা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া, গম্ভীরভাবে বলিল "কি মনে করেছ বল দেখি ? সাপের পাঁচ পা দেখেছ ?"

সামর্থ্যচন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্মিত মুখে ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে স্বীকার করিল—"হুঁ।"

শোভা সক্ষোভে বলিল "বুড়ো ধাড়ি ছেলে ! একটু লজ্জা করে না তোমার ?"

সামর্থ্য প্রবল অস্বীকারের ভঙ্গিতে সবেগে মাথা নাড়া দিয়া জানাইল—'না, না, না।'

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের বৈঠকখানার পণ্ডিত মহাশয়ের উচ্চকণ্ঠের ডাক শোনা গেল—"সামর্থ্য।"

নিমিষে তাল-ঠোকাঠুকি, স্থগিত রাখিয়া, সামার্থ্য এক লাফে ঘরের বাহিরে বারেণ্ডায় উপস্থিত হইয়া, সসম্ভ্রমে সাড়া দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার্ এই যে যাই।"

তারপর পিছনের দিকে দৃকপাত মাত্র না করিয়া সে তল্লাট ছাড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিল।

শোভা শূন্য বারেণ্ডার দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটু হাসিল। হাতের বইখানি তুলিয়া আবার পড়ায় মন দিল।

(৩)

সে দিন দুপুর বেলা আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ছুটির দিনে স্কুলের ছেলেরা বেলা এগারটা পর্য্যন্ত পড়ার ঘরে কাটাইয়া, দল বাঁধিয়া সবাই মিলিয়া হল্লা করিয়া কল ঘরে গেল। তারপর স্নান শেষ করিয়া সবাই যখন আহার স্থানে পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা।

ঘরে পা দিয়াই সামর্থ্য দেখিল, শোভা খাওয়া শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইতে যাইতেছে ! বিস্মিত হইয়া বলিল "বাঃ, তুমি যে বড় সকলের আগেই আজ খেলে ?"

শোভা কোন উত্তর না দিয়া, গম্ভীরভাবে আঁচাইতে চলিয়া গেল। সামর্থ্য সুর করিয়া ছড়া আবৃত্তি সুরু দিল "আগে খেলে বাঘে খায়......।"

শোভা নীরব ধৈর্য্যে আঁচাইয়া আসিয়া, নিঃশব্দে ক্ষিপ্রহস্তে টপাটপ সকলকে নুন, লেবু, ঘি, জল, পরিবেশন করিল। বাড়ীর পুরাতন রাঁধুনী 'মাসিমা' ভাত বাড়িয়া দিলেন, ছেলেরা চেঁচামেচি গল্প গুজব করিয়া খাইতে লাগিল। শোভা দুধ ও আচার লইয়া পরিবেশন প্রতীক্ষায় চুপ-চাপ এককোণে বসিয়া রহিল।

মা কার্য্যান্তরে কোথায় ব্যস্ত ছিলেন, খানিক পরে আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তিনি চৌকাঠে পা দিতে না দিতে সামর্থ্য চেঁচাইয়া অভিযোগ ঘোষণা করিল, "মা ছোট দি আজ রাগ করে আমার সঙ্গে কথা কয়নি।"

মা ছোট ছেলেকে চিনিতেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বেশ করেছে।"

ছোটদির দিকে ব্যঙ্গ কটাক্ষ হানিয়া সামর্থ্য জনান্তিকে বলিল, "আহা মার আদুরে মেয়ে!" মুহূর্ত্তে শোভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা তুমি আজ দুধ টুধ পরিবেশন কর, আমার কাজ আছে, চল্লুম।"

বাহিরে সেই সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। শোভা কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, মাথায় আঁচল ঢাকা দিতে দিতে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, সামর্থ্যের আর ধৈর্য্য রহিল না। হাত ঝাড়িয়া তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাধা দিবার উদ্যোগ করিয়া বলিল "আহা থামো, বিষ্টিতে ভিজে যে অসুখ করবে ভাই, একটু দাঁড়িয়ে যাও।"

"আমার আজ দাঁড়াবার সময় নাই,—" বলিয়া শোভা চট্ করিয়া পাশ কাটাইয়া ছুট্ দিল! সামর্থ্য নিষ্ফল ক্ষোভে—চীৎকার করিয়া বলিল "আমি শাঁপ দিচ্ছি, কিছু কাজ হবে না, হবে না, হবে না! এখনো বল্‌ছি ফিরে এসো। ফেরো ছোট দি।"

শোভা তখন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন!

মা বলিলেন "আঃ, কি যে রাতদিন খুনসুটি করিস্ সামর্থ্য! যেতে দে ওকে, আজ সৌরীনের চিঠি এসেছে,—ওকে এখন জবাব লিখ্‌তে হবে, নইলে কালকের মেল ধর্‌তে পাবে না।"

মুহূর্ত্তে সামর্থ্য শান্ত হইয়া বিনা বাক্যে আহারে বসিল। খাওয়া দাওয়ার পর সমস্ত দুপুরটা সে যে কোথায় রহিল কেউ টের পাইল না। বাড়ীতে তাহার উৎপাতের কোন সাড়াশব্দ সেদিন শোনা গেল না।

বৈকালের জলযোগ ও রাত্রের আহার সময়ে দেখা গেল, শোভাও সেদিন যেমনি ব্যস্ত গম্ভীর, সামর্থও তেমনি! কেউ কাহারো সঙ্গে কথা কহিল না, দু জনের এই অভাবনীয় নীরব ঔদাসীন্যে বাড়ীসুদ্ধ সবাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল!

(৪)

পরদিন সকালে শোভা যখন নিভৃত পড়ার ঘরটিতে ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া, তাহার সুদীর্ঘ পত্রখানার সুদীর্ঘ উপসংহার শেষ করিবার জন্য একান্ত মনোযোগে কলম চালাইতে ব্যস্ত ছিল, তখন সামর্থ্য চটিজুতা ফটাং ফটাং করিতে করিতে বারেণ্ডায় পৌঁছিয়া ডাকিল, "ছোট দি।"

শোভা শশব্যস্তে রাইটিং প্যাড্‌খানার উপর ব্লটিং চাপা দিয়া বলিল "কি?"

ঘরে ঢুকিয়া সামর্থ্য বলিল "আমার এই চিঠিখানাও জাপান-যাত্রা করবে, তোমার চিঠির সঙ্গে এটাও আজ পাঠিয়ে দিও ভাই বুঝলে?"

শোভা সংক্ষেপেই বলিল "আচ্ছা রেখে যাও,"

সামর্থ্য বিশিষ্ট ভদ্রতার সহিত সুগম্ভীরে বলিল "আচ্ছা-টাচ্ছা নয়, পাঠানো চাই-ই! বুঝলে, বিশেষ জরুরী জিনিস! লোভের বশে যেন আত্মসাৎ করে বোসো না।"

নিজের চিঠির উপসংহারের ঝাঁজে, শোভার মনটা তখন ঠিক-প্রকৃতিস্থ ছিল না।—সামর্থ্যের কথাটা তাহার কাণে ঢুকিল না, উন্মনাভাবে বলিল "আচ্ছা, সে হবে, হবে! তুমি এখন যাও, এখান থেকে।"

দু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সামর্থ্য বলিল—" 'হবে, হবে'!—অর্থাৎ লোভের বশে চিঠিখানি আত্মসাৎ করাই হবে?"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, বাঃ, আমি তাই না কি বল্‌ছি?"—পরক্ষণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল "দ্যাখ্‌ সামর্থ্য, রাতদিন জ্বালাতন, ভাল লাগে না,"—

আর কিছু না হউক, জাপানের ওই চিঠিগুলার উপর দিদির মনের জরুর তাগাদার টানটা, সামর্থ্যকে বহুদিন হইতেই 'সমঝাইয়া' লইতে হইয়াছে! সেটা মনে পড়িতেই,

মুহূর্তে সংযত হইয়া সবিনয়ে বলিল "আচ্ছা ভাই, এখন আর জ্বালাতন করব না, তুমি চিঠি লেখো। কিন্তু আমার চিঠিখানাও পাঠিয়ে দেওয়া চাই বুঝলে? ভুলো না যেন।"

কথা কয়টা বলিতে বলিতে সামর্থ্যচন্দ্র দিব্য উদারভাবে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শোভা আবার চিঠি লিখিতে লাগিল। ঝাড়া পনের মিনিট ধরিয়া কলম চালাইয়া, উপসংহারের বিদায়-অনুচ্ছেদটা শেষ করিতে করিতে তরুণী লেখিকার মুখের উপর অনেক বর্ণ-বৈচিত্র্যের ঢেউ খেলিয়া গেল! দ্রুত নিঃশ্বাসের তালে তালে, বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনার মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়া, বেচারার হৃদয়টা অকস্মাৎ ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্টায় রীতিমত অধীর করিয়া তুলিল! "ইতি"র পর নাম স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে,—হঠাৎ বিষাদ ম্লান চক্ষু দুটি ছাপাইয়া আচম্কা ঝর্ ঝর্ করিয়া একরাশ অশ্রুজল ঝড়িয়া পড়িল!

ত্রস্তে কলম ফেলিয়া সে ডেস্ক ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। চকিত দৃষ্টিতে দুয়ারের দিকে চাহিয়া,—ঘরের কোণে সরিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল। বল পূর্ব্বক নিজের এই 'ছেলেমানুষি' সামলাইবার জন্য,—মিনিট-পাঁচেক খুব ব্যতিব্যস্ততার ভিতর কাটাইয়া, তাড়াতাড়ি বইয়ের শেলফ্‌টার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, একটা বই টানিয়া লইয়া, মাঝখানটা খুলিয়া পড়িতে সুরু দিল।

এক মিনিট,—দু মিনিট,—তিন মিনিট! হাঁ, বইয়ের ঐ ছয়ছত্র লেখার মধ্যে মনকে ডুবাইয়া,—মনের আকস্মিক সঞ্চারিত বেদনা-মালিন্যটা, বেশ—চুণকাম-করা দেয়ালের মতই ধব্‌ধবে শাদা হইয়া গেল! আঃ,—জ্ঞান সমুদ্রের এক চুমুক জল, তার প্রভাব কি অসাধারণ! মানুষের মনের অসুস্থতা দূর করিতে,—এমন ঔষধ পৃথিবীতে দুটি নাই! সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন প্রতি মুহূর্ত্তে নত হয়!

বইখানিকে নমস্কার করিয়া, শেল্‌ফের ওপর রাখিয়া, শোভা দুহাতের তালুতে ঘসিয়া চোখের শেষ অশ্রুবিন্দুটুকু নিঃশেষে সাফ্ করিয়া ফেলিল। তারপর হাসি মুখে চেয়ারে বসিয়া ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া—চিঠির উপর পুনশ্চ নিবেদন লিখিল, "ব্যস্ত হোয়ো না, মনকে অনর্থক অস্থির হতে দিও না, তাতে মানুষ শুধু ভাবে কর্ত্তব্য পালনের জোর নিশ্চয়ই হারিয়ে

ফেলে! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শিক্ষা শেষ করে সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে ফিরে এসো ; আমার জন্যে কিচ্ছুটি ভেবো না, আমি বেশ ভাল আছি। আখো, এখুনি একটা বই পড়লুম, তার এক জায়গায় লেখা আছে দেখলুম—"Natureএর against যা কিছু rebellion, তাই হচ্ছে চেতনশক্তির ক্রিয়া ; কি চমৎকার! কথাটার দাম আমার কাছে,—Better more than thousand pearls.] সত্যিই! ওই 'চেতনশক্তির ক্রিয়াটা' যাতে অহরহ আমাদের ভিতর সজীবভাবে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে, তার দিকে সর্ব্বদা আমাদের সজাগ লক্ষ্য রাখা উচিত, কি বল? ইতি"

চিঠি ভাঁজ করিয়া খামে পুরিয়া, ঠিকানা লিখিয়া খাম বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়া,—চিন্তা-বিভোরা তরুণীর হঠাৎ স্মরণ হইল, ছোট ভাইটির চিঠির কথা!—হাত বাড়াইয়া সেটা টানিয়া লইয়া লইল ; ভাঁজ করা চিঠিখানা খুলিয়া দেখিবার উৎসাহ বিশেষ ছিল না কারণ দুষ্টু ছোট ভাইয়ের দুষ্টু-কীর্ত্তি—সে সর্ব্বজন বিদিত! বিশেষ শোভার চিঠির সঙ্গে, শোভার হাত দিয়া ইহা যখন পাঠানো হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই শোভার বিরুদ্ধে গুরুতর নালিশ ইহাতে চলিতেছে; তার কোন সন্দেহ নাই! সুতরাং এটা শোভার দেখা নিষ্প্রয়োজন!

চিঠিখানা না দেখিয়া সোজা খামে পুরিতে গিয়া, সহসা শোভার চক্ষে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিল! এ আবার কি?—চিঠির কাগজের উল্টা পিঠ ফুঁড়িয়া যে কত রং ঢং'এর বর্ণ-ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! তবে কি সৌরীনের কাছে চিত্র-বিদ্যার পরিচয় পাঠানো হইতেছে না কি?—

শোভা কৌতুহল উৎসুকভাবে চিঠির ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল! বাঃ, চমৎকার ছবি!—একখানা ঘরে, একটা ডেক্সের উপর ঝুঁকিয়া একটি মেয়ে কি লিখিতেছে। তাহার কাপড় জামা—এমন কি কাপড়ের চিড়িতন পাড়টা পর্য্যন্ত শোভার কাপড়ে পাড়ের মত, হাতের চুড়ি, গলার হার সবই শোভার মত!—পা হইতে গলা পর্য্যন্ত দেহটাও সবই শোভার মত,—শুধু মুখের চেহারাটা নিখুঁত বাঁদরের!—ছোট খুদে কপাল,—ও কোঁচ্‌কানো ভুরুগুলা খুদে চোখের মিটমিটে দৃষ্টিটা শুদ্ধ,—ঠিক আস্ত বাঁদরের দৃষ্টি!

ছবির নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে,—"বিনয় নমস্কার সহ বিজয়া-দশমীর প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে, আপনাকে এই "বাঁদর-মুখ্‌খি" ছবিটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এই 'বাঁদর মুখ্‌খিটি' আমাদের বাড়ীতে থাকে ;—এর সব ভাল—দোষের মধ্যে মহৎ দোষ, আমার সঙ্গে

রোজ্ রোজ্ ঝগড়া করে! আপনি ফেরৎ তাকে দয়া করে ওর জন্যে একগাছা মজবুত জাপানী-বেত পাঠাবেন,—দেখবেন, ভুলে যাবেন না যেন!—ইতি আপনার স্নেহের সামর্থ্য!"

শোভা মুহূর্ত্তের জন্য অবাক্! নিজের আকৃতি প্রকৃতির এই বিসদৃশ বিকৃত ভাব-ভঙ্গিমা দেখিলে, দুঃখে মানুষের চোখে জল আসাই বোধহয় উচিত—কিন্তু শোভার মনটা নাকি তখন নেহাৎ ভিন্ন সুরেই বাঁধা দিল, তাই কান্না চুলোয় গেল,—অপর্য্যাপ্ত কৌতুকে, খোলা প্রাণে, সহসা খিল্ খিল্ করিয়া উচ্চ-উচ্ছ্বাসে হাসিয়া উঠিল! বাবাঃ! ঐ দুষ্টু ভাইটির মাথায় কি অপার মহিমাময় দুষ্টু বুদ্ধিই ঠাসা আছে! দুষ্টামির জন্য ভাইটির গালে চড় বসাইতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে—ওর বুদ্ধির খুরে দণ্ডবৎ হইবার ভক্তিও জাগে যে!

হঠাৎ কানের ভিতর ও কি! পালকের সুড়্সুড়ি!—লাফাইয়া শোভা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! চারিদিক চাহিয়া, অবাক্ হইয়া গেল! নাঃ কেউ কোথাও নাই! ঘর তো জনমানব শূন্য!—সন্দিগ্ধভাবে বার বার কান ঝাড়া দিয়া,—এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল; এ কি-রে বাপু! নিরপরাধ কানটার উপর এমন অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করে কে?

কিন্তু হায়! জন প্রাণীর সন্ধান মিলিল না!—বার বার কানের উপর থাব্ড়া বসাইয়া, কাঁধের উপর মুখ ফিরাইয়া বেচারা, বিশেষ যত্নে উপর্য্যুপরি ঝাড়্ ফুক্ করিল। কিন্তু কোন পোকা মাকড়ের চিহ্ন দেখা গেল না। অগত্যা আবার চেয়ারে বসিল, ছবিখানি হাতে তুলিয়া, হাসিভরা মুখে প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টিতে অঙ্কন নৈপুণ্যের শোভা দেখিতে লাগিল।

ঐঃ! আবার ও কি! চেয়ারখানা যে আপনা-আপনি উল্টাইয়া পড়িতে সুরু দিল!—চমকাইয়া শোভা ব্যস্ত-ব্যাকুল হইয়া, চীৎকার করিল,—"এই এই, কে রে! সামর্থ্য নিশ্চয়!"

মুহূর্ত্তে চেয়ারের তলা হইতে গা-ঝাড়া দিয়া পিছন দিকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সামর্থ্য সপ্রতিভ গাম্ভীর্য্যভরা মুখে, টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার জানাইয়া,—বেশ ধীর গতিতে চেয়ারখানি পিছনের দিকে ক্রমশঃ কাৎ করিয়া লইয়া চলিল। শোভা বিষম আতঙ্কে অস্থির হইয়া চেয়ারের হাতা চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া বলিল "এই, এই,—ছাড়্ সামর্থ্য, তোর পায়ে পড়্ছি ভাই!"

বিনা-বাক্যে তৎক্ষণাৎ চেয়ারখানি সোজা করিয়া দিয়া, সামর্থ্য সামনে দাঁড়াইল;—পা দুখানি বেশ ভদ্র ধরণে জোড়া করিয়া দিয়া, গুরু পুরোহিত-জনোচিত গ্রাম্ভারী চালে, মধুর স্বরে বলিল "এই যে ভাই, পা পেতে দিয়েছি, পড়ো পায়ে।"

এক ত: চেয়ার উল্টানোর জন্য ঝাঁকানি খাইয়া শোভার মগজ তাতিয়া উঠিয়াছিল, তার উপর এই অসহ্য বে-আদবি দেখিয়া সদ্যঃ ত্রাসমুক্ত মনটা বেজায় উষ্ণ হইয়া উঠিল,—পরম নির্ভয়ে! রাগে লাল হইয়া বলিল "এই যে পড়ি!"

সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হইয়া সে, সামর্থ্যর পায়ের পাতা লক্ষ্য করিয়া, দুম্-শব্দে এক কিল্ বসাইল! নিমেষ মধ্যে সামর্থ্য কিছু হটিয়া, সতর্কভাবে পা বাঁচাইয়া, ধীরে,—নিতান্ত সহৃদয়-ভাবে বলিল "হাঁ, হাঁ,—স্থিরোভব!"

প্রাণপণ শক্তিতে খরচ-করা কিলটা পড়িল গিয়া—সটান মেঝের বুকে! হাতে কঠিন আঘাত বাজিল,—মাথা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল! ক্ষোভে চোখে জল আসিয়া পড়িল! কাজেই শোভা অধিকতর চটিয়া উঠিতেই বাধ্য হইল!—সজল চোখে, রুদ্ধ স্বরে বলিল "পাজি ছেলে, কোথাকার! উঃ, যা লেগেছে হাতটায়! ..তুই সরে গেলি কি-বলে?"

সামর্থ্য অম্লান বদনে সপ্রতিভভাবে বলিল "তুমি পায়ে পড়্‌বে বলেই পা পেতে দিয়েছিলুম, তোমার কিলটা পড়্‌বার জন্যে নয়! রাগ করো কেন ভাই?"

ব্যথিত হাতখানার উপর সযত্নে হাত বুলাইয়া ফুঁ দিতে দিতে শোভা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "আচ্ছা বড়দা'কে আজ বাড়ী আস্‌তে দাও,—তাপর তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে—"

(৫)

বড় বৌদিদি ঘরে ঢুকিয়া, ঈষৎ গম্ভীরভাবে তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিলেন "বলি রকমটা কি বল দেখি সামর্থ্য? ছোট্‌দি কি তোমার বড় বোন, না আর কেউ?"

শোভা অভিমান—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল "দ্যাখো দেখি বৌদি, কি বল্‌তে ইচ্ছে করে বল দেখি? নাঃ, আজ বড়দাকে যদি সব না বলি, তবে আমার নামই মিথ্যে! তুমি সাক্ষী থাক বৌদি,—সব গুলো সেই সময় আমায় একে একে মনে পড়িয়ে দিও।—এই দ্যাখো, ছবি আঁকা হয়েছে,—আমি 'বাঁদর-মুখ্‌খি'!—তাপর হেঁট হয়ে বসে লিখ্‌ছি, না—অম্নি পেছন থেকে এসে কানে পালকের সুড়সুড়ি দেওয়া, তাপর, পায়ে কিল মার্‌তে গেছি, না—অম্নি চট্‌ করে সরে দাঁড়ানো হোল!—হাতটায় আমার যা লেগেছে বৌদি, সে বলবার নয়! ভাখো-না, লাল হয়ে গেছে!—"

শোভার হাতখানার দিকে চাহিয়া বৌদিদি ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন "সত্যি সামর্থ্য! কি মনে করেছ বল দেখি?"

সামর্থ্য তটস্থ হইয়া হাতমুখ নাড়িয়া বক্তৃতা সুরু করিল "দোহাই ধর্ম্ম বল্‌ছি বৌদি—কিচ্ছু মনে করি নি, কিচ্ছু না! কিন্তু তুমিই বিচার করো, ছোট্‌দির অন্যায় নয়? আরে খেলে বা, পায়ে এক কড়ার কম নাই, আমার সঙ্গে লাগতে আসে কেন? আমার পায়ে কিল

বসাবার সাধ হয়েছে, বেশ তো বছর দুই তা হলে বক্সিং টক্সিং প্র্যাক্‌টিস্ করো আগে, তার পর এসো ! তা নয়, ঐ ননীর গোপালের মত হাত দিয়ে, "কেলে ধরতে পারি না-পারি— কেউটে ধর্‌তে যাই !" অন্যায় আবদার যে ! লাগবে না হাতে, বেশ হয়েছে ! আমার দোষ কি ?—"

একটু থামিয়া, খুব বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া, গভীর অবজ্ঞার স্বরে পুনশ্চ বলিল "হুঁঃ ! পীরের কাছে মাম্‌দোবাজি ! তা কি টেকে কখনো ?"

দুয়ারের কাছে জুতার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন-কৌতুকোজ্জ্বল মুখে বড় দাদা ঘরে ঢুকিয়া,—স্নিগ্ধ বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে বলিলেন "কস্মিন্ কালেও নয় ! কোন্ আহাম্মক্ এমন কথা বলে ?"

মুহূর্ত্ত সামর্থ্য ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ !

শোভা আক্ষেপের উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বলিল "দ্যাখো বড়দা, দ্যাখো ! ওর কত 'বিত্তের' বেড়েছে দ্যাখো !—আমায় জ্বালাতন্-পোড়াতন্ করে তুলেছে !—এই তুমি যতক্ষণ বাড়ীতে থাক্‌বে বড়দা, ততক্ষণ আমার সঙ্গে কিচ্ছুটি কর্‌বে না, কেন জানো ? ভয় আছে কি না, পাছে তোমায় বলে দিই ! আর তুমিও যেই বাড়ী থেকে বেরুবে, অম্নি ও-যেন দশভুজা হয়ে পড়ে।

সামর্থ্য মিটি মিটি চোখে চাহিয়া সকরুণ বিনয়ের সুরে বলিল "দশ ভু —জা ?"

বড়দা, হাসিয়া ছোট ভাইটির কাঁধে এক থাবড়া বসাইয়া বলিলেন "বড় বোন নয় ? ষ্টুপিড্ !"

শোভা অপ্রস্তুত ভাবে বলিল "আহা ! ওটা যেন আমার মুখ দিয়ে রাগের মাথায় বেড়িয়ে গেছে, কিন্তু তোমার বিদ্যে কি ? এই দ্যাখো বড়দা, আজ কাল উনি 'ফাইন্-আর্টে' কত বড় তালেবর হয়ে পড়েছেন ! ছবি দ্যাখো—আমি না কি বাঁদর মুখ্‌খি !"

শোভা ছবিখানি আগাইয়া দিল, বড়দা সেটা হাতে লইয়া চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সকৌতুকে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন !

সামর্থ্য অলক্ষিতে শোভার দিকে গভীর ভৎর্সনার দৃষ্টি হানিয়া, মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে আস্তে আস্তে প্রস্থানোদ্যত হইল। বৌদি সুগম্ভীরে বলিলেন "দাঁড়াও-না ভাল-মানুষ ! চলে যাচ্ছ কেন ?"

বড়দা চমকিয়া, ত্রস্তে হাত বাড়াইয়া, ছোট ভাইটির গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইলেন। সহাস্যে বলিলেন "দাঁড়াও না হে, অত ব্যস্ত কেন ? আমাকেও তো যেতে হবে এখুনি, এক সঙ্গেই যাব। তা পেন্টিং তো বেশ হয়েছে,—'অতি উত্তম' যাকে বলে তাই !

কিন্তু এই বেতগাছটি গৌরীনের কাছে না চেয়ে তোমাদের হেডমাষ্টার মশাইয়ের হাত থেকে নিলেই বেশ ভাল হয় গো! কি বল, ছবিখানি আমি তাঁরই কাছে পাঠিয়ে দি কেমন?"

সামর্থ্য নিরীহ ভদ্রলোকের মত ঘাড় হেঁট করিয়া নিরুত্তরে,—নিঃশব্দে মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

শোভা সোৎসাহে তাড়া দিয়া বলিল "জবাব দাও!"

সামর্থ্য ঠোঁট মুখ কুঁচকাইয়া সকরুণভাবে বলিল "তুমি থামো, তোমায় অত ভাবতে হবে না!"

শোভা হাসিয়া ফেলিল, বড়দাও হাসিলেন! বৌদি কৃত্রিম কোপে বলিলেন "না—না, তোমরা অমন করে হেসো না, ওতেই তো ওর আস্কারা আরো বাড়ছে! যত দোষের মূল শোভা,—ওর যত ছিঁচ-কাঁদনে-পণা বড়দের কাছে! কেন ও কি নিজে একটু বকুনী-ধমকানী দিতে পারে না, তা হলে সামর্থ্য কেমন না-শাসন হয় দেখি!—"

শোভা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল "করবো কি বলো? ওকে চোখ রাঙাতে গেলেই আমার চোখ টন্-টন্ করে ওঠে! আর বেশী রেগে কিছু বলতে গেলেই মাথা ধরে ওঠে! এতে শাসন করি কেমন করে?—"

বড়দাদা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! সামর্থ্য অপ্রতিভ ভাবে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল! বৌদি, ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তোমার দ্বারা যদি পৃথিবীর একটা উপকারের আশা আছে!"

শোভা সকরুণ ভাবে বলিল "আহা তাই যদি থাকবে বৌদি, তা হলে তো এদ্দিন মানুষ হয়ে যেতুম! তা তোমরা poor helpless criture বলে ঠাট্টাই করো আর যাই করো! তোমার ওই দুর্দ্দান্ত ছোট দ্যাওরটিকে শাসন করা, আমার দ্বারা হবে না বাপু। শুনলে তো তোমার সামনেই আমাকে বক্সিং প্র্যাক্‌টিস্ করবার উপদেশ দিয়ে বসল? ওর বুদ্ধি কত!"

বড়দাদা সবিস্ময়ে বলিলেন "কি? কি? বক্সিং প্র্যাক্‌টিস্? কাকে? তোমায় না কি?—"

"তবে আর দুঃখের কথা বলছি কি?"

বৌদি বলিলেন "শুধু তাই? বড় বোনকে আবার হুকুম হয়েছে, 'পায়ে পড়ো'!"

শোভা তটস্থ হইয়া সমর্থনের সুরে বলিল "হ্যাঁ, তা আবার বল্‌তে ভুলে যাচ্ছি!"

ছোট ভাইয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বড়দাদা গম্ভীর ভাবে বলিল "হ্যাঁ, হে!"

সামর্থ্য চুপ!

বড়দাদা অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন "জবাব দাও—বলেছ?"

"বলেছি।"

"কেন বলেছ ?"

অধোবদনে সামর্থ্য উত্তর দিল, "সে কি আর আমি 'আত্রিক্' বলেছি, আদর করেই বলেছি।"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, বড়দাদা সুগম্ভীরে বলিলেন, "অ !—'কিন্তু' ও রকম আদর তো ঠিক শিষ্টাচার-সম্মত নয় ! কান মলতে হবে।"

সামর্থ্য ঘাড় হেঁট করিয়া, দুহাতে নিজের কান দুটির উপর বেশ কঠিন মোচড় লাগাইল।

বৌদি কপট করুণার স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আহা মরে যাই ! কান দুটো লাল হয়ে গেল যে !"

সামর্থ্য ছেলেবেলায় রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া যখনি মুখ কান লাল করিয়া তুলিত, তখনি বৌদি অনুগ্রহ ভরে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন যে দুষ্টু ছেলের দৌরাত্ম্যের জন্য নিশ্চয়ই কেহ কান মলিয়া দিয়াছে ! বৌদির মুখে এই দুঃসহ অপমান-জনক সন্দেহের কথাটা শুনিলেই সামর্থ্য রাগে ক্ষোভে অস্থির হইয়া পড়িত। এখন বড় হইয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। তবুও আজ নিজের হাতে নিজের কানের যে দুর্দ্দশা-সম্পাদন করিতে বাধ্য হইল, তার জন্য আর সব দুঃখ কষ্ট সে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বৌদির নিষ্করুণ-সহানুভূতিটা মোটেই নয় ! ক্ষুণ্ণ চিত্তে অভিমান-ক্ষুব্ধ দৃষ্টি তুলিয়া, আড় চোখে একবার বৌদির দিকে চাহিল, তারপর নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিল।

শোভা বিশেষ মাত্রায় গুরু-গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া, খুব সংযত ভাবে বলিল "আর কখনো লাগবে আমার সঙ্গে ?"

সামর্থ্য নিরুত্তর।

সামর্থ্যের কাঁধে কুনুইয়ের ঠেলা দিয়া বড়দা বলিলেন "জবাব দাও—জবাব দাও, —ও হচ্ছে বড় বোন !"

শোভার দিকে দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, সামর্থ্য নিতান্তই অনিচ্ছার সহিত উত্তর দিল,—"না।"

বড়দা বলিলেন "মনে থাকবে তো ? এবার কিন্তু কিছু করলেই হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে হবে,—বুঝলে ?—"

সামর্থ্য ঘাড় নাড়িল।

(৬)

কায়ক্লেশে হাসি চাপিয়া, সমস্ত দিনটা ধরিয়া সামর্থ্যের সামনে শোভা দিদি-জনোচিত গাম্ভীর্য্যটা বজায় রাখিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর কুচা ছেলে কটিকে তেতলার ছাদে জড় করিয়া শোভা হার্ম্মোনিয়ামটা বাজাইতেছিল। সামর্থ্য হুড়্দাড়্ শব্দে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া, ডাকিল—"ছোটদি।"

অনাবশ্যক বিবেচনায় কোন উত্তর না দিয়া, শোভা নিজ মনেই গৎ বাজাইতে লাগিল। সামর্থ্য সামনে আসিয়া বসিয়া, পকেট হইতে তাহার প্রিয়তম রূপা-বাধানো কলমটি সখের শিল্কের রুমালখানি, এবং একটা সুদৃশ্য বাঁধাই নোট্বুক বাহির করিয়া শোভার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া খুব উদাস-গম্ভীরভাবে বলিল, "এই নাও ভাই, এ গুলো তোমায় দান করে দিচ্ছি!—"

এই পরম আদরের সম্পত্তিগুলা এমন উদারভাবে দান করিতে দেখিয়া শোভার মনে মনে যথেষ্ট বিস্ময় জাগিল, কিন্তু দিদিত্বটাকে তো হাল্কা করা চলে না! তাই, গ্রহণ সম্বন্ধে স্বীকার অস্বীকারের কোন লক্ষণ না দেখাইয়া,—নির্লিপ্ত মৌনভাবে, যেমন গৎ বাজাইতেছিল, তেমনি বাজাইয়া চলিল।

সামর্থ্য সামনে ছাড়িয়া, পিছনে গিয়া বসিল। শোভার পিঠে ঠেস্ দিয়া বসিয়া করুণ-গুঞ্জনে বিনীত নিবেদন সুরু করিল, "দ্যাখো ভাই—"

শোভা বাধা দিয়া হঠাৎ গলা ছাড়িয়া গান সুরু করিল:—

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগ্ব আমি
দাও মোরে সে কান।
ভুল্ব না আর সহজেতে—"

কিন্তু তন্দণ্ডই বাজনার সুরে সাংঘাতিক-ভুল হইল! বেচারা অপ্রস্তুত হইয়া গলা থামাইয়া, বাজনার সুর ঠিক করিতে লাগিল। সামর্থ্য নীরবতার অবকাশ পাইয়া আবার বলিতে সুরু করিল,—"বুঝ্লে ভাই, বড়দাকে অমন করে বলে-টলে দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি। হাজার হোক, বড়দা হচ্ছেন বড় ভাই,—তিনি তো ছেলে মানুষ নন্। তা নইলে ক্ষেতি ছিল না। কিন্তু ওকি ভাই, বড়দাদের কাছে কি অমন করে বলে দিতে আছে? দ্যাখো ভাই, আর যেন কখনো বলে দিও না, বুঝ্লে?"

শোভা গলা পরিষ্কার করিয়া আবার গান আরম্ভ করিল,—"ভুলব না আর সহজেতে—"

সামর্থ্য ক্ষণেকের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া গানের মাঝখানেই আবার আরম্ভ করিল,—"বুঝ্লে ভাই, তোমাকে আমি আন্তরিক ভালবাসি কি না, তাই জন্যই তোমার সঙ্গে অমন

করে লাগি, নইলে কি লাগতুম! এই যে মেজদি আছে, তা মেজদিকে কিচ্ছুটি বলি? কক্খোনো বলি? তাতো বলি না! তোমায় সত্যিই আন্তরিক ভালবাসি কি না, তাই তন্যেই—"

খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া শোভা হার্ম্মোনিয়াম ছাড়িয়া দিল। মুখ ফিরাইয়া, চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "আমায় অমন করে আন্তরিক ভালবাসতেও হবে না, আর অত করে পিছনে লাগ্‌তেও হবে না। আমি ঢের ঢের আন্তরিক ভালবাসা দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখি নি।"

একটু থামিয়া বলিল "তোমার রুমাল টুমাল ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ওসব আমার চাই না।"

সামর্থ্য তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সজোরে ধমক দিয়া বলিল "না, নাঃ! অত আদুরেপনায় কায নাই! ওসব তোমায় নিতেই হবে! আচ্ছা, আমার ওপর রাগ করো কি বলে? আমি কি একটা মানুষ? হুঁ! তোমার যদি একটুও বুদ্ধি আছে!—"

শোভাকে দ্বিতীয় কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া পরক্ষণেই সবেগে প্রস্থান!—

শোভা থামিল। স্নেহের টানে, গভীর ব্যথায় অজ্ঞাতেই তাহার সমস্ত হৃদয়টা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সত্যই, এই অতি দুষ্টু ছোট ভাইটির উপর রাগ করার মত বড় মূর্খতা তাহার দিদি-জীবনে আর কিছুই নাই!—

ছল্ ছল্ চোখে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, আবার বাজনাটা টানিয়া লইল, চাবি টিপিয়া গান আরম্ভ করিল,—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।"

(৭)

রাত্রে আহার স্থানে আবার দু ভাই বোনের দেখা হইল। অন্যমনস্কতার ভুলে, সামর্থ্য, শোভার সামনের আসনখানাতে বসিয়া পড়িল। ছেলেদের দলে প্রবল গল্প গুজবের সঙ্গে আহার চলিতে লাগিল।

খাইতে খাইতে সামর্থ্য কেবলই শোভার দিকে চাহিয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল; কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া শোভার দিকে চাহিয়া, বিনা-ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "দ্যাখো ভাই ছোট দি, তুমি না মরে গেলে, আমার আর নিশ্চিন্দি হবার যো নাই!—"

এত বড় গুরুতর সঙ্কটের সংবাদে শোভা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল মাত্র! কোন উত্তর দিল না।

"সত্যি বলছি!"—বলিয়াই সামর্থ্য সবিনয় অনুরোধের স্বরে পুনশ্চ বলিল "তুমি একটু শীগ্রী করে, মরে যাওনা ভাই।

ছেলেরা হো হো—হা-হা রবে হাসি জুড়িল!

সামর্থ্যের দুর্ভাগ্য! বৌদি দুয়ারের কাছে দিয়া সেই চলিয়া যাইতেছিলেন, কথাটা কানে ঢুকিতেই থমকিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। সামর্থ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেন বল দেখি? ও তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছে শুনি?—"

দু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সামর্থ্য বলিল "বলব তবে সত্যি কথা? এর চেয়ে পাকা ধানে মই আর আছে না কি? আজ দুপুরবেলা আমার এক বন্ধু আমার একটা বেশ ঝক্‌ঝকে বাঁধানো ডায়ারী বই উপহার দিয়ে গেছে, পাছে ছোটদি সেটা দেখ্‌তে পেয়ে লোভ করে বসে, বলে তাড়াতাড়ি সেটাকে কাউকে না দেখিয়ে বাক্সে পুরেছে, কিন্তু কিছুতে সুস্থির হতে পাচ্ছি নে,—কেবল মনে হচ্ছে কতক্ষণে ছোটদিকে সেটা দান করি!—এতে কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়-না, যে ছোটদি মা মরে গেলে, আমার নিস্তার নাই?—সত্যি, কি যে আমার হয়েছে জানিনে, খালি-খালি মনে হচ্ছে, আমার যা-কিছু ভাল জিনিস্ আছে সব ছোট্‌দিকে দিয়ে দিই!"

শোভা সস্নেহ হাস্যে বলিল "ঐঃ। আমি তোর কাছে চাইচি যে ভাই বল্‌ছিস্ ও রকম।"

সামর্থ্য গম্ভীর হইয়া বলিল "মুখে চাও-নি, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই চাইচ, না-হলে আমার এত অসোয়াস্তি লাগ্‌ছে কেন? নঃ, কায-নি ভাই, আমি শোবার আগেই আজ সেই ডায়ারীখানা তোমায় দিয়ে দেব, না হলে রাত্রে ঘুমুতে পার্‌ব না!"

শোভা হাসিমুখে বলিল 'আচ্ছা তোর ঘুমের ব্যাঘাত করতে চাইনে, আজ রাত্রের মত সব ক'টা জিনিস নেব, কিন্তু কাল সকালে সবগুলা তোকে ফিরিয়ে দান করে দেব ভাই; সত্যি বল্‌ছি, ওসব জিনিসের দরকারও আমার নাই, ওসবের ওপর লোভও কিছু নাই। কিন্তু ঐ জন্যেই কি, রুমাল টুমাল গুলো তাড়াতাড়ি ধমক দিয়ে দান করা হোল?—"

সামর্থ্য উত্তেজিত আগ্রহে বলিল "হাঁ গো! মনে করেছিলুম ঐগুলো দিয়ে তোমায় ভুলিয়ে দেব, ডায়রীখানা আড়াল থেকে বেঁচে যাবে! কিন্তু দেখছি তা হবার যো নাই!"

শোভা আসিয়া নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল! নিতান্তই শিশু বুদ্ধির ছেলে মানুষ, এই দুষ্টু-ছোট-ভাইটা!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"
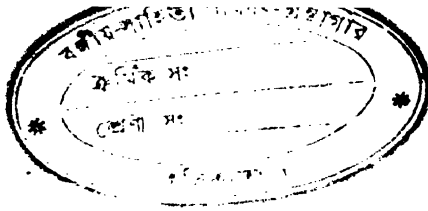
৫ম বর্ষ। | কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল। | ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পারের কড়ি।

—:•:-

আজ্‌কে হঠাৎ বান ডেকেছে
নামলো পথেই বাদ্‌লাটী,
অচেনা ঘাট পার পাব কি?
নেই যে কাছে আধলাটী।
ব্যস্ত হাটের লোকের ভিড়ে
দ্বিগুণ কড়ির লোভ ছেড়ে
পার কি আমার কর্‌বে মাঝি
ভাবছি বসে একলাটী।

(২)

ভাবছি বসে দেখলে মাঝি
ডাকলে দিয়ে হাত ছানি,
বল্লাম আমি 'নেই যে কড়ি'
বল্লে 'তোমার ঘর জানি
তুমিই এসো সবার আগে
প্রথম খেয়ায় পার হবে
পূজার লাগি যাচ্ছ তুমি
সবার চেয়ে সম্মানী।'

(৩)

চোখ ফেটে মোর জল যে এলো
উঠলো ভরে মোর হৃদি,
হরির দয়ায় অবিশ্বাসী
হয় যে কেবল নির্ব্বোধই।
অকূল পারাবারের মাঝি
দয়াল দীনবন্ধু হে
ভাবনা সেথায় কিসের বল
রিক্ত করে যাই যদি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সমাজ ও প্রথা।

'আজ এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রচারের যুগে সমাজ ও জাতি গঠনে লোকাচার ও প্রথার মূল্য কত নির্ণয় করতে বসেছি বলে ভয় হচ্ছে, যে বোধ হয় আমাকে অনেকেরই বিরাগভাজন হতে হবে। তাঁরা হয়ত বলবেন যে আমরা এখন জাতীয় উন্নতির প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁচেছি, এ সময়ে পূর্ব্ব-সংস্কারের ও কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে নূতন ভাবে জাতি গঠনের দরকার পড়েছে।' (নব্যভারত ১৩২৮ বৈশাখ সমাজসংস্কার)। আবার অনেকে বলবেন এখন আমাদের অগ্রসর হবার পালা—শুধু সামনে আমাদের দৃষ্টিকে চালিত করতে হবে,—এ পালা শেষ না হতে পেছনে তাকান কেন,—লোকাচার ও প্রথা অতীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংবদ্ধ, অতীতের অভিজ্ঞতার ও চেতনার ফল, এ যে শিশুর কোমরে বাঁধা Leading Strings এর মত ক্রমাগত আমাদের এগিয়ে যাবার চেষ্টাকে প্রতিহত করবে।

একথা খুবই সত্য যে আমাদের অগ্রসর হবার যুগ এসেছে—এ আমাদের নূতন করে সমাজ সংগঠনের কাল। আশার মাদকতায়, উৎসাহের আনন্দে, আর নূতনের আকর্ষণে আমরা চলেছি আমাদের জাতীয় জীবনের স্বপ্নটাকে বাস্তব করে তুলতে, আমরা চ'লেছি আমাদের অভীপ্সিতকে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে তাকে নিকট ও সুলভ ভেবে। প্রবর্ত্তক বলেছেন "সোণার ঊষা রঙীন আলোয় জগৎ ছেয়ে দিয়েছে—স্বর্ণপথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ধ্বজা নিয়ে সারি দিয়ে পথে এসে দাঁড়াও, এবারের অভিযান জয়ের নিশান কাঁধে নিয়ে ফিরবে—ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয়ের দিন সমাগত।" (প্রবর্ত্তক, চৈত্র ১৩২৭ সাধনার ত্রিধারা)। আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে সাধনার সাফল্য কেবল মাত্র উৎসাহ-দীপ্তিতে আলোকিত ও দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে না, একে লাভ করা যায় জ্ঞান-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত উপায় ও পথের সম্যক অবলম্বনে আর আত্মশক্তিতে, ঐকান্তিকী বিশ্বাস মহিমায়। কিন্তু জাতির কিম্বা ব্যক্তির জ্ঞান ও আত্মশক্তি-প্রত্যয় অতীতহারা নয় বরং অতীতের সত্যোপলব্ধির বিকাশ। জাতির উন্নতিকল্পে পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরবগাথা বা ঐতিহাসিক বিবরণের প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলেই স্বীকার করে

থাকি। তবে কেন আজ অতীতকে বিনা বিচারেই ঘৃণা করব, আর সেই অতীতের সন্তান—প্রথা ও লোকাচারগুলিকে বিনাতর্কে দূর করে দেব ?

তাই আজ যদি আমাদের কারও মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠে যে, যে সরল পথ আজ আমরা উৎসাহের আলোকে আমাদের সামনে প্রসারিত ও উন্মুক্ত দেখ্তে পেয়েছি সে পথ ধরেই কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমাজকে ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে "সত্যম্"এর— উপলব্ধির জন্য পরিচালিত করেছিলেন, না এ এক নূতন পথ—অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধহারা, একেবারে নবীন, চলবার সাথে সাথে পায়ের নীচে প্রচণ্ড উৎসাহের কুহকে গড়ে উঠা তবে সে প্রশ্নকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যদি কারও মনে জাগে পথ চলতে চলতে, যে পথে চলেছি এ কি শুধু ভবিষ্যতের মোহন ছবিটাকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্চে না পথের দুধারের চিরশ্যমলতার পূর্ণধারায় পার হয়ে আসা অতীতটাকে সৌন্দর্য্যের সূত্রে ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে তাকেও "Do-nothingism" এর প্রচারক বলে উপহাস করতে পারব না। জীবন একটা অখণ্ড সত্তা—অবিরামগতি জল প্রবাহের মত যার উৎপত্তি স্থান হতে পরিণতি পর্য্যন্ত একই ধারার ক্রমিক বিকাশ। বর্ত্তমান ও অতীত এ যেন প্রবাহের দুইটী তীর, এই দুই শক্তির সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিত্বের কিম্বা জাতিত্বের চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে উভয়েই ভবিষ্যতের আদর্শের দিকে প্রসারোন্মুখ হয়ে থাকে।

বর্ত্তমান কালে সমাজের বন্ধন আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনটাকে এতদূর বেদনা দিচ্ছে যে আমরা সংস্কারকে (Conventions) ঘৃণার বস্তু বলে উপেক্ষা করে আসছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহীচিত্ত পাশ্চাত্য দেশে একটা ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। এই "ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্র প্রচারক রুসো চীৎকার করে বলেছিলেন "Do just the opposite of what has been done and you will do right"—চিরকাল লোকে যা করে এসেছে তার বিপরীত কাজ করো তবেই কর্ত্তব্য করা হবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রকৃতি মানুষকে জ্ঞানী ধার্ম্মিক ও উদার করে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের কৃত সংস্থাই মানুষকে প্রকৃতির শিক্ষা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে অধঃপতনের পথে আকর্ষণ করছে। অতএব সমাজের কিম্বা রাষ্ট্রের সকল আইন কানুন অনুশাসন

সম্মার্জ্জনী নিয়ে দূর করে ফেলে দাও। রুসোর এ মন্ত্র বিরোধের মন্ত্র। এ দিয়ে যা আছে তাকে ভাঙবার ক্ষমতা জাগিয়ে তোলা যায় বটে কিন্তু গড়বার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। রুসোর শিক্ষায় রয়েছে একটা রূঢ় শক্তি যেটা প্রতি পদক্ষেপেই যা কিছু পুরাতন তাকেই কুসংস্কার ভেবে প্রবল তাড়নে ভাঙতে সমুদ্যত। আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাটা হল গঠন কার্য্য (Reconstruction) যেখানে গড়বার কোন প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে না সেখানে ধ্বংশ সাধনের কোনও প্রণালী নির্দ্দেশের আবশ্যকতা হয় না—একদিক হতে ভাঙতে সুরু করলেই যথার্থ কাজ করা হয়। তাই যে আদর্শ (Ideal of Reconstruction) আমরা সামনে করে চলেছি তাকে পেতে হলে রুসোর মন্ত্র আমাদের একটুও কার্য্যকর হবে না। একজন লেখক বলেছেন—

"The social problem of modern times is to combine conservation and progressiveness to retain all structural conventions while replacing those social prescriptions that have lost their efficacy."

আমাদের বর্ত্তমান কালের প্রধান সমস্যা এই যে কি করে সংরক্ষণনীতির সঙ্গে উন্নতির চেষ্টাটাকে সুসমঞ্জস করতে পারা যায়, সমাজের যে সকল বিধি ব্যবস্থা তাদের মঙ্গল সাধনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তাদের উচ্ছেদ সাধন করে কি উপায়ে সমাজ সৌধের মূলীভূত প্রথা-গুলিকে রক্ষা করতে পারা যায়।

সমাজের প্রথাগুলি কি, আলোচনা করলে পর আমরা দেখতে পাব যে সমষ্টিগত মানবের কার্য্য ও ইচ্ছাই লোকাচার বা প্রথায় পরিণত হয়। আমাদের আধ্যাত্মিক নৈতিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় সকল প্রকার প্রচেষ্টাই এই সংস্কার বা প্রথার সহায়তা পেয়ে গড়ে উঠেছে। আমাদের ভাষা এক দেশবাসী কতকগুলি লোকের পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য উদ্ভাবিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়—এ'দের মধ্যে অল্প কয়েকটা মাত্র শব্দ আমাদের মনো-ভাবের যথার্থ দ্যোতক স্বতঃজাত—এতদ্ব্যতীত প্রায় সকলগুলিই conventions. মানবের বিভিন্ন পথানুসারিনী শক্তিপুঞ্জকে একটা সংহত শক্তিতে—আবদ্ধ করবার পক্ষে এই convention গুলির যে একটা সার্থকতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কথা বলবার সময়

মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য এই যে Conventions সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্যই Tower of Babel অতটা দূর গড়তে পারা গিয়েছিল আর এই conventions এর লোপের জন্যই সংহত শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে Tower অগঠিত অসম্পূর্ণ পড়ে রইল।

একজন পাশ্চাত্য লেখক বলেছেন "Every convention is reservoir of social force" প্রত্যেক প্রথাই সমাজশক্তির আঁধার বিশেষ। সমাজ যেন একটা প্রবহমান নদী স্রোতশক্তির আধার আর সংস্কার আমাদের কতকগুলি স্রোতের বেগে চালিত কলবিশেষ (Water mills)। এই কলগুলি না থাকলে যেমন নদীর শক্তির অপচয় সাধিত হ'ত ঠিক তেমনি এই সংস্কারগুলি না থাকলে পর সমাজ শক্তির ক্রীড়া বৃথাই সংঘটিত হ'ত।

সমাজের অধিকাংশ লোকই তাদের জীবনে কতকগুলি অভাবের দ্বারা শাসিত; দেশকাল পাত্রভেদে তারা আমাদের উপর কমবেশী আধিপত্য বিস্তার করে। এরাই হল Primal wants (প্রাথমিক অভাব)। এই প্রাথমিক অভাবগুলি পূরণ করা না হলে আমাদের লুকান পাশবিকত্ব জেগে উঠে। Napoeleon তাঁর শত্রুদের সম্বন্ধে হেসে বলেছিলেন "If you scratch a Russian you find him a tartar". Napoeleon-এর এই বাক্যটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি—"If you scratch a man, you find him a savage." এই primal wantsগুলির নিবৃত্তি না হলে পর মানুষ বৃহৎ চিন্তায় কিম্বা মহৎ কর্ম্মে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। মানুষের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ও স্বার্থচিন্তা,—সমাজশক্তির উৎস যারা তারা পরস্পর সংঘাতে উত্তাল হয়ে উঠে। পুরাতন অভাব নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়, নূতন উদ্দেশ্য ও নূতন আকাঙ্ক্ষা এই ভাবে সমাজের বিরোধ ও দ্বন্দ্বটাকে চিরন্তন করে তোলে। ব্যক্তিগত স্বার্থের পর ক্ষুদ্র জনসমষ্টির স্বার্থের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় আবার ক্ষুদ্র সঙ্ঘকে অতিক্রম করে দ্বন্দ্ব বৃহৎ সংঘকে আশ্রয় করে থাকে। এ ভাবে সমাজ-সাগরের চারিদিক হতে প্রবল তরঙ্গ ক্রমাগত উত্থিত হচ্ছে আর সাগরকে ফেনিল ও উন্মত্ত করে তুলছে। এই যুদ্ধকামী বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে কোন একটা বৃহত্তর শক্তির সহায়ে নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্গত করতে না পারিলে প্রবল

আঘাতে সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির বিনাশসাধন হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থকে সঙ্ঘের বা সমাজের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল করবার জন্যই সামাজিক অনুশাসনগুলির উৎপত্তি হয়েছে।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে "What will Mrs Grundy say," এই Mrs Grundy নারীটীর জন্ম কবে হয়েছে তা ঠিক করে বলা যায় না, যদিও এই নামকরণটা এ যুগের। রাষ্ট্রীয় আইন, ব্যক্তিগত নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশাসন সবার চাইতেই ইনি হলেন বেশী শক্তিমতী অতি পুরাতন যুগ হতে সমাজগঠনের প্রথম অবস্থা হতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আপনার প্রভাব ক্ষমতা অব্যাহতভাবে খাটিয়ে যিনি চলেছেন, এঁকে মুখে উপহাস করলেও অন্তরে অন্তরে সবাই আমরা ভয় করে থাকি। সাধুভাষায় একে বলা হয় Social Conscience বা সমাজবিবেক। সমাজের দশে আমায় কি বলবে এ চিন্তা হতেই সমাজ-বিবেকের পরিচয় আমরা পাই। ব্যক্তিগত চিন্তা ও ধারণাকে অবহেলা করে এই সমাজ-বিবেকের উপর আমাদের কার্য্যের মূল্য অবধারণ করবার ভার দিয়ে থাকি—অন্তরের বাণীকে অবজ্ঞা করে আসল সত্যটাকে উপেক্ষা করে অনেক সময় দশজনের প্রশংসা ও নিন্দার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। সামাজিক প্রথাগুলি জীবনের ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বেই এই সমাজ-বিবেক আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের arbiter নিযুক্ত হয়েছিল আর তার শক্তির সাহায্যে ব্যক্তির বাসনা ও স্বার্থচিন্তাকে এক সুবিহিত পথে পরিচালিত করতে আরম্ভ করল।

শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু চৈত্র মাসের উপাসনায়—"সমষ্টিপুরুষ" নামে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে বলেছেন "একদিকে মানুষই সমাজকে বানাইয়াছে আর একদিকে সমাজও মানুষকে বানাইয়াছে * * * সমষ্টি বাঁধিলেই তাহার আপে চেতনা ও শক্তি লইয়া পৃথক সত্তা।" নলিনীবাবুর এই অতি অল্প কথার মধ্যেই আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়টীর সম্বন্ধে অনেকখানি তত্ত্ব জানতে পারি। এই সমষ্টি পুরুষের সত্তার ধর্ম্মই হল আমাদের social conscience বা সমাজবিবেক। ব্যক্তি সমাজশক্তির কোন একটা বিশিষ্ট অংশ নয় (unit of social force) কিন্তু সমাজশক্তির ক্রিয়ার ফলমাত্র (Product) সমাজবিবেকের কাজ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই আংশিকরূপে পরিস্ফুট। যেদিন হতে সমাজের উৎপত্তি সেদিন হতেই তাকে জীবননাট্যে দুটী অংশের অভিনয় করতে হচ্ছে। সমষ্টি

পুরুষের শক্তি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় আমরা কার্য্যের ফলাফল দুভাবে নির্ণয় করে থাকি—নিজের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সঙ্গে আরও একটা চিন্তা একই সময়ে আমাদের মনে উদিত হয় "সমাজের মতামত।" অর্থাৎ আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে কাজ করে থাকি তার বিচারক হয় আমাদের ব্যক্তিসত্তার সমাজবিবেকের অংশটা। এইভাবে আমরাই দশজনে লোকাচারের সৃষ্টি করেছি—এটা বাইরের থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি এটা Selfimposed. ব্যষ্টির ক্ষুদ্র শক্তির সংযোগের মূল সমাজের এই সংহত শক্তি। এই সংহত শক্তির প্রকাশ সমাজে লোকাচার ও প্রথাপদ্ধতির প্রবর্ত্তনে। এই প্রথাপদ্ধতিগুলিই আবার কালক্রমে রাষ্ট্রীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত হয় ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অধীনের লোকশাসনের দণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

যদি এরা Selfimposedই হবে তবে বিরোধ আসে কেন? তার কারণ আমাদের Individual conscience এর পরিবর্ত্তন যতটা ক্ষিপ্র social conscience এর পরিবর্ত্তন ততটা ধীর। ব্যক্তি যখন একটা বৃহত্তর আদর্শের মধ্যে আত্মসমর্পনে ব্যগ্র— তখন প্রায়ই Social conscience তার সঙ্গে সম পদক্ষেপে না চলতে পারার জন্য পশ্চাতে পড়ে থাকে ও নিজের শক্তির নিয়োগে ব্যক্তিকে আত্মসঙ্কোচ করতে বাধ্য করে। Individual conscience ও social conscience এর অসামঞ্জস্যের জন্যই এই বিরোধের সৃষ্টি। এই বিরোধের একটা সার্থকতা আছে—এতে করে লোকাচার ও প্রথাগুলির মধ্যে কতটা সত্য নিহিত তার পরীক্ষা হয় আর সমাজের প্রসারোন্মুখীনতার সৃষ্টি হয়।

ব্যক্তির আত্মবিবেক ও সমাজ বিবেকের মধ্যে যে প্রথমটাই সব সময়ে সত্য আর দ্বিতীয়টা ভুল আমাদের বর্ত্তমান বিদ্রোহ-ক্ষুব্ধ মন এ সিদ্ধান্ত করেই বসে আছে—ইহাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে সব সময়ে—সত্য নয় আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাব। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা এর—ততটা আবশ্যকতা নাই যতটা কিনা এই দুয়ের অসামঞ্জস্যটার। যে দিন এই বিরোধ ঘুচে যাবে—সে দিন সমাজে শান্তি স্থাপিত হলেও—তার অবনতি স্বতঃসিদ্ধ। ব্যষ্টির উন্নতির আকাঙ্খাই প্রথমে সমষ্টি পুরুষের—চলৎশক্তির—অনুপ্রেরণা। আগেই বলেছি সমষ্টি পুরুষের চিন্তা ও

ভাব crystallised হয়েছে ঐ লোকাচার বা প্রথাগুলিতে। এই জন্যই ঐ বিরোধের ভাবটা জাগ্রত রাখবার জন্য—সমাজের Evolution এর জন্য এদের একটা—আপেক্ষিক মূল্য আছে এদের একটা সার্থকতা আছে। প্রায় সমাজের সাধারণ লোকগুলির অনুষ্ঠিত কার্য্যের মধ্যে লোকাচার ও প্রথা প্রতিফলিত হয়—এরাই বিপ্লবের যুগে এদের অভিজ্ঞতার ও ভাবের যষ্টিটা হাতে করে পরিবর্ত্তনের স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে এর আকস্মিক বেগ প্রতিরোধ করতে প্রয়াসী হয় এই দলকে সাধারণভাবে বলা হয় Conservativeএর দল। এই Conservative দলের—সঙ্গে নবীনের দলের (Liberal) বিরোধের ধর্ম্মেই Reformsএর কাজ সুচারুরূপে সুসঙ্গতভাবে পরিচালিত হতে পারে।

সমাজসংস্কার সম্বন্ধে—শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পূর্ব্বোক্ত—প্রবন্ধে যে কথাটা বলেছেন তা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য "আধুনিক যুগের লক্ষ্য ও সাধনা ব্যষ্টির মধ্যে আছে যে সমষ্টির চেতনা—তাহাকে জাগাইয়া—তাহার সহিত এক হইয়া—তবে ব্যষ্টি নিজ নিজ জীবন চালাইয়া লইবে।"

সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হবার পূর্ব্বে—সমাজ বিবেকটাকে ভাল করে বুঝতে হবে, সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা অর্জ্জন করতে হবে—যে লোকাচার বা প্রথার উচ্ছেদসাধনে আমরা আজ ব্রতী তার মূলের তত্ত্বটা বিচারের নিকষে পরীক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য। এ কার্য্য আমাদের মধ্যে যে—"সমষ্টির চেতনা" আছে তার সম্যক উদ্বোধন বিনা সম্ভব হবে না। নলিনী বাবু—Individual conscience ও Social conscience এর মধ্যে যে Harmonisation বা Co-ordination এর কথা বলেছেন—এ ক্ষণিকের—এর পূর্ব্বে রয়েছে দ্বন্দ্বপ্রবণ শক্তিগুলির ঘাতপ্রতিঘাত—আবার পরেও রয়েছে একটা নূতন প্রচণ্ড বিরোধের খেলা।

আজ এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে বেসুরো গলায় গাইতে হবে এই বিরোধের সঙ্গীত—এ বিরোধ যেন আমাদের চিরন্তন হয় তবে উন্নতিও আমাদের চিরন্তন হবে এই বিরোধকে অবলম্বন করেই ব্যক্তি ও সমাজ তাদের Dead selvesকে অতিক্রম করে—আবার একটা সত্য জীবন্ত আদর্শের মধ্যে আত্মসমর্পণ করুক এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশ গুপ্ত।

———

আত্মোদ্বোধন।

-:*:-

ওমা দেবি জ্যোতির্ম্ময়ী কোথা তব আলো
একবার জ্বালো মাগো জ্বালো
এ জীবনপথে
অজ্ঞান সন্তানে তোর বাঁচা কোন মতে
শুধু এইবার
আবার মরি মা যদি বাঁচায়ো না আর !
চির দোষে দোষী
মাখিয়াছি কত পাপ-মসী
কত ধূলা মাখিয়াছি গায়
চির-অপরাধে দেবি অপরাধী তব রাঙ্গা পায় !
জানি জানি
তোমার কমল-করে স্বর্ণ দীপখানি
জ্বালিতেছে অবিরাম
কত সুধা কত মধু শান্তিময় প্রাণের আরাম
ব্যথিত তাপিত জনে
একবার পড়ে নি কি মনে
অভাগী মেয়ের কথা
বেদনা-মথিত প্রাণে তোর লাগি কত ব্যাকুলতা
কত খোঁজাখুঁজি
জগতের ব্যথা মাঝে মোর ব্যথা ভুলেছিলি বুঝি ?

ওমা ওমা শোন্ তবে শোন্
অভাগী মেয়েরে তোর দিস্ না মা ধন
ক্ষোভ কিছু নাহি মাগো তায়
মিনতি ও-পায়—

যে আলোর ছোট শিখা লভিয়াছি জন্ম-অধিকারে
আমার বুকের তলে আমার এ আমির মাঝারে
তাহারে দেখাও দেবি
আমার আমিত্ব দিয়ে তোমার তুমিত্বে আজ সেবি
এ দেহ মন্দির মাঝে মোর
আমারি এ দীপশিখা চিনাইয়া দিবে আলো তোর !
একবার জ্বলিলে এ শিখা
জন্ম জন্ম দিবে মাগো পুণ্য রাজটীকা
আমার ললাট 'পরে
চলাইবে তোরি পথ ধরে
মহা চেতনার পানে
পথহারা পথিকের মত আর ফিরিবে না মিথ্যার সন্ধানে !
যেই মহালোক
মঙ্গলের জ্যোতি দিয়ে ঘিরে আছে সপ্ত স্বর্গলোক।
যে আলোর রশ্মি লাগি
অজ্ঞানের অমঙ্গল কোথা যায় ভাগি
যে আলোর শিখা হতে উদ্ভাবিত সর্ব্ব দয়া ক্ষেম
ভূমানন্দ প্রেম

সর্ব্বধর্ম্ম বর্ণিয়াছে যায়
সহস্র বিদ্যুৎ-শিখা নিভে যায় যাহার প্রভায়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের রূপ ধরে ভ্রমিতেছে অনন্ত ত্রিদিব
যেই আলো একমাত্র নিত্য সত্য শিব !
সেই আলো আছে মোর প্রাণে
তবু কি মরিব ওমা মুদিত নয়ানে
জাগিব না মহা চেতনায়
মহানন্দে জাগিব না জ্যোতির প্রভায় ?
এ দেহের দুই আঁখি মুদে দাও চুপে
জাগাও জাগাও দেবি ও তোমার চিন্ময়-স্বরূপে !

কুমীর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

বুড়া টিমোফি সেমিওনিচ আমাকে একটুকু বিচলিত ভাবেই অভ্যর্থনা করলেন ; যেন একটুকু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমাকে তাঁর ছোট ষ্টাডিটিতে নিয়ে গিয়ে খুব সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন আর তারই অযাচিত কৈফিয়ৎ হিসাবে বল্লেন—"ছেলেগুলো বড্ড বিরক্ত করে তাই বন্ধ ক'রে দিলাম।" এই উক্তিতে তাঁর মোটেই যেন স্বচ্ছন্দতা ছিল না। লেখবার টেবিলটীর পাশের চেয়ারে আমাকে বসিয়ে নিজে বেশটা করে মুড়ি সুড়ি দিয়ে ইজি চেয়ারটীতে বসে, এমনভাবে চাইতে লাগলেন, যেন আমি তাঁর আফিসে এসেছি, আর তিনি আমার বড় বাবু, যদিও তিনি আমার কিংবা ম্যাটেভিচের মনিব নন, বরঞ্চ একজন সহকারী কর্ম্মচারী, তাই কি বন্ধুও বলা যেতে পারে।

তিনি বল্লেন, 'প্রথমতঃ, বেশ করে ভেবে দেখ যে আমি আইভ্যান ম্যাটেভিচেরই মত এ জন নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী, কর্ত্তাব্যক্তিদের ভিতর নই......এ সবের ভিতর আমি নেই আর এই সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াতেও চাইনে।"

আমি বড় আশ্চর্য্য হ'লাম এই ভেবে যে তবে বুড়া বোধ হয় সব ব্যাপার জানে। তা' সত্বেও আমি তাঁকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটী জানালাম। সেই সময়ে আমি যে একজন প্রকৃত বন্ধুর কায করছি, এই জ্ঞানটা টন্‌টনে হওয়ায়, আমার কথাবার্ত্তায় বেশ উত্তেজনা ছিল, তিনি যেন নির্ব্বিকারভাবে শুনে গেলেন, কিন্তু বোঝাও গেল যেন সন্দেহ করছেন।

তিনি বল্লেন, "আশ্চর্য্য, আমি বরাবরই ভেবে আসচি, ঠিক এমনিতর ঘটনাই ঘটবে।"

"কেন, সেমিওনিচ? এ রকম ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না......"

"হ্যাঁ তা' স্বীকার করি। কিন্তু ম্যাটেভিচের সারা চাকরী জীবনটা এই শেষ ঘটনাটীরই পূর্ব্ব আয়োজন! সে তরলচেতা ছিল—আর ছিল দাম্ভিক। "উন্নতি", 'উন্নতি", খালি উন্নতিরই আইডিয়ায় তা'র মগজ পূর্ণ ছিল—এত করেই তো এই সব লোকের এই দশা হয়."

"কিন্তু এই ঘটনাটী খুবই অসাধারণ সকল উন্নতিপন্থীরই পক্ষে যে এটা সাধারণ নিয়ম হবে, তা' মনে করা যায় না।"

'হুঁ। মনে করা যায়। আমি তাল ঠুকে বলতে পারি, বেশী পড়ার এ ফল। বেশী পড়াশুনায় মানুষকে সকলের চরকায় তেল দেওয়ায়। তিনি থাকতে চান সকল ঘটে। যেখানে বাপু তোর দরকার নেই সেখানে তোর যাবার দরকার কি?" আর একটু ঝাঁজের সঙ্গে বল্লেন—'আমি, বাপু, মুখ্‌খু মুখ্‌খু মানুষ, বুড়ো মানুষ। সৈনিকের ছেলে হয়ে কায আরম্ভ করেছি, এ বছর আমার চাকরির জুবিলী হ'ল!"

"না, না, না, সেমিওনিচ, একেবারেই নয়—মুখ্‌খু, মুখ্‌খু তুমি? কখনও না। উল্টে, ম্যাটেভিচ তোমার উপদেশের জন্যে ব্যস্ত, এক রকম কাঁদতেকাঁদতেই বলেচে—যে তোমাকে উপদেশ দিতে হবে—এ ক্ষেত্রে কি করতে হ'বে?"

'কি, কাঁদ্‌ছে, কাঁদ্‌ছে ? হুঁঃ! ও সব মায়া-কান্না', কেউ বিশ্বাস করবে না। আচ্ছা বাপু বলতো ? কি ভূতে তা'কে পেয়েছিল যে বিদেশে বেড়াতে যেতেই হবে ? আর যেতই বা কি করে ? কি তা'র এমন সঙ্গতি আছে ?"

আমি কাতরকণ্ঠে বল্লাম—"সে তার শেষ বোনাস (Bonus) থেকে কিছু জমিয়েছিল। মোটে তিন মাসের জন্য তো...সুইজরল্যাণ্ড যেতে চেয়ে ছিল—উইলিয়াম টেলের দেশ।"

"কি বল্লে, উইলিয়াম টেল ? হুঁঃ !"

"আর নেপ্‌ল্‌স (Naples) গিয়ে, দেখতে চেয়েছিল এই মিউজিয়ম, লোকের রীতি নীতি, জন্তু জানোয়ার......"

"হুঁ, জন্তু জানোয়ার! এ খালি তার ঠেকার। কোন্ জন্তু জানোয়ারই বটে! কেন রে বাপু, আমাদের দেশেই কি যথেষ্ট জন্তুজানোয়ার নেই ? আমাদের নাই কি ? যাদুঘর আছে, চিড়িয়াখানা আছে, উট আছে। সেণ্টপিটারস্‌বার্গের কাছে সাদা সাদা ভালুক আছে। আর সে নিজেই তো কুমীরের ভিতর ঢুকে বসে আছে !......"

"ওঃ খুব হয়েছে, থামো। লোকটা বিপদে প'ড়ে কি না তোমার কাছে বন্ধু ব'লে, বর্ষীয়ান ব'লে, উপদেশের কাঙাল,—আর তুমি তাকে তিরস্কার করছো। হতভাগিনী ইভানোভ্‌নার মুখ চেয়েও তো দয়া করা উচিত।"

বুড়ো তখন নরম হয়ে একটিপ নস্য নিয়ে বল্লেন, 'অ, তুমি তার স্ত্রীর কথা বলছ ? ছোটখাট চমৎকার মেয়েটী। বড়ই মনোহারিণী। বেশ পুষ্টপুরোট. ছোট্ট মাথাটী এক দিকে যেন হেলেই আছে......বড্ড চমৎকার। এই সেদিন আন্দ্রে অসিপিচ তারই কথা বলছিল।"

"তা-আ-র কথা ?"

"হাঁ, আর খুবই তার প্রশংসা ক'রে। সে বল্লে, কি গড়ন, এই-ই চোখ, এই চুল ..... মিছরীর ডেলা যেন, নারীই নয়—তার পরে হাসতে লাগল। অবশ্য সে এখনও যুবক বই তো নয়!" তার পর জোরে ফোঁ ফোঁ করে নাক ঝেড়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, যুবক বটে, কিন্তু এরি মধ্যে নিজের জীবনে কেমন উন্নতি করেছে।"

"ও সে সম্পূর্ণ আলাদা কথা, সেমিওনিচ"

"তা বটেই তো, তা বটেই তো।"

"তবে তুমি কি বল সেমিওনিচ !"

"আমি আমি তার কি করতে পারি ?"

"তুমি হচ্ছো একজন বহুদর্শী লোক, সংসারের এত দেখেছো, শুনেছো, তাতে আবার আত্মীয়ও বট, একটা সলা পরামর্শ দাও। এখন কি করবো ? কোন পথে যাব ? তুমি উপরিওয়ালাদের কাছে গিয়ে......"

"কি উপরিওয়াদের কাছে ? কক্‌খনোই নয়।" তাড়াতাড়ি সেমিওনিচ উত্তর দিলেন। "তুমি যদি আমার পরামর্শ চাও, তো সকলের আগে ব্যাপারটাকে আগাগোড়া চাপা দিয়ে ফেলো। আর—যাকে বলে—প্রাইভেট লোকের মতো কায কর। বড়ই সন্দেহজনক ব্যাপার, এমনটী কেউ কক্‌খনো শোনেনি। শুধুই কি কেউ শোনে নি, এর নজীর পর্যান্ত নেই, আর বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য......হবেই বুঝ্‌ছো, নিজের যে কাজ করা উচিত তাই করো—বুঝ্‌লে,......ওকে সেখানে একটুকু থাকতে দাও......ধীরেসুস্থে কাম কর্‌তে হয়। অপেক্ষা ক'রে দেখাই যাক না কি হয় ?"

"একি ধীরে সুস্থের কাম, সেমিওনিচ ? বেচারা যদি দম বন্ধ হ'য়ে মরে যায়—তখন ?"

"মরে গেলেই তোলো আর কি ? তুমিই না বল্‌ছিলে সে তোফা আরামে সেখানে আছে ?"

সব গল্পটা আবার আমাকে বলতে হ'ল। সেমিওনিচ গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর নস্যের কৌটাটা হাতে ঘুরোতে ঘুরোতে বল্লেন—"হুঁ। আমার মনে হয় যে বিদেশ ভ্রমণ করার চাইতে কিছুদিন ওর ওইখানেই থাকা ভাল। এই অবকাশে সে একটু ভেবে চিন্তে দেখুক। সত্যিই তো আর তার দম বন্ধ হচ্ছে না। এখন তাকে উপায় করতে হবে যাতে তার স্বাস্থ্য বজায় থাকে,—এই ধর যাতে কাশি টাশি না হয়, ইত্যাদি ...আর জার্ম্মানটার কথা বল্‌তে গেলে, আমার মতে বাস্তবিকই তো তার কোনও দোষ নেই...সে তো তার পুরো হকেই আছে। অপর পক্ষের চাইতে তারই হক্ তো বেশী। কেন না অপর পক্ষই তো তার বিনা অনুমতিতে তা'রই কুমীরের ভিতর গিয়ে সেঁধিয়েছে।

সে যে। আর বিনা অনুমতিতে আইভ্যান ম্যাটেভিচের কুমীরের ভিতর দিয়ে সেঁধোয় নি, যদি ও যতদূর মনে হচ্ছে ম্যাটেভিচের কুমীরই নেই। আর কুমীরটা তো সাধারণ সম্পত্তি নয়, প্রাইভেট সম্পত্তি, একেবারে নিজস্ব, তবেই খেসারত না দিয়ে তাকে চিরে ফেলাও অসম্ভব।"

"সেমিওনিচ, একটা মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ·"

"ও তা সেটা হ'চ্ছে পুলিসদের মাথাব্যথা। তুমি তাদের কাছেই যাও।"

"কিন্তু হতে পারে তো, আইভ্যান ম্যাটেভিচকে তাদের ডিপার্টমেন্টের দরকার। তাকে চাওয়া যেতে পারে।"

"কি ? আইভ্যান ম্যাটেভিচকে দরকার ? হাঃ হাঃ—তা ছাড়া, সে যে৷ এখন ছুটীতে আছে—তাকে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য কয়তে পারি—সে খুব করে ইয়ুরোপের দেশ দেখে বেড়াক্ না কেন ? অবশ্য ছুটী ফুরিয়ে গেলে, যদি সে ঠিক দিনে ক'যে হাজির না হ'তে পারে, তা হ'লে অন্য কথা। তখন—আমরা তাকে চাইব, আর তদন্ত করবো।"

"কি তিন মাস ! সেমিওনিচ, দোহাই ভগবানের, দয়া কর।"

"তা' আমি কি কোরবো। এ তার নিজের দোষ। কেউ তো আর তাকে জোর করে সেখানে গুঁজে দেয় নি। তা করতে গেলে গভর্ণমেণ্টের খরচে নার্স (nurse) রেখে তার তত্ত্বাবধান করতে হয়, রেগুলেশনে কিন্তু তা allow করবে না। এর মধ্যে প্রধান সমস্যাটা হচ্ছে এই—কুমীরটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তা হলেই এক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি এসে পড়ছে। আর অর্থশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলিই হচ্ছে সকলের চাইতে বড়। এই সেদিন সন্ধ্যে লুকা আন্দ্রেভিচের বাড়ীতে ইগনেটি প্রোকোফিচ এই কথাই বলছিল। হ্যাঁ, তুমি প্রোকোফিচকে চেনো ? সে হচ্ছে একজন ক্যাপিটালিস্। মস্ত তার ব্যবসা, আর কথা- বার্ত্তা তার কি চমৎকার। কোথাও কি একটুকু কাটাখোঁচা পর্য্যন্ত বাধে ? সে বলছিল— এখন আমাদের industrial development, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি পরিবর্দ্ধক অ ম দের ভিতর নেই।' আমাদিগকে তা' তৈরী করে দিতে হবে। আমাদিগকে তৈরী করে নিতে হবে মূলধন, তৈরী ক'রে দিতে হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ! আর যখন আমাদের মূলধনই নেই, তখন তাকে বিদেশ থেকেই আকর্ষণ করতে হবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে

বিদেশী কোম্পানীদিগকে সুবিধে দিতে হবে রাশিয়ার জমি কিনে নেবার জন্যে, যেমন ইয়ুরোপে হচ্ছে। সাধারণভাবে জমি নেওয়া (communal holding of land) হচ্ছে বিশ্ব সর্ব্বনাশের গোড়া। আর বুঝ্লে কম উষ্মার সহিত সে কথা বলে। অবশ্য তার পক্ষে বলা সাজে, সে ধনী লোক, আর কারও গোলাম নয়। সে আরও বল্লে, "কমুন্যাল সিষ্টেম (communal system) ব্যবসা বাণিজ্য বা কৃষির উন্নতি কিছুতেই হবে না। বিদেশী কোম্পানীগুলো যতদূর পারে বড় বড় লাটে (lot) আমাদের সব জমি কিনে নিক্। তার পর তাকে চিরে—চিরে—চিরে—যত কম অংশে ভাগ করতে পারে করুক—(উঃ কি জোরেই চিরে—চিরে—সে উচ্চারণ কর্‌ছিল); আর তারপর সেগুলোকে private property (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) বলে বিক্রী করুক। আর বিক্রীই বা করবে কেন, ঠিকে দিক্। যখন সব জমি গিয়ে পড়চে বিদেশী কোম্পানীর হাতে, তখন তাদের যা খুসী সেই রকম খাজানা নির্দ্ধারণ করতে পারে। আর তা হলেই চাষাকে তার রোজের খোরাকের জন্যে তিনগুণ বেশ খাটতে হবে, আর তাকে যখন ইচ্ছে উৎখাত করতে পারা যাবে। তখন সে টের পাবে মজাখানি কেমন; আর অমনি সুড় সুড় করে বাপের সুপুত্র হয়ে থাকতে হবে, ট্যাঁ ফোঁ চলবে না; তাতে সে পরিশ্রমী হবে আর একগুণ মজুরীর জন্যে তিনগুণ কাম করতে হবে। কিন্তু এখন যেমন Commune (কমুন) আছে, তাতে কার সে তোয়াক্কা রাখে? সে জানে খানাবেগর তাকে মরতে হবে না—কি তার পরোয়া! আলসের ধাড়ী হচ্চে, আর মদের পিপে হয়ে বসে আছে।—আর এপারে রুশিয়ার টাকা আসতে থাকবে, মূলধনের সৃষ্টি হবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গজিয়ে উঠবে। টাইম্‌স্ নামে ইংরাজী সামাজিক ও রাজনৈতিক কাগজখানি আমাদের finance (আর্থিক অবস্থা) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করেচে যে আমাদের আর্থিক অবস্থা এত যে অসন্তোষজনক তার কারণ আমাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই, বড়বড় ধনী নেই, আর নেই—হুঁ বলতেই উঠ গরীব শ্রেণী। ইগমেটি প্রোকোফিচ বলে বড় চমৎকার, বাগ্মী কি না? উপরিওয়ালাদের কাছে সে একটা রিপোর্ট পাঠাবে, তার পরে সংবাদ নামক কাগজ ছাপাবে। আইভ্যান ম্যাটেভিচের কাব্যি লেখার থেকে অনেক তফাৎ।

বুড়োকে বক্ বক্ করে বকে যেতে দিয়ে, তাকে বল্লাম "তা হলে এখন আইভ্যান ম্যাটেভিচের সম্বন্ধে কি করা যায় ?"

বুড়া গল্প করতে ভালও বাসেন আর দেখাতে চান যে তিনি সময়ের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলে আসচেন—আর সবই জানেন।

"ম্যাটেভিচের সম্বন্ধে কি করা যায়, এই না তোমার প্রশ্ন ? আরে, সেই কথাতেই তো আসচে। আচ্ছা আমরা বলছিলাম কি যে দেশে বিদেশী মূলধন আমদানী করতে হবে। আচ্ছা এখন একটি বার বিবেচনা করে দেখো। পিটার্সবার্গে আনীত একজন বিদেশীর মূলধন আইভ্যান ম্যাটেভিচের দরুণ যাহা হউক দ্বিগুণ হবার উপক্রম হয়েচে, আর অমনি, তাকে রক্ষা করা দূরে থাক্। আমাদের প্রস্তাব চল্‌ছে যে কি করে তার প্রথম মূলধন স্বরূপ কুমীরটার পেটটা ফাঁসিয়ে দিই ! এটা কি সুসঙ্গত ?

আমার মতে, দেশের উপযুক্ত সন্তান যদি ম্যাটেভিচ হয়, তবে তার আনন্দ করা উচিত যে তারই দরুণ একটা বিদেশী কুমীরের দাম দ্বিগুণ এমন কি তিন গুণ চ'ড়ে গেছে।। মূলধন আকর্ষণ করতে হ'লে ওইই তো চাই। একটা লোক কৃতকার্য্য হ'লে, মনে কর, আর একজন আসবে কুমীর নিয়ে, তৃতীয় ব্যক্তি দুটো এমন কি তিনটে কুমীর নিয়ে, আসবে—আর মূলধন ঝাঁ ঝাঁ করে বেড়ে যাবে—আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি। এই পন্থাতে উৎসাহ দিতেই হবে।"

তখন থাকতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম—"সত্যি কথা বলতে, সেমিওনিচ, তুমি একেবারে বেচারী ম্যাটেভিচের নিকট অতি প্রাকৃত অ ত্যাগ দাবী করছো !"

"আমি কিছুরই দাবী করিনি, আর সবলের আগে তোমাকে এই কথাটাই আমি স্মরণ করতে অনুরোধ করছি—সে আমি উপরিওয়ালাদের ভিতর কেউ নই—ক্ষমতাপন্ন লোক নই—যে কারু কাছে কিছু দাবী করবো।...আচ্ছা কি ভূতে তাকে পেয়েছিল যে সে কুমীরের ভিতরে ঢুকতে গেল ? ভদ্র সভ্য মানুষ, চাকরীতেও ভাল গ্রেডে আছে, আইন-সঙ্গত বিয়েও করেছে—তার কি না এই কাজ, এই রকম ব্যবহার তার করা উচিত হ'লে ? তুমি ই বল না, আচ্ছা এটা কি সুসঙ্গত হয়েছে ?"

"কিন্তু এটা তো accident (অ্যাক্সিডেণ্ট)"

"কে জানে? এখন মালিকের খেসারত দিতে কোথা থেকে টাকা আসবে ?"

"বোধ হয় তার মাইনে থেকে, সেমিওনিচ।"

'তা' কি যথেষ্ট হবে ?"

আমাকে দুঃখিতভাবে উত্তর দিতে হ'ল—"না, তা—হবে না। সে বেটা জার্মান প্রথমে ভয় পেয়েছিল যে কুমীরটা বোধ হয় ফেটে যাবে। কিন্তু যখন তার ধারণা হ'ল যে কিছুই হয় নি তখন আনন্দে অধীর হয়ে সে চেঁচাতে লাগল—তবে দর্শনী দ্বিগুণ যে বাড়িয়ে দিতে পারবে তার সম্ভাবনায় আহ্লাদে চৌচির হয়ে পড়ল।"

"তিনগুণ, চতুর্গুণ বোধ হয়, এখন দেখবে সাধারণে কিরূপ ঐ জায়গায় দাপা দাপি করে। আইভ্যান ম্যাটেভিচ যেন অস্থপ্রকাশ করে না ফেলে। সকলেই জানুক সে কুমীরের ভিতর রয়েছে, খালি যেন তারা Officially জানে। তাতে ম্যাটেভিচের অবস্থা খুব ভাল হয়েই দাঁড়াচ্ছে; কেন না সে বিদেশ গেছে এটাই ধরা উচিত। লোকে বলবে যে সে কুমীরের ভিতর রয়েছে; আমরা তা' কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইব না। এই রকমেই বন্দোবস্ত রাখতে হবে। এখন বড় কথাটা হচ্ছে যেন সে চুপচাপ করে অপেক্ষা করে, আর তার তাড়াতাড়িরই বা কি—দরকার পড়ে গেছে ?"

"হাঁা, কিন্তু যদি......"

"না তার জন্যে ভেবো না, তার দেহ বেশ মজবুত......"

"আচ্ছা না হয় অপেক্ষাই করলে, তারপর।"

"হাঁা, তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নাই। এমনতর আজগুবি Case (কেস) কখন হয় নি। এর বিষয়ে লোকে যে কি ভাবচে তা জানি না, আর দুর্ভাগ্যের বিষয় নজীরও নেই। নজীর থাকলে বরং দেখা যেত। এখন যেমন আছে, কি করা যায় ? এর নিষ্পত্তি হতে সময় নেবে।"

চট্‌ করে আমার মগজে একটা সুযুক্তির উদয় হ'ল।

আমি বল্লাম, "দেখ একটা কায করলে হয় না ? যদিই ওর কপালে থাকে যে কিছুদিন তাকে ভীষণ জানোয়ারটার অন্ত্রের ভিতরই থাকতে হবে, আর এটা যদি ভগবানের

অভিপ্রেত হয় যে সে জীবিতই থাকবে তবে সে একটা দরখাস্ত দিক্ না সে এখন ও চাকরীই কচ্ছে, ও চাকরীতে আছে তাই সাব্যস্ত করে নেওয়া হোক্ ?”

হুঁ·····তুমি বলতে চাচ্চ যে সে যন বিনা মাইনেতে ছুটীতে আছে (On leave without salary) ।”

“কেন with salary (ম ইনে ও পাবে এমন) হয় না ?”

“কোন অজু হাতে ?”

“যেন সে Special commissionএ প্রেরি ত হয়েছে ?”

“কমিশনই বা কি আর কোথায় ?”

“কেন ? অজ্রের ভিতর—কুমীরের অন্ত্রের ভিতর।...ধর না কেন যেন সে আবিষ্কারে গেছে—সরে জমিনে যেন তদন্ত করতেই গেছে। অবশ্য এটা নতুন ধরণের তদন্ত হ'ল, কিন্তু সেটা উন্নতিরই পরিচায়ক, Progressive, আর নতুন আলো পাবার জন্যে একটা উৎকণ্ঠা একটা উৎসাহ সূচিত করছে।

সেমিওনিচ স্থির হয়ে একটুকু ভাবলেন। অবশেষে বল্লেন—“আমার নিজের মতে স্পেশ্যাল এনকোয়ারির জন্যে একজন স্পেশ্যাল আফিসারকে কুমীরের ভিতর পাঠান একেবারে absurd, অ্যাবসার্ড নিছক গাঁজাখুড়ি। রেগুলেশনে এ কথা লেখে না। আর সেইখানে কোন ধরণের স্পেশ্যাল এন্‌কোয়ারি হবে শুনি ?”

“সরেজমিনে প্রকৃতিকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পাঠ করা—জলজীবন্ত Subject (সাবজেক্‌টের) এর ভিতর। আজকাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।······এই ধর botany, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা······সে সেইখানে থেকে যা পর্য্যাবেক্ষণ করছে তার রিপোর্ট লিখে দিতে পারে······যেমন ধর না কেন, হজমের বিষয়, অথবা খাল অভ্যাসের বিষয়। শুধু facts জড় করবার জন্যেই তো তার সেখানে থাকা দরকার।”

“অ, তুমি Statisticsএর কথা বলছো। তা, আমি ও বিষয়ে বড় একটা Authority নই—বাস্তবিকই Philosopherই নই। তুমি বলছো Facts এর জন্যে—বাবা, যে Facts আছে তারই ঠেলায় অস্থির, জানি না সেগুলো নিয়ে লোকে কি করবে। তা ছাড়া Statistics বড় বিপজ্জনক ব্যাপার।

"কি করে ?"

"বিপজ্জনক ব'লে বিপজ্জনক ! তার ওপর ধর তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে তাকে সেখানে নিশ্চল কাঠটীর মত পড়ে থেকে রিপোর্ট লিখতে হয়েছে। আর কেউ কি নিজের আপিসের কায কাঠটীর মত প'ড়ে থেকে করতে পারে ? ও আর একটা Novelty হবে, আর Dangerous novelty ; তা' ছাড়া এর কোন নজীরই নেই। হাঁ, যদি একটা নজীর বের করতে পারতে, ত কে ও Jobটা দেওয়া চল্‌ত পারতো।"

"কিন্তু সেমিওনিচ। এ পর্যান্ত এখানে কোনও কালে কোন জীয়ন্ত কুমীর তো আনা হয় নি ?"

আবার ভেবে সেমিওনিচ বল্লেন, হুঁ · হুঁ।। ঠিক ধরেছো, তোমার objection ঠিক। চাই কি এই ব্যাপারে অগ্রসর হবার একটা ground ; কিন্তু বেশ করে ভেবে দেখ দেখি, যদি জীয়ন্ত কুমীরের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কেরাণীর এই রকম করে রপ্তানী চলতে থাকে, আর তারপর তারা, আমরা খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে এখানে তোফাটী আছি অতএব আমাদের এই position এর official sanction হো'ক" এই আব্দার ধরে বসে, আর মজাসে সেখানে থাকে·········নাঃ, এটা বড়ই খারাপ দৃষ্টান্ত দেখান হবে। তখন আমরা দেখবো যে বিনা খরচায় বিনি কামে মাইনে পাবার জন্যে সবাই ওই পথে ঝুঁকবে।"

"সেমিওনিচ, যাতে তার ভাল হয় করো। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়লো, ম্যাটেভিচ তোমার কাছে তাসে হেরেছিল, সেই সাত রুবল দিয়ে পাঠিয়েছে।"

"আহা, নিকোফিরিচের বাড়ীতে হেরেছিলো। আমার স্মরণ হচ্ছে। সেদিন ও কেমন আমোদে ছিল—আর এখন, আহা !" সত্যিই বুড়োর এবার লেগেছিল।

"সেমিওনিচ, দোহাই তোমার, তার একটা গতি কর।"

"নিশ্চয়ই. আমার যা সাধ্যি আমি তা' কোরবো। আমি নিজের নামে, private person হিসেবে বলবো, যেন আমি সংবাদ চাচ্চি। এখানে তুমি indirectly, unofficially জানো যে কুমীরওয়ালা কত নিতে চায়।"

"নিশ্চয়ই, আমি ফিরে এসেই তোমাকে জানাচ্চি।"

"আর তার স্ত্রী ?... স কি একলা আছে ? ..বড্ডই কি মুষড়ে গেছে ?

"সেমিওনিচ, তার সঙ্গে তোমার একবার দেখা করা উচিত।"

"হ্যাঁ, আমি যাব। আগে থেকেই ভেবেছিলাম, এখন একটা সুযোগ পাওয়া গেল ...আর কি করতেই বা সে হতভাগা কুমীর দেখতে গেল !...যদিও বাস্তবিক আমার দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।"

'আহা, তাকে গিয়ে একবার দেখে এসো, সেমিওনিচ।"

"যাবো। যাচ্ছি কিন্তু তার ভিতরে আশার উদ্রেক করতে নয়। আমি যা private person হ'য়ে, বিদায়।"

"আমি এখন তবে করেদীর কাছে চল্লাম।"

"করেদীই বটে।...উঃ! নির্ব্বুদ্ধিতার কি ফল।"

নানারকম চিন্তায় আমার মগজ ভরে উঠেছিল। বড় অমায়িক আর সাধু এই বুড়ো সেমিওনিচ ; তবুও তাঁর পঞ্চাশ বছরের চাকরী হল আর তার জুবিলী উৎসব করলেন ! এখন আর এ ধরণের লোক পাওয়া যায় না। এই সব সংবাদ জানাবার জন্যে আমি ম্যাটেভিচের কাছে ছুটে গেলাম। বাস্তবিকই আমার অনুসন্ধিৎসা বেড়ে চল্‌ছিল—কেমন আছে সে কুমীরের ভিতর ; আর কি করেই বা কুমীরের ভিতর বাস করা চলে ? অনেক সময়। মনে ছিল এ একটা বুঝি দেশছাড়া আজগুবি স্বপন !

ক্রমশঃ—

শ্রীকালীপদ মিত্র।

নিত্যসঙ্গিনী।

নিশি মাঝে দিবাশেষ, রজনী ফুরিয়ে যাবে,
উষার বাতাসে ;
সচন্দ্র জ্যোছনার শেষে, দিনপতি দেখা দিবে
বিমল আকাশে
শীত গেছে লুকাইয়া বসন্তের মৃদু মধু
হাসিটী দেখিয়া,—
বসন্ত ঢাকিবে অঙ্গ আবার কালের স্রোতে
নিদাঘে রাখিয়া,—
কোরক জনম শেষে শোভিবে কি চারুবেশে
প্রস্ফুট কুসুম,
কোমল পল্লবগুলি ঝরি শেষে ফল হ'বে
ভাঙ্গিবে সে ঘুম।!
বাসন্তী নিকুঞ্জ মাঝে মুহুমু হু পিকবধু
গাহিছে যে গান,
বরষার—বারিধারে এ আনন্দমাখা সুর
হ'বে অবসান!
ফুরাইবে অভাগার "চোখ গেল" ক্ষীণ স্বর,
"দে জল" "দে জল"
শেষ হ'বে চাতকের ; বধূর ভাঙ্গিবে মান
ফুরাবে সকল!

দুদিনের তরে যারা আসিয়াছে দেখা দিতে
যা'বে তারা সব,
উৎসবের 'নহবতে' 'সোহিনী'র শেষ তান
হইবে নীরব;
নিবে যাবে দীপমালা এ জীবন 'দেওয়ালী'র
প্রশান্ত উষায়;
হে গোপন সহচরি, তুমি শুধু মোর কাছে—
চে'ওনা বিদায়।
অশ্রু যবে যা'বে চলি হেরিব তোমার মুখে
মধুভরা হাসি,
হাসি যবে ফুরাইবে দুর্ভাগ্যের কশাঘাতে
উঠিবে বিকাশি,—
ওনীল নয়ন তলে তরল মুকুতা ধারা;
হে স্বপ্ন সুন্দরী,
বিশ্ব পরিত্যক্ত জনে নিয়ে যাবে নিরজনে
আবরিত করি'
তোমার অঞ্চল তলে নিরালা তোমার গেহে
বন্ধু হে আমার,
তোমার জ্যোতির ছায়ে নিমেষে ঘুচিয়ে যাবে
সকল আঁধার!
মরণ-পাণ্ডুর আস্যে, তোমার মোহন হাস্যে
হবে সমুজ্জ্বল—
অবজ্ঞার তীক্ষ্ন শর তব দত্ত বর্ম্ম 'পরি
সহিব সকল

তুমি মোরে দেখাইবে　　হৃদয় মুকুর মাঝে
তার ছবিখানি
জগৎ নীরব হ'লে　　তুমি মোরে শুনাইও,
তার মধু বাণী !
হে মোর অন্তরতমা　　হে গোপন রাজ্যেশ্বরী
দীন প্রজা তব,
তোমার দুয়ারে আসি　　দেখে নিত্য সুনবীন
বসন্ত-উৎসব !
ঢাকিতে দীনের লজ্জা　　তোমার নিলয়ে তার
নিত্য নিমন্ত্রণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত চিত্তখানি　　টেনে নিয়ে স্নেহভরে
কর আলিঙ্গন !
তোমার দরশ পেয়ে　　নিত্য শুভ দিবা তার
নিত্য সুপ্রভাত,
তুমি "নাও নাও" বলি　　সকলি দিতেছ তারে
পাত্র না ত হাত
এ বিশ্বের প্রথা মত　　"আগে দাও শেষে দিব
এ কথা বলিয়া !
নাও টেনে নাও মোরে　　সঞ্জীবনী স্নেহ দিয়ে
দাও জুড়াইয়া !

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
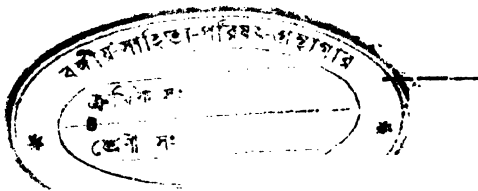
ডাইরী থেকে।

:০:-

বিকেলে বাসার মুখো-মুখি রাস্তাটায় বেরিয়ে পড়েচি। দিনের তীব্র আলো তখন ক্রমে ক্রমে নেশাখোরের দৃষ্টির মত ম্লান হ'য়ে আসছিল। বড় বড় গাছের পায়ের কাছে আঁধার-গুলো একটু একটু করে এসে কেবল জমছিল। রাস্তাটা জন-স্পর্শ-শূন্য হ'য়ে নীরবে গম্ভীর হয়েছিল। বেশ নিরিবিলি; কেউ কোথাও নেই। শ্রাবণের জল পেয়ে ছোট ছোট গাছপালাগুলো তৃষ্ণা মিটিয়ে গভীর তৃপ্তির ভরে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে। তাদের বর্ণে শ্যামশোভা উজ্জ্বলতায় ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। ড্রেনের ওপর একটা বাঁশের পোল্‌কে ঘিরে এরা বেশ জম্‌কে দাঁড়িয়েছিল।

তারি ওপর বসে দুটো সমান বয়েসী ছেলে মেয়ে মালা গাঁথা জুড়ে দিয়েছিল। এই শ্রাবণের স্তিমিত ম্লান অপরাহ্নে তাদের দুটী তরুণ হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস ঐ মালা ছড়াটীর ওপর আবদ্ধ হ'য়েছিল।

পশ্চিমাকাশে কার লজ্জা ভরা গালখানাকে তখন চুম্বনে চুম্বনে রাঙিয়ে তুলেছিল। মাঝে মাঝে একটু একটু ঝিরঝিরে হাওয়া, মেয়েটার অসংযত চুলগুলোকে দুলিয়ে দুলিয়ে উশৃঙ্খল ক'রে তুলছিল। তারা একমনে শুধু অসম্পূর্ণ মালাছড়াটীকে পূর্ণ করে নিতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। উগ্র-লোভটাকে আমি কিছুতেই নিরস্ত করিয়ে রাখ্‌তে পারছিলাম না।—আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে বল্‌লাম, "খুকী"!—এমনি একটা অপরিচিত কণ্ঠের আহ্বানের জন্য সে বোধহয় মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তাই তার সচকিত চোখ দুটী আমার দিকে তুলেই লজ্জায় তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিল। দৃষ্টি তার স্নিগ্ধ মধুর। ছেলেটা যে সেই মাথা তুলেছিল, আর তা নামাল না। তেমনি করেই তার উৎসুক চোখ দুটো আমার মুখের দিকে তুলে রাখ্‌লো। আমি বল্‌লাম, "বেশ ফুলগুলো, ক'টা দাও না।" ছেলেটার আগ্রহভরা চোখ দুটীতে বিরক্তি—আর অস্বীকারের ভাব ফুটে বেরুল; সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো, "ও: সে হবে না।"—মেয়েটা কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই তাড়াতাড়ি তার আঁচল থেকে সবগুলো ফুল

তুলে নিয়ে আমাকে নিঃশেষে চুকিয়ে দিল। ছেলেটা তার আধখানা কথা পেটে করেই তেমনি বিস্মিতের মত মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে থাকলো।

অর্দ্ধসমাপ্ত মালা ছড়াটীর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম,—"সবগুলো আমায় দিয়ে দিলে,—তোমার মালা তো শেষ হোল না!"

সে যে সেই স্বার্থটুকুকেই নিঃশেষে বাদ দিয়ে, এত বড় একটা আঘাতকে বুকে করে নিতে চাচ্ছে, তারি গর্ব্বে আর অভিমানে তখন তার বুকটা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই সে বললো, "নাই বা হোল আমার মালা শেষ।"—

যাকে করে এত আগ্রহ ছিল, তাকে এত সহজে বিনিওকয়ে আপত্তিতে, শুধু একবারটী মুখের দিকে চেয়েই ত্যাগ করতে পারাকে যে কতখানি তৃপ্তি আর আনন্দ সে পেয়েছিল,—তাই ভাবি।

*   *   *   *

সকালবেলা, পড়বার ঘণ্টাতে ঢুকতেই ফুলগুলো তাদের সঙ্গে সঙ্গে, মনে করিয়ে দিল তার—কথা কটা।

শ্রীকামাখ্যাচরণ মজুমদার।

ঈশোপনিষৎ।

এই উপনিষৎখানি বৃহদারণ্যকের ন্যায় শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়। ইহার সঙ্গে কাঠকোপনিষদের অনেক মিল আছে। তবে শ্বেতাশ্বতরের ন্যায় ইহা তেমন উন্নত ও পরিস্ফুট নয়। সেই জন্য ইহাকে উহা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ধরা হয়। বৈদিক আচার প্রণালীর কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইহাতে নাই এবং আরণ্যকের অনুকরণে ইহাতে কোনও গল্প বা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় নাই। যে আত্মতত্ত্বের উপর সকল উপনিষদই প্রতিষ্ঠিত সেই আত্মতত্ত্বও ইহাতে তেমন পরিষ্কার রূপে বর্ণিত হয় নাই।

ঈশোপনিষদে বর্ণিত বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। উপনিষদের মতে জগতই ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মই জগৎ। ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই, হয়ও নাই, হইবেও না। সুতরাং আমার যে আত্মা সেও ব্রহ্ম। সেই জন্য আত্মাকে বুঝিতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আর এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই মানুষ মুক্তি লাভ করে অথবা ব্রহ্মে মিশিয়া যায়। অনেকে বলিয়া থাকেন আত্মতত্ত্ব বেদেরই অংশবিশেষ এবং বেদ বিধি হইতেই ইহার জন্ম হইয়াছে। কিন্তু এই মতটীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ এই তত্ত্বের আবিষ্কারক হইতে পারেন কিন্তু উপনিষদের এই গুহ্যতত্ত্ব যে বহুকাল যাবৎ ক্ষত্রিয় সমাজেই আদৃত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছিল এবং তৎকালে ব্রাহ্মণগণ যে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডে মগ্ন রহিয়া উপনিষদের গুহ্যতত্ত্ব সমূহ প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতেই আমরা পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই পাঁচটী ব্রাহ্মণ আত্মন বৈশ্বানর সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার নিমিত্ত উদ্দালক আরুণির নিকট গেলেন। আরুণি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ সমর্থ নন ভাবিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া রাজা অশ্বপতির নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদের জ্ঞানের দোষ সমূহ নির্দ্দেশ করিয়া আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত বালাকি কাশীর রাজা অজাতশত্রুর নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বার বার বিষম ভুল করিয়া বসিলেন। অবশেষে রাজা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন ব্রাহ্মই আত্মা। ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ তখন ব্রাহ্মণের নিকটই শিক্ষা উপদেশ গ্রহণ করিত। এ ক্ষেত্রে যে সেই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিল তাহাও রাজা ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া দিলেন। জন্মান্তর বাদ সম্বন্ধে অন্যত্র দেখিতে পাই রাজা জৈবলী আরুণিকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি আরুণিকে বলিলেন ব্রাহ্মণগণ এই তত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়াই সকল স্থানেই রাজত্ব যা' তা' ক্ষত্রিয়গণই করিয়া আসিতেছেন। ইহা হইতে বোঝা যায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব ক্ষত্রিয়গণ অনেক কাল যাবত ব্রাহ্মণগণকে জানিতে দেন নাই। সেই জন্যই এই তত্ত্বের নাম উপনিষৎ বা গুহ্যতত্ত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই জন্যেই ব্রাহ্মণগণের মনে এই তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণগণ যখন এই তত্ত্ব অবগত হইলেন তখন ইহার সহিত বৈদিক দেবদেবীর কথা ও নানাবিধ ক্রিয়া কলাপ সংযোগ করিয়া দিলেন এবং উহাদের সহিত উপনিষদের সামঞ্জস্য

স্থাপন করিবার নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন এবং সর্ব্বশেষে লিখিয়া দিলেন বেদ না পাঠ করিলে আত্মতত্ত্ব জানা অসম্ভব। বেদ ও আত্মতত্ত্বের এই প্রকার সংমিশ্রণে উপনিষদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাব আসিয়া পড়িয়াছে এবং অনেক স্থলে মর্ম্ম অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয় সনৎকুমার ও রাজর্ষি জনকের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত। ইঁহাদের নিকট হইতেও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। জনকের রাজ সভায় যখন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু জনক তাঁহার সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহার মতের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া সকলকে শান্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ আচরণের যথেষ্ট কারণও ছিল। তখনও ব্রাহ্মণগণ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। তখন পর্য্যন্তও এই তত্ত্ব বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষভাগ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। তখনও এই তত্ত্ব গুহ্যতত্ত্ব বা উপনিষদ বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে পরিচিত ছিল। এই গুহ্যতত্ত্বে বেদবিহিত ক্রিয়া কাণ্ড ও বেদোল্লিখিত দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনার নিষেধ ছিল। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাজ যে এই গুহ্যতত্ত্বের বিরোধী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

ঈশোপনিষদে আমরা এই ব্রহ্মতত্ত্বের কথাই পাই। জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর স্বরূপ কি? ব্রহ্মই বা কি বস্তু? মানুষের জ্ঞাতব্য কি? মুক্তি কোন পথে, বিদ্যা অবিদ্যার তাৎপর্য্য কি? মৃত্যুকালে কি ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা এই উপনিষদখানিতে দেখিতে পাই।

এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নাই। ইংরাজীতে যাহাকে Pantheism (সর্ব্ব ঈশ্বর বাদ) acosmism (অজগৎ বাদ) কহে ঠিক তাহাই। এই শ্লোকের "ঈশা" শব্দটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই ঈশা ও আত্মনে কোনও প্রভেদ নাই। সুতরাং উপনিষদের মূলসূত্র আত্মতত্ত্ব যাহাতে ব্রহ্ম, জগৎ ও আত্মনকে এক বলা হয় সেই আত্মনতত্ত্ব যে এই উপনিষদে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে। কারণ এই ঈশাই আত্মন।

শঙ্করাচার্য্য ও তদীয় টীকাতে ঈশার ব্যাখ্যা আত্মনা করিয়াছেন। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ হইল এই যে আমার আত্মাতে ও জগতের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। অর্থাৎ আত্মাই জগৎ। জার্ম্মান দার্শনিক Paul Denssen ইহার অর্থ করিয়াছেন "to sink the universe in God." তবে এই "ঈশা" শব্দ হইতে অনেকে ভাবিতে পারেন ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে একটু ব্যবধান সৃষ্টি করিবার জনাই যেন উপনিষদকার আত্মন না ব্যবহার করিয়া ঈশা ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া উপাসনা প্রভৃতির পথ ও বেদের ঈশ্বর বাদ ও Theism এর পথ সূচনা করিবার নিমিত্তই উপনিষদকার আত্মন না ব্যবহার করিয়া ঈশা ব্যবহার করিয়াছেন। উপনিষদকারের উদ্দেশ্য যে তাহা নহে তাহার পরবর্ত্তী কয়েকটা শ্লোক পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ (Lord) শব্দের আধুনিক অর্থ ভুলিয়া গিয়া যদি ভাবি আত্মাই জগৎ আর জগৎই আত্মা তাহা হইলে দ্বৈত ভাব একবারেই আসিতে পারে না। কিঞ্চিৎ দ্বৈত ভাব না থাকিলে Theism বা বৈদিক ঈশ্বর বাদ একবারেই আসিতে পারে না।

জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে যে কোনও তারতম্য নাই—এই কথা বুঝিতে পারিলে এই উপনিষদকারের মতে আর ধনের আকাঙ্ক্ষা সম্ভবপর হয় না। কারণ সবকই যদি আমি হইলাম অর্থাৎ জগতের মধ্যে আমার যদি পৃথক অস্তিত্ব (isolated existence) না রহিল তবে আকাঙ্ক্ষা করিবার বস্তুই ত জগতে রহিল না, সুতরাং আকাঙ্ক্ষা হইবেই বা কেমন করিয়া। দুই বা ততোধিক না হইলে কিম্বা আপন পর বোধ না হইলে আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। সুতরাং মানুষ যখন আপন আত্মা ও জগতের মধ্যে তারতম্য ভুলিয়া যায় তখন আকাঙ্ক্ষা হওয়া আর সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি অনিবার্য্য। এই আকাঙ্ক্ষার ধ্বংস হইলেই মানুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিয়া মোক্ষ লাভ করার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের তৃষ্ণাদূর করিয়া নির্ব্বাণ লাভের বিধির সহিত একবারে মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদ ও উপনিষদ যে ভিন্ন পন্থী তাহা দ্বিতীয় শ্লোক পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। বেদ মানিয়া চলিলে হোমাদি নানা প্রকার কর্ম্ম মানিতে হয় এবং কর্ম্মানুসারে মানুষ যে সুফল

কুফল লাভ করে তাহাও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। ভাল কাজ করিলে যে আত্মার উন্নতি হয় আর মন্দ কাজ করিলে যে আত্মার অবনতি হয় তাহাও মানিতে হয়। কিন্তু এই উপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা মানুষের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। আত্মাকে কর্ম্মফল স্পর্শ করিতে পারে না সুতরাং আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন কর্ম্মদ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না। একশত বৎসর জীবিত থাকিয়া যে বেদবিহিত কর্ম্মাদি করিয়া আসে সে কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়। কর্ম্মফল তাহার আত্মাকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। Denssen ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"the stain of work clings not to thee." আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা অন্য প্রকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে—যে সকল ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হয় নাই তাহাদের পক্ষে যাবজ্জীবন বেদবিহিত কর্ম্মে বদ্ধ থাকাই সঙ্গত কারণ এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত এমন কোনও উপায় নাই যাহাতে এই আত্মজ্ঞান শূন্য ব্যক্তিগণ কলুষিত কর্ম্ম হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। বলা বাহুল্য শঙ্করাচার্য্য বেদের সহিত উপনিষদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্তই শ্লোকটার ব্যাখ্যা একটু টানিয়া করিয়াছেন। বেদ ছাড়িয়া শ্লোকটার সহজ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিতে গেলে Denssen যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন ঠিক সেই ভাবেই অর্থ শঙ্করাচার্য্যও করিতেন। সুতরাং এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই মানুষ মুক্তিলাভ করে। কর্ম্ম দ্বারা মানুষের কিছুই যায় আসে না। কারণ আত্মাতে কর্ম্মফল স্পর্শ করে না। সুতরাং বোঝা গেল সকলেই অমৃতের অধিকারী কেবল আত্মজ্ঞান হইলেই হয়। কর্ম্মদ্বারা এই মুক্তির পথ উন্মুক্তও করা যায় না বদ্ধও করা যায় না।

এখন বিদ্যা অবিদ্যা জ্ঞান অজ্ঞান সম্বন্ধে এই উপনিষদের মতামত আলোচনা করা যাউক।

এই উপনিষদকারের মতে "আত্মহনো জনা" অর্থাৎ আত্মনাশী ব্যক্তি মরণান্তে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন অসুরোচিত লোকে প্রস্থান করে। অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান রহিত ব্যক্তি কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারে না, চিরকাল মৃত ব্যক্তির মত অন্ধকারে অসত্য পথে বিচরণ করিতে থাকে। ঐরূপ ব্যক্তি তাহার এবং বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে না। মুক্তি পাইতে

হইলে, কামনাশূন্য হইতে হইলে কিম্বা জগতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। নবম শ্লোকে লিখিত আছে—যে অবিদ্যার উপাসনা করে সে অন্ধকারে প্রবেশ করে আর যে বিদ্যার অর্থাৎ বেদোল্লিখিত দেবতার আরাধনা করে সেও অন্ধকারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ বৈদিক বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। এখানেও বেদের সহিত উপনিষদের মতভেদ দৃষ্ট হয় দশম ও একাদশ শ্লোকে উপনিষদকার যে বিদ্যা অবিদ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মত হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। দশম শ্লোকে আছে—সুধীগণের নিকট শুনিয়াছি বিদ্যার ও অবিদ্যার ফল পৃথক। এখানে বিদ্যা অর্থে বৈদিক দেবতা আরাধনা বুঝিতে হইবে। উপনিষদকার একাদশ শ্লোকে তাহার নিজের মতটী প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে আছে—যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তুল্য জ্ঞান করেন অর্থাৎ যিনি উভয়কেই মুক্তিলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী মনে করেন তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন বা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

এই সম্পর্কে কথা উঠিতে পারে এই আত্মজ্ঞানের সহিত অমৃতত্বের কোনও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে কি না। উপনিষদের মতে উহাদের মধ্যে কোনও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই বলিয়াই মনে হয়। অর্থাৎ উপনিষদ বলেন আত্মজ্ঞানই অমরত্ব। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যদি আত্মা মানিয়া লওয়া হয় আর এই আত্মাই যদি ব্রহ্ম বলিয়া ধরা যায় তবে মানুষ দৈহিক হিসাবে জন্মিতেও পারে মরিতেও পারে কিন্তু আত্মার দিক হইতে তাহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। সে অমর। তবে আত্মজ্ঞান না হইলে কিম্বা শুধু বৈদিক দেবতার আরাধনা করিলে, কি অবিদ্যায় রত থাকিলে কাহারও অমৃতত্ব বা অমরত্ব বোধ হয় না। সুতরাং দৈহিক মৃত্যুর পূর্ব্বেও আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি অন্ধকারময় অসত্যপথে বিচরণ করে এবং দৈহিক মৃত্যুর পরেও তাহার সে অন্ধকার ঘোচে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করে সে জীবিত কালেও অমৃতত্বের আস্বাদ লাভ করে আর দেহনাশের পরও তাহার এই জ্ঞান নষ্ট হয় না—অমৃতত্বও নষ্ট হয় না। সুতরাং আত্মজ্ঞানই অমরত্ব। এই অমরত্ব আত্মজ্ঞানের ফল নয়। কারণ অমরত্ব আত্মজ্ঞানের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। আত্মজ্ঞানে এই অমরত্ব ধরা পড়িয়া যায় মাত্র। এই যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধটীর কথা বলা হইল ইহা শুধু ভৌতিক জগৎ (empirical

world) সম্বন্ধেই খাটে। আধ্যাত্মিক জগতে (metaphysical world) ইহা অচল। এ সম্বন্ধে ক্যাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকের সহিত উপনিষদকারের মিল দেখা যায়। পরবর্ত্তী ১২ — ১৪ শ্লোকে এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হইয়াছে।

এই কয়টী শ্লোকে উপনিষদকার বুঝাইয়াছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তা বিরাজিত, আর এই অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যাই হইতেছে আত্মন বা ব্রহ্মণ। সুতরাং প্রকৃতি বা প্রকৃতিজাত কোনও কিছু উপাসনা করা অসঙ্গত। কারণ এই সব অবাস্তব ও মায়া দ্বাদশ শ্লোকে আছে—যাহারা অসম্ভূতি উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে আর যাহারা সম্ভূতি উপাসনা করে তাহারাও অন্ধকারে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্তিও পায় না, সত্যও লাভ করে না। পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে পণ্ডিতগণের নিকট শোনা যায় সম্ভূতি উপাসনার ফল অসম্ভূতি উপাসনা করার ফল হইতে ভিন্ন। উপনিষদকার সম্ভূতি অসম্ভূতি সম্বন্ধে নিজমত চতুর্দ্দশ শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে ব্যক্তি সম্ভূতি অসম্ভূতিকে তুল্য জ্ঞান করেন অর্থাৎ অবাস্তব বলিয়া চিন্তা করেন তিনি সম্ভূতি অসম্ভূতি অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর পরপারে উপস্থিত হন এবং অমরত্ব লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর অসম্ভূতি দ্বারা প্রকৃতি বুঝিয়াছেন আর সম্ভূতিদ্বারা প্রাকৃতিক যত কিছু বুঝিয়াছেন। সুতরাং সম্ভূতি অসম্ভূতি দ্বারা the realm of causality and the realm of becoming and not becoming অর্থাৎ কার্য্যকারণ সম্পন্ন জগৎ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মকে প্রকৃতি বলিয়া উপসনা করা অসঙ্গত, প্রাকৃতিক কোন কিছু বলিয়া আরাধনা করাও অন্যায়। ফল কথা প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক কোন কিছু দ্বারাই ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় এবং অখণ্ড, আর বহু না হইলে সম্ভূতি অসম্ভূতি সম্ভবপর হয় না। প্রথম শ্লোক হইতে আমরা পাইয়াছি ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং। সুতরাং ঈশ্বর এই কার্য্যকারণময় সম্ভূতি অসম্ভূতির রাজ্যের কেহও নন।

এখন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদকার কি বলিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। চতুর্থ শ্লোকে আছে আত্মা অদ্বিতীয় স্পন্দনবর্জ্জিত অর্থাৎ অচল তথাপি ইহা মন অপেক্ষা দ্রুতগামী। দেবতারাও আত্মার নাগাল ধরিতে সক্ষম নন। কিন্তু একস্থানে স্থির থাকিয়াই আত্মা সকল ধাবমান বস্তু বা ব্যক্তিকেই অতিক্রম করিতে সক্ষম। এই আত্মার মধ্যেই অর্থাৎ

এই আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুদেবতা আদিভূত জল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটী পড়িলেই মনে হয় যে আত্মার সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী কথা বলা হইয়াছে। আত্মাকে অচলও বলা হইয়াছে আবার সচলও বলা হইয়াছে। একং বলিয়া আবার বহুর অবতারণা করা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল ভৌতিক জ্ঞান (empirical knowledge) আত্মার সম্বন্ধে খাটে না। কারণ ভৌতিক জ্ঞানের দিক হইতে আত্মা অজ্ঞেয়। এই শ্লোকে বেদের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক মনস্তত্ত্ববাদ অনেকটা এখানে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে! বৈদিক মতানুসারে এক আদিভূত জল হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি যত কিছু উদ্ভূত। এই শ্লোকে সেই জল আত্মাতে অবস্থিত বলিয়া প্রকারন্তরে বলা হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদকার বলিতেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে!
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

অর্থাৎ আত্মা সচলও বটে অচলও বটে! তিনি দূরেও আছেন আবার নিকটেও আছেন সকল জিনিষের অন্তরেও তিনি বিরাজ করেন আবার বাহিরেও অবস্থান করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে আত্মাকে transcendental (বহির্জ্জাগতিক) বলা হইয়াছে আবার immanental (অন্তর্জ্জাগতিক) ও বলা হইয়াছে! মোট কথা ভৌতিক জ্ঞানের মাপকাটির স্থান (Space) কাল (Time) ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Causality) প্রভৃতি দিয়া আত্মার বিচার চলে না। অষ্টম শ্লোকে আত্মার কথা বড়ই সুন্দরভাবে লিখিত আছে, যথা—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম
কবি মণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধ্যাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বব্যাপী, দীপ্তিমান, অবয়ব শূন্য, ব্রণ ও স্নায়ু শূন্য (অর্থাৎ সুন্দর), নির্ম্মল পাপ বিরহিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর এবং স্বয়ম্ভু। তিনি নিখিল পদার্থের প্রকৃতি ও

করণীয় চিরকালের জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এই শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই আত্মাকে স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ জন্মরহিত বা *causasui* বলা হইয়াছে। আত্মাকে শরীর বর্জ্জিত বলিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে, এবং কবি ও মণীষী বলিয়া আত্মাকে ত্রিকালজ্ঞ ও সর্ব্বনিয়ন্তা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে আত্মা ভিন্ন কাহারও স্বাধীন ইচ্ছাও নাই এবং ইচ্ছানুরূপ কিছু করিবার ক্ষমতাও নাই। কারণ তাহা হইলে আত্মা পূর্ব্ব হইতে এই সকল ইচ্ছা ও কার্য্য সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত হইতে পারেন না। তবে ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—এই প্রশ্ন আত্মা-সম্বন্ধে উঠিতেই পারে না। কারণ আত্মা স্থান ও কালের বাহিরে অবস্থিত কিন্তু এই প্রশ্নে ধরিয়া লওয়া হয় যে তিনি স্থান ও কালের মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন।

এখন যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করেন তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে উপনিষদকারের কি মত তাহা বলা যাউক। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার আত্মপর বোধ থাকে না। সকলের মধ্যেই যে এক অখণ্ড সত্তা বিরাজিত, তাহা তিনি বুঝেন এবং সেই জন্যই তিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, কাহারও প্রতি তাঁহার ঘৃণা হয় না কিম্বা কোন কিছু দ্বারা তিনি বিরক্ত হন না। এক কথায় তিনি এই বিরাট জগতে (manifold universe) এক অখণ্ড সত্তা বা আত্মাকে নিরীক্ষণ করেন। সুতরাং তিনি অবলীলাক্রমে মোহ এবং শোক অর্থাৎ ভ্রম ও দুঃখ অতিক্রম করিয়া সত্য এবং শান্তি লাভ করেন।

১৫—১৮ শ্লোকে উপনিষদকার মৃত্যুকালীন প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আত্মাকে পূষণ অর্থাৎ জগৎ পোষক বলিয়া আহ্বান করিয়া সত্যের মুখে যে হিরণ্ময় পাত্র স্থাপিত আছে তাহা উদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে মৃত্যুকালেও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও দেবদেবী উপাসনা প্রভৃতি ভুলিয়া সত্য ধর্ম্ম বা আত্মজ্ঞানে মননিবেশ করা উচিত। ষোড়শ শ্লোকে আছে হে পূষণ, হে একাকী গমনশীল, হে সূর্য্য, হে প্রজাপতি, তোমার দিগন্তব্যাপী রশ্মিজাল ও তেজ অপসারিত কর আর তোমার পরম কল্যাণময় রূপ দেখিতে দাও। তোমার মধ্যে যে পুরুষ অবস্থিত আমিই সেই; অর্থাৎ জগৎ মণ্ডলের মধ্যে যে এক অখণ্ড সত্য বিরাজিত আমিও সেই সত্তবস্তু। সুতরাং অনুমান

(inference) করা যাইতে পারে যে আমার দেহের বিনাশ হইলেও আমার আত্মার বা প্রকৃত সত্বার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। সপ্তদশ শ্লোকে কথাটা আরও স্পষ্ট বলা হইয়াছে। উপনিষদকার বলিতেছেন, আমার প্রাণবায়ু এখন মহাবায়ুতে বিলীন হউক আর শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হউক। হে মন, তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ কর আর যাহা করিয়াছ তাহা স্মরণ কর। অর্থাৎ মৃত্যুকালে যখন প্রাণ বিনষ্ট হইতে থাকে আর শরীর ভস্মসাৎ হইবার সময় উপস্থিত হয় তখনও যেন মন কর্ত্তব্য বা সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়। অষ্টাদশ শ্লোকে উপনিষদকার বলিতেছেন, হে, অগ্নি, তুমি আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর। তুমি আমাদের সকল কর্ম্মই অবগত আছ। আমাদিগকে পাপরাশি হইতে মুক্ত করিয়া দাও। আমরা তোমাকে ভূয়িষ্ঠ প্রণতি করি।—এখানে অগ্নি দ্বারা আত্মা বুঝিতে হইবে। তথাপি এই কয়টী শ্লোক পড়িলে মনে হয় বৈদিক ব্রাহ্মণ এই উপনিষদের সঙ্গে বেদের সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রাখিবার নিমিত্ত অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের স্তব জুড়িয়া দিয়াছেন। নতুবা আত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করার পর এই সব শ্লোকের প্রয়োজন থাকা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

সাঁজের বেলার জুঁই।

সাঁজের বেলার জুঁই
কোন্ সে বধূর গোপন মধুর মুখের হাসি তুই ?

মনের লাজুক মিনতিরে
রূপের কালো রাখে ঘিরে।
কালো চোখের চাউনি ওরে
কোথায় তোরে থুই ?

কোন বেদনার ছায়াতলে
প্রাণের গানের প্রদীপ জ্বলে,
প্রেমের আলোর পরিমলে
কতই ছলে ছুঁই !

শোকে আঁধার পুরীর মাঝে
শিশুর কল-কণ্ঠ বাজে।
মেঘের কোলেই জ্যোৎস্না বোলেই
নূতন সে নিতুই !

চিঠির কালো আখর চিরে
মনের মাণিক পেয়েছি রে
হিয়ার হারে গেঁথে তারে
আঁখির ধারে ধুই !

ঘুমের ফুলে গোপন সে কোন্ স্বপন-সুধা তুই,
আঁধার রাতের জুঁই !

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

বৃষ্টিবৈদ্য।

অনেক দেশেই বহুলোকের এরূপ সংস্কার আছে যে কোন কোন লোকের বৃষ্টি করিবার এবং বৃষ্টি নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে। বাঙ্গলা দেশে বৃষ্টি-বৈদ্যদিগকে অর্থাৎ যে সকল লোকের এই ক্ষমতা ছিল তাহাদিগকে "সিয়েল" বলিত। আমি বাল্যকালে সিয়েলদের গল্প

শুনিয়াছি। সিরেলরা প্রায়ই আত্মপরিচয় দিত না। কিন্তু লোকে তাহাদের গুণ দেখিয়া ধরিয়া ফেলিত। একদিন দুইজন কৃষক ছাতা না লইয়া ক্ষেতে গিয়াছিল। এমন সময়ে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল কিন্তু তাহাদের গায়ে এক বিন্দুও জল পড়িল না। তাহার পর তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময়ে তাহাদের উভয় পার্শ্বে শিলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল কিন্তু তাহা তাহাদের শরীর স্পর্শ করিল না। ইহা দেখিয়া তাহাদের একজন অন্য জনকে "সিরেল" বলিয়া চিনিতে পারিল। বর্ষাকালে কোন কৃষকই কোন সিরেলের সঙ্গে বিবাদ করিত না কেন না সে তাহা হইলে প্রয়োজনের সময়ে সেই কৃষকের ভূমিতে বৃষ্টি হইতে দিত না, আর যখন অপ্রয়োজন তখন বৃষ্টি পাতিত করিয়া তাহার শস্য নষ্ট করিয়া দিত। ইত্যাকার কত গল্পই শুনিতাম। ইহাও শুনিয়াছি জলপাইগুড়ি দুয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে চা বাগানের সাহেব ম্যানেজারেরা নিজ নিজ বাগানে বেতন দিয়া সিরেল রাখিতেন। স্কট্‌ল্যাণ্ডেও বৃষ্টি বৈদ্য ছিল। সার্ ওয়াল্‌টার স্কটের একখানি নভেলে ইহার আভাস পাওয়া যায়। নভেলখানির নাম ঠিক মনে নাই—বোধ হয় রেড্‌গণ্ট্‌লেট। যে ব্যক্তির সেইরূপ ক্ষমতা ছিল তাহার নামটাও ভুলিয়া গিয়াছি—বোধ হয় মেগ্‌সেরিলিস্। আফ্রিকায় একদল লোক বৃষ্টিবৈদ্যের ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহাদিগকে ইংরেজীতে (Rain Doctor) বলে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন বাঙ্গলা পত্রিকায়—বোধ হয় "রহস্য সন্দর্ভে"—একজন ইউরোপীয় চিকিৎসকের সহিত আফ্রিকার একটী বৃষ্টিবৈদ্যের নিম্নলিখিত তাৎপর্য্যে একটা কথোপকথন পড়িয়াছি। ব্যাধি-বৈদ্য বৃষ্টি-বৈদ্যকে বলিলেন "তুমি যে বিশ্বাস কর যে তোমার বৃষ্টি পাতিত করিবার ক্ষমতা আছে তাহা বড় ভুল। বৃষ্টি হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় অথবা স্বাভাবিক নিয়মে।" বৃষ্টি বৈদ্য বলিলেন "তাহা হইলে তুমি যে মনে কর যে তুমি রোগ সারাইতে পার সেটাও তোমার ভুল। রোগ সারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় অথবা স্বাভাবিক নিয়মে।" ব্যাধি-বৈদ্য বলিলেন "আমি ঔষধ দিয়া স্বাভাবিক নিয়মের সাহায্য করি।" বৃষ্টি-বৈদ্য বলিলেন "আমিও ঔষধ পোড়াইয়া তাহার ধূম দিয়া স্বভাবকে সাহায্য করি।" ব্যাধি-বৈদ্য বলিলেন "তোমার ধূম ত মেঘ পর্য্যন্ত পঁহুছিতেই পারে না।" বৃষ্টি-বৈদ্য—"তোমার ঔষধ কি প্রতি বারেই রোগ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া থাকে?" ব্যাধি-বৈদ্য—"কখন কখন পঁহুছে না সত্য। তখন রোগ সারে না। কিন্তু পঁহুছিলে রোগ সারে।"

বৃষ্টি বৈদ্য—"আমার ধূমও যেবার মেঘ স্পর্শ করিতে পারে না সেবার বৃষ্টি হয় না। স্পর্শ করিলেই বৃষ্টি হয়। তুমি যেমন চিকিৎসা করিয়া কখন কখন রোগ সারাইতে পারে না, আমিও তেমনি কখন কখন বৃষ্টি করাইতে সমর্থ হই না। তুমিও যেমন মধ্যে মধ্যে রোগ সারাইতে পার আমিও তেমনি মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি করাইতে পারি। তোমার ঔষধ ও আরোগ্য যদি কাকতালীয় সংঘটন না হয় তাহা হইলে আমার ধূম ও বৃষ্টিও কাকতালীয় নহে। আমার বৃষ্টিবিদ্যার জন্য আমি উপর্জ্জন করি, তুমি তোমার ব্যাধিবিদ্যার জন্য উপর্জ্জন করিয়া থাক।" ইত্যাদি।

বৃষ্টি-বৈদ্যের এই যুক্তি অনেককে হাসাইবে বটে কিন্তু লজিকপাঠী ছাত্রেরা ইহার হেত্বাভাস বা Fallacy নির্ণয় করিয়া দেখিবেন।

সে যাহা হউক একজন প্রকৃত বৃষ্টি বৈদ্যের অতি অদ্ভুত কার্য্যের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইঁহার নাম চার্লস্ হ্যাটফিল্ড্। ইনি কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত লোস্ এঞ্জেলিস (Los angeles) নামক স্থান বাসী। ইনি সতের বৎসরের মধ্যে বিয়াল্লিশ বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বৃষ্ট করাইয়া পণ জিতিয়াছেন। তিনি অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে "বৃষ্টি-বৈদ্য হ্যাট্‌ফিল্ড্" এই নামে সুপরিচিত হইয়া, সম্প্রতি, তিনি যে ইচ্ছা করিলেই আকাশকে কাঁদাইতে পারেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ইংলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত তাঁহার বৃষ্টিকরণের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের পশ্চিম ভাগে, প্রধানত কালিফর্ণিয়ায় এবং ওরিগনে (Oregon)। এই সকল স্থানেই তিনি উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করিয়াছেন। তবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার লোকেরও অভাব নাই। তাঁহারা তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া থাকেন। ১৯০৪ অব্দে প্রথমে লোকে তাঁহার কথা জানিল। সেই অব্দে তিনি লোস্ এঞ্জেলিস নগরের বণিক্ সম্প্রদায়ের সহিত এই বলিয়া বাজি রাখিলেন যে তিনি দক্ষিণ কালিফর্নিয়ার তদানীন্তন অনাবৃষ্টি ভাঙ্গিয়া দিবেন। তিনি তাড়াতাড়ি আবশ্যক রাসায়নিক বস্তু সংগ্রহ করিয়া সিয়েরা মাদ্রি পর্ব্বতের পাদদেশে

যে সকল ক্ষুদ্র শৈল আছে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ৬০ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সর্ব্বসমেত ১·৬৪ ইঞ্চ বারিপাত হইল।

তাহার পরবর্ত্তী শীত ঋতুতে লোস্ এঞ্জেলিসে দীর্ঘকাল ব্যাপী অনাবৃষ্টি হইল। সেখানকার ব্যবসায়ীরা বলিলেন যে তিনি যদি বৃষ্টি করাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে এক হাজার ডলারের স্বুবর্ণ মুদ্রা দিবেন। প্রতিজ্ঞা (চুক্তি) হইল যে ডিসেম্বর এবং মে মাসের মধ্যে ১৯ বৃষ্টি ইঞ্চ পাত হওয়া চাই। সেই সময়ের মধ্যে সেখানকার স্বাভাবিক বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ ছিল ন্যূনাধিক ১০ ইঞ্চ। প্রতিজ্ঞাত সময় পূর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বেই হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ বাজি জিতিলেন। ১৯·৫২ ইঞ্চ বৃষ্টি হইল। তাহার ফলে সেবার পূর্ণমাত্রায় শস্য জন্মিল।

গত পনের বৎসরের মধ্যে হ্যাট্‌ফিল্‌ডের কয়েকটা বিষয়ে এমন অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একবার দক্ষিণ কালিফর্ণিয়ার একটা নগরের সহিত তাঁহার এই চুক্তি হইল যে একটা নির্দ্ধারিত দিনের পর পোনের দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হইলে তিনি পোনের শত ডলার পাইবেন। তিনি তাঁহার যন্ত্র জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। একটা শনিবার ছিল নির্দ্ধারিত দিন। কথা রহিল যে সেই দিন জাহাজ পঁহুছিলে বৈকালে তাঁহার যন্ত্র নামাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু ঘটনা ক্রমে তাহা হইল না। সোমবারে যন্ত্র নামান হইল। রবিবার অপরাহ্ন হইতে অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল এবং ছত্রিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইল। চুক্তি নামার মত বৃষ্টি করাইবার কথা ছিল তদপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইল। চুক্তি নামায় লেখা ছিল "যদি পোনের দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয় তাহা হইলে 'চেম্বর অব্ কমস্' বৃষ্টিবৈদ্য হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌কে পোনের শত ডলার দিবেন।" সুতরাং তাঁহার যন্ত্র ব্যবহার না করিলেও যখন বৃষ্টি হইল তখন চেম্বর্স্ সেই টাকা দিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা টাকা দিলেন না।

আর একবার কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত চাইনো নামক স্থানের চিনি উৎপাদন করার বীট ক্ষেত্রগুলি অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কয়েকটা নগরের চেম্বর অব্ কমর্স হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌কে ডাকাইলেন। হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট পঁহুছিলে তাঁহারা

তিনি বৃষ্টি করাইতে পারিবেন কি না এ বিষয়ে তাহার বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। তিনি কোথায় কোথায় চুক্তি করিয়া কত ইঞ্চ বৃষ্টি করাইয়াছেন সেই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, কুড়ি মিনিটের মধ্যে, তাঁহাদের সভাগৃহের বহির্ভাগে বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনা গেল। পরক্ষণেই মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

হ্যাট্‌ফিল্‌ডের আর একটা প্রধানতম অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। স্যান্‌ডিয়েগো নামক স্থানের সিটি কাউন্সিল লেখাপড়া না করিয়া মুখে মুখে তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি যদি মোরীনা জলাধার (Moréna Reservoir) বৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি পোনের হাজার ডলার পাইবেন। মোরীনা জলাধার একটা প্রকাণ্ড অতি বৃহদায়তন জলাধার। ইহা নগর হইতে ষাট্ মাইল দূরে পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। নগর বাসিগণ এখানকার জল দিয়াই তাহাদের যাবতীয় গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পোনের হাজার ডলার দিয়া সেই জলাধারটা পূর্ণ করাইয়া লইতে পারিলে প্রতি শত গ্যালন জলের জন্য এক সেণ্ট্ মাত্র ব্যয় হইবে। ইহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই এই ভাবিয়াই সিটি কাউন্সিল পোনের হাজার ডলার দিতে চাহিলেন।

ইহা ১৯১৬ অব্দের শীতকালের কথা। সিটি কাউন্‌সিল্ হেট্‌ফিল্‌ড্‌কে জলাধার পূর্ণ করিবার জন্য এক বৎসরের সময় দিলেন। তিনি কার্য্য আরম্ভ করিবার পর তেত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে ২·৮০ ইঞ্চ্ বৃষ্টি পাত হইল। এক জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ছত্রিশ ইঞ্চ্ বৃষ্টি পাত হইল। গণনা করিয়া দেখা গেল সেই সময়ের মধ্যে ৪০০ ০,০০০,০ ০ গ্যালন জল সেই জলাধারে সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রতি শত গ্যালনের মূল্য এক সেণ্ট ধরিয়া ধরিলে এই সঞ্চিত জলের মূল্য হয় ৪,০ ০,০০০ ডলার। সিটি কাউন্‌সিল্ স্বীকার করিলেন যে পাঁচ বৎসরের ব্যবহারোপযোগী জল সঞ্চিত হইয়াছে। এক দিনেই ১৫·০০ ইঞ্চ্ বৃষ্টি হইয়াছিল। অবশিষ্ট ছাব্বিশ দিনে জলাধারের চতুঃপার্শ্বে ১৪·৪ ইঞ্চ্ বৃষ্টি হইল।

অবশেষে জলাধারের উপরিস্থ নালা দিয়া সাড়ে চারি ফুট জল উপচিত হইয়া প্রবাহিত হইল। তাহার পর ঘটনার মত ঘটনা ঘটিতে লাগিল। অতি বৃষ্টিতে দেশের স্রোতস্বতী সকল স্ফীত হইয়া দেশ প্লাবিত করিল। তাহাতে নগরের ও পল্লীগ্রামের এক শতেরও অধিক

সেতু ভাঙ্গিয়া গেল এবং সান্টা ফে (Santa Fe) রেল রোডের এমন ক্ষতি হইল যে অনেক দিন তাহার কাজ বন্ধ রহিল। সান্ ডিএগো নগরের ওটে (Otay) বাঁধ নামক আর একটা জলাধার একদিন রাত্রিকালে ফাটিয়া গেল। তাহাতে এমন প্লাবন হইল যে বারজন লোক ডুবিয়া মারা গেল এবং কয়েক লক্ষ ডলারের সম্পত্তি নষ্ট হইল।

যখন দেনা পাওনার সময় আসিল তখন কর্ত্তৃপক্ষ টালমাটাল করিয়া হ্যাটফিল্‌ড্‌কে কিছুই দিলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে লিখিত কোন চুক্তিপত্র নাই এবং বৃষ্টি যে হ্যাট্‌ফিল্‌ডের কৃত তাহাও হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ বলেন যে তাঁহাদের অনুরোধে এই বৃষ্টি পতিত হওয়ায় বহু লোকের ক্ষতি হইয়াছে এজন্য তাঁহাদের নামে মকদ্দমা উপস্থাপিত হইলে তাঁহাদিগকে বহু অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে অঙ্গীকৃত পুরস্কার দেন নাই।

১৯১২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত হেনেট (Henet) নামক স্থানের অধিবাসীরা তখনকার দীর্ঘকাল স্থায়ী অনাবৃষ্টি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিলে হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌কে চারি হাজার ডলার দিতে চাহিলেন। তাহার পূর্ব্বে এগার মাসের মধ্যে দুই ইঞ্চ মাত্র বৃষ্টি হইয়াছিল। লোস্ এঞ্জেলিস্ অপেক্ষা প্রতি বৎসরই হেনেটে প্রায় ২·৩৪ ইঞ্চ্ কম বৃষ্টি হইয়া থাকে। হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ চুক্তি অনুসারে কার্য্যারম্ভ করিবার দিনই পূর্ব্বের দিগুণ বৃষ্টি হইল। বর্ষাকালের শেষে দেখা গেল যে লোস্ এঞ্জেলিসে ১১·৪৭ ইঞ্চ এবং হেনেটে ১১·৭৯ ইঞ্চ্ বৃষ্টি হইয়াছে।

পোনের বৎসর গত হইল হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ ওআস্কো (Wasco) নামক স্থানের ঘাট্‌ বর্গমাইল ভূমিতে ছয় ইঞ্চি্‌ বৃষ্টি করিবার কণ্ট্রাক্ট্‌ লইলেন। ছয় সপ্তাহে সেই পরিমাণে বৃষ্টি পাত হইল। সেই প্রদেশে পূর্ব্ববর্ত্তী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মে মাসে কখনই ·০৫ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টি হয় নাই কিন্তু ৯ই মে হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ কার্য্যারম্ভ করার পর ৩১সে মের মধ্যে সেখানে ১·২১ ইঞ্চ বৃষ্টি হইল।

এক বৎসর কালিফর্নিয়ার এক স্থানের লোকেরা তাঁহার সহিত এই চুক্তি করিল যে তিনি যদি সাত ইঞ্চ বৃষ্টি দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে পঞ্চাশ ডলার, নয় ইঞ্চ দিলে

আড়াই শত ডলার এবং বার ইঞ্চ দিতে পারিলে দেড় হাজার ডলার দিবে। সে স্থানের বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ছিল পাঁচ ইঞ্চ্। হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন। এগার ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়া দেশ প্লাবিত হইল। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহার বৃষ্টিলীলা সংবরণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে দেড় হাজার ডলার দিয়া বিদায় করিল।

লেক স্পল্‌ডিং (Lake Spaulding) প্রদেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টির ফলে গোমড়ক হইয়াছিল এবং খনির কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে সেই অনাবৃষ্টি ভঙ্গ করিয়া হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ দুই শত ডলার পাইলেন। মার্সেড্‌ (Merced) নামক স্থানের কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত আট বৎসর হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌কে বেতন দিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের প্রচুর শস্যলাভ হইয়াছিল।

১৯০৫ অব্দের জুন মাসে আলাস্কার অন্তর্গত ডসন নগরে বৃষ্টি দান করিবার জন্য এই অসাধারণ ব্যক্তি আহূত হইয়াছিলেন। সেখানে ছয় বৎসরের মধ্যে জুন মাসে ·২৫ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টি হয় নাই। তিনি সেখানে গিয়া প্রতিদিন ·৮ ইঞ্চ করিয়া ছয় দিন বৃষ্টি করাইলেন।

হ্যাট্‌ফিল্‌ড্‌ যে কিরূপে এই কার্য্য সাধন করেন তাহা বুঝা যায় না। তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে করিয়া থাকেন ইহা বলেন। গবর্ণমেণ্টের মিটিয়রলজিকাল কর্ম্মচারীরা তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে ইহা কাকতালীয় ঘটনা। কিন্তু বৃষ্টি যে সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগমন করে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

বৃষ্টি বৈদ্য হ্যাট্‌ফিল্‌ডের উল্লিখিত বিবরণ গত ডিসেম্বর মাসের Wide World Magazine হইতে গৃহীত হইল। এই বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্ততঃ দুইবার তিনি অনাবৃষ্টি স্থানে যাইয়া পঁহুছিবামাত্রই, তাঁহার রাসায়নিক প্রয়োগের পূর্ব্বে এমন কি তাঁহার যন্ত্র খুলিবারও পূর্ব্বে, বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়। ইহাতে আমার ত এইরূপ বোধ হয় তাঁহার রাসায়নিক প্রয়োগের ফলে বৃষ্টি হয় না। তাঁহাতে এমন কিছু আছে যে, যেখানে অনাবৃষ্টি তিনি সেখানে গেলেই বৃষ্টি হয়।

আমার এইরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু এই যে, বাঙ্গালা দেশে এমন একজন অতি উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী আছেন যিনি অনাবৃষ্টিপীড়িত কোন স্থানে যাইবামাত্র

বৃষ্টি হয় তিনি আমার অতি নিকট কুটুম্ব। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার সম্মতি না লইয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করা উচিত বোধ করিলাম না। তিনি যদি এই বিবরণ পড়িয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করার অনুমতি দেন তাহা হইলে আগামী বারে তাহা প্রকাশ করিব। অনেক বৎসর পূর্ব্বে তিনি উড়িষ্যায় ছিলেন। সেখানকার লোক দেখিয়াছিল যে, বড় গ্রীষ্মের সময়ে তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই বৃষ্টি হইত। এই দেখিয়া কত স্থান হইতে তাঁহাকে লোকে আমন্ত্রণ করিত। তিনি যখন২ সেই স্থানে যাইতেন তখনই সেখানে খুব বৃষ্টি হইত।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সন্ধ্যার ফুল।

তখন ছিলে সখি নীরব নত চোখে
আড়ালে,
কনক প্রাতে যবে প্রথম আসি কাছে
দাঁড়ালে।
মধুপ মাতোয়ারা ভ্রমিত গুন্‌গুনি
ফিরিতেছিল দ্বারে তপন জাল বুনি
মলয় মুরছিয়া মরিত তনু বেড়ি
সাদরে
গুণ্ঠা আধ'টানি লুকাতে মুখখানি
কাতরে।

বিরহ তপভারে দয়িতে মিলাবারে
বয়ানে
নয়ন পল্লব— মুদিতে বল্লভ—
ধেয়ানে।
দুয়ারে কর হানি গেল যে কতবার
মুকুতা শুভ সিত তরল হিমহার
পাপিয়া ফুকারিয়া ; বিফল মুকুলিকা
ঝরিয়া—
চরণে তৃণদল শয়ন সুকোমল
রচিয়া।
কেমনে গেল টুটি মৌন সঙ্কোচ
সাধনা
হইলে বিকশিত মধুতে ভরি চিত্ত
বত না।
টুটিল সব বাধা, লুটিল সবে মিলি
তোমার যাহা কিছু ছিল গো নিরিবিলি
নিলাজ রবি কর হইল খরতর
অসহ
ক্ষণিক ভুলে কেন বরিলে চির হেন
বিরহ ?
উতলা হাওয়া এবে তোমারে পরিহরে
দেখিয়া
শীর্ণ পাতাগুলি দীর্ণ কলিকায়
ঠেকিয়া।

তবুও দিন শেষে ঊর্দ্ধ মুখে চাহি
আছ' এ যার আশে আর সে হেথা নাহি ;
হাওয়ার তালে আসা তার সে ভালবাসা
পাবে কি ?
পরতে পরতে এ তনুটি দিতে দিতে
রবে কি ?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিররহস্য-সন্ধানে।

:*:

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ফুলদানির সম্মুখে, অন্যমনে বিধৃত ছিন্ন-পাপড়ী গোলাপবৃন্তটী হাতে করিয়া, নিঃশব্দে দণ্ডায়মান, এল র‍্যামি তাঁর বর্ত্তমান নিষ্ক্রিয় মানসিক অবস্থার কথা ভাবিতেছিলেন। এরূপ স্বপ্নাবিভোর অন্যমনস্ক অবস্থায় মেঝের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি হয়তো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কিন্তু বাহিরের রাস্তায়, গৃহাভিমুখী একদল মদ্যপের হাস্যে চীৎকারে ও শিষের আওয়াজে তন্দ্রা টুটিয়া যাওয়ায় গৃহতল হইতে চোখ তুলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

"বেশীর ভাগ লোকই এই রকম ইতর আমোদ প্রমোদ উপভোগ্য মনে করে"—মনে মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"পানাসক্তি, মূঢ়তা, পাশবিকতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অদম্য চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের যত সব দুঃখময় দৃষ্টান্ত। এ কি সম্ভব যে ভগবান এ সমস্ত সহ্য করেন? স্বেচ্ছায়

ধ্বংসের পথে অগ্রসর এ সব লোককে খৃষ্টের করুণায় কি ক্ষমা করতে পারে? কি বললুম—খৃষ্টের করুণা?—না, কখনও কখনও তিনিও নিষ্করুণ। একটা বন্ধ্যা ডুমুরগাছকে তিনি কি অভিশাপ দেন নি?—যদিও এই বন্ধ্যাত্বের কারণও সেই সঙ্গে বলা আছে, মানি। অবশ্য এর শিক্ষা হচ্ছে এই যে জীবনের—ডুমুরগাছের—ফল-সম্বন্ধে বন্ধ্যা হবার অধিকার নেই। কিন্তু তা' হলেও; অভিশাপ দেওয়া কেন? যে কোনো সময়েই হোক্, অভিশাপের উপযোগীতাটা কি? অপরপক্ষে একথাও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, যে আশীর্ব্বাদেরই বা প্রয়োজন কি জন্যে? কোনোটাই প্রাপ্ত হয় না; অভিশাপ কদাচিৎ ফলে—আর আশীর্ব্বাদ, দুঃখীরা বলে, কখনই ফলপ্রসূ হয় না।"

বাহিরের হাস্য ও কোলাহল মিলাইয়া গিয়াছে,—ঘরে গভীর স্তব্ধতা বিরাজমান,—দর্পণে এল র‍্যামির ছায়া পড়িয়াছে, চিন্তামগ্ন মুখের ছায়া। সহসা সেদিকে দৃষ্টি পড়ায় ছবি দেখিবার মতন করিয়া তিনি আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"তুমি তো এ্যাণ্টিনাস নও বন্ধু"—আপন প্রতিচ্ছায়াকে তিক্তকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি সামান্য একজন প্রাচ্যদেশবাসী সূর্য্যতাপে তাম্রবর্ণ দেহ, আর উজ্জ্বল একজোড়া চক্ষু যাতে বুঝি বা স্বর্গের চেয়ে নরকেরই আলো বেশী সপ্রকাশ। অদৃষ্টকে ভ্রূকুটী করে' নিজের জন্যে কিই বা তুমি করবে? চরম আত্মাভিমানী ছাড়া তুমি অন্য কিছুই নও।"

এই সময় ফুলদানির কয়েকটী গোলাপ-পাপড়ি যেন বা মৃদুল বায়ুবীজনেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের সুবাস নিদাঘ-সন্ধ্যার মৃদু নিশ্বাসের মত কক্ষ-সমীরণে ছড়াইয়া গেল।

কোনো জানালা খোলা ছিল না, অথবা এল র‍্যামিও নড়াচড়া করেন নাই—তথাপি ফুলদানিতে পাপড়ীগুলির চাঞ্চল্য ঘটায় ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া তিনি সেদিকে চাহিলেন। অবশ্য, কারণ অনুসন্ধান করিবার কোনো ইচ্ছা আপাততঃ তাঁহার ছিল না—কেন না, তাঁহার অন্তরের মধ্যে অধুনা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, এবং আপন দৌর্ব্বল্য-সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিষের দিক হইতে স্বভাবতঃই তিনি মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন

"চাইনে না আমি ওদিকে—সাহস নেই"—অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি ব'ললেন—"এখনও নয়, এখনও নয়।"

পার্শ্বেই একখানা চেয়ার ছিল—এক হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া তিনি তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং আপন চিন্তা ধারাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। হস্তাবৃত নয়নে তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

"—'সমস্তই খৃষ্টের প্রাপ্য'—জ্যারোবা এই কথা বলেছিল কিন্তু এমন কি তিনি করেছিলেন যাতে সমস্তই তাঁর প্রাপ্য হ'তে পারে? প্রচারকেরা বলে—'আমাদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন!' বেশ—অপরেও তা' পারে। 'তিনি ঐশীশক্তিসম্পন্ন'—ধর্ম্মমন্দির এই কথা জানায়। আমরা সকলেই ঐশীশক্তিসম্পন্ন, যদি ঐ শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ-চেষ্টা করি। এ চিন্তা মনে উদয় হইবামাত্র তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং গৃহপ্রাচীর-গাত্রের একটী কুলুঙ্গির দিকে অগ্রসর হইলেন। জড়োয়ার কাজ করা একখানি ভেলবেটের পর্দ্দায় কুলুঙ্গিটী আবৃত ছিল—সেটী অপসারিত করিবামাত্র, সমুদ্র-বেলায় শিষ্য-পরিবেষ্টিত খৃষ্টের একখানি সুচিত্রিত ছবি বাহির হইয়া পড়িল; চিত্র-পাদদেশে এই কথা কয়টি খোদিত—'বল দেখি আমি কে'?"

মূর্ত্তিটীর দেহ-গঠন ও মুখাকৃতির মর্য্যাদা-সুন্দর ভঙ্গী বাস্তবিকই বিস্ময়কর, এবং আয়ত দু'খানি নয়নে গর্ব্ব ও মাধুর্য্য মিশ্রিত একটী অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা। এল র‍্যামি অধীর ঔৎসুক্যে ছবিখানির সম্মুখীন হইলেন।

"বল দেখি আমি কে?"

চিত্রিত ঈশা যেন নিজেই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

"হে মহৎ মানব-রহস্য, আমি তা' বলতে পারিনে!"—সহসা উচ্চকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"বলতে পারিনে তুমি কে। একটা প্রহেলিকা, যা'তে সারাজগৎ বিস্ময়মুগ্ধ. ঈজিপ্ট নগরীর যাবতীয় রহস্যও তোমার রহস্যের তুলনায় কিছুই নয়। হে সরল, পবিত্রচেতা! দৈন্যের ক্রোড়ে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেও তুমি পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছো, মানব-সভ্যতাকে রূপ দিয়েছো, তার মধ্যে পবিত্রতা-সঞ্চার করছো জীবনে জীবনে এমন উন্নততর কর্ম্ম প্রেরণা বহমান করেছো যা' অভূতপূর্ব্ব। এ সমস্তই তিন

বৎসরের চেষ্টায়, আর তার পরিণাম নিয়মভঙ্গ-অপরাধে মৃত্যুদণ্ড। বাস্তবিকই, তোমার মধ্যে যদি ঐশীশক্তি কিছু না থাকে, তবে ঈশ্বর নিজেই একটা ভ্রান্তি।"

মনে হইল যেন সেই বিচিত্র আননখানি গাঢ়-অনুকম্পায় একটু হাসিল এবং ঘরের ভিতর হইতেই কে যেন উচ্চারণ করিল "বল দেখি আমি কে ?"

"হয়তো আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি—ছবির উপর ধীরে ধীরে আবরণখানি টানিয়া দিয়া ও ঘরের চারিদিকে বিহ্বলভাবে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"বোধ হয়, দুর্ব্বলতম মানুষ ছাড়া মোটের ওপর আর কিছুই আমি নই।"

লিলিথের পালঙ্ক-অভিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইবামাত্র শায়িতার অপরিসীম সৌন্দর্য্য চোখে পড়ায় তাঁহার বুকের ভিতরটা একটু যেন কাঁপিয়া উঠিল। অল্পে অল্পে পালঙ্কের নিকটস্থ হইয়া তিনি শয়ানা যুবতীটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, কিন্তু নাম ধরিয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন না। তরঙ্গায়িত কেশরাশির একটা গুচ্ছ তাঁহার হাতের কাছেই পড়িয়া ছিল—কেমন-যেন-একটা আকস্মিক উত্তেজনা-বশে সেগুলি মুষ্টিবিধৃত করিয়া তিনি চুম্বন করিলেন।

"এক গুচ্ছ সূর্য্য-রশ্মি!"—মনে মনে তিনি বলিলেন—"একখানি স্বর্ণজাল যার ফাঁদে চুম্বন ধরা পড়ে' মরণ লাভ করে! হে ভগবান, রক্ষা কর!"—পালঙ্কে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে তিনি বলিলেন—"যদি এ বালিকাকে আমি ভালবাসি,—যদি এই উন্মত্ত আবেগের নাম ভালবাসা হয়, তবে এ যেন কখনও তা' জান্‌তে না পারে দয়াময়! অন্যথায়, সেও নষ্ট হবে আমিও হব। না, না, এখন তাকে আমার কাছে ডাক্‌বো না—তার অনুপস্থিতিই এখন আমার পক্ষে ভাল; এই দেহ,—তার আত্মার এই সুন্দর আবরণটা আত্মার অনুপস্থিতিতে মৃত ছাড়া আর কিছুই নয়। সে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না—আমাকে দেখতেও পাচ্ছে না—না, এমন কি যখন এই হাতখানি আমার নির্ব্বোধ চিত্তবেগ-চরিতার্থতার জন্যে এইখানে রাখ্‌ছি, তখনও না।"

উক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গেই লিলিথের বাহুলতাটী আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার রক্তকরপুটখানি চুম্বন করিলেন। সেই সুকোমল অঙ্গুলিগুলির স্পর্শে তাঁহার মধ্যে এমন একটী শান্তি ও পরিতৃপ্তির আবেশ সঞ্চারিত হইল, যেন বা নির্জ্জন কোনো পর্ব্বত স্রোতস্বতী

বা হ্রদ হইতে সজীবতা বুকে করিয়া দক্ষিণ সমীরণের প্রবাহ-পরশই গায়ে লাগিল। তিনি নিঃশব্দে নতজানু হইয়া বসিলেন—পরক্ষণেই, কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া, লিলিথের দিকে চাহিবার জন্য চোখ তুলিলেন—সে গভীর তন্দ্রার ভিতর হইতেও একটু হাসিল,—সে যেন একখানি সুখনিদ্রিতা অপ্সরার নিখুঁত চিত্র। বিধৃত বাহুখানি ধীরে ধীরে শায়িতার বুকের উপর রাখিয়া, তিনি উদ্গ্রীব আগ্রহে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর আননের প্রত্যেকটী রেখা ও বর্ণাভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তুষার-শুভ্র সাটীনের সুকোমল শয়নে শায়িতা প্রভাত-পদ্মের মতন সুসম্পূর্ণ তনুভঙ্গিমা,—পরিপুষ্ট গ্রীবাখানি উপর সুগোল সুন্দর চিবুকটী,—আরক্ত দু'খানি কপোলের মধ্যশায়ী গোলাপী অধরপুট,—কান্তিময় নিটোল ললাট-তটে কুঞ্চিত কেশরাশির তরঙ্গ-হিল্লোল—সমস্তই তাঁহার নয়নদর্পণে প্রতিফলিত হইতে লাগিল; আর সেই সঙ্গে তিনি একথাও না ভাবিয়া থাকিতে পারিলেন না যে এ সমস্তই তাঁর, একান্তভাবে তাঁরই—যদি তিনি জ্ঞান ও প্রেম এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞানকে ছাড়িয়া প্রেমকেই বরণ করেন। যদি তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বৃদ্ধির সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়াই সাব্যস্ত করেন, পৃথিবী যে ভাবে আছে এবং স্বর্গ যেরূপ হইতে পারে সেই ভাবেই তাহাদের গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন,—তাহা হইলে, সৌন্দর্য্য পবিত্রতা ও পরিপূর্ণ নারীত্বের মূর্ত্ত-প্রতিমা এই লিলিথ তাঁরই। এ চিন্তায় তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—অতঃপর জোর করিয়াই তিনি মনের ঝোঁকটীকে সংযত করিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, কি করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,—যে সুখ-কল্পনা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতেছে তাহা অধিকার করিবার পূর্ব্বে অদ্বিতীয় মহা-রহস্যটীকে আবিষ্কার করা—সেই যথার্থ ব্যক্তিগত নিত্য অস্তিত্বটীকে প্রমাণ করা যা' নাকি রক্তমাংসের মধ্যে সাময়িক আবাস অধিকার করে আছে বলে' শুন্‌তে পাওয়া যায়। লিলিথের দেহ তিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন—তার আত্মাকেও অবশ্যই দেখ্‌বেন।

অতঃপর তিনি পালঙ্কের অভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন,—এবং সেই মুহূর্ত্তেই একটা আকস্মিক স্বরলহরী কক্ষব্যাপী স্তব্ধতার ভিতর হইতে সমুত্থিত হইয়া, গভীর ও পবিত্র স্তোত্র-গীতির ন্যায়, বায়ুস্তরে মধুর অনুরণনে বিকম্পিত হইতে লাগিল। হতবুদ্ধি হইয়া তিনি সেদিকে কাণ পাতিলেন, কিন্তু ভয় পাইলেন না; আপনাকে ছাড়া স্বর্গেমর্ত্ত্যে অন্য কিছুই তিনি খুঁজিয়া পান নাই যা' তাঁহার নিকট ভীতিকর। তথাপি তাঁহার বিস্ময় আরও বেশী

বাড়িয়া গেল যখন ঐ প্রহেলিকাময় গীতি-তরঙ্গের উত্থানপতনের মাঝখানে তিনি শুনিতে পাইলেন, লিলিথ তাহার যথাবিহিত কোমল-কণ্ঠে বলিতেছে—

"আমি এইখানে!"

তাঁহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল এবং নত-জানু ভঙ্গী হইতে উঠিয়া তিনি তাহার পার্শ্বে বসিলেন। "আমি তো তোমাকে ডাকিনি, লিলিথ!" কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন।

"না,"—হাস্যোজ্জ্বল অধরতল হইতে উত্তর আসিল—"তুমি ডাকনি,...আমিই এলুম!"

"কেন এলে?" তিনি অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"নিজের ও তোমার আনন্দের জন্য!"—মধুর নিক্কণে উত্তর আসিল—"সপ্তস্বর্গের মধ্যে সেরা জিনিস প্রেম, আর সেই প্রেম এখন এখানে!"

তাহার উচ্চারণের উল্লসিত ভাবটুকুতে এল র‍্যামির বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল—কি যে উল্লাস!—যেন সৌর-কর-বিহসিত বসন্ত-প্রভাতে অজস্র বিহঙ্গের প্রভাত-সঙ্গীত। এল র‍্যামির স্মৃতি যবনিকার অন্তরাল হইতে সন্ন্যাসীর সেই উক্তিগুলি বাহির হইয়া আসিল— "প্রেমের ভিতর দিয়া লিলিথের মুক্তিও আসিতেছে।"

"না,—না!" তিনি মনে মনে বলিলেন—"তা' হ'তে পারে না, কখনই তা' হবে না! সে আমার, একা আমারই। আমিই তার ভাগ্যবিধাতা; স্বর্গে যদি সুবিচার থাকে, তবে তার দেহমনে আমার চেয়ে বেশী দাবী আর কার হ'তে পারে?"

লিলিথের ওষ্ঠ কাঁপিল,—পরক্ষণেই সে পুনরায় কথা কহিল। "চমৎকার ঐশী নিয়মের গতি-লীলা! অসংখ্য,—প্রাণীরাজ্যে এ-নিয়মের বিচিত্র-কর্ম্মগুলি। একটী বৃদ্ধ, অবজ্ঞাত ও দরিদ্র, স্বজন-পরিত্যক্ত,—বিকলচিত্ত কিন্তু পবিত্রচেতা,—একটী অগ্নিশিখার মতন আমার পাশ দিয়ে ঊর্দ্ধে চলে যাচ্ছে—মুক্ত ও উন্নীত, জ্ঞানের পথে নয়, প্রেমের পথে।"

এল র‍্যামি শুনিলেন, শঙ্কিত ও হতবুদ্ধি হইলেন। নিশ্চয়ই তার কথা জেলমণীসেরই উদ্দেশে?

"নক্ষত্ররাজ্যের জ্ঞান বা আলোক-রশ্মির গতির এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সীমাসংখ্যা নেই"—স্বপ্নাবিষ্টভাবে লিলিথ বলিতে লাগিল—"কিন্তু বিশ্বস্ত প্রীতি, যা' প্রণয়িনীকে অনন্তকাল একজনের পাশে ধরে রাখে, খুবই দুর্ল্লভ; সেই জন্যেই আদর্শ প্রণয়িনীও জগতে অল্প।"

এল র‍্যামি আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না।

"তুমি কি এমন কোনো লোকের কথা কইছো, লিলিথ, যে মৃত"—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাকে আমি জানতুম"—

"যে জীবিত"—উত্তর আসিল—"এবং যাকে তুমি জানো। কারণ কেউও মৃত হয় না এবং জ্ঞানের অতীত' নেই, সবগুই বর্ত্তমান।"

তাহার স্বর স্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; এল র‍্যামি নত হইয়া মুগ্ধ-আগ্রহে তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন,—শায়িতার নেত্র-পল্লব কাঁপিল, এইবার বুঝিবা তাহা উন্মীলিত হইবে—কিন্তু না, তাহা নিমীলিতই রহিয়া গেল। কি সুন্দর এই মুখখানি! 'সুন্দর' বলিলে বুঝিবা কিছুই বলা হয় না।

"লিলিথ!"—পূর্ব্বের অমঙ্গলাশঙ্কা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া আবেগোজ্জ্বল কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন—"প্রিয়তমে লিলিথ!"

সে তাঁহার দিকে ঈষৎ একটু ফিরিল—এবং শয্যায় বিলুণ্ঠিত হাত দু'খানি অনুনয়ের ভঙ্গীতে মাথার সোজাসুজি তুলিয়া যুক্ত করিল।

"ভালবাসো আমাকে!"—গানের সুরের মত মধুর-কণ্ঠে সে বলিল—"ভালবাসো, প্রিয়তম আমার!"

এল র‍্যামির মাথা ঘুরিয়া গেল, চিন্তাধারা বিশৃঙ্খল হইল—নিজের অজ্ঞাতসারে সেই যুক্তকর-পল্লবটী তিনি আপন মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিলেন।

"বাসি না কি লিলিথ?" আধ-সুপ্ত আধ-সচেতন অস্ফুটভাবে তিনি বলিলেন—"আমি কি তোমায় ভাল বাসি না?"

"না, না!"—উত্তেজিত উত্তর আসিল—"আমাকে না, আমার শরীরকে না! আমাকে ভালবাসো, প্রিয়তম, আমার ছায়াকে নয়!"

হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া তিনি সরিয়া বসিলেন—শঙ্কিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ। শারিতার উক্তি তাহার সমস্ত সংশয়ের মূলে ঘা দিয়াছিল,—মুহূর্ত্তের জন্য বিনা প্রমাণে অমর আত্মার যথার্থ সত্যে বিশ্বাস করিতে প্রায় প্রস্তুত হইয়াও পরক্ষণেই নিজের মূঢ়তা ও দৌর্ব্বল্যকে তিনি ধিক্কার দিলেন, অথচ উত্তর দিতেও সাহস না পাওয়ায় মৌনই রহিলেন। কিন্তু সে পুনরায় এতই দৃঢ় আগ্রহে আত্মপ্রকাশ করিল যে প্রায় তিনি বুঝিবা বিশ্বাসই করিলেন—তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

"বাস্তবকে ছেড়ে প্রতীয়মানকে ভালবাসাই"—সে বলিল—"মানব জগতের সাধারণ দোষ। এ-দোষ বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে রেখেছে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে। দেহটা ছায়া মাত্র—আত্মাই হচ্ছে বস্তু। বিশ্ব-মুকুরের ছোট একটু জায়গা জুড়ে যে ছায়া আমি ফেলছি, তা' প্রতিরূপ মাত্র—আমার স্বরূপ নয়। আমি তার সীমার বাইরে!"

মুহূর্ত্তকালের জন্য এল র‍্যামি হাল ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন,—পরে আপন বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলি একত্র করিয়া তাহাদিগকে নিজের মধ্যে সুবিন্যস্ত ও সুসম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চয়ই এতদিনে চরম-পরীক্ষা গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়া থাকিবে?—একথা মনে হইবামাত্র তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হইল, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল, এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানুরাগ পুনরায় তাঁহার মনের উপর দাবী জানাইল। তিনি ভাবিলেন, এই দীর্ঘ অধ্যয়ন ও ধৈর্য্যের পরও যদি মানব-জগতের আত্মিক সত্যের দিকে অন্তর্দৃষ্টি-লাভে অকৃতকার্য্য হইতে হয়, তবে নিজের কাছে লজ্জিত ও নিজের চোখে হেয় ছাড়া আর কি প্রতিপন্ন হইবেন? এই যন্ত্রণা, সংশয় ও অবিশ্বাসের যাবতীয় পীড়ন শেষ করিয়া দিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি শারিতার সন্নিকটে সরিয়া আসিলেন এবং তাহার নবনীত-কোমল হাত দু'খানি আপন বক্ষের উপর টানিয়া আনিয়া স্নেহগর্ভ বিনম্র বচনে বলিলেন—"তা' হ'লে আমাকে শেখাও লিলিথ, তোমাকে জানতে শেখাও। আমি যা' দেখ্‌ছি তা' যদি প্রতিরূপ মাত্র হয়, তবে তোমার স্বরূপ আমাকে দেখ্‌তে দাও। যদি প্রতীয়মান তোমাকেই এখন আমি ভালবেসে থাকি, তবে আসল তোমাকেই ভালবাসবার উপায় করে দাও। তোমার জ্যোতির্ম্ময় সমগ্র সৌন্দর্য্যে আমার সম্মুখে প্রকাশিত হও, লিলিথ!—হ'তে পারে, সে সুষমা-

গৌরব আমার মৃত্যুরই কারণ হবে—অথবা তোমার কথামত মৃত্যু যদি না-ই থাকে, তবে তোমার জীবনের আলোক-উৎসেই হয়তো বা আমি মিলিয়ে যাবো। আমাদের মাঝখানের যবনিকা তুলে ধর লিলিথ,—সামনাসামনি তোমাকে দেখ্‌তে দাও!"

কথাগুলি বলিয়া, বিকম্পিত-হৃদয়ে তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কি উত্তর দিবে সে?......কি করিবে সে? তাহার মুখ হইতে পলকের জন্যও তিনি চোখ সরাইতে পারিলেন না—পাছে কোনো পরিবর্ত্তন নজর এড়াইয়া যায়। সেই সময়টুকুর মধ্যে ইহাও তাঁহার নিকট সম্ভব মনে হইল যে, এখনি এমন কোনো স্বরূপই সে পরিগ্রহ করিবে, যাহা গ্রীক-পুরাণ-বর্ণিত দেবতা-বিশেষের মত স্বকীয় রশ্মি-শিখায় যে-কোনো নরদেহধারী দর্শককেই ভস্মীভূত করিতে সমর্থ। কিন্তু সে ভাস্কর-খোদিত মূর্ত্তিটীরই মত প্রশান্ত ও অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল,—কেবল শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও এল-র‍্যামির বক্ষ-সংলগ্ন বাহুলতা দু'খানি ঈষৎ বিকম্পিত হইল মাত্র।

তাহার পরবর্ত্তী কথাগুলি, কিন্তু, তাঁহাকে চমকিত করিল—

"আমি দেখা দেবো!"—করুণ দীর্ঘশ্বাস-উদ্ভিন্ন-অধর-যুগলের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"প্রস্তুত হও আমার জন্যে। প্রার্থনা কর!—ঈশার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর,—কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে থাক্‌লে সমস্তই কল্যাণময় হয়ে ওঠে।"

একথায় তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্ন ও নয়ন যুগল চিন্তাভারনত হইল।

"ঈশা!"—আপন মনে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমার তাঁকে কি দরকার? কি এমন তিনি যে আমাদের সঙ্গে তাঁকে থাকতেই হবে?"

"এ জগতের পরিত্রাতা,—আর— সমস্ত জগতের গৌরব!"

রৌপ্য-নিক্কণের মত কণ্ঠস্বরে উত্তরটী বাজিয়া উঠিল—সে স্বর সংশয়লেশহীন ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ; শুধু লিলিথের কণ্ঠবীণা নয়,—মনে হইল যেন অজস্র কণ্ঠস্বরের ঐক্যতান সে উত্তরে বিজড়িত। এই সময় তাহার হাতদুখানি স্পন্দিত হইতে লাগিল, যেন বা এল র‍্যামির মুষ্টি হইতে মুক্ত হইবারই চেষ্টায়। কিন্তু তিনি মিশ্র-ঈর্ষা-ও-প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে উহা জোর করিয়াই ধরিয়া রাখিলেন।

"কখন তুমি আমাকে দেখা দেবে লিলিথ ?"—উদ্‌গ্রীব কোমল-কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন আমি তোমাকে লিলিথের স্বরূপে দেখ্‌তে বা জানতে পাবো ? আমার লিলিথ, আমার চিরকালের লিলিথ-রূপে ?"

"ঈশ্বরের লিলিথ—ঈশ্বরের চিরকালের !"—তন্দ্রা-জড়িম-কণ্ঠে কথাকয়টী উচ্চারণ করিয়া সে নীরব হইল।

এল র‍্যামির মনের ভিতর একটা ক্রুদ্ধ বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল। আপন অদম্য ইচ্ছার সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি বিধৃত হাত দু'খানি শায়িতার উভয় পার্শ্বে পুনরায় রক্ষা করিলেন এবং তাহার বক্ষের উপত্যকায় (যেখানে হীরকখণ্ডটী দীপ্তি ছড়াইতেছিল) হাত রাখিয়া পূর্ব্বাভ্যাস-মত আদেশ-কঠোর কণ্ঠে বলিলেন—"উত্তর দাও, লিলিথ ! কখন তুমি আমার কাছে আসবে ?"

তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন আভ্যান্তরিক শৈত্যাধিক্যে সহসা অত্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল ; পরে ধীর ও পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে সে উত্তর দিল—

"যখন তুমি প্রস্তুত হবে।"

"আমি আজই প্রস্তুত !"—এল র‍্যামি উচ্চকণ্ঠে জানাইলেন।

"না,—না !"—ক্ষীণতর কণ্ঠস্বরে গুঞ্জন শোনা গেল—"এখনও হওনি ! প্রেম এখনও প্রবল হয়নি, নির্ম্মল হয়নি, বিশুদ্ধ হয়নি। অপেক্ষা কর, সজাগ থাক প্রার্থনা কর। সময় উপস্থিত হলেই সঙ্কেত করা হবে—কিন্তু প্রিয়তম, যদি আমাকে জান্‌তে চাও, তবে আমাকেই ভালবাসো—আমার ছায়াকে নয় !"

ধীরে ধীরে একটী পাণ্ডুর আভায় তাহার আননখানি সমাচ্ছন্ন হইল এবং মুখের সজীব ভাবটুকু মিলাইয়া গেল। সে পরিবর্ত্তনের অর্থ এল র‍্যামি বুঝিলেন।

"লিলিথ ! লিলিথ !—তিনি বলিলেন—"যদি ভালবাস, তবে এমন করে' আমায় ছেড়ে যাচ্ছ কেন ? আরও কিছুক্ষণ থাক আমার কাছে !"

কিন্তু লিলিথ,—অথবা ভাবান্তরে, যে আত্মাটী লিলিথের দেহকে কথা কওয়াইতেছিল,—চলিয়া গিয়াছে।

সে রাত্রে আর দ্বিতীয় কোনো শব্দ, সঙ্গীত বা প্রাণ্যান্তর উক্ত কক্ষের স্তব্ধতাকে বিক্ষুব্ধ করে নাই। নিশাবসানে কুহেলিকাচ্ছন্ন ধূসর উষাখানি আসিয়া দেখিতে,—গর্ব্বী এল য়্যামি ঈশার উন্মুক্ত চিত্রটীর পার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। আশা, প্রার্থনা তিনি করিতেছিলেন না, কেননা প্রার্থনা করিতে যে পরিমাণ নিরহঙ্কার নম্রতা প্রয়োজন হয় তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না; তিনি শুধু বিস্মিত-চিত্তে ভাবিতেছিলেন—চিত্র-পাদদেশে যে প্রশ্নটী বিজ্ঞাপিত, উহার সম্ভাব্য উত্তর কি হইতে পারে—ঐ প্রশ্ন যাহা কোন্ সুদূর প্রাচীন কাল হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে—

"বল দেখি আমি কে ?"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

বেদনা-অভিমান।

-:০:-

ওরে আমার বুকের বেদনা !

ঝঞ্ঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সম রে

আকুল এমন কাঁদন কেঁদো না !

কখন্ সে কার ভুবন-ভরা ভালবাসা হেলায় হারালি,

তাইতে রে আজ এড়িয়ে চলে' সকল স্নেহে পথে দাঁড়ালি !

ভিজে ওঠে চোখের পাতা তোর,

একটি কথায় অভিমানী মোর !

ডুক্‌রে' কাঁদিস বাঁধন-হারা, ওগো আমায় বাঁধন বেঁধ না।
বাঁধন গৃহের সইল না তোর,
তাই ব'লে কি মায়াও ঘরের ডাক দেবে না তোকে ?
অভিমানী গৃহ-হারা রে !
চল্‌লে একা মরুর পথেও
সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাক্‌বে নত-চোখে,
ডাক্‌বে বধূ সন্ধ্যে-তারা যে
জানি ওরে এড়িয়ে যারে চলিস্ তারেই খুঁজে চলিস্ পথে।
জোর ক'রে কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস্ বিজয়-রথে।
ওরে কঠিন। শিরীষ-কোমল তুই।
মর্ম্মর তোর মর্ম্মে চাপা বেল কামিনী যুঁই।
বুক-ভোরা তোর ভালোবাসা, মুখে মিছে বলিস্, 'সেধোনা!'

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

প্রবাসীর পত্র।

—:০:—

শ্রীরেণুকা দাসী।

বন্ধু,—

জানি তুমি এর এতটুকুও সম্মান রাখবে না, তবুও এ চিঠি তোমায় লিখতেই হবে; কারণ, তা' না হ'লে—অনেক কথা না বলা থেকে যায়। পূজারী নানা উপচারে দেবতাকে পূজা করে, সে জানে না, তা'র সেই অর্ঘ্য দেবতা গ্রহণ করেন কি না; কিন্তু পূজা করেই তার সুখ—তার তৃপ্তি! তুমি এর সম্মান রাখ বা না রাখ—এতেই আমার সুখ—এতেই আমার তৃপ্তি!

যাক্! আমার দানটী তুমি হেলা ভরে ঘৃণা করে পায়ে দলে ফিরিয়ে দিয়েছো; কিন্তু তোমার দানটী বড় আদরে—বড় যত্নে বুকে তুলে নিয়েছি—দেবতার নির্ম্মাল্যের মত। এত দিয়ে যে এই পাওয়া যায় এ ত আমার বিশ্বাস ছিল না! প্রতিদানের কথা আমি কিছু বল্‌তে চাই না; কিন্তু আজও আমি বুঝতে পারি না, যে মানুষ কেন মানুষের তৈরী করা জিনিষের এত আদর করে! ভগবানের দেওয়া যে জিনিষ তার কেন এতটুকু সম্মান রাখে না—তার একটুও আদর কেন বোঝে না!

তুমি বল্‌বে মানুষকে আমি ঘৃণা করি। এটী তোমার ভুল। মানুষকে আমি কোন দিনই ঘৃণা করিনি। মানুষই আমাকে ঘৃণা করে সংসারের মধ্যে ঠাঁই দিলে না; তাই ত আজ আমার এই ব্যথাহত নিষ্ফল জীবন নিয়ে সবার চোখের আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি। জোর করে আমি কোন আশ্রয়ের দাবী করতে চাই না; কিন্তু ক্ষমাই যে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম—এ কথা তুমি কেন যে ভুলে গিয়েছো, তা আমি বুঝতে পারি না। তুমি হয়তো বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করবে; কিন্তু আমি বলি, অবিশ্বাস করে মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করার চেয়ে বিশ্বাস করে একটু ঠকা কি ভাল নয়? বিশ্বাস আর অবিশ্বাস নিয়েই ত এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বাস করা যায়; কিন্তু বিশ্বাস করা খুব সহজ ও সরল। প্রমাণ ব্যতিরেকেও অনেক সময়ে অনেক জিনিষ বিশ্বাস করা যায়; কিন্তু অবিশ্বাস করার একটী ভিত্তি থাকা চাই—একটা দৃঢ় প্রমাণ থাকা চাই। অবিশ্বাস করা তত সহজ ও সরল নয়। বিশ্বাসে সুখ আছে; অবিশ্বাসে অশান্তি এনে দেয়।

তুমি হয় তো মনে করবে যে আমি এত কথা লিখে তোমার বাঁকা মনকে সোজা করবার চেষ্টা করছি; কিন্তু তা' নয়। আমি বলতে চাই যে সংসারকে আমি কি দিয়েছি, আর তার বিনিময়ে আমি কি পেয়েছি। এটী খুব স্বার্থপরের মত কথা হ'লো বটে; কিন্তু আমি আমার প্রাণের অনন্ত বিশ্বাস সংসারকে দিয়ে—পেয়েছি শুধু ঘৃণা আর অবিশ্বাস। আমি আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ—হাসি কান্না দিয়ে পেলাম ঘৃণা আর অবহেলা। এর জন্য আমার দুঃখ করবার কিছু নেই; তবে এই ক্ষোভটুকু নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে যে আমার জীবন দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে মরণ পেয়েছি। যে নিশ্চিন্ত

নির্ভর আশ্রয়টুকু আমি ভিক্ষা করেও তোমাদের কাছে পাই নি ; মরণ আজ হাসি মুখে আমায় সেই আশ্রয়ে ঠাঁই দিয়েছে। একদিকে আমায় তোমরা ঘৃণা করেছো বটে, কিন্তু আর একদিকে আমার চিরশান্তির পথটা মুক্ত ক'রে দিয়েছো—তোমাদের অপমানই আমার আশীর্ব্বাদ—তোমাদের শাপই আমার বর !

যাক্! এখন আসল কথাটা বলি। সে আজ অনেক দিনের কথা। এমনি বাদল সন্ধ্যাবেলা—সে দিন তুমি আমাকে পেয়েছিলে—আমি তোমাকে পেয়েছিলাম—মানুষের তৈরীকরা কোন নিয়মের মধ্যে দিয়ে নয় ; ভগবানের গড়া সনাতন পবিত্র ধর্ম্মের মধ্যে দিয়ে। সে দিন সামান্য একটা "না" বলে তুমি আমার জীবনের সমস্ত ধারা বদলে দিয়েছো। তখন আমার শুধু এই কথা মনে হ'য়েছিল যে তুমি—

স্বপ্নঃ নু, মায়া নু, মতিভ্রমঃ নু
ক্লিশনং নু তাবৎ ফলম এব পুণ্যাম্—

হয়তো স্বপ্ন—না হয় মায়া—কিম্বা মতিভ্রম ; অথবা অতীতের কোন পুণ্যের সামান্য একটু ফল মাত্র। তাই আনন্দে তখন আমার যা' কিছু ছিল সবই তোমার পায়ের তলায় নিবেদন করেছিলাম—দেবতারে দেওয়া অর্ঘ্যের মত। অটল বিশ্বাসের উপর প্রাণের ভক্তি দিয়ে আমি আমাকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম। তখন আমি ভাবি নাই যে—

জোছনা তরল
ঢালিবে গরল।

আমি জানতাম যে ভাল থেকেই ভালর উৎপত্তি। ভগবানের দেওয়া জিনিষের মধ্যে যে কপটতা থাকতে পারে, তা' আমার জানা ছিল না। আজ বুঝেছি—কেন চাঁদে কলঙ্ক—কেনই বা পেলব কুসুমে কীট! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যদি আমন্ত্রণই করেছিলে, তবে আবার বিসর্জ্জন দিলে কেন? চিরদিনই ত আমি তোমার মঙ্গল কামনা করে এসেছি ; কিন্তু যারা তোমার পদে পদে শত্রুতা সাধন করেছে, তারাই তোমার সবার বড় হলো ; আর আমি যে শুধু তোমারই মঙ্গলের জন্য আমার জীবনটা বলি দিলাম—তার বিনিময়ে আমার কপালে একটা কলঙ্কের কাল দাগ এঁকে দিয়ে আমাকে সবার ঘৃণ্য করে সংসারের বাহিরে ঠেলে

দিলে। এর জন্য আমি একটুও দুঃখ করি না ; কিন্তু এইটুকু ক্ষোভ রইল যে আমার এত বড় ভালবাসাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তুমি তোমার জীবনের সার্থকতা করলে। আমিও ত এই চাই ! তোমার জীবনকে সার্থক করে তোলাই আমার জীবনের সার্থকতা। আমার জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যে তোমার জীবনের সার্থকতা হয়েছে, এর জন্য আমি ধন্য ; কিন্তু তুমি কি ! এই ত্যাগ স্বীকারের এতটুকু সম্মান রাখলে না ! তোমার জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলবার জন্যই ত আজ এই ছ'বছর আমি মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছি। কিন্তু চিরদিনই তুমি আমাকে ঘৃণা করে এসেছো। একটা দিনের তরেও একটা ভাল কথা বল নি। আমার এ ত্যাগস্বীকার স্বার্থক হ'তো ; যদি তুমি এর এতটুকু সম্মান রাখতে। তুমি নিজ-মুখে এক দিন বলেছিলে যে এই ছ' বছর আমার সঙ্গে ঘর করে তুমি এক দিনের জন্যও শান্তি পাও নি ; কিন্তু এই ছ' বছর কত ফোঁটা চোখের জল আমার ঝরিয়েছ, তার কি কোন দিন সন্ধান করেছো ? তাও আমি সমস্ত নীরবে সহ্য করে এসেছি ; কিন্তু যে দিন নারীত্বের অবমাননা করলে, সে দিন আমার সুপ্ত আত্মা জেগে উঠ'লো ; মনে হয়েছিল এক নিমিষে গড়া সমস্ত ভেঙ্গে চুরে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্তু তোমার সুখের সংসার ভাঙতে ইচ্ছা হলো না। তোমাকে সুখী করাই ত আমার ধর্ম্ম। তাই সমস্ত অপমান—সমস্ত অবহেলা আশীর্ব্বাদের মত মাথায় পেতে নিয়ে রাবণের চিতা বুকে করে সংসারের বাহিরে এসে দাঁড়ালাম জানি না এতে তুমি কত সুখী হয়েছো—সংসারই বা কি পেয়েছো ! কিন্তু যদি তোমাদের ঐখানে আমার একটু ঠাঁই হতো, সংসারের কতটা ক্ষতি হতো তা আমি ঠিক জানি না ; কিন্তু আমার যে অক্ষয় স্বর্গবাস হ'তো সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। যাক্ ! যা হবে না, তা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না।

তোমাদের মুনিঋষিরা বলে গিয়েছেন যে আমাদের বিশ্বাস করতে নেই ; এ কথা খুব সত্য ; কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাদের যে কেন বাদ দিয়েছেন তা' আমরা বুঝতে পারি না। হয়তো—"মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। আর যে পণ্ডিত তোমাদের ক্ষমা করে দয়া বিতরণ করে গিয়েছেন, তাঁকে তোমাদের এক ডেপুটী বাবু মূর্খ বলেছেন। কিন্তু আমরা বলি—তাঁর মত পণ্ডিত আর কেউ নেই।

যাক্। এখন আসল কথা বলি। ভগবান তোমাদের বড় করে সৃষ্টি করেছেন—দুর্ব্বলকে আঘাত করবার জন্য নয়—রক্ষা করবার জন্য। তোমরা যে ধর্ম্মের অপলাপ করেছো, আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করেছি। তোমরা শুধু বলেছো—"তিতিক্ষা সম নাস্তি সাধনম্"; আর সেই নীতির সার্থকতা করেছি আমরা। তোমরা তোমাদের তৈরী-করা জিনিষের আদর কর; কিন্তু আমরা ভগবানের দেওয়া জিনিষ নিয়ে আলোচনা করি।

হয় তো তুমি বুঝবে যে এত কথা লিখে তোমার কাছে আমি আশ্রয় ভিক্ষা করছি; কিন্তু তা' নয়। তোমার পায়ের তলায় আমার ঠাঁই আমি অনেক দিন করে নিয়েছি। এখন তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারলে না; ক্ষমা না করার যে কি কষ্ট তাও তুমি অনুভব করতে পারলে না; কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন এই বলে তোমায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে হবে যে—

"বিদায় করেছি যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে।"

এ বিশ্বাস আমার আছে; তাই আজ তোমার দেওয়া সকল অপমান—সকল ঘৃণা মাথায় পেতে নিয়ে তোমার সুখের সংসার বজায় রেখে আমার জীবনকে সার্থক করেছি। এ সার্থকতার মর্ম্ম তুমি বুঝবে না আত্মবলিদানে যে কত সুখ—ত্যাগে কত শান্তি—কত তৃপ্তি, তা' তোমার ধারণা হবে না। তুমি তোমার গর্ব্ব—তোমার তেজ নিয়ে থাক। প্রার্থনা করি যেন ঐ তেজটুকু তোমার জীবনকে সার্থক করে মহিমান্বিত করে তোলে! যেখানে অভিমানের মর্য্যাদা থাকে না—ভালবাসার যেখানে সার্থকতা হয় না—হৃদয়ের যেখানে মূল্য নেই, সেখানে আমার ঠাঁই হবে না। তাই আজ এই কথা বলে তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি যে—

আর না আসিব তোমারই এ দ্বারে
লাঞ্ছনা নিতে শত বারে বারে
চলিলাম এবে মরণের পারে—
　　থাক সুখে তুমি থাক রে!

অদূরে ডাকিছে বিশ্ব প্রকৃতি—

বলিছে আয়রে—আয় রে।

তাই আজ এ বিশ্বের ডাকের অপমান করতে পারলাম না। জানি না কোথায়—কত দূরে, এ জীবনের অন্তঃ হবে। এ মরণ আমার সার্থক হতো যদি এ ভালবাসার তুমি এতটুকু মর্য্যাদা রাখতে। তোমার এ বিষ আমার কাছে অমৃত হ'য়ে উঠতো, যদি তুমি আমার এ ত্যাগের মহিমা বুঝতে। আমি জানি এ ভুল একদিন তোমার ভেঙে যাবে, যে দিন বুঝবে কেমন করে আমি সমস্ত অপমান—সমস্ত তাচ্ছিল্য নীরবে সহ্য করে গিয়েছি। সে দিন তুমি এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিয়ো যে মরণের কোলে আশ্রয় পেয়ে আমি শান্তি লাভ করেছি।

যাক্! আজ আর, বেশী কিছু বলবো না। এখন আমার বড় সাধনার—বড় কামনার তীর্থ-ভূমিতে যেতে হবে। চলে যাবার আগে তীর্থ ভূমি দর্শন করে, দেহমন পবিত্র করে জীবনের সার্থকতা পূর্ণ করে যেতে চাই। আজ শুধু তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি যে আমার জন্য একটু প্রার্থনা করো যেন আমি শান্তি লাভ করতে পারি। আর আমার এই ব্যথাহত নিষ্ফল হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা—

……"তুমি সুখী হবে,

ভুলে যাবে সর্ব্ব-গ্লানি বিপুল গৌরবে।"

ইতি—

তীর্থযাত্রী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
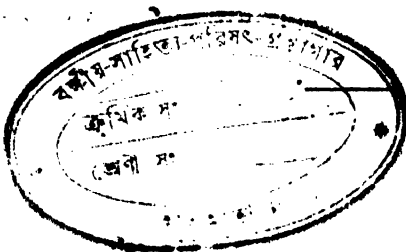
বিলাতী সব্জার চাষ।

আজকাল সব জিনিষই দুর্মূল্য। খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য ত খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এ সময়ে মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন এবং সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের মোটা ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া দিন গুজরানও কষ্টকর হইয়াছে। আর যাহাদের নির্দিষ্ট মাসিক বেতনের উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালাইতে হয় তাহাদের ত কথাই নাই। এ সময়ে যাহাতে গৃহস্থগণ সামান্য শারীরিক পরিশ্রম ও দু'চারি আনা পয়সা ব্যয়ে নিজ নিজ বাটীসংলগ্ন পতিত জমিতে শাক্‌সব্‌জী উৎপন্ন করিয়া কতকটা ব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, ইহা ব্যবসায়ীদিগের জন্য নহে। আশা করি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থেরা আমাদের লিখিত মত কার্য্য করিয়া সুফল পাইবেন।

এ প্রবন্ধ লিখিবার আর একটী কারণ আছে। বিগত বৎসর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের নানাজেলার অনেক দরিদ্র গৃহস্থ, সরকারী কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে শাক্‌সবজীর বীজ ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু চাষ করিয়া সুফল পান নাই, সে দোষ বীজঘটিত নহে—নিজেদের অনভিজ্ঞতার; ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ নিরাশ হইবার কারণ না ঘটে, সেজন্যই এ বিষয়ে কয়েকটী কথা লিখিলাম। আমাদের কথানুসারে কার্য্য করিলে কেহই নিরাশ হইবেন না।

বাঙ্গলাদেশে এমন গরিব গৃহস্থ অতি কম যাহার বাড়ীর পাশে সামান্য দুই এক কাঠা পতিত জমি না আছে। এই সামান্য এক কাঠা জমি হইতেই যে কোন বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ নিজ পরিবারের খাদ্যের উপযোগী শাক্‌সব্জা উৎপন্ন করিয়া অনেকটা ব্যয়ের সংক্ষেপ করিতে পারেন।

এমন কি ভাবে কাজ করিতে হইবে সে কথা বলিতেছি। পতিত জমিতে গৃহস্থেরা সাধারণতঃ আবর্জ্জনা ফেলেন, সে সকল আবর্জ্জনাও একরূপ সার, কাজেই প্রথম বৎসর সে জমিতে সব্‌জীর বীজ বপন করিলে ফসল খুব ভাল হয়, কিন্তু জমির সে উর্ব্বরতা বেশী দিন

থাকে না, এ জন্যই যাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত জমির উর্ব্বরতা সমানভাবে থাকে সেরূপভাবে জমি প্রস্তুত করিতে হইবে।

সব্জী-চাষের জন্য যে জমি নির্দ্দেশ করিবেন, সে জমি খুব ভাল করিয়া কোদাল দ্বারা কোপাইয়া লইতে হইবে; একান্ত পরিশ্রমী ও ব্যায়াম-প্রিয় গৃহস্থ নিজেও আমন্দের সহিত করিতে পারেন, নচেৎ মজুর লাগাইয়া প্রস্তুত করিবেন।

আপনাদের জেলার কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনাকে বহু বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন, যেমন—মাটি কি পরিমাণ গভীর করিয়া খুঁড়িতে হইবে ইত্যাদি, এসব বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করা ভাল; তবে আসল মাটির সীমা ছাড়িয়া নূতন মাটির দিকে খুঁড়িবার আবশ্যক করে না। জমি বুঝিয়া ১০" বা ৬" ইঞ্চির বেশী গভীর করিবার প্রয়োজন হয় না।

জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক। গোবরের সার খুব ভাল ও ফলপ্রদ। জমিতে প্রচুর পরিমাণে পুরাণ গোবরের সার দিবেন। সাবধান! কাঁচা গোবর দিবেন না। এইরূপ ভাবে সার মিশাইয়া জমি প্রস্তুত হইলে পর বাকী প্রয়োজনীয় কাজ গৃহস্থ নিজেই করিতে পারেন। যন্ত্র-পাতির মধ্যে শুধু একখানি কোদালি, একখানি কাস্তে বা বিদা আবশ্যক।

জমিতে কোনরূপ বুনো ঘাসের মূল, বা অন্য কোন আগাছা থাকিলে তাহা বেশ যত্ন পূর্ব্বক বাছিয়া ফেলিয়া জমিটিকে খুব ভালরূপ সমতল করিয়া ফেলুন। এইরূপ জমী তৈরী হইলে কি কি শাক্‌সব্‌জী উৎপন্ন করিতে চাহেন তাহা স্থির করিয়া কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সে সকল বীজ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। এখন জিজ্ঞাস্য, বীজ প্রথমে কোথায় বপন করিবেন? কেহ কেহ হাপরের জমিতে চারা প্রস্তুত করেন এবং চারা একটু বড় হইলে সেখান হইতে তুলিয়া আনিয়া জমিতে লাগাইয়া দেন। কোন্ কোন্ সব্জীর বীজ স্বতন্ত্র ভাবে বপন করিলে ভাল হয় এবং কোন্‌টী জমিতে বপন করিলেই সুফল ফলে সে কথা পরে বলিব।

এক্ষণে হাপরের বা চারা-ভিটির কথা বলি। ৬×৩ ফিট পরিমাণ জমি, চারা জন্মাইবার জন্য প্রস্তুত করুন। এই জমি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার, সারবান এবং সমতল করিতে হইবে। যাহাতে সামান্য পরিমাণও আগাছা বা কাঁটা ইত্যাদির মূল না থাকে সে দিকে খুব লক্ষ্য রাখিবেন। এখন এজমির উপর বেশ ভাল করিয়া ঘনভাবে বীজ ছড়াইয়া দিন। দেখিতে পাইবেন দু'চারিদিনের মধ্যেই অঙ্কুর জন্মিয়াছে। এখন আশানুরূপ চারা উৎপন্ন হইল। চারাগুলি একটু বড় হইল। অতি সন্তর্পণের সহিত একটী একটী করিয়া তুলিয়া লইয়া স্বতন্ত্র জমিতে লাগাইয়া দিন,—যাহাতে তরুণ চারাগুলির কোমল মূলে কোন রূপ আঘাত না লাগে; সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, মূল মাটিতে ধরিয়া যাইবার জন্য অল্প অল্প জল দিতে হইবে; তাহা হইলে ধীরে ধীরে গাছ এই নূতন মাটিতে লাগিয়া যাইবে। চারাগুলি ভালরূপ মাটিতে না লাগা পর্য্যন্ত—সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে যাহাতে ঝলসিয়া না যায়, সেজন্য কলাপাতা বা অন্য কিছুর ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া দিতে ভুলিবেন না। হাপরের উৎপন্ন চারাগুলির ন্যায় আবাদি জমিতে উৎপন্ন চারাগুলিরও কতক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক।

জমি সমতলভাবে প্রস্তুত হইলে পর, জমির পরিমাণানুযায়ী সমকোণী চারিটী ভাগ করিয়া লউন, উহার এক একটি ভাগ ১২×৩ ফিট চওড়া হইলেই ভাল হয়—ইহার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়া এক ফিট চওড়া পথ তৈরী করুন; এবং তাহার পাশ দিয়া অল্প গভীর কয়েকটি খানা কাটিয়া তাহাতে পাতলাভাবে অন্য যে কোন সবজী বপন করিতে ইচ্ছা হয় তাহা বপন করিয়া কোদালি দ্বারা হাল্কাভাবে মাটি দিয়া ঢাকিয়া ফেলুন—এইভাবে প্রত্যেক ভাগে প্রয়োজনানুরূপ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে খানা কাটিয়া ভিন্ন ভিন্ন বীজ বপন করুন। এইরূপ জমিতে কোন্ কোন্ শাক্‌সবজীর চাষ ভাল হইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা লেখা হইল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে ইহার বীজ বপন করিবেন এবং অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হাপরের জমি হইতে চারা তুলিয়া জমিতে লাগাইয়া দিবেন। প্রত্যেকটি চারা ১৮" ইঞ্চি অর্থাৎ একহাত পরিমাণ দূরে দূরে রোপণ করিবেন। প্রত্যহ ভোরের বেলা ও সন্ধ্যার সময় জল দেওয়া আবশ্যক। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে এই জাতীয় কপি ভালরূপ বাঁধিয়া যায় অর্থাৎ পাতায় জমাট বাঁধে নিজ নিজ বিবেচনানুসারে ফল দেখিয়া ইহা বাগান হইতে তুলিয়া লইবেন।

কপি (বাঁধা)।
(*Cabbage*)

আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে ফুলকপির বীজ চাপরে বপন করিবেন। চাপরের উপর খলপা বা চেটাইয়ের অনুরূপ কোন হাল্‌কা আবরণ দিয়া ছাউনি করিয়া দিতে হইবে।

ফুলকপি। (*Cauliflower*) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে চারা তুলিয়া লইবেন এবং বাঁধা কপির ন্যায় একহাত দূরে দূরে এক একটী চারা জমিতে বপন করিবেন। প্রত্যহ ভোর ও সন্ধ্যায় জল দেওয়া আবশ্যক। ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগেই ফুলকপির ফুল ফুটিতে থাকে ও খাদ্যের উপযোগী হয়। দেশীয় কপির বীজ হইতে উৎপন্ন ফুলকপিই সকলের আগে ফোটে—বিলম্বে ফুটিলেও বিদেশের আম্‌দানি বীজই উৎকৃষ্ট।

ওল কপি। (*Khol Rabi*) সেপ্টেম্বর মাসে চাপরে বীজ বপন করিয়া অক্টোবর মাসে চারা তুলিয়া আবাদী জমিতে লাগাইতে হয়, প্রত্যেক চারা ৯'' ইঞ্চি পরিমাণ দূরে দূরে বপন করিবেন। জানুয়ারী মাসে ইহা খাওয়ার উপযুক্ত হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যায় জল দেওয়া আবশ্যক।

সালাদ। (*Lettuce*) সালাদ দুই জাতীয়। সেপ্টেম্বর মাসে চাপরে করিয়া, অক্টোবর মাসে চারা তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ৬'' ইঞ্চি দূরে দূরে এক একটী চারা লাগাইয়া দিবেন। কেহ কেহ দুই বার করিয়া চারা তুলিয়া লইয়া রোপণ করেন, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। জমিতে লাগাইবার তিন সপ্তাহ পরেই ইহা খাওয়ার উপযোগী হয়।

বিলাতি শাক্। (*Spinach*) এই শাক্‌ও সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে বপন করিতে হয়। ৬" ইঞ্চি তফাৎ রাখিয়া ½ বা ১" ইঞ্চি পরিমাণ মাটি খুঁড়িয়া রোপণ করা বিধেয়। এই শাক্ তিন সপ্তাহের ভিতরেই খাইবার উপযোগী হয়, শাক কাটিবার সময় খুব গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিবেন না, কারণ গোড়ার দিক হইতে আবার নূতন পাতা গজাইতে থাকে।

ব্রাসেল স্প্রাউট। *Brussels sprouts* এই জাতীয় সব্‌জীর গোড়ার দিকে থোপা থোপা নিরেট পাতার গুচ্ছ জন্মে, উহাই খাদ্য। দক্ষিণ বাঙ্গালায় এই সব্‌জী ভাল জন্মে না, কিন্তু উত্তরবঙ্গ শীত-প্রধান বলিয়া সেখানে বেশ জন্মে। রোপিবার প্রণালী ঠিক বাঁধাকপির ন্যায়।

অক্টোবর মাসে বেশ পাতলা করিয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ গভীর মাটির সারি তৈরী করিয়া বীজ বপন করিবেন। চারাগুলি এক ইঞ্চি পরিমাণ উচু

শালগম (*Turnips*) হইলে তুলিয়া লইয়া প্রায় ৭" ইঞ্চি পরিমাণ দূরে দূরে রোপণ করিবেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় জল দেওয়া আবশ্যক। দুই মাসের মধ্যেই শালগম খাওয়ার উপযুক্ত হয়।

গাজর (*Carrots*) ইহার রোপণ-প্রণালী ঠিক্ শালগমের মত।

Parsnips পার্সিপস্ একরূপ মূলাজাতীয় শাক্, কতকটা গাজরের মত। ইহার রোপণ-প্রণালীও শালগমের ন্যায়।

বিট মূলার রোপণ-প্রণালীও শালগমের মত। হাপরে চারা জন্মাইবার পরে অন্যত্র লাগান যায়। সেইরূপ লাগাইবার সময় প্রত্যেকটী চারা ৬" ইঞ্চি

বিট মূলা (বিট)। দূর দূর রোপণ করিবেন। চারা তুলিয়া লাগাইবার সময় শিকড়ে যাহাতে কোনরূপ আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

লিক্. পেঁয়াজের ন্যায় একরূপ বিলাতী সবজী। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে বপন করিবেন। পরে চারা তুলিয়া লইয়া সার বাঁধিয়া লাগাইতে হইবে। প্রত্যেক চারা ৬" ইঞ্চি পরিমাণ দূরে দূরে রোপণ করাই ভাল। প্রত্যহ সন্ধ্যায়

লিক্ (*Leek*) জল দিবেন। শিকড়ের দিকের ডিমের মত সাদা অংশই আহার্য্য। কোন কোন অভিজ্ঞ কৃষক যাহাতে গোড়ার দিকটা বেশ স্থূল ও সুন্দর হয় সেজন্য কাগজ দিয়া উহা ঢাকিয়া দিয়া থাকেন। আলো প্রবেশ করিতে না পারায় গোড়াটা বেশ মোটা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামঝি লিক্ খাইবার উপযুক্ত হয়।

পিঁয়াজ (*Onion*)—ইহার রোপণ-প্রণালী ও ঠিক "লিকের" মত। যদি গোড়ার দিক হইতে ফুল বাহির হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিবেন।

এই পেঁয়াজগুলি দেখিতে খুব ছোট হয়, পাক না করিয়াও চিবাইয়া খাওয়া চলে। চারাগুলি সার বাধিয়া ½ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিবেন। তিন

ছোট পিঁয়াজ। সপ্তাহের মধ্যেই উহা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, অক্টোবর মাস হইতে

(*Spring onions*) আরম্ভ করিয়া প্রতি দুই মাস পর পরই ইহার বপন চলিতে পারে।

মটরও সারি বাঁধিয়া রোপণ করিতে হয়। প্রত্যেকটী সারি দুই ফিট অন্তর হইবে। খানাগুলি ১" ইঞ্চি পরিমাণ গভীর করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিবেন। চারাগুলি একটু বড় হইলেই যাহাতে বাড়িতে পারে সে জন্য বাঁশের কঞ্চি কিংবা পাটশলা বা খড়ি দাঁড় করিয়া দিবেন। তাহা হইলে চারাগুলি লতাইয়া লতাইয়া বাড়িয়া উঠিবে। দেশীয় বীজের চারা ৬ সপ্তাহের মধ্যে খাইবার উপযোগী হয় কিন্তু বিদেশ হইতে আনীত বীজের অঙ্কুরিত চারার খাওয়ার মত হইতে একটু বেশী সময় লাগে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে বীজ বপন করিবেন।

মটর (*Peas*)

বড় সিম্ বা মোগল সিম্—(*Broad Beans*) ইহার রোপণ-প্রণালীও ঠিক্ মটরের মত। বড় সিম্ দক্ষিণ বাঙ্গলায় ভাল জন্মে না।

সিম্ (*French Beans*) ইহাও মটরের ন্যায় রোপণ করিতে হয়।

থলো সিম্ (*Cluster Beans*) ইহার বীজও খানা করিয়া রোপণ করিতে হয়। ১১" ইঞ্চি দূরে দূরে চারা রোপণ করিবেন। এই চারাগুলি বড় হইলে দেখিতে ঠিক ঝোপের মত হয়।

বিলাতি বেগুণ—(*Tomatoes*) সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ইহার বীজ বপন করিয়া চারা বড় হইলে সারি বাঁধিয়া রোপণ করিবেন। দুই ইঞ্চি দূর দূর রোপণ করাই বিধেয়। চারাগুলি ৪" ইঞ্চি পরিমাণ উচু হইলে তবে তুলিয়া লইয়া অন্যত্র লাগাইয়া দিবেন। ভোরের বেলাও সন্ধ্যাবেলা জল দিবেন, খুব বেশী পরিমাণ জল দিবেন না। লাল, পীত বা জরদ এই দুই রংয়ের বেগুণ জন্মে; ফলের পক্কতা উহার গায়ের রং দেখিলেই বোঝা যায়, উহা আর লিখিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করেনা।

গোল আলু—(*Potatoes*) আলু হইতেই আলুর চাষ চলে। আলু রোপণ করিয়া চারা জন্মাইতে হইলে আলুটীর চোখগুলি ভাল কিনা দেখিয়া তবে লাগাইবেন।

বেশ ভাল সার দেওয়া জমিতে আলুর চাষ করিতে হয়। খানা করিয়া লউন—৩" ইঞ্চি হইতে ৬' ইঞ্চি পরিমাণ গভীর করিয়া খানা খুঁড়িবেন, খানা যেন ৯' ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া হয়। খানার নিম্নভাগে বীজের আলুগুলি ৬' হইতে ৯' ইঞ্চি অন্তর অন্তর রোপণ করুন। যদি আলু বড় হয় তাহা হইলে তিন চার টুক্‌রা করিয়া লাগাইয়া দিবেম। প্রত্যেকটী

টুকরারই যেন চোখ থাকে। তারপর মাটী দিয়া বীজগুলির উপরের জমি সমান করিয়া ঢাকিয়া দিবেন। চারাগুলি বাড়িতে থাকিলে খানা হইতে মাটী তুলিয়া লইয়া চারাগুলির গোড়া ঢাকিয়া দিবেন, এইরূপভাবে ঢাকিয়া না দিলে আলুগুলি খাওয়ার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

গাছের পাতাগুলি যখন মরিতে থাকে, তখনই আলু তুলিয়া লইবার প্রশস্ত সময়।

কৃষিসমাচার। শ্রীকেনিথ ম্যাকলিন।
মার্চ্চ। ২১

"কামরূপে কোচরাজকীর্ত্তি"

প্রবন্ধের ভ্রমসংশোধন ;

——:০:——

২৯৪ পৃষ্ঠা—৩য় পংক্তি—"দ্বিতীয় শ্লোকটি স্বয়ং লিখিয়া" ইহার পরে যে * (তারকা) চিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা সূচিত পাদটীকা ("গুণাভিরামের বুরঞ্জীতে আছে" ইত্যাদি) ২৯৭ পৃষ্ঠা ১১শ হইতে ১৪শ পংক্তিতে মুদ্রিত হইয়াছে। ২৯৬ পৃষ্ঠা ১০ম পংক্তি "কারু স্বয়ং শ্রীধরঃ॥" তৎপরে যে * (তারকা) চিহ্ন আছে, তৎসূচিত পাদটীকা (বিজনী অভয়াপুরী" ইত্যাদি) ২৯৪ পৃষ্ঠার নিম্নভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

২৯৮ পৃষ্ঠা † চিহ্নিত পাদটীকা ("গৌহাটী শহরে" ইত্যাদি) অতীব ভ্রমাত্মক। (ইহাতে শকাঙ্কও ভুল ছাপা হইয়াছে।) গৌহাটি শহরস্থিত জনার্দ্দনের মন্দিরের গাত্রে যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে ১৬৬৬ শকে ঐ মন্দির আহোমরাজ প্রমত্তসিংহের আদেশে নির্ম্মিত হয়। ইহা দেখিতে ঠিক ৺কামাখ্যা মন্দিরের অনুরূপ। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অশ্বক্রান্ত শৈলোপরি যে জনার্দ্দন মন্দির আছে তাহাও আহোমরাজকীর্ত্তি—কিন্তু দেখিতে ৺কামাখ্যা মন্দিরের ন্যায়। এতদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে আহোমরাজগণের সময়ে কামরূপে (অন্ততঃ) কোচরাজগণের প্রবর্ত্তিত মন্দির গঠন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

২৯৯পৃষ্ঠা—পাদটীকায় প্রথম পংক্তিতে আছে,—"এই শিলালিপির ছাপ এতৎসঙ্গে প্রদত্ত হইল।" প্রবন্ধলেখককর্তৃক প্রেরিত হইলেও ছাপটির চিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই।

প্রবন্ধলেখকস্য।

মায়া।*

—:*:—

ইয়াকোহামার রাস্তায় একজন জাপানী নারী চলিতেছিল—সে সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তার পিঠের উপর তিন বছরের শিশু মায়া বসিয়াছিল। মায়া তার আয়ার ঘাড় দুহাতে জড়িয়া ধরিয়াছিল—মুখে অনর্গল নানা কথা কহিতেছিল। বালিকার প্রতিটি কথায় আয়ার চক্ষু ঝরিতেছিল,—মায়া আজ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। আজ এই শেষ সে মায়াকে কোলে করিয়া ষ্টীমারে উঠাইয়া দিতে যাইতেছে!

চোখের জলে আয়ার মুখ ভাসিতেছিল, এই দু'বছর যে সে মায়াকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সব তাহার কাছে স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। মায়া চলিয়া যাইতেছে, মায়ার মতটি আর সে কোথায় পাইবে? আর সে মায়াকে পিঠে করিতে পারিবে না, আর সে তাহার ছোট হাত দুখানি দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিবে না, আর সে মধুর কথা শুনিতে পাইবে না, সহস্র চুম্বনে আর মায়া তাহার মুখ চোখ ছাইয়া ফেলিবে না।

পথে চলিতে আর কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে না "এ মেয়েটি কার গা? যেন স্বর্গের দেবী!"

আর কেহ তাহকে বলিবে না—"ওগো খুকীকে আমাদের বাড়ী এনো—ওর কথা শুনিতে বড় ভালবাসি আমরা।"

আজ সব শেষ, মায়া ঐ কাল ষ্টীমারে চড়িয়া চলিয়া যাইতেছে; আজ যেমন ষ্টীমার মায়াকে লইয়া যাইতেছে এমনি ক'বছর আগে তার স্বামীকেও চীনদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য ঐ ষ্টীমারই লইয়া গিয়াছিল! কত ভালবাসিত সে তাহাকে! সে জানিত তার স্বামী আর ফিরিয়া আসিবে না,—বীর যারা তারা কখনো ফেরে না। মরার মত হয়ে সে সেই ভীষণ সংবাদের আশায় বসিয়া রহিল। অবশেষে সংবাদ আসিল—"সে মরে গেছে।"

সে শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"বীরের মত মরেছে তো?"

* এই গল্পের লেখক B. N. Garine প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে "The Childhood of Temma" নামক উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম যথেষ্ট খ্যাতি উপার্জ্জন করেন। ১৯০৬ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

"হাঁ বীরের মত।"

মায়া যে নৌকায় দাঁড়াইয়াছিল, সে নৌকা হইতে ষ্টীমার ক্রমেই দূরে সরিতে লাগিল। ডেকের উপর হইতে মায়া দেখিতেছিল কেমন করিয়া ষ্টীমারখানা তাহাকে আয়ার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। মায়া অস্থির হইয়া হাত বাড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।— "আয়া! আয়া!"

বালিকা এই প্রথম জগতের কাছে বড় নিষ্ঠুরতা লাভ করিল। এ আঘাত তার প্রাণে বড় বাজিল—"আয়া—আয়া!" স্বর ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। ষ্টীমার দূরে সরিতেছিল, তীর ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছিল।

অশ্রুর উৎস মায়ার ক্রমে শুকাইয়া গেল। মায়া অশ্রুসিক্ত তিনটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আয়া যে দিকে দাঁড়াইয়াছিল সেই দিকে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার প্রথম বেদনায় অভিভূত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্নে সে আয়াকে তার খেলার সঙ্গীদের সব দেখিতে পাইল।

মায়ার বাপ, মা, যখন জাপান ত্যাগ করেন তারপর দু'বছর চলিয়া গেছে। এখন তারা মাঞ্চুরিয়াতে থাকেন। মায়া এখন চীনে কথা বেশ বলিতে পারে, ঠিক চীনে বালিকার মত কখনও গলায় কখনও বা নাকে রাখিয়া সে কথা বলে। এখন একটি চীনে বালক তাহাকে রাখে। মায়া তাহাকে ভাল বাসিত—তার হাতে চুমো খাইত, মায়া সব চীনেদেরই চুমো দিত। চীনেরা পাগলের মত ছেলেদের ভালবাসে, কখনও তাদের তিরস্কার করিতে জানে না। মায়াকে তাহারা খুব ভাল বাসিত। যখনই মায়া 'বয়কে' সঙ্গে লইয়া সহরে যাইত চীনেরা ফল, মিষ্টি কত কি মায়াকে দিত। তার মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া বলিতেন "মেয়েটাকে এই সব খাইয়ে মেরে ফেলবে না কি?" কিন্তু মায়া সেই চীনে মেঠাই আনন্দ সহকারে খাইত।

মায়ার চুলগুলি এখন দীর্ঘ ঢেউ খেলান হইয়াছে। স্তরে স্তরে উচ্ছ্বসিত তার হাসি, মধুর সরল ভালবাসা তার সকলের উপরে।

মায়া মাঝে মাঝে মার কাছে না বলিয়াই রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িত। এই জন্য একদিন তার মা তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন, মায়া খুব কাঁদিতে লাগিল, পরে বলিল

"বন্ধই কর আর যাই কর, আমি আবার পালাব, আমি মরে গেলে আর তুমি মুয়াকে পাবে না, তখন শুধু তোমায় কাঁদতে হবে।

মায়ার কান্না দেখিয়া 'বয়' ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত "আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেল, তারপর আমাদের খেলনা দাও।" সহসা সব বদলিয়া গেল। কোন চীনে আর তাহাদের বাড়ী আসিত না—মায়াকেও কাছে যাইতে দিত না। বয় সব সময় কাঁদিত। মায়া তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিত না, পরে একদিন 'বয়' গোপনে মায়ার মার কাছে বলিল "চীনেরা সব তোমাদের মেরে ফেলবে, তাই আমি কাঁদছি। তারা আমায় এ জায়গা ছাড়তে বলেছে।"

একদিন মায়া উঠিয়া দেখিল তার 'বয়' নাই, মা তাহাকে পোষাক পরাইতে আসিয়াছেন।

"বাঃ বয় কোথায় ?"

"বয় চলে গেছে"—

"কোথায় গেছে ?"

"সে একেবারে চলে গেছে আর আসবে না"

"প্রথমে আয়া গেল, তারপর বয়ও যাবে আর আমি কাকো ভাল বাসবো না, তাকে এনে দাও।"

একদিন একদল চীনে বাড়ীর কাছে আসিল। তাহাদের হাতে সব রিভলবার, তলোয়াড়। ভয়ে আড়ষ্ট গৃহবাসী সব জানালা দিয়া গোপনে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ চীনেদের মধ্যে মায়া তার 'বয়'কে দেখিতে পাইয়া এক মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া অলক্ষ্যে বাহির হইয়া একেবারে দৌড়াইয়া তাহার কাছে উপস্থিত—দূরে থাকিতেই মায়া বলিল "আমি জানতেম,—তুমি ফিরে আসবে, আমি তাই বলেছি।" মায়া দু'হাতে বয়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

কেহ বালিকার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না, সকলেই তাহাকে কোলে নিতে ব্যগ্র। মায়ার বাপ তাদের কিছু টাকা দিলে তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেল। মায়া তার বয়ের হাত ধরিয়া বলিল—

"যখন আমরা বড় হব,—তখন আয়ার কাছে যাব—তিন জনে এক সঙ্গে থাকবো

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগার